সৌরভ

সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচন।

—সম্পাদক—

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

—দশম বর্ষ—

মাঘ ১৩২৮ হইতে পৌষ ১৩২৯

ময়মনসিংহ।

বার্ষিক মূল্য—দুই টাকা।

PUBLISHED FROM
RESEARCH HOUSE—MYMENSINGH.

বিষয় সূচী।

দশম বর্ষ। ময়মনসিংহ, মাঘ, ১৩২৮ সন। প্রথম সংখ্যা।

শঙ্করের জগৎ কি একান্ত অসৎ ?

আমাদের জাতীয় সাধনা হইতে আমরা এরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি যে, সম্যক্ পরিচয়ের অভাবে যে হিন্দুদর্শন আজ সকল সভ্য জাতির বিস্ময়শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে তাহার মূল সিদ্ধান্ত গুলি সম্বন্ধেও আধুনিক শিক্ষিত ভারতবাসীদের মনে গুরুতর ভ্রান্ত সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। তাই সময়ে অসময়ে শঙ্করের বিরুদ্ধে এই নালিশ শুনিতে পাওয়া যায় যে তাঁহার মায়াবাদ এই দৃশ্যমান বাহ্য জগৎটাকে আকাশ-কুসুমের মত অলীক, স্বপ্নের ন্যায় ভুঁয়া বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে, এবং ইহার ফলে সমগ্র হিন্দু-জাতিটার কর্ম্মপ্রবৃত্তির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া জাতিটাকে নিশ্চেষ্ট অথর্ব জড়বৎ করিয়া দিয়া সর্ব্বপ্রকার অভ্যুদয়ের পথ রুদ্ধ করিয়াছে!

যাহারা সামান্যভাবেও শঙ্করের গ্রন্থাদির সঙ্গে পরিচিত, এমন কি যাহারা Prof. Max Muller এর "The six Systems of Indian Philosophy" নামক গ্রন্থের পৃষ্ঠা গুলি একবার উল্টাইয়া গিয়াছেন তাহারা জানেন, শঙ্কর একদিকে যেমন নির্গুণ নির্ব্বিশেষ নিত্যবুদ্ধ-শুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মকে একমাত্র পারমার্থিক সত্তা বলিয়া অখণ্ডনীয় যুক্তিপরম্পরা ও বেদান্তবাক্যের অপূর্ব্ব সমন্বয় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তেমনি অপরদিকে এই জগৎ চরাচরের ব্যবহারিক সত্তা (Phenomenal existence) স্বীকার করিয়াছেন। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ জগতের সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আদান-প্রদান লেনা-দেনা চলিতেছে, তাই ইহাকে একান্ত অসৎ, স্বপ্নের ন্যায় অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিনা, অথচ সেই একমাত্র পারমার্থিক ধ্রুব সত্তা ব্রহ্মের সঙ্গে তুলনায় এই নিয়ত পরিণামশীল জগৎপ্রবাহকে একান্ত ভাবে সৎ অর্থাৎ ধ্রুবও বলিতে পারি না। অতএব এই সমস্যার সুমীমাংসার জন্য, এই ব্যবহারিক সত্তাবিশিষ্ট কিন্তু পরিণামশীল দৃশ্য জগতের ব্যাখ্যার জন্য, এই পরিণামী নামরূপে ব্যক্ত ব্যবহারিক সত্যের সঙ্গে সেই সর্ব্বপরিণামরহিত নির্ব্বিশেষ নিরবয়ব একমাত্র সত্যের সম্বন্ধাসম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্যই মায়াবাদের উদ্ভব।

এই পরিদৃশ্যমান জগতকে একান্ত সত্তাহীন বলা যায় না, তাহা স্বপ্নদৃশ্যের ন্যায় কিম্বা মরীচিকায় জলভ্রমের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে বাধিত হয় না, অথবা 'বন্ধ্যাপুত্রের' ন্যায় তাহা উদ্ভট কল্পনা বা 'তুচ্ছ' নহে, অপরন্তু তাহার প্রাতিভাসিক, ব্যবহারোপযোগী সত্তা "আছে—ইহা" "ব্রহ্ম-সূত্রের" শাঙ্কর ভাষ্যের সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট। বৌদ্ধ শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ প্রভৃতি মতবাদের খণ্ডনচ্ছলে "ব্রহ্মসূত্রের" দ্বিতীয় অধ্যায়, ২য় পাদ, ১৮শ হইতে ৩২শ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর অকাট্য যুক্তি-বলে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে এই নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়-জগৎ সত্তাবিহীন নহে, পক্ষান্তরে বিষয়বৈচিত্র্যের অস্তিত্ব ভিন্ন মানসিক বিজ্ঞানবৈচিত্র্য অসম্ভব। শুধু তাই নহে— এই জগতের অনন্ত বৈচিত্র্য, ইহার রচনা-নৈপুণ্যের অচিন্ত্যত্ব, ইহার সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের নিয়ত অলঙ্ঘ্য বিধিপরত্ব প্রভৃতি স্বীকার ও লক্ষ্য করিয়াই এবম্বিধ জগতের কারণ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। যথা—"অস্য জগতঃ নাম-রূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্য অনেককর্ত্তৃ-ভোক্তৃ-সংযুক্তস্য প্রতিনিয়তদেশ কাল-নিমিত্ত-ক্রিয়া-ফলা-শ্রয়স্য মনসাপি অচিন্ত্যরচনারূপস্য জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গং যতঃ

সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাৎ ভবতি তদ্‌ব্রহ্ম।" ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য ১।১।২।— আবার, আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত বিশ্বচরাচরের অনাদি সৃষ্টিস্থিতি-লয়-চক্র যে নিয়ত বিধানে বিধৃত ও আবর্ত্তিত হইতেছে তাহা বিধাতারও অলঙ্ঘনীয়- ইহা শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ১ম অধ্যায়, ৩য় পাদ ৩০ সূত্রের ভাষ্যে বিশদ করিয়াছেন। তাই জগতের ব্যবহারিক সত্তাবিষয়ে শঙ্করের দর্শনে এইরূপ ভূরি ভূরি অভ্রান্ত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও যদি আমরা বলি যে শঙ্কর শূন্যবাদী বৌদ্ধদের মত জগৎকে শূন্যে বিলীন করিয়া দিয়াছেন তবে সে অপরাধ শঙ্করের কিম্বা আমাদের অজ্ঞতার তাহা বিজ্ঞগণের বিচার্য্য।

জগৎ সৎ বটে, কিন্তু ইহা সেই অর্থে সৎ নহে যে অর্থে ব্রহ্ম সত্য। পরমার্থতঃ সৎ তাহাই যাহা সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বাবস্থায় নির্ব্বাধ (persistent)—যাহার স্বরূপের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান, কোন কালে, জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-তুরীয় কোন অবস্থায় ব্যভিচার হয় না। কিন্তু জগৎ অনবরত পরিণত হইতেছে, রূপান্তরিত হইতেছে, যদিও আমাদের ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে যতটা নির্ব্বাধতার প্রয়োজন ততটা ইহাতে রহিয়াছে। স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থনিচয় জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ বাধিত হয়, অথবা স্বল্পালোকে দৃষ্ট রজ্জুতে সর্প-দর্শন যেমন স্পষ্টালোকিত রজ্জুর জ্ঞানদ্বারা অপনীত হয়, সেইরূপে জগদ্দৃশ্যের জ্ঞান বাধিত হয় না বটে, এবং সেই অর্থে জগৎ সৎ। কিন্তু ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহুনাম-রূপাত্মক জগতের সত্তা বাধিত হয়। কারণ, এই অবস্থায় জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের ভেদ অপনীত হইয়া এক অদ্বিতীয় সত্য-জ্ঞান-অনন্ত-স্বরূপ স্বপ্রভায় প্রকাশিত হন। তাই— "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" [যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হন]

"যস্যামতং তস্য মতং, মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং, বিজ্ঞাতং অবিজানতাম্‌॥"

[(ব্রহ্ম) যাহার অজ্ঞাত তাহারই জ্ঞাত, যাহার জ্ঞাত তাহার অজ্ঞাত। তিনি জ্ঞাতৃগণের অবিজ্ঞাত, এবং অবিজ্ঞ-গণের বিজ্ঞাত *] ইত্যাদি শ্রুতি-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শঙ্করাচার্য্য আপনার সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

আপত্তি হইতে পারে যে, জগতের যদি প্রকৃত, পারমার্থিক সত্তা না রহিল তাহা হইলে ত ইহা অসত্যই হইয়া পড়িল? হাঁ, এই অর্থে জগৎ অসৎই বটে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত মানুষের ব্রহ্মাত্মৈকত্বের অপরোক্ষ উপলব্ধি না হইয়াছে সেই পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে জগৎ ও আছে। আর, এই সুখ-দুঃখ-শোক-মোহের হেতুভূত বিষয়-জগৎ বস্তুতঃ নিত্য নহে ইহাতে ক্ষুব্ধ হইবার ত কারণ নাই। যাহা আপাত মধুর কিন্তু পরিণামে অশেষ দুঃখের আকর সেই বিষয়-জগৎ যদি চিরন্তন হইত তবেই ত আমাদের দুঃখ-শোক ও নিত্য হইত। এই নিত্যানিত্য বিবেক হইতে যে সংসার-বিরাগ জন্মে তাহাই, শুধু অদ্বৈত-বাদীর মতে নহে, সকল ধর্ম্মাবলম্বিগণের মতেই, প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবনের প্রবেশ-দ্বার, ইহাই অমৃত আনন্দ-লোক উত্তীর্ণ হইবার প্রথম সোপান। তাই শঙ্করের "বিবেক-চূড়ামণি" ও "মোহমুদ্গর" জড়বাদ-মুগ্ধ আমাদের ক্ষণিক ইন্দ্রিয়-সুখের স্বপ্নকে নিদারুণ ভাবে আঘাত করে বলিয়া আমরা আপাতত যতই ক্ষোভ প্রকাশ করি না কেন, তাঁহাকে সমাজ-সংহারক, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ইত্যাদি বিশেষণে যতই আখ্যাত করি না কেন, যখনি সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দৃষ্টি মৃত্যু হইতে অমৃতের দিকে ফিরিবে তখনই বুঝিব এই ঘোর ভবার্ণবতরণের নৌকা-স্বরূপ অদ্বৈত-জ্ঞানের সন্ধান দিয়া তিনি আমাদের অশেষ হিতসাধন করিয়াছেন।

আজকাল প্রায়শঃই এই প্রশ্ন শুনা যায়—শঙ্কর-প্রচারিত অদ্বৈত-সিদ্ধির উপায়রূপে ত সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাস উপদিষ্ট হইয়াছে, অতএব এই সাধন অবলম্বন করিলে মানুষ বাধ্য হইয়া সংসার-বিমুখী, সর্ব্বলোক-হিতকর-কার্য্যবিরত ও অকর্ম্মা হইয়া পড়িবেই। সুতরাং শঙ্কর প্রবর্ত্তিত অদ্বৈত-পন্থীদের বিরুদ্ধে সমাজ-পরি-পন্থিত্বের অভিযোগ অব্যাহতই রহিল? না, ইহাও সত্য নহে। যে নিত্যানিত্যবিবেক, ঐহিক ও পারত্রিক ভোগ-বিরাগ, মুমুক্ষুত্ব এবং শমদমাদি সাধন-সম্পদ্‌কে শঙ্কর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা (অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের ইচ্ছা) সঞ্জাত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও অধিকাংশ স্থলেই নিত্যনৈমিত্তিক, শাস্ত্রবিহিত এবং লোকহিতকর কর্ম্মানুষ্ঠানকে অপেক্ষা করে। কারণ,

* অর্থাৎ যাহারা ব্রহ্মকে আপনা হইতে পৃথক্ জ্ঞেয় বস্তু বলিয়া জানেন, তাহাদের প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে নাই। পক্ষান্তরে, যাহাদের জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ের দ্বৈতভাব অন্তর্হিত হইয়া ব্রহ্মাত্মজ্ঞানজাত হইয়াছে তাহারাই প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্‌।

মোক্ষ লাভের উপায়স্বরূপে (কিন্তু ঐহিক কি পারত্রিক ভোগের উদ্দেশ্যে নহে এইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত বাসনা-মুক্ত হইলেই তাহা ব্রহ্মোপলব্ধির যোগ্যতা লাভ করে তাই শঙ্কর, "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" (ব্রহ্মসূত্র ২। ১। ১৪ সূত্র) এই সূত্রের ভাষ্যে, ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক সত্তা হইলেও লৌকিক ব্যবহার, বৈদিকাদি কর্ম্মানুষ্ঠান এবং গুরুশিষ্যভেদাপেক্ষ বেদান্তানুমোদিত সাধন-প্রণালী কিপ্রকারে সম্ভব হয় তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন :— সর্ব্বব্যবহারাণামেব প্রাগ্‌ব্রহ্মবিজ্ঞানাৎ সত্যত্বোপপত্তেঃ, স্বপ্নব্যবহারস্যেব প্রাক্ প্রবোধাৎ। যাবদ্ধি ন সত্যাত্মৈকত্বপ্রতিপত্তিস্তাবৎ প্রমাণ-প্রমেয়-ফললক্ষণেষু ব্যবহারেষু অনৃতবুদ্ধির্ন কস্যচিৎ উৎ-পদ্যতে; বিকারানেব ত্বহং মমেত্যবিদ্যয়া আত্মাত্মীয়ভাবেন সর্ব্বো জন্তুঃ প্রতিপদ্যতে স্বাভাবিকীং ব্রহ্মাত্মতাং হিত্বা। তস্মাৎ প্রাগ্ ব্রহ্মাত্মতাপ্রবোধাৎ উপপন্নঃ সর্ব্বো লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ।"—অর্থাৎ জাগরিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যেমন স্বপ্ন ব্যবহার সত্য তেমনি ব্রহ্মাত্মৈকত্ব উপলব্ধির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমস্ত লোকব্যবহারই সত্য বলিয়া উপপন্ন হয়। যে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম ও জীবে একত্ব বোধ না জন্মে সে পর্য্যন্ত প্রমাতৃ প্রমেয় ও প্রমার ভেদমূলক লৌকিক ব্যবহারকে কোন মানুষ মিথ্যা বলিয়া মনে করে না; পক্ষান্তরে অবিদ্যাবশতঃ আপনার স্বাভাবিক ব্রহ্মস্বরূপতা ত্যাগ করিয়া বিকার-সমূহকে "আমি" "আমার" বলিয়া গ্রহণ করে। অতএব সিদ্ধ হইল যে ব্রহ্মাত্মবোধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সকল লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানই প্রচলিত থাকে।

আমরা দেখিতে পাইলাম, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের মূলোচ্ছেদ করে এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। পক্ষান্তরে এই বেদান্ত দর্শন মানুষের ব্রহ্মত্ব, অনন্তত্ব ঘোষণা করিয়া মানবজীবনের অসীম সম্ভাবনীয়তা সপ্রমাণ করিয়াছে। এই বেদান্ত শুধু তত্ত্ব মাত্র নহে, শুধু মানসী শক্তির বিলাস-লীলা নহে—ইহা জীবনের কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই কর্ম্মের বন্ধন অর্থাৎ সংসারোৎপাদিকা শক্তি কি প্রকারে বিনষ্ট করা যায় এবং সর্ব্বদুঃখলেশহীন অমৃতত্ব লাভ করা যায় সেই সাধন-প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। মানব-মণ্ডলীর প্রকৃত সাম্য, মৈত্রী স্বাধীনতা কি, সর্ব্ব মানব জাতির অটল ঐক্য-ভূমি কোথায়,—মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে বাদ-বিসম্বাদ, হানাহানি, রক্তারক্তির উপশমের প্রকৃষ্ট পন্থা কি, তাহা এই বেদান্তত্বই আবিষ্কার করিয়াছে। তাই, অদ্বৈত-দর্শনের কল্যাণকারিণী শক্তি সম্বন্ধে আমরা সন্দেহ প্রকাশ করি এতদপেক্ষা শোচনীয় অজ্ঞতা আর কি হইতে পারে!

শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর।

স্নেহের দান।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কুলকলঙ্কিনী পদ্মার তীরে নন্দীগ্রাম অবস্থিত ছিল। এই গ্রামের হরসুন্দর তর্কালঙ্কার দুই পুত্র রাখিয়া দেহ ত্যাগ করেন। জ্যেষ্ঠ রাম কানাই, কনিষ্ঠ বলরাম। তর্কালঙ্কার পৈত্রিক যজমান রক্ষা করিয়া কোন মতে দিন কাটাইয়া গিয়াছিলেন; পুত্র দিগকে বিশেষভাবে সময় উপযোগী শিক্ষা দিয়া মানুষ করিয়া তুলিবার তাঁহার ক্ষমতা ছিলনা। সুতরাং কানাই ও বলাইর যাহা সামান্য শিক্ষা তাঁহার নিজের টোলে ও গ্রাম্য বিদ্যালয়ে হইয়াছিল, তাহাই যথেষ্ট বলিয়া পিতা মনে করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

রামকানাই গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুল হইতে বৃত্তি পরীক্ষায় পাস হইয়াছিলেন। বলাই পিতার নিকট মুগ্ধ-বোধ পর্য্যন্ত পড়িয়া পৈত্রিক যজমান রক্ষা করিবার মত বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ফলে জ্যেষ্ঠ হইয়াছিলেন নন্দীগ্রাম স্কুলের হেড্ পণ্ডিত, কনিষ্ঠ পৈত্রিক-বৃত্তিধারী পুরোহিত। উভয়েই ছিলেন পিতার ন্যায় অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু।

রামকানাইর দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠপুত্র যদু ও কনিষ্ঠ মধু এবং এক কন্যা পুঁঠি। বলরামের একমাত্র পুত্র মাখন। মাখন ও মধু সমবয়স্ক। পুঁঠি সকলের ছোট। ছেলেরা স্কুলে পড়িতেছে।

রামকানাই ও বলরামের মধ্যে যেরূপ গাঢ় প্রাণের বন্ধন ছিল, তাঁহাদের স্ত্রীদ্বয়ের মধ্যেও সেইরূপ আন্তরিক ভাব বিদ্যমান ছিল।

একদিন অপরাহ্নে কানাই বলিলেন—"বলাই চল আমরা পৃথক হই"।

কথাটা মুখ হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া তাঁহার মনে বড়ই কষ্ট বোধ হইতেছিল; তিনি বলাইর মুখের দিকে চাহিয়া হাসি মুখে সে কষ্ট চাপিবার চেষ্টা করিলেন। বলাই দাদার মুখের দিকে চাহিয়া তারপর মাথা অবনত করিয়া বলিলেন—"এমন কথা বলিলেন যে দাদা?"

কানাই হাসিমুখে বলিলেন—"এখন আমাদের মধ্যে বেশ সদ্ভাব আছে, এই সদ্ভাব বর্ত্তমানে পৃথক হইয়া থাইলে সে ভাবে আঘাত পড়িবে না। বিশেষ দেখিতেছ এ কালের আবহাওয়াও সেই প্রাচীন হিন্দু—একান্নবর্ত্তী পরিবার রক্ষার অনুকূল নহে।"

বলাই বুঝিলেন দাদার পরিবারে পোষ্য বেশী, তাই তিনি ভাইয়ের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশে এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলিলেন—আপনার পরিবারে ভগবানের ইচ্ছায় দুটী প্রাণীর সংখ্যা অধিক—ইহাই যদি এই প্রস্তাবের কারণ হয় সেটা খুব গুরুতর কারণ আমি মনে করি না। যজমান যজাইয়া যাহা পাই তাহার ও তো দাদা আপনি অর্দ্ধেকের অংশী, তার উপরও আপনার বার টাকা মাসিক বেতন আয় আছে। আপনার কুণ্ঠিত হইবার বিষয়তো কিছুই দেখি না!"

কানাই বলিলেন—"আমি মনে করি যদি দুই ভাইতে বেশ সদ্ভাবে থাকিয়া আপোষে পৃথক হই—তারপর কখন কি হয়—আজকালকার ছেলে পেলের ভাব গতিক—তাহা হইলে আমাদের অভাবে এ গুলি কিলা কিলি করিয়া লোক হাসাইবে না।"

বলাই বলিলেন—"এ সম্বন্ধে বৌঠাকুরাণীর কি মত? তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি?"

কানাই—"প্রয়োজন মনে করি নাই। আমাদের ভাই ভাইর মধ্যেই পরামর্শ সঙ্গত, অন্যের নিকট বিশেষ মেয়ে মানুষের পরামর্শ এ সকল কার্য্যের ভিতর থাকা কদাপি উচিত নয়।"

বলাই—"বলেন তো আমিই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি।"

কানাই—"অনাবশ্যক; তবে তুমি যদি জিজ্ঞাসা করিতে চাও, উভয়কেই জিজ্ঞাসা করা উচিত।"

"তবে তাই করি।" বলিয়া বলাই খরমের চটাপট্ ধ্বনি তুলিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন। কানাই ছেনি হাতে লইয়া বাগানে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভট্টাচার্য্য-বাড়ীর ভিতরের আঙ্গিনায় পাঁচখানা ঘর। উত্তরের ভিটের বড় ঘরে রামকানাই বাস করেন, পশ্চিমের অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর বলাইর। পূর্ব্ব ভিটের ঘরে ছেলেরা পড়াশোনা করে, নিরামিষ পাকের প্রয়োজন হইলে সেই ঘরেই হইয়া থাকে। দক্ষিণের ছোট ঘরে ঢেকীর বাসা। উত্তরের ঘরের পূর্ব্ব-কোণে ক্ষুদ্র পাকশালা। মধ্যস্থলে একখানা ক্ষুদ্র গৃহে গৃহদেবতা স্থাপিত। বাহির আঙ্গিনায় তিনখানা ঘর; উত্তরের চৌচালা ঘরে ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা বসিয়া থাকেন; পশ্চিমে গোশালা, পূর্ব্বদিকে খড়ের ঘর। দক্ষিণে কোন ঘর নাই। সেখানে একখানা বাগান—তাহাতে ফলমূল তরকারী সবই কিছু কিছু হইয়া থাকে। তারপর পুষ্করিণী।

উত্তরের বড় ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলাই ডাকিলেন "বৌঠাইন ঘরে আছেন কিরে পুঁঠি!"

পুঁঠি ডাকিয়া বলিল—"ওমা কাকা ডাকেন।"

বৌঠাকুরাণীও শুনিয়াছিলেন; তিনি তখন তরকারী কাটিতেছিলেন, তরকারী কাটা বটিখানা কাত করিয়া রাখিয়া তরকারী বাটিতে হাত ডুবাইয়া ধুইয়া তাহা নিজ পরিধানের মলিন বস্ত্রে মুছিয়া অবগুণ্ঠন মুখের উপর একটু টানিয়া ধরিয়া আসিয়া দেবরকে সম্বোধন করিলেন "আমাকে ডাকিয়াছেন?"

বলাই বলিলেন—"দাদা প্রস্তাব করিতেছেন আমরা পৃথক হইতে—আপনি কি বলেন এ বিষয়ে?"

বউ ঠাকুরাণী বয়সে বলাইর সমান—উভয়েরই বয়স ৩০। ৩২ এর মধ্যে। দেবরের সঙ্গে কথা বলিলেও তিনি ঘোমটা এক হাতে না ধরিয়া কথা বলেন না। তিনি বলিলেন—"কি বলিলেন, আমি বুঝিতে পারিলাম না।"

বলাই হাসিয়া বলিল—"দাদা বলিতেছেন আমরা দুই ভাই পৃথক অন্ন হইতে..............." বধূ রাগ করিয়া বলিলেন—"আপনার দাদা পাগল হইয়াছেন, এ কুবুদ্ধি তাহাকে কে দিল? আপনি কি বলিয়াছেন?"

বলাই—"আমি আপনার মত জানিয়া বলিব—বলিয়াছি

বৌঠাকুরাণী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"তবে আমি মত দিলাম না; ছোট বৌ কি বলে?"

বলাইও হাসিয়া উত্তর করিলেন—"সে দরবার করি নাই; হাইকোর্টের যখন মত হয় না, তখন আর জজের কথায় কি হইবে?"

বলরাম ভট্টাচার্য্য বৌঠাকুরাণীর রায় লইয়া নিজের ঘরে গেলেন।

বলাই ঘরে গিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞসা করিলেন 'ওষুধ খাইয়াছ কি?'

স্ত্রী রোগ-জীর্ণ ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর করিল—"না আমি আর ওষুধ খাইব না; শরীর আমার আর চলে না……

"যত দিন প্রাণ থাকে বাঁচিতেই হইবে; ওষুধ না খাইলে চলিবে কেন?"

"আমার আর উঠিবার শক্তি নাই, কবিরাজী ওষুধ কে আনে কে ছেঁচে কুটে? শরীরটাও আর ভাল পাইতেছি না—যেন কেমন কেমন করিতেছে, মাখন কোথায়?"

স্ত্রীর কথা শুনিয়া বলরাম তাহার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া বলিলেন—কি রকম করিতেছে তোমার শরীর? কবিরাজ মহাশয়কে খবর দিব কি?

ছোট বৌ বলিল "মাখন কোথায়?"

বলরাম—মাখন-মধু বুঝি লইয়া তোমার জন্য মাছ আনিতে গিয়াছে। পুঁঠিকে বলিলেইতো ওষুধটা ছেঁচিয়া দিত।"

"ওকি তার কিছু জানে; আমি আর এ ওষুধ খাইব না। ওতে আমার কিছুই হইবে না।"

স্ত্রীর কথা শুনিয়া বলরাম বাহির হইয়া দাদার সহিত স্ত্রীর চিকিৎসার পরামর্শ করিতে যাইবেন বলিয়া উঠিলেন—এমন সময় বড় বৌ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৌঠাকুরাণীকে দেখিয়া বলরাম বুঝিলেন তাহার কি বলিবার আছে—বলরাম দাঁড়াইলেন।

বউঠাকুরাণী মুখের উপর ঘোমটা টানিয়া বলিলেন—আজ ওর মাথাটাও ঘুড়িতেছে দাস্তও খুব বেশী হইতেছে, কবিরাজ মহাশয়কে ডাকিয়া একটু ধনেশ্‌পক্ষীর তৈল ব্যবস্থা করিতে বলেন না…।"

বলরাম হাসিয়া বলিলেন—"ধনেশ্‌পাখীর তেল আর সুতিকান্ত বড়িতেই কি রোগ যাবে? আর তাই বা ব্যবহার হইতেছে কোথায়?"

বড়বৌ বলিলেন—"সুতিকা রোগীর মাথাটা ঠাণ্ডা থাকিলেই ব্যারাম গেল………"

বলরাম—"ডাক্তার ডাকা সম্বন্ধে আপনার কি মত?"

বড় বৌ—"ডাক্তার আয়ু দিতে পারে না, অনর্থক জাত মারিয়া পরকালটাও নষ্ট করিবেন না। স্ত্রীলোকের প্রাণ আর বিড়ালের প্রাণ—তাকি এত সহজে যায়? কাল বরং একটু সন্তয়ণ করুণ।"

"আচ্ছা যাই দাদা কি বলেন?" বলিয়া বলরাম চিন্তান্বিত মনে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

ডাক্তার ডাকা সম্বন্ধে পূজা আহ্নিকপরায়ণ নিষ্ঠাবান হিন্দু রামকানাইরও কিছুতেই মত হইল না; সুতরাং বড় বধুর ব্যবস্থাই শিরোধার্য্য করিয়া বলরাম কবিরাজ মহাশয়কে ডাকিয়া আনিয়া দেখাইলেন এবং ধনেশ পাখীর তৈল ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিলেন। কবিরাজ তাহাই করিলেন।

আহারের জন্য কবিরাজ সাবুদানা ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু বড় বৌ তাহা নামঞ্জুর করিয়া বর্দ্দিতে মারা কৈ মৎস্যের ঝোল ও পুরাতন চাউলের ভাত ব্যবস্থা করিলেন।

সেকালের একান্নবর্ত্তী পরিবারের পারিবারিক যাবতীয় ব্যবস্থাই এইরূপ গৃহের কর্ত্তা বা কর্ত্রী করিতেন, তাহা ভাল কি মন্দ ব্যবস্থা, তাহার ফলে বিপদ বাড়িবার সম্ভাবনা হইলেও তাহা লইয়া কোন আলোচনা হইত না, সেটাকেই সুব্যবস্থা বলিয়া সকলে স্বীকার করিত। এই জন্যই তখনকার একান্নবর্ত্তী পরিবার এত সুখের ও এত শান্তির ছিল।

রাত্রির আহারের পর বলাই স্ত্রীর কেশশূন্য তালুতে ধনেশ পাখীর তেল টিপিতে টিপিতে বলিলেন—"শুনিয়াছ কি আমরা যে পৃথক-অন্ন হইব।"

ছোট বৌ স্বামীর মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল—"এমনকি দৌলত দেখা দিয়াছে যে পৃথক-অন্ন খাইতে সখ হইয়াছে?"

"দৌলত বেশী হইলেই কি লোক পৃথক-অন্ন হয় ?"

"তখন লোভে পৃথক-অন্ন হয়।"

"আমাদের তাহা হয় নাই, তবু আমরা হইব।"

"আমি মরিয়া যাই, তারপর যাহা হয় হউক।"

"মরিবে তো সকলি—বাঁচিয়া থাকিতেই হউক না।"

"ভাসুর ঠাকুর কি বলেন, দিদি কি বলেন, তাহাদের মত জানিয়াছ কি ?"

"দাদাই পৃথক হইবার প্রস্তাব তুলিয়াছেন।" ছোট বৌ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল— ভাসুর ঠাকুর দেবতার মত মানুষ ; আমার বোধ হয় মাঐ মা আসিবেন বলিয়াই তিনি পৃথক হইতে চাহিতেছেন। মাঐ মার সঙ্গে কারো বনিত্ত হয়না ; নিজের পেটের মেয়ের সঙ্গেও না তাতো সেবারেই দেখা গেল।"

"তাঁর আসিবার কথা হইয়াছে না কি ?

"দিদির যে সন্তান সম্ভাবনা, আমার ও এই অবস্থা আমি ভাল থাকিলে দিদিই তাঁর মার নিকট যাইতেন ; তার দাদার মারা যাওয়ার পর তিনি যাইতে পারেন নাই ; মা-বাপ-মরা দুইটা ছেলে মেয়ে লইয়া বুড়ীই বা এখন যায় কোথায় ? কেই বা তত্ত্ব-তালাপি করে ? দিদি বলিয়াছিলেন—তোমাদের মত হইলে ছেলে মেয়ে সহ মাঐ মাকে এখানেই আনাইবেন।"

"দাদাতো আমাকে এ কথা বলেন নাই !"

"বলিলে কি তুমি আপত্তি করিতে ?"

"তা কেন করিব।"

"সেরূপ ভাবিয়াই তিনি তাহা বলেন নাই।"

"আচ্ছা— পৃথক হওয়া সম্বন্ধে তোমার মত কি ?"

এমন দাদার আশ্রয় ত্যাগ করা আমি ভাল মনে করি না। দিদিও সোনার মানুষ ; দুঃখে কষ্টে কোন মতে দিন চলুক, তথাপি পৃথক হইয়া কাজ নাই। দিদির কি মত ?"

"তাঁহারও মত নাই।" বলিয়া বলরাম মাখনকে ডাকিয়া তাহার মার মাথায় ধীরে ধীরে তৈল টিপিয়া দিতে উপদেশ দিয়া বাহির বাটীর দিকে চলিয়া গেলেন।

এই সময় সম্মতি আইনের বিভীষিকা হিন্দু সমাজে মহা আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল। "বঙ্গবাসী" হিন্দু দিগের পক্ষে কোমর বাঁধিয়া আন্দোলন করিতেছিলেন। রামকানাইর একটু লেখিবার অভ্যাস ছিল, তিনি নন্দীগ্রামের প্রতিবাদ সভার যে বিবরণ বঙ্গবাসীতে প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন তাহা বঙ্গবাসীতে ছাপা হইয়াছিল। তিনি তাহার ছয় পয়সা মূল্যের পৈত্রিক ডাঁটা হীন চসমাটী সুতাদিয়া কানের সহিত আবদ্ধ রাখিয়া তাহার সাহায্যে পত্রিকাখানা হইতে ঐ বিবরণ পড়িয়া কেবল নমশূদ্র, রমা সূত্রধর, জকী সেক প্রভৃতি শ্রোতাদিগকে শুনাইতেছিলেন। জকী সেক তাম্রকূট নিঃশেষিত কলিকাটী বাম হস্তের তালুতে পুরিয়া রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি নলের মত করিয়া লইয়া সজোড়ে তাহা হইতে ধূম্র বহিস্করণ করিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতেছিল। জকীর পুত্র পিতার কাছ হইতে কলিকাটী উদ্ধার করিবার জন্য একহাত বাড়াইয়া দিয়া দুর্গা প্রতিমার কাঠামের অসুরের অভিনয় করিতেছিল। এমন সময় বলরাম খড়মের চটাপট, ধ্বনি করিতে করিতে যাইয়া শ্রোতার সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন।

রামকানাইর পত্রিকা পাঠ হইয়া গেল। বলরামের পায়ের ধূলি লইয়া কেবলরাম জিজ্ঞাসা করিল, আজ বৌ মার অবস্থা কেমন দাদা ঠাকুর ?"

বলরাম নিরাশার হাসি হাসিয়া বলিল "আর কেমন মরণ নাই কার্তিসার।"

সমগ্র শক্তি ব্যয় করিয়াও কলিকা হইতে ধূম বাহির করিতে না পারিয়া জকী সেক উঠিয়া পাড়ল সঙ্গে সঙ্গে একদল তাহার অনুসরণ করিল।

তারপর রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া একে একে সকলেই চলিয়া গেল।

সকলে চলিয়া গেলে বলরাম বলিল—"সে প্রস্তাবে তো কাহারো সায় পাওয়া গেল না।

রামকানাই চসমার সুতা গুটাইয়া তাহা বাক্সবন্দী করিয়া সহাস্তে বলিলেন "তবেতো তোমাদেরই জিত। বেশ ভাল কথা।"

বলরাম বলিল— পৃথক খাওয়ায় খরচ ও বৃদ্ধি হয় শক্তিও হ্রাস পায়, দুটাই ক্ষতির কারণ........."

কানাই—"সেতো ঠিক। তবে কিনা সময় আসিতেছে বড়ই প্রতিকূল ; ইংরেজী শিক্ষা আমাদের প্রাচীন ভাব নষ্ট করিয়া দিতেছে। এখন ছোটবড় সকলেই ব্যক্তিগ

লইয়া ব্যস্ত; নিজের ব্যক্তিত্ব ডুবাইয়া কেহ আর অন্যের কর্ত্তৃত্ব মানিতে চায় না—তাই বলিয়াছিলাম যাইক্, তোমাদের যখন সকলের মত হয় না—তখন আর সে আলোচনার কাজ নাই ”

ইহার পর রামকানাই ছোট বধুর চিকিৎসার কথা তুলিয়া বলিলেন—“ডাক্তার ডাকাটা যখন যজমানদিগের মধ্যেও চল হয় নাই, তখন আমরা ডাক্তার ডাকিলে—লোকে কি বলিবে? তারপর যখন কবিরাজ মহাশয় ও সাহস শূন্য হন নাই, বাড়ীর ও তাদের যখন মত হয় না তখন আর·········”

বলরামও রক্ষণশীল প্রকৃতির লোক সুতরাং দাদার কথায় তিনিও সায় দিয়াই চলিলেন। সে দিন আর অন্য কোন কথা হইল না। ভাই ভাইর সংসার শান্তিতেই চলিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর চার বৎসর চলিয়া গিয়াছে। সুতিকায় বটীকা ও ধনেশপাখীর তৈল ছোট বধুকে ইহজগতে রাখিতে পারে নাই। দাদার স্নেহ বন্ধন এবং বৌ ঠাকুরাণীর অমায়িকতাও ভ্রাতাকে ভ্রাতার সহিত একান্নবর্ত্তী রাখিতে সমর্থ হয় নাই। লোকে বলে—কালস্য কুটীলা গতিঃ কথাটী নিরর্থক বলিয়া এ ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয় নাই। এ চার বৎসরে ভট্টাচার্য্য পরিবারে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে সকল কথারই আভাস এই পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইল।

রামকানাইর জ্যেষ্ঠপুত্র যদু স্কুল ছাড়িয়া পুরোহিতের ব্যবসায় লইয়াছে। নন্দীগ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলটী মাইনর স্কুলে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং মাধব তাহা হইতে বৃত্তি পাইয়া রায়পুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেছে। মধু ও ঐ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছে। উভয়ই বাড়ী হইতে ৩ মাইল পথ হাঁটিয়া গিয়া স্কুল করে।

বড় বধুর আর একটী মেয়ে হইয়াছে। এই নবীন অথিতির আগমন উপলক্ষ করিয়া এই সংসারে যে জনতা বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা আর কমে নাই। এ বৃদ্ধি স্থায়ী ভাবেই হইয়াছে। তাহা বড় বধুর বৃদ্ধা জননীও সেই বৃদ্ধার দুটী মাতৃপিতৃহীন পৌত্রী।

বড় বধুর মাতা জয়মণির বয়স ষাইট অতিক্রম করিলেও এখন বুড়ীর একটী চুল পাকে নাই বা একটী দাঁত পড়ে নাই—শ্রবণ শক্তি ও শারীরিক শক্তি দুইই অসাধারণ। বুড়ী পুকুর হইতে জল আনিয়া নিজের রান্না নিজে করে, গরুর জাব কাটীয়া দেয়, কুড়ালীর সাহায্যে আস্ত বাঁশকে টুকরা টুকরা করিয়া লাকুড়িতে পরিণত করে। এইরূপ কার্য্যে তাহার শ্রম বোধ হয় না। কিন্তু জয়মণি বড় মুখরা। ইহা নাকি সেকালের স্ত্রীলোকদের একটা গুণের মধ্যে গণ্যছিল। এরূপ গুণ না থাকিলে কেউ পাকা গৃহিণী হইতে পারিত না, গৃহিনী ঘরনী শাশুড়ী হইয়াও বধুদিগকে শাসনে রাখিতে পারিত না। সে জন্যই শাশুড়ীর বিশেষণটি ছিল সেকালে বাঘিনী।

যাহার যাহা নিত্য-অভ্যাস, সে তাহা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে না। জয়মণি পুত্রের সংসার এইরূপে পুড়াইয়া শেষ করিয়া আসিয়াছেন কন্যার সংসারে। এখানে আসিয়াও অভ্যাস দোষ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

মাতার মৃত দেহের উপর পড়িয়া মাতৃহারা মাধব যখন উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছিল, তখন জয়মণি অনুশাসন প্রচার করিলেন—যেহেতু তাঁহার কন্যা গঙ্গামণি গর্ভবতী ও আসন্নপ্রসবা, সেইহেতু জামাতা রামকানাই মৃতদেহ দাহ করিতে কখনই শ্মশানে যাইতে পারে না।

রামকানাইর শ্মশানে যাইবার পক্ষে যে খুবই প্রয়োজন ছিল, তাহা নয়, কেননা হিন্দুর আর কোন বিপদের সময় না হউক অন্ততঃ এই অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সাহায্যে লোকের অভাব হয় না। জয়মণির অনুশাসন এই দুঃসময়ে বলরামের হৃদয়ে গুরুতর আঘাত প্রদান করিয়াছিল; রামকানাই তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাই শাশুড়ীর অনুশাসনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে কিছুতেই সম্মত হইয়াছিলেন না। ইহাতেই জয়মণির ক্রোধ ও দ্বেষ ক্ষিপ্ত হইয়া বলরামের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

গঙ্গামণির ভ্রাতুষ্পুত্র দীনেশের বয়স যদুর সমান। দীনেশের পিতা শাস্ত্রজ্ঞ কবিরাজ ছিলেন। দীনেশ তাঁহার নিকট হইতে যে দুই একটী সংস্কৃত শ্লোক শিক্ষা করিয়াছিল, সতীর্থ সমাজে যখন তখনই সে তাহা উচ্চারণ করিয়া পাণ্ডিত্য ফলাইত। দীনেশের চেহারা পরিষ্কার গৌরবর্ণ ছিল বটে কিন্তু তাহার আলস্য দোষে সে গৌরবর্ণের উপর

স্থানে স্থানে এত ময়লা জমিয়া উঠিয়াছিল যে, সেজন্য তাহাকে সকল সমাজেরই ঘৃণার পাত্র করিয়া তুলিয়াছিল। ফলে সে ইতর লোকের সঙ্গই সারাদিন করিত।

গঙ্গামণির আগ্রহে দীনেশও মধু এবং মাখনের সহিত কিছু দিন হইল রায়পুরের ইংরেজী স্কুলে যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। রামকানাই যাইয়া তাহাকে অল্প কয়েকদিন হইল ৫ম শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া আসিয়াছেন। দীনেশের লেখা পড়ায় আসক্তি না থাকিলেও তাহার গাঁজা এবং মদের ব্যবহারিক বিদ্যায় তাহার বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল। এবং সে পারদর্শিতা লাভের কারণ সম্বন্ধে ধারাবাহিক ইতিহাস ছিল।

দীনেশ ছিল মল্লির ছেলে। অনেকগুলি ছেলে মেয়ে নষ্ট হইবার পর অসংখ্য দেব দেবীর নিকট মানসিক করিয়া তাহার গর্ভধারিণীকে অসংখ্য কবচ ধারণ করাইয়া তবে এই দীনেশকে রক্ষা করা গিয়াছিল। তাই দীনু হইয়াছিল ঠাকুর মার পরম আদরের ধন। দীনু ছাড়া ঠাকুর মা, আর ঠাকুর মা ছাড়া দীনু—এ ছিল অসম্ভব ব্যাপার। ঠাকুর মার আদরের দীনু এত লাই পাইয়া গিয়াছিল যে দীনুর অকরণীয় আব্দার কিছু ছিল না। দীনু যদি আসিয়া বলিত—"ঠাকুর মা গরম অম্বলে প্রস্রাব করিব"। তবে ঠাকুর মা পুত্রবধূকে দিয়া অম্বল রাঁধাইতেন, সেই সদ্য রান্না গরম অম্বলে ঠাকুর মার সোহাগের দীনু দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিয়া তবে নিরস্ত হইত। তাতে ছেলেরই বা কত আমোদ, ঠাকুর মারই বা কত আনন্দ।

একটু বড় হইয়া দীনুর মানসিক আদায়ের পালা আরম্ভ হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রসাদ অভ্যাস হইয়াছিল। শ্মশান কালীর পূজায় মদ্য ও ত্রৈলোক্যনাথের পূজায় গাঁজা, দীনুর মার শাশুড়ীর উপর কথা বলার অধিকার ছিল না। তাহার বাবা ছেলেকে শাসন করিতে উদ্যত হইলে ঠাকুর মা প্রতিবাদী হইয়া বলিতেন—"দেবতার প্রসাদেই দীনু আমার ভিটা রক্ষা করিয়া উজল থাকিবে। মদ, গাঁজা খাইতে পয়সার দরকার, দেবতা প্রসাদে দীনু আমার রোজগার করিয়াই তাহা পাইবে। যে যত খায়, সে তত পায় ইত্যাদি।"

জয়মণি ভাল হুকায় তামাকু টানিতেন। ভদ্র বিধবার পক্ষে তাহা যে দোষণীয় ব্রাহ্মণেতর সমাজের স্ত্রীলোকদের সংসর্গ করিয়া করিয়া সেজ্ঞান তাহার ছিল না। দীনু তামাক ভরিয়া দিত ঠাকুর মা টানিতেন। একদিন ঠাকুর মা দীনুকে বলিলেন—"তামাক জালান বড় কষ্টরে নদি, দেতো আস্তে আস্তে টানিয়া দে।" দীনু ঠাকুর মার উপদেশ পাইয়া সেই হইতে তামাক ভরিয়া তাহা নিজে জালাইয়া ধরাইয়া দিত; ঠাকুর মা নাতির সেবায় পরম আরামে তামাকু টানিতেন।

জয়মণির সোহাগের পৌত্রটীর এই সকল অনাচার তাহার পরমাত্মীয়া পিসি মা হইতে আরম্ভ করিয়া খেলার সাথী যদু, মধু, মাখন কেহই প্রীতির চক্ষে গ্রহণ করিত না। সুতরাং দীনুর হিংসা ও দ্বেষ বুভুক্ষু হইয়া সকলের বিরুদ্ধেই অভিযান করিয়াছিল।

গঙ্গামণির ওরফে বড় বধূর ভ্রাতুষ্পুত্রী কুসুমের চরিত্র ছিল এদুইটী প্রকৃতির বিপরীত। কুসুম যেন কৈশব-যৌবনের সঙ্গম স্থলে তাহার দুখানা রাঙ্গাচরণ স্থাপন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার উজ্জ্বল গৌর কান্তির ভিতর দিয়া কোমলতা ও কমনীয়তা, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য যেন ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। তাহার দাদা যেমন সকলের কঠোর দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছিল, কুসুম তেমনি সকলের স্নেহে ও প্রীতির ভাণ্ডার লুটিয়া লইয়া আদরের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ত্রিবিধ প্রকৃতির এই তিনটী প্রাণী আপাততঃ নূতন উপসর্গরূপে আসিয়া ভট্টাচার্য্য পরিবারে জুটিয়াছিল।

বাড়ীর ভিতরের যে ঘরে ছেলেরা পড়াশোনা করিত, সেই পূর্ব্ব ভিটার হবিষ্যের ঘরেই হইয়াছিল—এই নূতন আগন্তুকদের স্থান।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গভাষা বনাম বাঙ্গালীর মাতৃভাষা।

বাঙ্গালা ভাষার গতি এখন গুরুতর বেগে এদিক ওদিক সেদিক—সকল দিকেই ছুটিয়া চলিয়াছে। উপন্যাস, রমন্যাস, নবন্যাস, নাটক, নভেল, প্রহসন অপেরা প্রভৃতি দিন দিন

হু হু করিয়া চলিয়াছে। উন্নতির লক্ষণ সন্দেহ নাই। পৃথিবীতে যে জাতি যখনই উন্নতিলাভ করিয়াছে সেই জাতিরই সেই সময়ে ভাষা ও সাহিত্যের পরিপুষ্টি সংসাধিত হইয়াছে। ইতিহাস এই উক্তির সাক্ষ্য প্রদান করিবে। বাঙ্গালাভাষার এই উন্নতির সময়ে আমরা যে শুধু ইহার বাহ্য চাক্‌চিক্যেই ভুলিয়া থাকিব তেমন কেহও কামনা করেন না। সুধী ব্যক্তি মাত্রেরই বর্ত্তমান সময় বাঙ্গালাভাষার ভিতরের দিকেও ক্রমে ক্রমে প্রবেশলাভ করা নিতান্ত প্রয়োজন। বাঙ্গালী হইয়া যদি আমরা বাঙ্গালাভাষার আদর ও কদর না বুঝিলাম তবে অপরে ইহার সমাদর কিপ্রকারে করিবে? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকম্পায় বাঙ্গালা-ভাষা-এখন উচ্চতম পরীক্ষায় ও ছেলেদের পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন রসায়ণ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, উদ্ভিদ তত্ত্ব, শারীরতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের বৈদেশিক ভাষায় গ্রন্থ সমূহ বাঙ্গালাভাষায় ক্রমশঃ অনূদিত হইতেছে। প্রত্যেক স্কুলে ও কলেজে বাঙ্গালাভাষা অবশ্য পাঠ্যরূপে (Compulsory) নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তবে প্রথম প্রশ্ন আসিতে পারে এই; অধুনাতন স্কুল কলেজের ছাত্রগণ কোন্ রকমের বাঙ্গালা-ভাষাকে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিবে, বাঙ্গালাভাষার প্রকৃতি প্রথমযুগ হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত মোটামুটি তিনটী রকমের বা প্রকারের হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সন্ধি-সমাস পরিপূর্ণা কৃত্তদ্ধিতবহুলা বাঙ্গালাভাষা এক রকম, তারপর প্রাদেশিক কথ্যভাষায় পরিপূর্ণ ইদানীন্তন বঙ্গভাষার শ্রী অন্য রকম, এবং মধ্যযুগের বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, দামোদর, সঞ্জীব প্রভৃতির ভাষা অন্য রকম। এই শেষোক্ত প্রকৃতির ভাষা অতিশয় সংস্কৃতঘেষা নহে অথচ একেবারে প্রাদেশিক কথ্য ভাষাও (Colloquial) নহে। কোন্ সময়ের ভাষা কিপ্রকারে তাহার একটা বিস্তৃতি নমুনা বারান্তরে প্রদান করিতে চেষ্টা করিব সম্প্রতি কথ্য ও প্রাদেশিক ভাষার ব্যবহারে স্বল্পমতি শিক্ষার্থিগণ কতদূর বিড়ম্বিত ও প্রতারিত হইতেছে তাহারই একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। কথ্য ভাষা বা প্রাদেশিক ভাষাকে যে একেবারে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে তেমন কথা আমরা বলিব না; তবে বাঙ্গালা শিক্ষার্থী যুবকগণকে গোড়া হইতেই কয়েকটা দিকে অগ্রসর হইয়া চলিতে হইবে। মনে করুণ "কোল্‌কাতায় একজন বাবু ঢাকা এসে দুদিন না যেতেই বলে উঠলেন এখানকার রাব্‌ড়ী জিনিষটা বড় মাগ্‌গি।" এখন এই মাগ্‌গি শব্দটা যে কি এবং কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তাহার প্রকৃতি প্রত্যয় কি তাহা কি সেই "কোল্‌-কেতাই বাবু" বুঝাইয়া দিতে পারিবেন? আমরা হয়ত বলিব যে মহার্ঘ শব্দের অপভ্রংশ "মাগ্‌গি" উচ্চারণ দোষে তেমন একটা বিশুদ্ধ শব্দ এমন একটা কদাকাররূপ ধারণ করিয়াছে। কথ্যভাষার এই প্রকার বহুশব্দ পাওয়া যায় যাহা উচ্চারণ দোষে বা দেশ বিদেশের অধিবাসীর অভ্যাস বশতঃ বিশুদ্ধশব্দটীও অশুদ্ধরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। উদাহরণচ্ছলে আমি নিম্নে একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করিতেছি; শিক্ষার্থিগণ মনোযোগের সহিত অবধান করিবেন।

শুদ্ধ শব্দ	প্রাদেশিক শব্দ	উদাহরণ
মহার্ঘ	মাগ্‌গি	
অক্রেয়	আক্রা	(আজকাল বাজারে চালটা বড়ই আক্রা)
চিকিৎসা	তিগিচ্ছে	(কি করবো ভাই রোগীর তিগিচ্ছে চল্‌ছে না।)
নূতন	নতুন	(নতুন জামাটা ছিঁড়ে ফেলেছে।)
ঔষধ	ওষুধ	(ওষুদপত্তর চলেছে বটে কিন্তু
ব্যারাম	ব্যামো অথবা বায়রাম	ব্যামোটার ভালো মন্দ কিছুই দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছেনা)
বিবাহ	বিয়ে, বে	(আস্‌ছে মাসে বিয়ের দিন।)
গৃহিণী	গিন্নী	(গিন্নী বল্লেন, মেয়ের কি বে থা কোথাও দেখ্‌বেনা? যেন নিশ্চিন্দি মহাপুরুষ। মেয়েটাকে চিরকাল আইবুড়ো রাখ্‌তে চান।)
পার হ'য়ে	পেরিয়ে	
বৈশাখ	বোশেক	(বোশেক মাসে আঁবের চাট্‌নি।)
অগ্রহায়ণ	অঘ্রাণ	
বৎসর	বচ্ছর, বছর	(গেলো বছর আমার ছেলেটী একজামিনে পাশ দিয়েছে।)
নিশ্চিন্ত	নিশ্চিন্দি	(অদ্ভুত নহে কি?)
পুণ্য	পুণ্যি	

সত্য সত্যি (সেই সত্যিযুগের মানুষ কি না ?)
অদৃষ্ট অনিষ্টি
বাণিজ্য বাণিজ্যি
বৃক্ষ বক্ষি
ভবিতব্য ভবিতব্যি
হবিষ্য হবিষ্যি

তারপর তারা নিমন্ত্রণকে বলেন নেমন্তন, কৃষ্ণকে ডাকেন কেষ্ট, বিষ্ণুকে ডাকেন বিষ্টু। মূর্চ্ছা না যাইয়া মূর্চ্ছো যান, মূলা না খাইয়া মূলো খান। ধূলা হয়ে যায় ধূলো, কুলা, কুলো, চুলা চুলো, পূজা পূজো (তোমার পূজো আর্চ্চা চুলোয় যাক) জুতা জুতো, গুতা গুতো। সেই প্রাদেশিক ভাষার রাজ্যে রাত্রিতে হয় রাত্তির অথবা রাত, অথবা রেত ("রেতের বেলায় দৈ কেবা খায় শ্যামাদাস রায় রোযে") জাতি জাত, জাতি জাত, (ঘরের দুয়ারে জাতভাই আর জাত ভাই হাক'রে চেয়ে আছে।)

ছত্র ছত্তর ছ'ছত্তর ইংরিজি লিক্তে (ক্ত) পারেনা, সে আবার বি, এ পাশ দিয়েছে ?
পত্র পত্তর (বিয়ের পাতি পত্তর সব হ'য়ে গেছে
ভদ্র ভদ্দর (ওরা সব ভদ্দর লোক গো ভদ্দর লোক।)
শূদ্র শূদ্দুর বামুন শূদ্দুর একঠাই খাচ্ছে, ছি ছি, যেন শ্রীক্ষেত্তর !
মিত্র মিত্তির মিত্তির বাড়ীর রামচন্দরটা আজ কৃরেছে কি ?
চন্দ্র চন্দর
দ্বিপ্রহর দুপ্রহর, দুপুর,
দুক্কুর (এই দুক্কুর বেলা তুই কোথা যাচ্ছিস্ রে ?)
সকাল সকাল আহা, সকাল বেলা !
অনাসৃষ্টি অনাচ্ছিষ্টি এমন একটা অনাচ্ছিষ্টি।
জিজ্ঞাসা জিজ্ঞেস আচ্ছা জিজ্ঞেস করছি
আজ্ঞা আজ্ঞে ("যে আজ্ঞে"—প্রস্থান)
শয্যা শয্যো
কন্যা কনে (বর ক'নের শয্যো)
ভিক্ষা ভিক্ষে (ভিক্ষে দাও মা,

রক্ষা রক্ষে (এবার আর রক্ষে নাই)
শিক্ষা শিক্ষে (শাস্তি না দিলে আর শিক্ষে হচ্ছে না)
বিদ্যা বিদ্যে (হা, তার বিদ্যে বুদ্ধি জানা আছে)
মিথ্যা মিথ্যে (যাই বলনা কেন কথাটা কিন্তু মিথ্যে নয়)
সন্ধ্যা সন্ধ্যে (সন্ধ্যে হ'য়ে এল)
ইচ্ছা ইচ্ছে (আজ্ঞে, কত্তা, তামাক ইচ্ছে করুন)
ক্ষুধা ক্ষিদে (ছেলেটার ক্ষিদে পেয়েছে গো)
বিদায় বিদেয়
নাই নেই
দেখিয়া দেখে
দিব দেব, দোবো কোত্থেকে দোবো মশাই)
নিব নেব, নোবো (বর্দ্ধমান)
মহাশয় মশায়, মশাই, মোশয় বোলপুর)
মহারাজ মহারাজা এবং মোহারাজ।
কালা কেলো,
কাজের কেজো
অকাজের অকেজো
ভাল ভালো

আশঙ্কা হয় কোন্ দিন বা বঙ্গদেশটাই বোঙ্গদেশ হইয়া যাইবে। ইহা ছাড়া কেহ কেহ পনরকে গণেন পনেরো, ষোল—ষোলো, সতর—সতেরো, আঠার আঠারো (আঠারো বাড়ী, ময়মনসিংহ) ইত্যাদি এতদ্ভিন্ন কেহ কেহ "ম"কারের উচ্চারণ স্থানে "ব"কার উচ্চারণ করেন। তাঁহারা তামা গড়িতে তাঁবা গড়েন প্রকৃত শব্দটী কিন্তু তাম্র শব্দের অপভ্রংশ) আম খাইতে যাইয়া আঁব খান (if আম্র. অমৃত)। নেমে যাবার কালে "নেবে" যান (নম্ ধাতু, নামিয়া যাওয়া)। কিন্তু সুখের বিষয় মাতুল, মামা, মা প্রভৃতির উচ্চারণ বাতুল, প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করেন না। স্থান বিশেষে অকারের উচ্চারণ ওকার শোনা যায় এবং ওকারের উচ্চারণ অকার শোনা যায় কেহ কেহ গোবিন্দকে ডাকেন গবিন্দ, গোপালকে গপাল, দামোদরকে দামদর, মোহিনীকে মহিনী, কোটি কোটিকে কটি কটি।

পক্ষান্তরে মশাকে বলেন মোশা মনকে মোন, মহারাজকে মোহারাজ, মহাশয়কে মোশয়, মঙ্গল মোঙ্গল।

"বাঙ্গালা"দেশ ও "বাঙ্গালী" জাতিটাকে নিয়াও আজকাল খুব একটা টানা হেঁচ্ড়া চলিতেছে। কেউ বল্‌ছেন বাঙ্গালা, কেউ বা বলছেন বাঙ্গলা, কেউ বা লিখিতেছেন "বাংলা"। ওদিকে কেহ লিখিতেছেন বাঙ্গালী, এবং অপরে লিখিতেছে বাঙালী। কিন্তু সমস্যার বিষয় এই যাহারা বাঙ্গালাকে গায়ের জোড়ে "বাংলা" লিখিতেছেন তাহারাও কিন্তু বাঙ্গালী লিখিবার সময় কখনও বাংলী লিখেন না। এমন অবিচারের হেতু কি তাহা আজ পর্য্যন্তও জানা যায় নাই। "বাংলা" শব্দটা কখন কখনও ছন্দঃ রক্ষার জন্য পদ্যে ব্যবহার করা যায় সত্য অথচ কথা ভাষায়ও চলিতে পারে সত্য কিন্তু সাহিত্যের শিক্ষনীয় ভাষায় ছেলেদের নিকট উহা স্থান পাইতে পারে না, যে হেতু তাহারা জানে বঙ্গ শব্দ হইতেই বাঙ্গালা শব্দের উৎপত্তি বংগ্ ল্ শব্দ হইতে নহে। পূর্ব্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে গ্রাম্য ভাষা প্রসঙ্গে যে সমস্ত অবিশুদ্ধ শব্দের উচ্চাচরণ হয় তাহারও একটী স্বতন্ত্র দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত হইতে পারে বটে, কিন্তু তত্তদ্‌বাসিগণ নিজেদের অশুদ্ধ ভাষাকে রাজার পোষাক পরিয়ে কখনও সমাজে বাহির করিতে চান না, এই নিমিত্তই সম্প্রতি সে সমস্তের অনুসন্ধান হইতে নিবৃত্ত রহিলাম। আমরা পুঁথি পুস্তকে, পত্রিকায় যাহা যাহা দেখি সেই সমস্ত অলক্ষুণে কাণ্ড দেখে "চাস্" কোর্ত্তেও ইচ্ছে হয় না, খেতেও মোন্ বসে না—লেখাপড়া ত দূরের কথা। অতএব আজ এই পর্য্যন্তই "ইস্তাফা" (উর্দ্দু)। অলমতি বিস্তরেণ (সংস্কৃত)। শুভমস্তু (সংস্কৃত)।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

ময়মনসিংহের কবি-কাহিনী।

কবি ৺ লোকনাথ চক্রবর্ত্তী।

কতকগুলি প্রাচীন কবি সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট পাঠাইবার জন্য আমি আমার অনুজ প্রতিম সুলেখক সাহিত্য-রসিক শ্রীমান্ চন্দ্রকুমার দে কর্ত্তৃক অনেক দিন হইতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। চন্দ্রকুমারের সেই অনুরোধের কথা মনে করিয়া, কয়েক দিন যাবত্ত পুরাতন কাগজ পত্রের মধ্যে প্রাচীন কবিগান খুঁজিতেছিলাম। খুঁজিতে খুঁজিতে,—নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত কাশীপুর নিবাসী স্বর্গীয় লোকনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দুইটী ছড়া, তিনটী কবিগান ও দুইটী হোলী কীর্ত্তন প্রাপ্ত হইয়াছি। অদ্য তাহারই আলোচনা করিব। কবিতাগুলি লিখিবার পূর্ব্বে কবি লোকনাথ চক্রবর্ত্তীর পরিচয় ও সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখা কর্ত্তব্য মনে করিলাম।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বাল্যকাল হইতে যেমনি বিদ্যানুরাগী ছিলেন, তেমনি সঙ্গীত প্রিয়ও ছিলেন। তিনি বাল্য বয়সে সংস্কৃত পাঠ করিয়া যৌবনে বাঙ্গালা ভাষায় যথেষ্ট চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। গীত রচনায় তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। তিনি মিষ্টভাষী ও প্রিয়দর্শন ছিলেন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় অবিবাহিত অবস্থায় আজ ২৫।২৬ বৎসর হইল, শ্রীধাম নবদ্বীপে তনুত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহারা তিন ভাই ছিলেন। জ্যেষ্ঠ উমানাথ, কনিষ্ঠ কুঞ্জকিশোর। তিনজনই পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন বর্ত্তমান সময়ে কেবল উমানাথ চক্রবর্ত্তীর তিনটী সুসন্তান আছেন।

কবি লোকনাথ চক্রবর্ত্তীর কবি গানের সখটা অত্যন্ত অধিক ছিল। তিনি নিজে আসরে উঠিয়া ছড়া পাঁচালী গাইতেন না। তখনের দিনে ব্রাহ্মণ, কবির আসরে দাঁড়াইলে সমাজের নিকট নিতান্ত হেয় বলিয়া গণ্য হইত।

কবির সরকারেরা অনেক সময় অশ্লীলতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, অনেক অশ্রাব্য কথার অবতারণা করিতেন বলিয়া, কবি গানটা তখন (উচ্চ ও রস প্রাচুর্য্যে মধুর হইলেও) নীচ লোকের গান বলিয়া সর্ব্বসাধারণের ধারণা ছিল। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ ভাব ও ভাষার মর্য্যাদা সংরক্ষণ করিয়া, সংযত রসনায় সভ্যতার সীমানায় থাকিয়া কবি গান গাওয়া হয়,—তখন এমন ছিল না।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিজে আসরে উঠিয়া কবি গান গাইতেন না বটে, কিন্তু বাসা ঘরে বসিয়া তাঁহার অনুচর দিগকে উপদেশ ও মন্ত্রণা দিতেন ;- জোওয়াব টপ্পাও রচনা করিয়া দিতেন। তাঁহার একটী অত্যুৎকৃষ্ট কবির দল ছিল।

সেই দলে তাঁহারই শিষ্য, দুর্গা ধুবি ও অর্জ্জুন ধুবি ছড়া পাঁচালী গাইত।

একবার বাজলায় হাটখলার বিদেশী বিশ্বম্ভর ঠাকুরের দলের সঙ্গে চক্রবর্ত্তীর দলের গান হইতেছিল। তখন চক্রবর্ত্তীর অর্জ্জুন ধোপাকে, বিশ্বম্ভর ঠাকুর টপ্পায় কিছু গালী দিয়াছিলেন॥

"দলের কর্ত্তা ঠাকুরজী, গোমস্তা ধুবা বাবাজী,
এমন পাজি মিলে অতি কম,—
আমাকে কেন্ বল্লি মন্দ? হারামজাদা বে সরম্!"

বিশ্বম্ভর ঠাকুরের স্ত্রীলোকের দল ছিল। অর্জ্জুন ধুপি চক্রবর্ত্তীর পরামর্শে সেই দলের শ্যামা নাম্নী একটী স্ত্রীলোককে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিলে, বিশ্বম্ভর এই টপ্পা কাটিয়াছিলেন।

বিশ্বম্ভরের টপ্পার উত্তর দিবার জন্য চক্রবর্ত্তী মহাশয় অর্জ্জুনকে নিম্নলিখিত টপ্পাটী রচনা করিয়া দিলেন।

চিতান,—বল্লে নাকি আমায় তুমি, আমি বে সরম্।
পারাণ,—লয়ে বাজারের সব পেশাকার,—
করি গানের দল তোমার,
জাতের বিচার নাইত আর একদম্॥
মিল,—তুই যে ব্রহ্মকুলে জন্ম নিলে
রাখ্‌লে কৈ আর কুল মান॥
মহড়া,—মৈলে কি তুই মুক্তি পাবি?
হবে তুই খান্‌কী বাড়ীর কুকুরের সন্তান॥
অন্তরা,—আগে ডাক্‌লে বাবাজী, তারপরে বল্লে পাজী,
আন্দাজী করিস্ কবি গান,—
মিল,—(এখন) তুই পাজী না আমি পাজী,
বুঝে দেখ পাজী সয়তান॥

আমার যখন কবি গান শিক্ষার প্রথমানুষ্ঠান,—তখন এই পল্লী কবি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ই ছিলেন আমার উপদেষ্টা গুরু। তাঁহার নিকট হইতে আমি কবি গান সম্বন্ধীয় বহু উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি।

কবি লোকনাথ চক্রবর্ত্তীর বন্দনা ছড়া।

নমস্তে কালিকে, গিরিরাজ বালিকে,
চরাচর পালিকে, অম্বিকে অভয়া।
ভবভীতি বারিনী, দুঃখ দৈন্য হারিণী,
ত্রিলোক তারিণী, ভবজায়া॥ ১॥
পরমা প্রকৃতি, সতী হৈমবতী,
পার্ব্বতী পরমেশ্বরী।
সুরাসুর বন্দিনী হিমগিরি নন্দিনী,
হ্লাদিনী, সঙ্গিনী, শঙ্করী॥ ২॥
মহিষাসুর মর্দ্দিনী, চণ্ডমুণ্ড অর্দ্দিনী,
জ্ঞান বিদ্যা বর্দ্ধিনী, শুভঙ্করী শ্যামা।
দানব দলনী, মানব পালিনী,
নৃমুণ্ড মালিনী, পরাৎপরা পরমা॥ ৩॥
ওঙ্কার-স্বরূপা, জয় বহু রূপা,
রুধির লোলুপা, বিশ্বভূপা সনাতনী।
জয় দিগম্বরী, শিবানী শঙ্করী,
ব্রহ্মা হরহরি, আদি প্রসবিনী॥ ৪॥
অনাদ্যা, অনন্তা, শিব-শক্তি, শান্তা,
কাপালিক কান্তা, সীতা, অসীতা তারা।
জয় রণরঙ্গিনী, ডাকিনী যোগিনী,
বিশ্বজননী বাঘাম্বরা॥ ৫॥
হর মনমোহিনী, যশোদা রোহিণী,
যোগমায়া রূপিণী, সুভদ্রা, সাবিত্রী।
শ্মশানবাসিনী, অট্ট অট্ট হাসিনী,
গজাসুর নাশিনী, জয় জগদ্ধাত্রী॥ ৬॥
হর হৃদাসীনা,—দনুজা দক্ষিণা,
বসন বিহীনা, বিশ্বেশ্বরী।
খর্পর ধারিণী, বিপদ বারিণী,
পাপ তাপ হারিণী, গিরি কুমারী॥ ৭॥
এ ভবসংসারে, পড়ি বারে বারে,
ডাকিছি তোমারে, পাইতে চরণতরী।
তুমি যদি পার, না কর এবার,
ভব পারাবার, বল মা কেমনে তরি॥ ৮॥

কবি লোকনাথ চক্রবর্ত্তীর এই স্তোত্র কবিতাটির ভিতর পরাৎপরা পরমেশ্বরীর শক্তি তত্ত্ব অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। কবি কেবল মাত্র তাহাকে অর্থাৎ নিজকে পৃথক রাখিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব মহাশক্তিতে মিশাইয়া দিবার যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন। নিজকে পৃথক করিয়া না রাখিলে, সেব্য সেবক ভেদ না হইলে, ভজনের মধুর্য্য

হ্রাস পাইয়া যায়। এবং পরিশেষে অতি নীরস "সোহহং তত্বে উপনীত হইতে হয়। কবি সেইজন্ত নিজকে ভিন্ন রাখিয়া, শক্তি পদে ভক্ত পূর্ব্বক বন্দনার শেষভাগে ভবপারের প্রার্থনা জানাইয়াছেন। তাহার আরো একটী মাথুর লীলার ছড়া নিম্নে লিখিতেছি ॥

(ছড়া, বৃন্দা-ভক্তি।)

আমি বৃন্দা রাধার দাসী, চিন্‌বে কিহে কালোশশী ?
অনেক দিন হয় দেখাশুনা নাই।
আমিও ত অনেকক্ষণে, চিনিয়াছি এতক্ষণে,
তুমি মোদের ত্রিভঙ্গ কানাই ॥ ১ ॥
তোমারও নাই সাবেক রূপ, আমারও নাই সাবেক রূপ,
স্বরূপ কথা জানাই তোমার কাছে।
তোমার গেল অতি সুখে, আমার গেল অতি দুঃখে,
উভয়েরি সাবেক রূপ গিয়াছে ॥ ২ ॥
আমাদের যে রাইকিশোরী, কি দশা তাঁর হরি হরি ॥
ধূলায় পড়ি থাকে সর্ব্বদায়।
বিচ্ছেদ বিষে সোণার অঙ্গ, ধরিয়াছে কালো রঙ্গ,
শ্যাম ত্রিভঙ্গ তোমার ভাবনায় ॥ ৩ ॥
তারি দুঃখে দুঃখী মোরা, আছি যেমন আধা মড়া,
খাড়া হৈতে দেহে শক্তি নাই।
রাই দুঃখের আগুণে পোড়া, ভাব-কান্তি সকল সারা,
কি দেখিয়া চিনবে কানাই ? ॥ ৪ ॥
তোমার ছিল রাখাল বেশ, মনোজ্ঞের একশেষ,
সে বেশের ত লেশমাত্র নাই।
মস্তকে নাই মোহনচূড়া, গলেতে নাই গুঞ্জা ছড়া
পীত ধরা মোহন বাঁশী নাই ॥ ৫ ॥
কটিতে কিঙ্কণী নাই, অলকা তিলকা নাই,
চরণে নূপুর দেখি নাই।
নাই সেই নাগরচাঁদ, সেইজন্যে কালাচাঁদ,
হঠাৎ আসিয়া চিনি নাই ॥ ৬ ॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ নাই, মথুরায় শ্রীরাধা নাই,
মানে কান্দা, পায় ধরা নাই। ভ্রমরের শব্দ নাই,
ফুলে ভরা মধু নাই, ব্রজে কেবল নাই নাই নাই ॥ ৭ ॥
মথুরার রাজ্যভার, পাইয়াই ত শ্যাম তোমার,
রাজ অভরণ অঙ্গে পরা।
জন্মেও দেখি নাই যাহা; বিধাতা দেখাইল তাহা,
রাখালের গায় জামা জোড়া ॥ ৮ ॥
যাউক আর এ সকল, কথাতে কি আছে ফল,
বিধাতা সকলি কর্ত্তে পারে।
শ্রীরাধা বাঁচে না প্রাণে, চল কৃষ্ণ বৃন্দাবনে,
একবার দেখে আইস তারে ॥ ৯ ॥
যে দশা দেখে ছ তার, আশা নাই আর বাঁচিবার,
তোমার আশাতে মাত্র আছে।
তুমি গেলে কালাচান আমি করি অনুমান,
তবে যদি রাধা সতী বাঁচে ॥ ১০ ॥
নতুবা ত নারী বধ, তোমারি হবে বিপদ,
জন্মে জন্মে ভোগিবে সন্তাপ।
প্রায়শ্চিত্তে পাপ খণ্ডে, কিন্তু শুনি এ ব্রহ্মাণ্ডে,
অখণ্ডন নারী বধের পাপ ॥ ১১ ॥
দেখিয়া চক্ষের দেখা, ফিরে এইস প্রাণ সখা,
তোমার সাধের মধুপুরে।
মধুপুরে থাইও মধু সত্য বলি প্রাণ বঁধু,
আমরা কেন রাখিব তোমারে ? ॥ ১২ ॥
(আর) এক্ কথা মনে হৈল, আমারে ডাকিয়া কৈল,
(কহিল) নন্দঘোষের বাড়ীর একজন।
"কাহও কৃষ্ণের ঠাই, আর বেশী বাকী নাই,
যশোদার নিকট মরণ ॥ ১৩ ॥
চল শীঘ্র শ্যামরায়, সময় বহিয়া যায়,
আমিও না থাকিবারে পারি।
যা' তোমার মনে লয়, শীঘ্র কর রসময়,
হরি বলি করিলাম শ্রীহরি ॥ ১৪ ॥

কবি লোকনাথ চক্রবর্ত্তীর এই ক্ষুদ্র কবিতাটীর মধ্যে খুব বৃহৎ একটী তাৎপর্য্য পরিলক্ষিত হইতেছে। কবিরা কবি গানের সময় অনেকেই শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরত্বের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া, তাঁহার নিকট বৃন্দা বা এইরূপ অন্য কেহ হইয়া আপন মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে থাকেন। ইহা প্রকৃত কবি গানের রীতি নহে। কারণ, ঈশ্বরের নিকট মানুষ ত দূরের কথা, সুরাসুর গন্ধর্ব্ব, কিন্নর কাহারই কোন তর্ক যুক্তি খাটে না। ঈশ্বর ইচ্ছাময়, যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন। তিনি যাহা বলিবেন, করিবেন,

তাহাই সত্য। এমনটী হইলে তাঁহার সঙ্গে কবি গানের পাল্লা চলে কেমন করিয়া? এইরূপ ভাবের কবিগান রসাভাস-দোষ-দুষ্ট হইয়া যায়। যেমন বৃন্দা বলিতেছেন,—

"হে কৃষ্ণ জগতপতি, দয়া কর দাসীর প্রতি,
তুমি অগতির গতি, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূল ॥
আমরা যত ব্রজনারী, অকূলে ডুবিয়া মরি,
তুমি বিনে বাঁকা হরি কেবা দিবে কূল ॥"

"জগতপতি, অগতির গতি, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূল।"

এই শব্দ কয়টীতে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর বলিয়া বুঝাইতেছে। এইরূপ ঐশ্বর্য্য জ্ঞাপক শব্দের ব্যবহার করিয়া কবি গান গাওয়াটা নিতান্ত রীতি বিরুদ্ধ। ঈশ্বরের সঙ্গে কোন মানবী কন্যার পরকীয় প্রেমের আদান প্রদান বা আবদার খাটে কি? তাহা হইলে ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণের লীলা-মাধুর্য্য একবারে নষ্ট হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর হইলে,—মাখনচুরী, গোচারণ, বস্ত্র হরণ, কলঙ্ক ভঞ্জন, মানভঞ্জন ইত্যাদি লীলা সমূহ একবারে নীরস হইয়া পড়ে। অথবা হইতেই পারে না।

কৃষ্ণ অদ্বিতীয় পরম তত্ত্ব হইয়াও মধুময়ী শ্রীবৃন্দাবনলীলায় যশোদার স্তন্যপায়ী নরবালক। এ জন্যেই ব্রজলীলা মধুর হইতে সুমধুর। ব্রজ-বালকেরা বনফুলের কিছু খাইয়া, তিক্ত কষায় বুঝিয়াও সেই উচ্ছিষ্ট ফল শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রমুখে তুলিয়া দিয়া আনন্দে নাচিত।

নন্দরাণী গোপালকে গোষ্ঠ যাত্রা কালে সাজাইয়া কাচাইয়া, মাথায় থু থু দিতেন,—রক্ষা মন্ত্র পড়িতেন,—পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। মা-দংশন করিলে সন্তানকে অন্য কিছুতে দংশন করিতে পারে না, এই জ্ঞানের বশীভূতা রাণী গোপালের বাম হস্তের কানিষ্ঠাঙ্গুলী ঈষদ্দংশন করিয়া দিতেন। রাখালের কৃষ্ণ, নন্দরাণীর কৃষ্ণ, ঈশ্বর হইলে কি ব্রজলীলা এত মধুর হইত?

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে পূতনা বধ, যমলার্জ্জুন ভঞ্জন, শকট ভঞ্জন, দাবাগ্নি পান, কালীয় দমন, গোবর্দ্ধন ধারণ, বদনে মাকে ব্রহ্মাণ্ড দেখান প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য লীলার প্রকটন বহুবার করিয়াছেন, কিন্তু, যোগমায়ার প্রভাবে ব্রজবাসীগণ তাহা বুঝিতে পারে নাই অতএব কবি গানের কবিগণ কৃষ্ণকে মানুষের মধ্যে রাখিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিলে, রঙ্গ-রহস্য করিলে, কবির পাল্লা খাটি হয়।

একটা অমৃত মধুর ভাবের প্রবাহে গা ঢালিয়া দিয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িলাম। সহৃদয় পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

কবি লোকনাথ চক্রবর্ত্তীর এই কবিতাটীতে এমন কোন একটী শব্দ নাই, যে সেই শব্দটীতে কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া বোধ জন্মায়। অথবা এমন একটী ভাবের সমাবেশ নাই যে, সেই ভাবটীতে কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া ধরিয়া দেয়। চক্রবর্ত্তী কবির ইহাই বাহাদুরী।

কৃষ্ণ মধুপুরে আসিয়া কংশ রাজ্যের অধিপতি হইয়াছেন, উগ্রসেন উপলক্ষ মাত্র। সুতরাং এখন শ্রীকৃষ্ণের রাজার বেশ ভূষণ। ব্রজের রাখাল বেশ নাই। অনেক দিন পর বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণকে রাজাভরণে ভূষিত দেখিয়া চিনি চিনি করিয়াও চিনিতে একটুকু বিলম্ব হইল, হইবারও কথা। তাই কবি বৃন্দা বলিতেছেন,—"আমিও ত অনেকক্ষণে, চিনিয়াছি এতক্ষণে, তুমি মোদের ত্রিভঙ্গ কানাই।" তৎপর বৃন্দা-ভাবে-বিভাবিত-কবি কহিতেছেন,—"তোমার নাই সাবেক রূপ, (এই 'রূপ' শব্দটীতে বেশ ভূষণকেও লক্ষ্য করিতেছে।) আমারও নাই সাবেক রূপ" এখানে বৃন্দার মনের ভাব,—কৃষ্ণ সুখ সম্ভোগের মধ্যে পড়িয়া অন্যরূপ হইয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার পূর্ব্বের বেশ ভূষণ এবং মনের ভাব অন্য রকম হইয়া গিয়াছে। আমারও দুঃখ দুর্দ্দশায় পড়িয়া বেশ ভূষণ মনের ভাব অন্য রকম হইয়া গিয়াছে।

পরে বৃন্দা কৃষ্ণকে স্পষ্টভাবে বলিলেন,—তোমার ধড়া, চূড়া মোহন বাঁশী প্রভৃতি ব্রজ ভূষণের কিছুই নাই দেখিয়া, তোমাকে অনেকক্ষণে এতক্ষণে চিনিলাম। তুমি কি আমাকে চিনিয়াছ?

এই সব কথার ইতি হইলে বৃন্দা কৃষ্ণকে শ্রীরাধার নিদান সংবাদ দিয়া শীঘ্র ব্রজে যাইতে অনুরোধ করিলেন। এবং নারী বধের ভয় দেখাইয়া ব্রজের দুর্দ্দশা জানাইলেন।

কৃষ্ণকে শ্রীবৃন্দাবনে নিবার নানা উপায় চিন্তা করিয়া,—চতুরা বৃন্দা একটী মিথ্যা কথার অবতারণা করিলেন। কহিলেন,—"আমি আসিবার কালে নন্দ ঘোষের বাড়ীর একজন আমাকে ডাকিয়া বলিল, "কৃষ্ণকে কহিও, তাহার মা যশোদার মৃত্যু অতি নিকট।" "তুমি শীঘ্র শীঘ্র তোমার

মাকে দেখিয়া আইস।" বৃন্দা ভাবিয়া চিন্তিয়া, এবং কৃষ্ণের ভাব গতিক বুঝিয়া পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে,—কৃষ্ণকে ব্রজে নেওয়া সহজ সাধ্য ব্যাপার নহে। মা'র কথা বলিলে অবশ্যই যাইবে। তাই স্বকার্য্যোদ্ধারের জন্য এই মিথ্যা কথাটা বলিতে কুণ্ঠিত হইলেন না।

লোকনাথ চক্রবর্ত্তীর এই ছড়াটী সুন্দর হইলেও শেষটায় একটুকু দোষ দৃষ্ট হয়। "হরি বলে করিলাম শ্রীহরি।" "শ্রীহরি" করার অর্থ প্রস্থান করা। বৃন্দা এখন চলিয়া গেলে, কৃষ্ণ ব্রজে যাওয়ার সম্বন্ধে কার কাছে কি উত্তর করিবেন ?

এখন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কয়েকটি গীত লিখিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

গীত। (১)

চিতান,—চন্দ্রার কুঞ্জে, নিশি ভূঞ্জে, কৃষ্ণ দয়াময়।
পারাণ,—সারা নিশি জাগিয়ে, শেষে বিদায় মাগিয়ে,
প্রেম-অনুরাগে,—প্রভাত কালে রাই কুঞ্জে উদয়॥
লহর,—যেয়ে কুঞ্জ দ্বারে বৃন্দা কয়, কি জন্যে হে দয়াময়,
এসেছ এথায় ? হায়! হায় রে!
অধরে নাই মধুর হাসি, কে করেছে মনোদাসী ?
(যেমন) গ্রহণান্তে উদয় আসি, পূর্ণমাসীর শশীর প্রায়॥
মিল,—আজ কেনে, নিকুঞ্জ পানে ঘন ঘন চাও ?
যাও হে বন্ধু ফিরিয়ে যাও এদিক্ পানে চাইও না।
মহড়া,—বারে বারে বারণ করি, চোরা কুঞ্জে যাইও না।
ধুয়া,—কাল তিনি ছিল একাদশী ব্রত কল্লেন রাই রূপসী,
নিশি কল্লেন ভোর,—এসে প্রভাত কালে,
উদয় হলে, চন্দ্রার মনচোর।
ঘুমায়েছেন কমলিনী, শ্রীমতী মৃগ নয়নী,
মান সাগরের জলে কর্ব্বেন দ্বাদশীতে পরনা।
খাদ,—কাঁচা ঘুমে আছেন প্যারী কাছে যাইও না।
লহর,—(ওহে) বন্ধু কোথায় চলেছ, কোন্ ঘাটে মুখ ধুয়েছ,
কাল ছিলে কোথায় ? হায় হায় রে!
কে দিল সিন্দুরের দাগ, কে করেছে অঙ্গরাগ,
(এমন) সাধের প্রেম, সোহাগের দাগ,
হায় মরি! কি শোভা পায়॥

এই গীতটি অতি সরল ভাবে রচিত। স্থানে স্থানে শ্লেষ ব্যঞ্জক কবিত্বের পরিস্ফুট ঝঙ্কারে গীতটি বড়ই সুন্দর হইয়াছে। আক্ষেপের বিষয় এই যে, গীতের অন্তরা ও পরচিতান পাওয়া গেল না।

গীত। (২)

চিতান,—ধনুর্যজ্ঞে যাত্রা করে চল্লেন গিরিধর।
পারাণ,—অতি মনের দুঃখে, বিনয় বাক্যে
বলাইকে ডেকে, সকলে চক্ষে বল্লেন যজ্ঞেশ্বর॥
লহর, যে মায় লালন পালন করেছে,—
দুখের বেদন বুঝেছে।
তাঁরে ছেড়ে যাই, আমার এ দুঃখের আর সীমা নাই,
খেলতে খেলতে ক্ষুধা হৈলে, মা আমারে করে কোলে,
(দিত) মাখন ছানা মুখে তুলে, গোপাল বলে সর্ব্বদাই॥
মিল,—তুমি আমি যাত্রা করে চল্লাম মথুরায়,—
কি হবে যশোদার উপায়,—মা, বলতে আর কেহ নাই।
মহড়া,—মাকে একবার দেখে আসি,
দাঁড়াও খানিক দাদাগো বলাই॥
ধুয়া,—(কাল দৈবকিনীর কোলে যাব,—
মা বলিয়া প্রাণ জুড়াব,
সেই মধুপুরে, যশোদা মা'র জন্যে আমার পরাণ পোড়ে,
কেমন করে যাব ছেড়ে,—মনে মনে ভাবি তাই।
খাদ,—জন্মের মত মাকে একবার মা ডাকিয়া আই(সি)।
লহর,—ছেড়ে সাধের বৃন্দাবন, মথুরায় চল্লেম এখন,
আরত কখন আসব না এথায়,—
মা আমাকে কত করে, পালন কল্ল ব্রজপুরে,
মাতৃ ঋণ শোধ করিবারে,—
(আমার) কি আছে উপায়।

করুণ রসাত্মক এই গীতটি, মাতৃভক্তির উজ্জ্বল কিরণে প্রদীপ্ত। কবি, সরল ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের কৃতজ্ঞতা মূলক মনের ভাব অতি পরিস্কার রূপে ফুটাইয়াছেন।

গীত। (৩)

চিতান,—নবমী—প্রভাত কালে, গৌরীকে নিবার ছলে,
এইলেন পঞ্চানন।
পারাণ,—করে শিঙ্গার ধ্বনি, বভম্ বভম্ বভম্ ধ্বনি,
শুনে তাই গিরিরাণী জুড়িল ক্রন্দন॥
লহর,—(তখন) জয় দুর্গে শ্রীদুর্গে বলে,

গিরিরাণী কেন্দে বলে,
কৈ গো উমাধন,—
আমি দুঃখিনীর জীবনের ধন,—
আয় মা একবার করি কোলে,
মায়ের কথা যাইস্ না ভুলে
তোর দুঃখে মোর জীবন জ্বলে,
জামাই পাগ্‌লা পঞ্চানন ॥
মিল,—শিঙ্গা ধ্বনি শুন্তে পাই,
এসেছে পাগল জামাই,
তোমাকে নিতে,—
আমি ঘরে রব হায়! কিমতে,
তুই গেলে প্রাণ রবে না।
মহড়া,—মাগো উমা এবার তোরে
কৈলাসে যেতে দিব না।
ধুয়া—কেমন করে যাবে উমা, আমি যে তোর দুঃখিনী মা,
আমাকে ছেড়ে—আমি তোর দুখেতে পুড়ে মর্ব্ব কাঁদ্‌বে তুই পরে,
গর্ভে ধরে আমি তোরে পেলেম কত যন্ত্রণা।
পাদ,—ঝিয়ের বেদন মায়ে বিনে অন্যে বুঝে না।
লহর,—তুই গেলে মা জামাই বাড়ী,—
তোর বিচ্ছেদে মর্ব্বো পুড়ি,
গিরিপুর ঘিরিবে আন্ধারে,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে গেল নবমী,
উদয় হল কাল দশমী,
বিদায় দিয়ে তোরে আমি,
ঘরে রই কেমন্ ক'রে ॥

কবি লোকনাথ চক্রবর্ত্তীর এই গীতটিও বাৎসল্যরসের অনর্গল ধারায় অতি মধুর হইয়াছে। খুঁজিলে তাঁহার রচিত আরো অনেক গীত, ছড়া, খণ্ড কবিতা পাওয়া যাইতে পারে।

হোলী। (১)

চল সখিগণ, মধু বৃন্দাবন,
মুষ্টি ভরে খেল্‌ব লাল ফাগুয়া রে।
আতর গোলাপ ভরি, লয়ে চল পিচকারী,
নানা রঙে খেল্‌ব লাল ফাগুয়া রে।
যদি সখি কালা চোরা, নিকুঞ্জে আজ পরে ধরা,
মুখে মাইখে দিব লাল ফাগুয়া রে।

হোলী কীর্ত্তন। (২)

সখিরা সকলে কৃষ্ণকে ফাগুয়া খেলায় হারাইয়া অবমাননা করিতেছেন।

কুঞ্জের বাহির হৈয়া দূরে যারে কালাচান।
পাইবে অপমান,—পাইবে অপমান ॥
চূড়া ধড়া লব কাড়ি, আরো রঙ্গের পিচকারী,
তোমার মাথায় দিব প্যারীর বিমান,
হো—হো—হো! তোমার মানে দিব প্যারীর বিমান ॥

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

ঘাটু ঘাট।

সেবার টাকার বাজার বড় মন্দা ছিল; কৃষকের ঘরেও অন্ন ছিল না। পাটের বাজার ক্রেতার অভাবে এবং ধানের বাজারে অত্যধিক পাইকারের প্রাদুর্ভাবে দেশের অবস্থা যতদূর শোচনীয় হইতে হয়, তাহাই চরম মাত্রায় হইয়াছিল। দেশের অবস্থার সহিত যেমন ব্যবসায়ীর ব্যবসায় নির্ভর করে, তেমনি চাকুরীয়ার চাকুরীও নির্ভর করে। ফলে আমাদের থানাদারীর অবস্থাও হইয়া দাঁড়াইয়াছিল শোচনীয়তর। লোকে খাইতে পাবে না ফৌজদারী করিবে কি? তবে অভাবের তাড়নায় চুরি চামারী বৃদ্ধি হইয়াছিল বটে! কিন্তু কেবল চুরির তদন্তে কি পেট ভরে?

এই অবস্থায় পড়িয়া যখন বায়ু ভক্ষণের অবস্থায় দিন গুণিয়া মাসকাবার করিতেছিলাম সেই সময় শ্রাবণের এক জলধারা বর্ষী দ্বিপ্রহরে চৌকিদার আসিয়া খবর দিল "থানায় একটা লাস আসিয়াছে—সাপে কাটা"—

চৌকিদারের মুখের দিকে ইঙ্গিত প্রকাশক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকিয়া, বুঝিলাম—আশা নিষ্ফল। বিরক্তির সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম—সাপে কাটা না বিষে মারা? সেও বিরক্তির সহিত উত্তর করিল—"বলে তো সাপে কাটা।"

"থাক! আজ এখনি তেরখি যাইতে হইবে—গোশাই বাড়ীর চুরির তদন্তে—শুনিলাম ক্বালু চোরাও বাড়ীতে

আছে, শালাকে এবারও কিছু জব্দ করিতে হইবে। এখনি প্রস্তুত হওগে; রামসিং আর নকরচাঁদকেও যাইতে হইবে।

সহযাত্রীদিগকে প্রস্তুত হইতে আদেশ দিয়া সেই নিঝুম বাদলের অবকাশ প্রত্যাশায় গৃহিনীর সহিত বিশ্রম্ভালাপে নিযুক্ত হইলাম।

গৃহিনী বৈশাখ মাস হইতে তাহার নীলকণ্ঠির জন্ম দিনরাত তাগাদা করিতেছিলেন। ১লা বৈশাখ নূতন বছরের উপহার স্বরূপ তাহাকে এই নেকলেসটী দিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম, অবস্থার হীনতায় প্রতিশ্রুতি রক্ষা হইতেছিল না। রামপুরের তদারকে যে বিপুল প্রাপ্তির প্রত্যাশা ছিল তাহাই এই প্রতিশ্রুতির জন্মদাতা। কিন্তু সে খুনের তদারক ইনিস্পেক্টর বাবুর হাতে চলিয়া যাওয়ায় এবং ইহার পর এই ৭।৮ মাসের ভিতর তেমনতর কোন গুরুতর তদারকের সুযোগ উপস্থিত না হওয়ায়—সে উপহারটী সম্বন্ধে গৃহিনীর নিকট আমার মুখ ছিল না।

আমার বৈষয়িক অবস্থা বুঝিয়া কিছুদিন যাবৎ গৃহিনী আর নিজের নীলকণ্ঠির কথা তুলিতে ছিলেন না, তৎ পরিবর্ত্তে তাহার একমাত্র ছেলের গলার জন্ম একটা সোণার চেনের দাবি উপস্থিত করিয়াছিলেন। আমি উত্তরে বলিয়াছিলাম—ছেলেকে অলঙ্কার পড়াইতে নাই—ইহাতে লোকের দুষ্ট নজর পড়ে। তারপর তোমার সবে এই এক মাত্র মল্লির ছেলে।

গৃহিনী প্রত্যুত্তরে বলিলেন—'ও তোমার না দিবার কথা।' আমি সে দিন আর কোন কথা বলি নাই।

আজ এই নিঝুম বর্ষণ ক্ষণের বিশ্রম্ভালাপের সূচনায়ই গৃহিনী বলিলেন "আজ এই দিনে কেমন করিয়া তদারকে যাইবে?"

আমি বলিলাম—"ঘোড়ায় চড়িয়া, রবারের ওয়াটার প্রুফটা আছে কিসের জন্ম?

"এমন দিনে না গেলেই কি নয়?"

"পুরাণো দাগী চোর ধরিবার ইহাই সুদিন। শুনিলাম * * * * * শালা বাড়ীতেই আছে। এমন দিনে যে তার পুলিশ বাবা তাহার ঢেকী ঘরেও উদয় হইতে পারে সে চিন্তা সে হারামজাদার নিশ্চয় নাই। এদিকে টাকা পয়সায় ওতো প্রয়োজন ....।

টাকার আভাস পাইয়া গৃহিনী বলিলেন—খোকার ভাগ্য দেখি কেমন? আজ যাহা পাও সে সমস্তই কিন্তু তার?

সে তদারকে যে বেশী কিছু লাভ হইবে, তেমন বিশ্বাস আমার ছিল না; তবে কালু চোরাকে হাতে পাইলে, যে যাত্রাটা একেবারেই বিফলে যাইবে না, তেমন বিশ্বাস খুবই ছিল। আমি বলিলাম—হাঁ, তাহাই, আজকার প্রাপ্তি খোকারই। সিদ্ধিদাতা গণপতির উদ্দেশে এক পয়সার সিন্নি মানসিক কর।"

বৃষ্টি প্রবল ধারে পড়িতেছিল। আমি সহিসকে ঘোড়া সাজাইতে বলিয়া পাঠাইয়া পোষাক পরিতে লাগিলাম।

খোকা চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর চক্ দিয়া ঘোড়া আঁকিতেছিল। আমার কোথাও যাত্রা করিবার বন্দোবস্ত বুঝিলেই সে আসিয়া, বুটজুতা, ছড়ি, টুপি, মোজা প্রভৃতি আনিয়া একে একে উপস্থিত করে।

আমি পেন্ট পরিতেছি দেখিয়া সে সশবাস্তে চেয়ার হইতে নামিয়া বুট ও মোজা আনিয়া হাজির করিল, তারপর টুপি ....

গৃহিনী রবারের ড্রেসটা আনিয়া চৌকির উপর রাখিলেন, কটরায় পান ভরিয়া রাখিয়া দ্বিতীয় আদেশ প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আমি পোষাক পরিয়া খোকাকে টানিয়া কোলে তুলিয়া লইয়া চুম্বন করিলাম।

খোকা জিজ্ঞাসা করিল "কখন আস্‌বে বাবা?"

আমি বলিলাম—"ঘুমিয়ে থেকো বাবা, ঢের রাত হবে আমার; আমি এসে তোমাকে তুলে চুমুখাব।"

গৃহিনীকে বলিলাম—"রাত্রি হইবে আসিতে; আসিলে পরে যেন ঠাকুর আমার ভাত রাঁধে। পাঁচ মাইল রাস্তা হলেও দরবার করতে হবে সারা রাত।"

(২)

বর্ষণ একটু থামিতেই ঘোড়ায় সাওয়ার হওয়া গেল। সঙ্গীয় কনেষ্টবল এবং চৌকিদারদিগকে আপন মনে যাইয়া যথাস্থানে পঁহুছিতে উপদেশ দিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম —কালু চোরা যেন টের না পায়।

বাহনের প্রথম পাদক্ষেপেই বাধা পড়িল। একটা নির্জ্জিব প্রায় লোক দৌড়াইয়া আসিয়া দণ্ডবৎ হইয়া

উন্মত্তের ন্যায় বলিল—"হুজুর আমার প্রতি কি হুকুম"—লোকটার মুখে আর কোন কথা ফুটিল না—সে আপন মাথায় করাঘাত করিতে করিতে আমার যাত্রার পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়া চক্ষের জল ছাড়িয়া দিল।

দেখিলাম একটা মৃতদেহ দূরে একখানা সামান্য ছেঁড়া কাপড়ে ঢাকা পড়িয়া রহিয়াছে; বর্ষা অবিরল ধারা বোধ হয় তাহার উপর দিয়াই গিয়াছে—কেন না সেই আর্দ্র বস্ত্রখানা শবের শরীরটাকে তখন জড়াইয়া ধরিয়া যেন তাহার প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্বরূপ তাহার ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছিল।

বেজায় রাগ হইয়াছিল। ধমক দিয়া বলিলাম—"বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছিস, এখন ভিজাইয়া ফুলাইয়া কিরূত করিতে চাস—বেটা পাজি, হারামজাদা বদমাইশ থাক—আসি আগে—

লোকটা ঘোড়ার পায়ের সম্মুখে পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"ধর্ম্মাবতার আর জ্বালার উপর জ্বালা সয় না। পুত্রেরে কালনাগে ডংসিছে, আমাকে ঘোড়ার পায়ে পারিয়া মারুণ—জ্বালা জুড়াইয়া যাউক ....

যাত্রার পথে এরূপ বাধা কার না রাগ হয়? তার উপর নিষ্ফল ডাইরী! এই নিষ্ফলতার উপর প্রারব্ধ কার্য্যের ফলাফল সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছিল। মনে হইতে ছিল এই নিষ্ফলতা আজকার দিনের এই শঙ্কটপূর্ণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়টা বুঝি বা সবই পণ্ড করিয়া দিবে, খোকা বাবুর বরাতটা একেবারে ব্যর্থ করিয়া দিবে! না তা কখনই হইতে পারে না।

লোকটার কথা শুনিয়া ও অবস্থা দেখিয়া ও যাত্রাকালে শব দর্শন শুভ মনে করিয়া ঘোড়ার লাগাম ফিরাইয়া শবের নিকট গেলাম। দেখিলাম ১০।১২ বৎসরের একটী হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর বালক—মুখের কাপড়খানা তুলিয়া ধরিয়া লোকটা শবের মুখের উপর আছাড় খাইয়া কাঁদিয়া পড়িল—দেখিলাম ফুটফুটে মুখখানা বিষে কালো হইয়া গিয়াছে। কেশগুলি মেয়েলী ধরণের লম্বা ও সিঁথির দুইধারে সমানে বিন্যস্ত।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ ছেলে তোমার কে হয়?"

লোকটা চক্ষু মুছিয়া বলিল—"ধর্ম্মাবতার পুত্র—ছেলে।"

"কি কাজ করিত তোমার ছেলে?"

ঘাটুর নাচ করিত—আর গান গাইত।"

"কবে মরিয়াছে?"

"কাল সকাল বেলায়।"

"কাল সারাদিন কি করিয়াছিলে?"

"সারাদিন উঝায় ঝাড়িয়াছিল ....

"সন্দেহজনক।"

আমি ঘোড়া চালাইয়া দিলাম। লোকটা চীৎকার করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল। আমি ঘোড়ায় চাবুক কসিলাম। জমাদারকে বলিয়া গেলাম আমি আসিয়া ইহার ডাইরী করিব—

* * * * *

(৩)

সন্ধ্যার পর পুনরায় মুসলধারায় বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। সেই প্রবল বর্ষণের সুযোগ আপাদমস্তক জলসিক্ত করিয়া যাইয়া সেই কালু ছোরাকে আমাদের অনুসন্ধান মতই নির্দ্দিষ্ট স্থানে ধরিতে পারিয়াছিলাম। ইহার পর অন্যান্য কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া রাত্রি ১১টায় থানায় ফিরিয়া আসিয়াছিলাম।

সাপে কাটা সেই ছোকরার কথা এ পর্য্যন্ত স্মরণই ছিল না; থানার সীমানায় আসিতেই পঁচা শবের গন্ধে সে কথাটা হঠাৎ স্মরণ হইল। যাত্রাকালে শব দর্শন শুভ—খোকার অদৃষ্টেরও জোড় ছিল যাত্রাটা যাহা হউক একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। বাধাটা অবশ্যই ফলিয়াছে—গোঁসাই বাড়ীর চুরির তদারকের কিছুই হয় নাই। ভদ্র গৃহে চুরি, চোরের অনুসন্ধান না পাইলে কে কাহাকে কি দিবে?

ব্রহ্মপুত্রের তীরেই আমাদের থানা। ব্রহ্মপুত্রের মুক্ত হাওয়ায় শবের দুর্গন্ধ থানার সম্মুখের বিস্তৃত মাঠটা ছাইয়া ফেলিয়াছিল।

সহিসকে বলিলাম শবটার বেজায় দুর্গন্ধ হইয়াছে; ঐ লোকটাকে শবশুদ্ধ দূরে হাকাইয়া দে। কাল প্রাতে ডাইরী করিয়া তদন্ত করিব।"

তখন জোৎস্না উঠিয়াছিল, দেখিলাম লোকটা তখনও শব আগুলিয়া বসিয়া আছে।

ঘোড়ার শব্দ পাইয়া লোকটা পুনরায় ছুটিয়া আসিয়া কম্পিত স্বরে চীৎকার করিয়া বলিল—হুজুর—মা—বাপ—পুত্রশোক.........

"পুত্রশোকের পালা কাল প্রাতে, আজ আর হবে না ঐ দিকে মরা লইয়া চলিয়া যাও।"

নাকে রুমাল দিয়াও আমি আর যেন তিষ্ঠিতে পারিতে ছিলাম না। পুত্রহীনের কান্না শুনিবার বিরুদ্ধে কর্ণ তখন বধির হইয়া উঠিয়াছিল। ঘোড়া বাসার দিকে চালাইয়া দিলাম।

(৪)

রাত্রি প্রায় বারটায় ঘুমাইয়াছিলাম। শেষরাত্রে গৃহিনী আমাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—উঠ দেখি, খোকার দাস্ত হইতেছে, বিছানা নষ্ট হইয়াছে দুইবার; বিকালে কাল জাম খাইয়াছিল—উপরের পর্দ্দাগুলি আস্ত বাহির হইয়াছে—"।

গৃহিনীর কথা শেষ হইতে না হইতে আমি উঠিয়া পড়িলাম। বাহিরের ঘরে ঠাকুর ও চাকর ঘুমাইতেছিল, তাহাদিগকে ডাকিয়া তুলিলাম। চাকরকে দৌড়াইয়া ডাক্তারের নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমি খোকাকে কোলে লইয়া বসিলাম। গৃহিনী বিছানা পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। চাকরকে পাঠাইয়া থানা হইতে রামসিং ও পিতাম্বর সিং কনেষ্টবলদ্বয়কে ডাকাইয়া আনিলাম।

তখনও বৃষ্টি হইতেছিল। ঘুমন্ত খোকা সংজ্ঞাহীন প্রায় আমার ক্রোড়ে পড়িয়া, আমি পুনঃ পুনঃ তাহার নিদ্রিত মুখ চুম্বন করিতেছিলাম। এই সময় সে আমার ক্রোড়েই মলত্যাগ করিল। সে মলের বর্ণ আকার ও অবস্থা দেখিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম—রামসিং দেখিতেছ না, তুমিও যাও, ডাক্তার বাবুকে শীঘ্র লইয়া আইস।"

রামসিং দৌড়িয়া গেল।

আমার শরীর কাঁপিতেছিল; মাথা ঘুরিতেছিল। ময়লা-যুক্ত কাপড় ছাড়িবার কথা বিস্মৃত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলাম "খোকা! বাবারে চেয়ে দেখ দেখি বাবা, আমি আসিয়াছি। বাবা, এই যে আমার টুপি, তুমি তুলিয়া রাখিবে না?"

খোকা নির্জ্জিবের মত অবশ হইয়া পড়িয়া রহিল। চক্ষু মেলিল না, সাড়াও দিল না।

খোকার মা বিছানা পরিস্কার করিয়া নূতন করিয়া তাহা পাতিয়া খোকাকে পরিস্কার নেকরায় মুছিয়া আমার কোল হইতে লইয়া গেলেন। আমি কোন প্রকারে কাপড় বদলাইয়া লইয়া ইকুইলিপটাসের শিশি ঢালিয়া বিছানাটার দুর্গন্ধ দূর করিতে চেষ্টা করিলাম; তারপর খোকার মুখের উপর ঝুকিয়া পড়িয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম।

ডিস্পেন্সারী একটু দূরে ছিল; সুতরাং ডাক্তার আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। সে বিলম্ব আমাদের নিকট অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। এই সময় স্ত্রী বলিলেন—"পুনরায় বিছানা নষ্ট হইয়াছে"।

"কি সর্ব্বনাশ এখনও ডাক্তার আসিল না"।

এই সময় বাহিরে শব্দ হইল। আমি ডাকিলাম—"ডাক্তার বাবু কি?" বাহির হইতে উত্তর আসিল হাঁ, কি হইয়াছে দারোগা বাবু?"

ডাক্তার ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমি বলিলাম—"দেখুন, সর্ব্বনাশ হইতেছে—খোকাকে বুঝি আর রাখিতে পারিলাম না—।"

আমার মুখ হইতে কথা স্পষ্ট বাহির হইতেছিল না।

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"কোন চিন্তা নাই। ওষুদ খাইয়েই সারিয়া যাইবে 'খন।"

ডাক্তার বাবু রোগীর মল দেখিলেন ও রোগীকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন--পেটে আরো মল আছে বাহির হইয়া যাওয়াই প্রয়োজন। তিনি ঔষধ দিলেন। ঔষধ খাওয়ার পরেও বমি হইতে লাগিল।

স্ত্রী অস্থির হইয়া পড়িলেন আমিও সুস্থির রহিলাম না। ডাক্তার আমাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন "কোনও ভয় নাই। "কিন্তু তাহার মুখ ও চক্ষু যে ভাব ব্যক্ত করিতে-ছিল, তাহাতে আমার মন কিছুতেই আশ্বাসে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিল না।

কয়েক ডোজ ঔষধ খাওয়াইয়া ডাক্তার বলিলেন—একটা ইন্‌জেক্‌সনের ব্যবস্থা করা যাউক। আজকাল উহাই ইহাকে এরেষ্ট করিবার একমাত্র ঔষধ।

আমার মাথা ঠিক ছিল না, বলিলাম—"আপনার হাতে খোকাকে দিলাম; আপনি যাহা ইচ্ছা করুন।

ডাক্তার ইন্‌জেক্‌সনের জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত যেন আমার নিকট যুগ বলিয়া মনে হইতেছিল। আমি ছুই হাত মাথায় রাখিয়া বসিয়া ডাক্তারের মুখের ভঙ্গি লক্ষ্য করিতেছিলাম।

স্ত্রী কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন—"ওমা, খোকা আমার একি করেগো? হাত ছু'টাতে যে তার খেচুনি ধরিয়াছে—কি হইবে গো!"

ডাক্তার বলিলেন—"একটু বেশী দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, ইন্‌জেক্‌সন করিলেই সব সারিয়া যাইবে 'খন।

রামসিং বলিল—"একটু তারপিন মালিশ করিয়া দিব কি?"

ডাক্তার বলিলেন—"বেশতো দিতে পার; ততক্ষণে আমি ইন্‌জেক্‌সন প্রস্তুত করিয়া নিই।"

রামসিং তাহার ঘর হইতে তারপিন তৈল আনিয়া নিজেই খোকার হাতে মালিস করিতে লাগিল।

গল্পপ্রিয় ডাক্তার ইন্‌জেক্‌সনের মালমশলা ঠিক করিতে করিতে গল্প জুড়িয়া দিলেন—

থানার সম্মুখে সেই সাপে কাটা মরাটার ভয়ানক একটা দুর্গন্ধ হইয়াছে; ঐ গন্ধে চিত্ত অপেক্ষা অচিত্তটাই বেশী হইবে দেখিতেছি...আপনারা পুলিশ আপনাদের দৃষ্টি সে দিকে কম...।

ডাক্তারের কথায় আমার সেই হতভাগা পুত্র শোক-কাতর ব্যক্তির বেদনা ব্যথিত চিত্ত ও তাহার মৃত পুত্রের স্নিগ্ধ-মলিন পাণ্ডুর মুখখানা স্মৃতিপথে উদিত হইল। আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম—"ডাক্তার বাবু আমার সেই পাপেরই এই প্রায়শ্চিত্ত। রামসিং চল ভাই আগে সেই পুত্রশোক কাতর হতভাগাকে যাইয়া মুক্তি দিয়া তাহার তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস রোধ করি। তাহার অভিসম্পাৎই মূর্ত্ত হইয়া খোকার পরমায়ু গ্রাস করিতেছে।"

আমি খোকার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই লাফাইয়া উঠিয়া রামসিংকে টানিয়া লইলাম।

ডাক্তার টেবিলের উপর ঔষধ রাখিয়া চেয়ারে বসিয়া ইন্‌জেক্‌সন ঠিক করিতেছিলেন; তিনি ত্রস্তভাবে বলিলেন, শান্ত হউন, করেন কি? পাগল হইলেন নাকি? এখন এত বাবড়াইলে চলিবে না, যার্জ করিতে হয় জমাদারকে বলুন তাহারাই করিবে।

সেই পুত্র শোকাতুরের অসহায় দৃষ্টি যেন তীব্র অভি-সম্পাতে আমার হৃদয়ের শান্তিকে দগ্ধ করিয়া দিতেছিল। ডাক্তারের কথায় সান্ত্বনা পাইলাম না। বলিলাম—ডাক্তার বাবু আপনি খোকার জন্ত যাহা হয় করুন। সেই বিপন্নের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস খোকার পরমায়ু ক্রমেই ভস্ম করিয়া দিতেছে। এখনও যদি কোন আশা করিতে হয়তো সেই হতভাগ্যেরই আশীর্ব্বাদ। তা ছাড়া আর কিছু নাই—হাজার ঔষধ দাও ডাক্তার সব পণ্ডশ্রম——"

আমি পীতাম্বরসিংহ কনেষ্টবলকে টানিয়া লইয়া বাহির হইলাম। আমার স্ত্রী আমার মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া নূতন কোন বিপদ আশঙ্কায় চীৎকার করিয়া বলিলেন ওগো আপনারা তাহাকে ধরুণ। ও ঠাকুর ধর—এই অঝোর বাদলে কোথায় যাইবে তুমি?

স্ত্রীর কথায় আমাদের ঠাকুর আমাকে বারান্দায় আসিয়া ধরিয়া ফেলিল। বৃষ্টি তখন বাস্তবিক অঝোরে ঝরিতেছিল। আমি স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম আমারই ত্রুটীতে একটা শোকদগ্ধ হতভাগা তাহার একমাত্র পুত্রটীর মৃত দেহ লইয়া এই বারিধারার নীচে রাত কাটাইতেছে, আর আমি তাহার হৃদয়ের বেদনা বৃদ্ধি করিয়া দিয়া সুখে পুত্রক্রোড়ে নিদ্রা যাইব, ভগবানের চক্ষে কি ইহা সহ্য হইতে পারে? সেই হতভাগ্যের মুক্তি ব্যতীত আমার কল্যান নাই; আমাকে অগ্রে তাহাই করিতে হইবে। আমি পাগল হই নাই; তোমরা খোকার শুশ্রূষা কর, ডাক্তারবাবু এখানে থাকুন; আমি সেই হতভাগ্যের আশীর্ব্বাদ খোকার জন্ত লইয়া আসি——"

আমি পীতাম্বরসিং কনেষ্টবলকে লইয়া সেই বৃষ্টি ধারার মধ্যেই বাহির হইয়া পড়িলাম।

আমার হৃদয়পটে তখন কেবল দুইটী অসহায় মুখই ভাসিতেছিল। একটী সেই পুত্র শববাহি ব্যথিত ব্যক্তির কাতর চাহনী, ২য় আমার পত্নীর সদা-পুত্রহারা আলু থালু বেশে উন্মাদিনী মূর্ত্তি। (৫)

সেই অবিরাম বর্ষা বারিধারার মধ্যেও সেই হতভাগা পিতা তাহার মৃত পুত্রের দুর্গন্ধযুক্ত শব নিজ বক্ষপুটে চাপিয়া লইয়া পড়িয়া আছে। নিস্বার্থ অপত্য স্নেহের কি দেবোপম প্রকাশ!

আমি উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া ডাকিলাম 'কোথা তুমি পুত্রহারা হতভাগ্য? তোমার অসহ্য হৃদয় বেদনা আজ সর্প হইয়া আমার বক্ষে ছুড়ি মারিয়াছে—এস ভাই, এই দুই বিষ দগ্ধ বক্ষ একত্র মিলাইয়া উভয়ের বিষের যাতনা লাঘব করি।"

আমার চীৎকার শুনিয়া সেই হতভাগ্য ভয় পাইয়া গিয়াছিল। এবং সে তাহার মৃত পুত্রকে আরো বক্ষের নিকট টানিয়া লইয়াছিল। সে বোধহয় ভাবিয়া ছিল কনেষ্টবলদের পুনঃ পুনঃ আদেশেও সে সেই দুর্গন্ধময় শব সরাইয়া না নেওয়ায় এখন তাহার প্রতি দস্তোরমত অত্যাচার হইবে। সে তেমন অত্যাচার সহ্য করিতেও প্রস্তুত ছিল। কেননা শব বহন করিয়া অন্যত্র নিবার এবং পুনরায় থানায় আনিবার জন্য তখন আর তাহার সঙ্গী কেহ ছিলনা।

সেও তাহার মৃত পুত্রকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়া উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিল—"মার মার; ইহার বেশী আর কি করিবে, আর কি করিবার ক্ষমতা আছে?

পীতাম্বর সিং তাহাকে বুঝাইয়া বলিল—ওহে, দারোগা বাবু নিজেই আসিয়াছেন তোমার কথা শুনিতে, তুমি এই ঘরে আসিয়া সকল কথা শুন।" পিতাম্বরের কথা শুনিয়া লোকটা শব ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, আমি উন্মত্তের ন্যায় তাহাকে দুই হাতে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম 'ক্ষমা কর ভাই, তোর শোক দগ্ধ হৃদয়ের উষ্ণ শ্বাসে আমার একমাত্র পুত্রটীর প্রাণ দেহ ছাড়িয়া চলিয়াছে......'

লোকটা আমার অবস্থা দেখিয়া ও কথা শুনিয়া কিছুই বোধ হয় বুঝিয়া উঠিতে ছিলনা। দুই হাত যোড় করিয়া লম্বা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া পীতাম্বর তাহাকে সরল ভাষায় আমার মনের কথা বুঝাইয়া দিল। পীতাম্বর তাহাকে বলিল—তুমি সকল কথা ভুলিয়া গিয়া দারোগা বাবুর শিশু পুত্রটীর জন্য একটু আশীর্ব্বাদ কর, বাবুর বিশ্বাস তোমার অভিসম্পাতেই তাঁহার পুত্রের প্রাণ শঙ্কটাপন্ন হইয়াছে।"

লোকটা দুইহাত যোড় করিয়া নত মস্তকে অভিবাদন করিয়া বলিল—আমার শত্রুরও যেন এমন না হয় আমি তাহাকে আর কথা বলিতে না দিয়া বলিলাম "তোমার পুত্রের শব পুড়িবে না জলে ভাসাইবে? সে বলিল না বাবু ভাসাইবার সময় গিয়াছে, এখন গোর দিবার অনুমতি দিলেই হয়। আমরা যোগী বৈরাগী—গোরই আমাদিগের ব্যবস্থা।

আমি বলিলাম তবে সত্বর তাহাই কর। তোমার পুত্রের সৎকার না হইলে আমার প্রাণে শান্তি নাই। ঐ নদীর ঘাটের বাম দিকের ঐ পরিষ্কার যায়গায় তোমার পুত্রের গোর হইবে। আমি নিজেই তাহা করিব, চল।

এই বলিয়া আমি নিজেই যখন সেই শব রক্ষিত চাটাই ধরিয়া তুলিতে চেষ্টা করিলাম তখন পীতাম্বরসিং ও আর তাহা না ধরিয়া পারিল না। আমরা তিনজনে তখন শবটা নদীর ঘাটে লইয়া গেলাম। এবং রাত্রি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শবের সৎকার শেষ করিয়া ফেলিলাম।

গৃহে পুত্রের অবস্থা যে তখন কিরূপ সে সম্বন্ধে আমার জানিবার কোন চেষ্টা ছিলনা, চৈতন্যও ছিলনা। আমার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল সেই পুত্রহারার প্রাণে শান্তি দিতে পারিলেই নিজের মনেও শান্তি পাইব, তারপর ভগবানের যাহা ইচ্ছা সেতো অবশ্যই ঘটিবে।

নদীর জলে অবগাহন স্নান শেষ করিয়া বৈরাগীকে হাতে ধরিয়া লইয়া যখন গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম তখন গৃহের স্পষ্ট চিত্র যেন চক্ষের সম্মুখে মূর্ত্ত হইয়া প্রকাশ পাইল দেখিলাম যেন খোকার সেই চির সহাস্য মুখখানা গোর প্রোথিত ঘাটু বালকের বিষ-মলিন পাণ্ডুর বর্ণ মুখের অনুরূপ নিস্তেজ হইয়া গিয়া কোন এক ক্ষমতাবান পুরুষের ডাইরী লেখার অবসরের অপেক্ষায় ফুলিয়া উঠিয়া বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে; আর তাহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে তাহার হতভাগিনী জননী, —সেই ক্ষমতাবান পুরুষের দয়ার জন্য!

আমার কর্ণে যেন সেই করুণ ক্রন্দন ধ্বনিই বাতাসের সাথে সাথে প্রবেশ করিতেছিল।

আমি বলিলাম পীতাম্বর সিং শেষ হইয়া গেল কি? ক্রন্দনের শব্দ আসিতেছে না।

পীতাম্বর বলিল-না, আপনি বৃথা অশুভ চিন্তা করিবেন না।

খোকার অবস্থার অবনতি ব্যতীত কোন উন্নতি হয় নাই। হাতে পায়ে খেচুনি বৃদ্ধি পাইয়াছে; দাস্ত ও বমির

বিরাম ছিল না। ডাক্তারবাবু প্রাতঃকৃত্যাদির জন্য চলিয়া গেলেন। বৈরাগীকে আনিয়া ছেলের মস্তক স্পর্শ করাইয়া আশীর্ব্বাদ লওয়াইলাম। কিছুতেই কিছু হইল না। প্রস্রাব বন্ধ হইয়া গেল। ডাক্তার পুনরায় আসিলেন, নাড়ী পরীক্ষা করিলেন; তাহার কর্ত্তব্য তিনি করিলেন।

আমার মন তখনও বৈরাগীর দিকে ছিল, বুঝিতে পারিলাম বৈরাগীর মনে শান্তি আসে নাই, সে প্রাণের সহিত খোকাকে যেন আশীর্ব্বাদ করিতে পারে নাই। করিতে পারিলেই যেন খোকার ব্যারামের বিরাম হইত।

বৈরাগীকে খুঁজিতে যাইয়া দেখি সে তাহার পুত্রের গোরস্থানে যাইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে। আমি বলিলাম "বাবাজী নিশ্চয় তোমাকে কোন দুশ্চিন্তায় পীড়ন করিতেছে এবং সেই পীড়নের ফলে আমার পুত্র এখনও অভিভূত হইয়া আছে। তুমি ছেলে পাবে না বাবা—অনর্থক আমাকে কাঙ্গাল করিও না। তোমার মনে আর কি কষ্ট এখন আছে বল, তোমার হৃষ্ট মনের আশীর্ব্বাদ না হইলে খোকার রক্ষা নাই; তোমার জন্য আর কি করিতে হইবে বল

বাবাজী বলিল—"বাবু, কবরটা ভাল করিয়া খোদা হয় নাই, শিয়াল কুকুরে········

আমি বলিলাম—"কোন চিন্তা নাই, আজ রাত চৌকিদার পাহারায় রাখিব; কাল রাজমিস্ত্রী আনিয়া তাহা পাকা করিয়া দিব। তুমি নিশ্চিন্তমনে প্রাণ খুলিয়া খোকাকে আশীর্ব্বাদ কর।"

বৈরাগী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া যেন নিশ্চিন্ত হইল।

বাস্তবিক আমাদের তাড়া হোড়ায় ও অপটুতায় গর্ত্ত বেশী গভীর হয় নাই। যাহা হউক শৃগাল কুকুরের জন্য রাত্রিতে পাহাড়ার বন্দোবস্ত রাখিলাম।

বৈরাগী আসিয়া হৃষ্টচিত্তে খোকার মস্তকের নিকট বসিয়া তাহার মালা জপিয়া খোকাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। রাত্রিতে খোকার অবস্থা ভালই রহিল।

পরদিন রাজমিস্ত্রী আনাইয়া গোরস্থানটী পাকা করিয়া তাহার সম্মুখেই নদীর মধ্যে একটী ঘাট বাঁধাইয়া দিলাম। যেন তাহার নিকট দিয়া লোক সর্ব্বদা ঘাটে যাতায়াত করিতে করিতে পারে। বৈরাগী তাহাতে খুব সন্তুষ্ট হইল।

খোকার অবস্থাও তারপর হইতে আশাপ্রদ দেখা যাইতে লাগিল। বৈরাগী ত্রিসন্ধ্যায় তাহার মালা জাপ করিয়া খোকাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

ডাক্তার বলিল আর চিন্তা নাই।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া বৈরাগীকে লইয়া গোরস্থান ও বাঁধা ঘাট দেখিতে গিয়া দেখি কোন দুষ্ট লোক অঙ্গার দ্বারা সেই গোরস্থানটীর উপর লিখিয়া রাখিয়াছে –

"দুঃখ পাইয়া চণ্ডালে সাপে
না পারে সহিতে ব্রহ্মার বাপে"

আর বাঁধা ঘাটলাটীর সিঁড়ির উপর লিখিয়াছে "ঘাটুঘাট"।

গোরের উপরের লেখাটীর ভাব প্রাণের সহিত অনুভব করিলাম। আজও সেই ঘাট, "ঘাটুঘাট" নামে পরিচিত থাকিয়া সেই সত্যের সাক্ষ্য দান করিতেছে।

বাঙ্গালীর পুত্র-পূজা।

পূজা কেবল এক রকমেরই নহে। হিন্দুগণ দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া তাঁহাদের পূজা করিয়া থাকেন এবং যাহার যতদূর সাধ্য সকলেই দেবতার মন সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন মদ্যপায়ীর মদ্য পূজার কথা, অহিফেন সেবীর অহিফেন পূজার কথা কে না জানে? স্ত্রৈণের স্ত্রী পূজার কথা চরাচরে খ্যাত। মহাত্মা রামের বনে গমন ব্যাপারে বৃদ্ধ রাজা দশরথকে অনেকে স্ত্রৈণ বলিয়া দোষারোপ করিয়া থাকেন। মানুষ কষ্টে পড়িলে দেবদেবীকে স্বেচ্ছাচারী বলিয়া দোষ দিয়া থাকে, কিন্তু পত্নীদেবীর স্বেচ্ছাচারিতা তো প্রত্যক্ষ। দৃষ্টান্ত যথা—ভ্রাতুষ্পুত্র চক্ষের সম্মুখে থাকিয়া শুখাইয়া মরিতেছে, কিন্তু পত্নীর ভাইর কালেজের পড়ার খরচ পাঠাইতে একদিন বিলম্ব হইলে পত্নীদেবী আর পূজা গ্রহণ করেন না। এ সকল পূজার কথা সকলেই অল্লাধিক পরিমাণে জানেন, কিন্তু আর এক প্রকারের পূজা সচরাচর সকলের চক্ষে পড়ে না—তাহা বাঙ্গালীর পুত্র পূজা। সোণাচাঁদ পুত্র আজ রাগ করিয়াছেন; তাই কর্ত্তা গিন্নি হইতে আরম্ভ করিয়া দাসদাসী পর্য্যন্ত সকলেই শঙ্কিত, কিসে কি হয়! তাড়নায় অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় বিড়াল যেমন চতুর্দ্দিকে শঙ্কিত দৃষ্টিপাত করিতে

থাকে কর্ত্তার দূর সম্পর্কিত আত্মীয়রাও (অর্থাৎ অন্ন ধ্বংশকারীরা) সেইরূপ এই দেবতার ভয়ে চারিদিকে শঙ্কিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকে। আবার সুযোগও অন্বেষণ করিয়া থাকে যদি কোন সুযোগে দেবতার মন তুষ্ট করা যায়! বাটীর গৃহিনী নানা উপচারে দেবতার পূজা দিয়া দেবতার ক্রোধের উপশম করিতে চেষ্টা করেন। দেবতার ক্রোধ কিন্তু সহসা পড়িতে দেখা যায় না। দেবতার ক্রোধের চরম পরিণতি অনেক সময় ভয়াবহও হইয়া পড়ে। দেবতা ক্রোধভরে কোন সময় বা গৃহিনীর অলঙ্কারের বাক্স গভীর জলে নিক্ষেপ করেন; কোন সময় বা বাটীর অপর ছোট মেয়ের নাসিকার অগ্রভাগ দাঁতে কাটিয়া দেন, কোন সময় বা কর্ত্তার মূল্যবান টেক ঘড়ী দ্বারা কুকুরকে ঢিল ছোঁড়েন। মিষ্টান্নের হাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলা, দুধের বাটী গরম বলিয়া ঝির মাথায় ঢালিয়া দেওয়া তো অতি সাধারণ ব্যাপার।

পূজা বিধাতার চরণে স্ব স্ব দোষ-ক্রটীর পূর্ণ উপলব্ধির সহিত আত্ম নিবেদন না হইলে সে পূজার স্বার্থকতা নাই। যে মমতায় পুত্রের মানুষ হইবার পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায় সে মমতারও কোন স্বার্থকতা নাই। সে মমতা একটা নিজের স্বাভাবিক স্নেহবৃত্তির নিরর্থক চরিতার্থকরণ মাত্র। প্রকৃত পূজার অনুষ্ঠান করিতে পারিলে নিজের জীবনের শান্তি-সাধনের সহিত জগতেরও কোন না কোন উপকার সাধিত হয়; আর পুত্রের ভবিষ্যত চিন্তা করিয়া মমতা করিতে পারিলে নিজ পরিবারের দশের দেশের উপকার সাধিত হয়। অত্র প্রবন্ধে ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয় যে আমরা মানুষ গঠন করাটাকে অতি সহজ ব্যাপার বলিয়া মনে করি। যে মানুষ গঠনের উপর জগতের ভাল মন্দ সকলই নির্ভর করে সে মানুষ গঠন করার বিষয় আমরা দিনের মধ্যে একবারও চিন্তা করি না। আমাদের ঘরে ঘরে ভবিষ্যতের রাজমন্ত্রী, দেশনায়ক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ব্যবসায়বীর, কর্ম্মবীর সকলই বিরাজ করিতেছে তাহাদের কথা দিনের মধ্যে একবারও চিন্তা করি না অথচ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কয়েকবারই জগতের যাবতীয় রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা করিয়া শেষ করিয়া থাকি। ছেলেকে স্কুলে দিয়াই আমরা তাহার সম্বন্ধে ইতি কর্ত্তব্য শেষ করিয়া থাকি। বৎসরের শেষে একবার তাহার পুস্তক কিনিয়া দেই; আর বেশী হইলে তাহাদের জন্য একজন প্রাইভেট্‌টিউটার নিযুক্ত করিয়া দেই। চক্ষের সম্মুখে আমার ছেলে একটা গরীবের ছেলেকে প্রহার করিল। আমি তাহাকে সেই জন্য ভৎসনা করিলাম না বা বুঝাইয়া দিলাম না যে তুমি তাহাকে প্রহার করিলে সেও তোমাকে প্রহার করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিবে; আর যদি তুমি তাহার অন্যায় ব্যবহার ক্ষমা কর সে তোমাকে ভালবাসিবে; বলতো কোন্‌টা ভাল? বস্তুতঃ এই সামান্য প্রসঙ্গে তাহাকে ছোটখাট একটা সমাজ নীতিও বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে সমাজের সাধারণের মঙ্গলের জন্য সকলেরই ক্ষমাশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়। নিজের সহিত জগতের অন্য সকল কিছুর সম্বন্ধ সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে না পারায়, সমাজে কতই না অশান্তির সৃষ্টি হইতেছে।

এক ভদ্রলোক তাহার অল্পবয়স্ক পুত্রের সমভিব্যাহারে কোন একটী বিখ্যাত সেতু দর্শন করিতে গেলেন। পুত্র সেতুটী দেখিয়া অবাক হইয়া কত প্রশ্নই করিতেছেন। ভদ্রলোক তাহার প্রশ্নে মন না দিয়া নিজের চক্ষু তৃপ্ত করিতেছেন। পুত্রের এই কৌতূহলের আজ কতই না সদ্ব্যবহার করা যাইত। সেতুটীর বিষয় তাহার মনে এমন একটা ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া যাইত যে সে কিছুতেই তাহা ভুলিয়া যাইতে পারিত না। অবশেষে তাহার মনে সেতু নির্ম্মাণ কৌশল ও তদ্বিষয় গবেষণা করিবার আকাঙ্খা আপনি জাগিয়া উঠিতে পারিত। ইত্যাদি।

এই সকল না করিয়া বাঙ্গালী পুত্রপূজা করিয়া থাকেন এবং নিজের অহঙ্কার বজায় রাখিবার জন্য পুত্রের স্বেচ্ছাচারিতায় প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। এই রকমে কত শত পুত্রের ভবিষ্যত নষ্ট হইতেছে তাহার ইয়ত্তা কে করে? বাঙ্গালীর মাথায় কবিতা আসে, উপন্যাস আসে কিন্তু বিজ্ঞান আসে না কেন? অধিকাংশ স্থলেই ইহার কারণ শিশুর শিক্ষা দানের ক্রটী।

পুত্রের স্বেচ্ছাচারিতায় প্রশ্রয় দেওয়ার একটা দৃষ্টান্ত আমার গায়ে একটা ছেঁড়া জামা ছিল। আমার এক আত্মীয়ের এক শিশু পুত্র আমার উপরে কোনও কারণে রাগান্বিত হইয়া বায়না ধরিল যে সে আমার জামার ছেঁড়া স্থান ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া আরও কতকটা ছিঁড়িয়া দিয়া কিছু সুখানুভব (?) করিবে। আমার আত্মীয়টী সত্য সত্যই আমাকে অনুরোধ করিয়া বলিল "আপনি একটু কাছে আসিয়া দাঁড়ান, ও একটুখানি ছিঁড়িয়া দিক, এতো আপনার একটী ছেড়া জামা বই নয়!" লজ্জায় পড়িয়া আমাকে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে হইল। পুত্রদেব আমার জামা ছিঁড়িয়াও সন্তুষ্ট হইল না। সে ক্রোধে আধ আধ স্বরে আমাকে গালি দিতে লাগিল, তুয়ালেল বাত্তা!" (অর্থাৎ শুয়রের বাচ্চা) "তাৰামদাদা!" (অর্থাৎ হারামজাদা) ইত্যাদি আমার আত্মীয়ের খুসী দেখে কে? বোধ হয়

তাহার কোন বয়স্ক পুত্র বিজ্ঞান জগতের কোন মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেও তিনি এত আনন্দ বোধ করিতেন না। বাল্যকাল হইতেই জিহ্বাকে সংযত করিতে শিক্ষা না দেওয়াতে সমাজে কতই না অনিষ্ট ও অশান্তির সৃষ্টি হইতেছে। আজকালকার শিক্ষার উপর যে জনসাধারণ বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন তাহার কারণ কি? কেবল যে জীবিকা নির্ব্বাহের প্রশ্নই সকলের মন ব্যতিব্যস্ত করিতেছে তাহা নহে। আজকালকার স্কুলের ছেলের জন্য রাস্তায় পর্য্যন্ত অনেক সময় মান বাঁচাইয়া চলা ভার। রাস্তা জুড়িয়া তাহাদের দল বুক ফুলাইয়া চলিয়াছেন, এক অষ্টাশী বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ তাহাদিগকে তিন চতুর্থাংশ রাস্তা সাড়িয়া দিয়াও রক্ষা পাইলেন না। ভদ্রলোককে অবশেষে কাদায় আসিয়া পড়িতে হইল তিনি তবুও কোন রকমে মুড়িসুড়ি দিয়া পাশ কাটাইয়া সম্মান বাঁচাইয়া চলিয়া গেলেন। কেবল স্কুলের শিক্ষা বা শিক্ষার মজ্জাগত দোষে ছাত্রগণ এইরূপ হইতেছে এ কথা সত্য নহে। বাড়ীতে অঙ্কুর হইতে যে শিক্ষা আরম্ভ হয় সে শিক্ষাও এ সকলেরজন্য অনেকটা দায়ী।

আমরা কথায় কথায় আমাদের জাতিকে স্বাধীনতার উপযুক্ত বলিয়া ঘোষণা করি, কিন্তু কয়জন বাঙ্গালী তাঁহার পুত্রকে শিশুকাল হইতে স্বাধীনতার দায়িত্ব শিক্ষা দিয়া থাকেন? আমেরিকায় নিগ্রো স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে যখন সে বিষয় ঘোর কলহ চলিতেছিল তখন সকল নিগ্রোই স্বাধীনতার আশায় উৎকণ্ঠিত হইয়া কেবলই প্রার্থনা করিতেছিল, ভগবান যদি কোন প্রকারে তাহাদের স্বাধীনতা সাধন করিয়া দেন। কিন্তু স্বাধীনতা ঘোষণা হইবার অল্প কাল পরেই তাহাদের আনন্দ পরিম্লান হইয়া গিয়াছিল; এই চিন্তায় যে এখন তাহারা দাঁড়ায় কোথায়? কেমন করিয়া নিজদের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় তাহা তাহারা এতদিন মোটেই চিন্তা করে নাই; এখন হঠাৎ তাহারা কেমন করিয়া সমাজ বন্ধন সৃষ্টি করিয়া লয়? সত্যকথা বলিতে গেলে, আমরা স্বাধীনতার দায়িত্ব শিখিয়াছি এ পরিচয় কিন্তু আমরা অনেক স্থানেই দিতে পারিতেছি না।

যাহা হউক, বর্ত্তমান যুগের এ উন্নতির সাড়ায় এ বিষয় ও যথেষ্ট সতর্ক হওয়া দরকার। এই বিষয় সতর্ক হইতে গেলে নিম্নলিখিত কথাগুলি মনে রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে যথা—

১। বিজ্ঞান-দর্শনের কঠিন তত্ত্বের ন্যায় শিশুর মানসিক শক্তির বিকাশও একটা জটিল ও কঠিন বিষয়।

২। বিজ্ঞান দর্শনের অনুশীলন মানবের যতখানি দরকারী শিশুর সম্বন্ধে গবেষণা তদপেক্ষা অধিক না হইলেও অন্ততঃ ততখানি দরকারী।

৩। জন্মের পর হইতেই শিশুর আহার, পরিচ্ছদ, অভিরুচি প্রভৃতি সকল বিষয়েই সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৪। প্রকৃতির অন্য দশকার্য্য যেমন কতকগুলি নিয়মের অধীন, শিশুর মনোবিকাশও তেমনি কতগুলি বিশেষ নিয়মের অধীন।

৫। সুতরাং শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন উন্নত ও কার্য্যোপযোগী করিতে হইলে জন্ম হইতেই সেই সকল বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অর্থাৎ যে বয়সে শিশুর মনে যে ভাব, শিক্ষা সেই ভাবের ভিতর দিয়া প্রবেশ করাইতে হইবে। যথা—যখন তাহাদের ক্রিয়াপ্রবৃত্তি প্রবল (জন্ম হইতে ষষ্ঠ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত) তখন তাহাদের শিক্ষা ক্রিয়ার ভিতর দিয়া দিতে হইবে ইত্যাদি। পুত্রের প্রকৃত পূজার ইহাই নিদর্শন।

শ্রীমোহাম্মদ আবদুর রসিদ।

সৌরভের কথা।

"সৌরভ" সম্পাদক মহাশয় বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার্থ কলিকাতা চলিয়া যাওয়ায়, ও প্রেসের গোলযোগে "সৌরভ" বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তিনি আপাততঃ একটু সুস্থ হইয়া "সৌরভ" চালাইতে আদেশ করায় মাঘমাস হইতে সৌরভের দশমবর্ষ আরম্ভ করা হইল

আশ্বিন মাসে সৌরভের নবম বর্ষ শেষ হইয়াছে। অতঃপর মাঘ মাস হইতে সৌরভের বর্ষ গণনা হইবে। মাসের ১লা তারিখে সৌরভ প্রকাশিত হইবে। আশা করি সৌরভের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকগণ "সৌরভকে পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহ দৃষ্টিতে দেখিবেন।

সম্পাদকের অসুস্থতার জন্য "স্রোতের ফুল" উপন্যাসটী আর দশম বর্ষের সৌরভে প্রকাশিত হইল না তৎপরিবর্ত্তে "স্নেহের দান" নামক একটী নূতন পারিবারিক উপন্যাস বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে বাহির হইল।

কলিকাতা ও ঢাকা বাঙ্গালার এই দুইটী রাজধানী ব্যতীত মফঃস্বল হইতে কোন মাসিক পত্রিকা বাহির হয় না। সময় সময় হইলেও তাহা দীর্ঘজীবী হইতে পারে না; এরূপ অবস্থায় ময়মনসিংহের মত স্থান হইতে দশ বৎসর ধরিয়া যে একখানা পত্রিকা বাহির হইতেছে, তাহা ভাবিবার বিষয় সন্দেহ নাই। আশা করি সৌরভের গ্রাহক ও পাঠকগণ এই বিষয়টা চিন্তা করিয়া সৌরভের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটীগুলি ক্ষমা করিবেন। এবং সময় সময় উপদেশ দানে ও সৌরভ পরিচালনে সাহায্য করিবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

ময়মনসিংহ লিথিয়া প্রেসে শ্রী... অনন্ত কর্তৃক মুদ্রিত

দ্বিতীয় ওরিয়্যাণ্টাল কন্‌ফারেন্সের সভ্যগণ।

লিলিপ্রেস, ময়মনসিংহ।
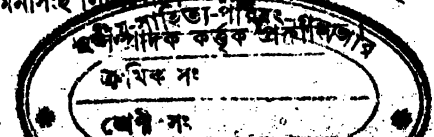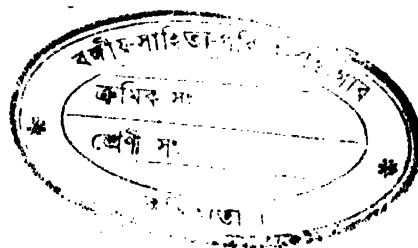
সৌরভ

দশম বর্ষ। | ময়মনসিংহ, ফাল্গুন, ১৩২৮ সন। | দ্বিতীয় সংখ্যা।

প্রাচীন গ্রীকজাতির শিক্ষা প্রণালী।

আমাদের পুরাণের কথা ছাড়িয়া দিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রাচীন গ্রীক জাতিই সর্ব্ব প্রথম শিক্ষাপ্রণালীকে বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত বলিয়া মনে করিতেন। ইঁহারা মানুষের প্রকৃতি-প্রদত্ত স্বাভাবিক গুণসমূহ যাহাতে নিজ নিজ ব্যক্তিগত চেষ্টায় উন্মেষ প্রাপ্ত হয়, তাদৃশ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন! বস্তুতঃ ইহারাই সর্ব্বপ্রথম রাজনৈতিক স্বাধীনতার বীজ কল্পনা রাজ্যে বপন করিয়াছিলেন। নগরের মধ্যে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি প্রস্তুত করিবার জন্যই প্রাচীন গ্রীকগণ শিক্ষা প্রণালীর আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত জ্ঞানলাভের জন্যই জ্ঞানস্পৃহা ইঁহাদের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়া পরবর্ত্তীকালে বলবতী হইয়াছিল। ইঁহারাই সর্ব্বপ্রথম জ্ঞান দেবতাকে ধর্ম্ম-শাস্ত্রের জটিল নিগড় হইতে মুক্ত করিয়া জ্ঞানের স্বাধীনতা প্রচার করিয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রীকগণই সর্ব্ব প্রথম বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে মানুষের ভিতর বিবেক ও যুক্তি নামক যে দুইটী বৃদ্ধি আছে, যে দুটীকে জাগ্রত করিতে পারিলেই মানুষ মনুষ্যপদ বাচ্য হইবার যোগ্য হয়। এবং তাহারা ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সুশিক্ষাই ইহাদিগকে জাগ্রত করিবার একমাত্র পন্থা। তদনুসারে প্রাচীন গ্রীকজাতি শিক্ষার উন্নত পদ্ধতি দ্বারা মানুষের সকলগুলি শক্তিকেই পরস্পর সামঞ্জস্য রাখিয়া বিকাশ করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

শিক্ষা ও সভ্যতা হিসাবে গ্রীকজাতির ইতিহাসকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে; (১) প্রাচীন, ও (২) আধুনিক। প্রাচীন ইতিহাসকেও আবার পৌরানিক (হোমারিক) ও ঐতিহাসিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়।

পৌরানিক যুগ—এই যুগে আমরা গ্রীকদিগকে আদিম অবস্থায় দেখিতে পাই। তখন গ্রীসদেশে বিদ্যাশিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র কোন স্কুল বা বিদ্যালয় ছিল না। সংসারযাত্রা এরূপ ভাবে নির্ব্বাহ করা হইত যেন তাহাতেই স্কুলের সকল প্রকার শিক্ষা প্রণালী সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। জীবনের সাধারণ দৈনন্দিন কার্য্যাবলী গৃহেই শিক্ষা দেওয়া হইত; কিন্তু নাগরিকতা প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা প্রণালী কোনও সমিতি, মন্ত্রনা-সভা যুদ্ধ বা অভিযান উপলক্ষে দেওয়া হইত। তখনকার দিনে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল কর্ম্ম, জ্ঞান ও বাগ্মীতা। শৌর্য্য বীর্য্য, সৌন্দর্য্য, বিচারক্ষমতা ও সভায় বাকপটুতা প্রভৃতিই তখন গুণের পরিচায়ক ছিল। কিন্তু তখনকার দিনে গুরুজনের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধাপ বিসর্জ্জন দিয়া লোক সাহসের ও শৌর্য্যের অপব্যবহার করিত না। পরন্তু জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিত। হোমারের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া আমরা পৌরানিক যুগের শিক্ষা প্রণালীর আভাস পাই।

ঐতিহাসিক যুগ—এই যুগে গ্রীসদেশে দুই রকমের শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল। একটীর অভ্যুদয় হইয়াছিল স্পার্টানগরে এবং অন্যটী প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল এথেন্সে।

স্পার্টানদের শিক্ষা প্রণালী—শৌর্য্য বীর্য্য সম্পন্ন স্বদেশবৎসল, কষ্ট সহিষ্ণু ও সাহসিক বীরপুরুষ বা আদর্শ সৈনিক প্রস্তুত করাই স্পার্টাবাসিদের শিক্ষার উদ্দেশ্য

ছিল। তথায় ব্যক্তিগত জীবনের বড় বিশেষ সার্থকতা ছিল না। দেশবাসিগণ সকলই ষ্টেটের অঙ্গীভূত বা অংশাবশেষ বলিয়া গণ্য হইতেন। ষ্টেটই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল। ষ্টেটের মহৎ উদ্দেশ্যে প্রনোদিত হইয়া, ষ্টেটের ব্যয়ে ষ্টেটই দেশবাসিগণের সুশিক্ষা লাভের বন্দোবস্ত করিতেন। ইঁহাদের প্রায় সমস্ত জীবনই শিক্ষাকার্য্যে অতিবাহিত হইত। বাল্য কৌমার যৌবন ও প্রৌঢ়, জীবনের এই চারিটী অবস্থা অনুসারে ইহাদের শিক্ষা প্রণালী চারিভাগে বিভক্ত ছিল।

বাল্যাবস্থা—(১--৭)—শিশুর জন্ম হওয়া মাত্রেই তাহাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত একজন ষ্টেটের কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেন। শিশুটীর স্বাস্থ্য সন্তোষজনক হইলে এবং তাহার শারীরিক গঠন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি নির্দ্দোষ হইলে তাহাকে বাঁচিতে দেওয়া হইত। অন্যথায় তাহাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলা হইত। রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন পালনের ভার ৭ বৎসর পর্য্যন্ত মাতার উপরই ন্যস্ত থাকিত।

কৌমারাবস্থা———(৭--১৮)—সাত বৎসর অতীত হইতে না হইতেই শিশুটীকে মাতার ক্রোড় হইতে কাড়িয়া আনিয়া লেডোনোমাস্ ও তাহার সহকারী শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে দেওয়া হইত। লেডোনোমাস্ ছিলেন শিক্ষা বিভাগের সাধারণ তত্ত্বাবধায়ক। বয়স অনুসারে শিক্ষকগণ বালকদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেন। বয়ঃ কনিষ্ঠ বালকদিগকে (Iren) আইরেন নামক বয়োজ্যেষ্ঠ বালকদের পরিচালনাধীনে ছাউনিতে থাকিতে হইত। এই সময়ে বয়স্ক ব্যক্তি মাত্রকেই শিক্ষকরূপে মান্য করিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। এবং ইহারা কোন অন্যায় কাজ করিতে দেখিলে প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তিই ইহাদের চরিত্র সংশোধন করিবার অধিকারী ছিলেন। তাহাদের আর একটী নিয়ম এই ছিল যে প্রত্যেক বালককেই কোন না কোন বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে এরূপ ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ হইতে হইতে যেন তিনি তাহার আচরণের জন্য দায়ী হইতে পারেন। এইরূপ অভিভাবকের উত্তরসাধকতায় স্পার্টাবাসী বালকেরা কৌমারাবস্থায়ই স্বীয় স্বীয় আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, ও বাকসংযম প্রভৃতি নৈতিক গুণগ্রাম সুশিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইত।

কুস্তি কসরৎ; ঐকতান নৃত্য-গীত ও সামান্য লিখন পঠন ও সামান্য পাটীগণিত এই কয়টী স্পার্টান বালকগণের শিক্ষিতব্য বিষয়ের অঙ্গীভূত ছিল।

যৌবনাবস্থা—(১৮—২০—৩০) অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে যুবকেরা কেডেট্ (Cadet) শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়া সামরিক শিক্ষাপ্রণালী আরম্ভ করিত। এই যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিতে তাহাদের দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইত। প্রথম দুই বৎসরে তাহাদিগকে অস্ত্র পরিচালনা ও সামরিক কৌশল শিক্ষা করিতে হইত। প্রত্যেক দশম দিনে বয়স্ক ব্যক্তিগণের সম্মুখে তাহাদিগকে কঠোর পরীক্ষা দিতে হইত। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে কঠোর বেত্রাঘাত সহ্য করিতে হইত। বিশ হইতে ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তাহাদিগকে প্রকৃত যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইত। এই সময়ে তাহাদিগকে অতি মোটা সাদাসিদা আহার্য্য দ্বারা জীবন ধারণ করিতে হইত, এবং খড়ের বিছানায় শয়ন করিতে হইত। কখনও তাহাকে সৈন্যাগারে থাকিয়া কাজ করিতে হইত কখনও বা দূরবর্ত্তী যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিতে হইত। ইহা ব্যতীত তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য শরনিক্ষেপণ শিক্ষা, অশ্ব ও অস্ত্র পরিচালনা, সন্তরণ, গুটিকা নিক্ষেপণ এবং নৃশংস বিবাদে লিপ্ত হইতে হইত।

প্রৌঢ়াবস্থা—ত্রিশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে যুবকেরা ষ্টেটের সম্পূর্ণ সভ্য হইতেন এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া রাজ্যের ও স্বজাতির মঙ্গল বিধান করিতেন। তখন বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইলেও তাহাদিগকে সৈন্যাবাসেই থাকিতে হইত।

স্ত্রী শিক্ষা—প্রাচীন গ্রীসদেশে শিক্ষা কেবল পুরুষ জাতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অন্যান্য প্রাচীন জাতিদের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তথাকার স্ত্রী শিক্ষার একটু বিশেষত্ব ছিল। গ্রীসদেশে স্ত্রী পুরুষের একই শিক্ষাপ্রণালী ব্যবস্থিত ছিল। কি উদ্দেশ্যে যে ইহারা একই শিক্ষাপ্রণালী স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিতে পারা যায় না। যোদ্ধৃ জাতির মাতাদিগের ও পুত্রদিগকে মানুষ করিবার মত শিক্ষার প্রয়োজন—যেন এই ভাবিয়াই ইহারা ভাবি গ্রীকমাতৃ-

গণের ও সমান শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তবে বালক ও বালিকাগণের শিক্ষার মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ ছিল যে বালিকাগণের শিক্ষাপ্রণালী ততদূর কঠোর ছিল না। বালিকাগণেরও স্বতন্ত্র ক্রীড়াভূমি ছিল। তথায় তাহারা ধাবণ, উল্লম্ফন, বর্শা ও চক্র নিক্ষেপণ, এবং নৃত্য-গীতাদি ক্রীড়া করিতে পারিত। কুস্তি কসরৎ প্রভৃতিতে গ্রীক-জাতির অত্যধিক অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও গ্রীকগণের স্বতন্ত্র মল্লাগার ছিল না।

এবার সংক্ষেপে স্পার্টানদের শিক্ষাপ্রণালীর কথাই বলা গেল; এথেন্স নগরে যে শিক্ষাপ্রণালীর অভ্যুদয় হইয়াছিল তাহা বারান্তরে বলিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

স্নেহের দান।

(৩)

রায়পুরের স্কুলটী নন্দীগ্রাম হইতে ৩।৪ মাইল দূরে ছিল, সুতরাং মাখন ও মধুকে নয়টাতেই স্নান করিতে হইত এবং দশটায় স্কুলে যাত্রা করিতে হইত। ১১টার অল্প পূর্ব্বে তাহারা যাইয়া স্কুলে পঁহুছিত। দীনুর তামাক খাইতে ও তেল মাখিতে, স্নান করিতে ও আহার করিতে এবং আহারের পর তামাক টানিয়া স্কুলে যাত্রা করিতে কোন দিন ১১টা কোন দিন ১২টা বাজিত। পল্লীগ্রামের স্কুলে এ সকল ত্রুটী অবশ্য খুব গুরুতর বলিয়া ধরা হয় না। সুতরাং দীনুর তাহাতে বড় বেশী ভ্রূক্ষেপ করিবার কারণ ছিল না।

সেদিন স্কুলে ইন্‌স্পেক্টর আসিবেন, সুতরাং সকল ছাত্রকেই সকালে স্কুলে উপস্থিত হইবার জন্য পূর্ব্বদিন বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। দীনুর কিন্তু আসিতে সেদিনও বারটা হইল।

দীনু ক্লাশে উপস্থিত হইলে ক্লাশ শিক্ষক হরকুমার বাবু বেত্র আস্ফালন করিতে করিতে দীনুকে সম্ভাষণ করিলেন—"কয়টা বাজিয়াছে হে নবাবপুত্র! এস দিকিন এদিকে!"

কালীনাথ অগ্নির্গেজী ছেলে ভাল কিন্তু বড়ই বখাটে; সকল কথাতেই শব্দ করা তাঁর অভ্যাস, শিক্ষক মহাশয়ের প্রশ্নে সে উত্তর করিল—12 past Sir."

দীনেশও কম নহে; সে বলিল—"not Sir, 12 not past Sir, 12 future Sir."

মাষ্টার মহাশয় হাসিবেন কি তাঁহার শিক্ষাদানের পরিচয় পাইয়া লজ্জায় কাঁদিবেন ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না—ঠিক এমন সময় ১২টার ঘণ্টা বাজিল; অমনি দীনেশ বলিয়া উঠিল—"এই যে 12 present Sir, কালী নাথ মিথ্যা বলিয়াছিল Sir."

মাষ্টার মহাশয়ের উদ্যত আস্ফালিত বেত্র দীনেশের পৃষ্ঠে নির্দ্দয় ভাবে বর্ষিত হইল। তখন তাহার বিকট চীৎকারে স্কুলগৃহ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

স্কুলের ঘণ্টা পড়ায় অনেক ছেলে বাহির হইবার সুযোগ পাইয়াছিল, তাহারা দীনেশের চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়া ক্লাশের দরজায় জমাট হইয়া দাঁড়াইল; অবস্থা শুনিয়া মাখন এবং মধু আসিয়াও তাহাদিগের দীনেশ দাদার অবস্থা দেখিল।

মাষ্টার রাগে চীৎকার করিয়া হাকিলেন—"ষ্টেণ্ডাপ অন দি বেঞ্চ—ষ্টেণ্ডাপ।"

দীনু শিক্ষকের আদেশে কর্ণপাত করিল না। এত ছেলের সম্মুখে বিশেষতঃ মাখন ও মধুর সম্মুখে সে কখনই এরূপ অপমানজনক আদেশ পালন করিতে পারে না; সে শুনিল না। শিক্ষক তখন তাহার কাণে ধরিয়া টানিয়া তাহাকে বেঞ্চের উপর তুলিতে চেষ্টা করিলেন, তারপর নিজে বেঞ্চে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার সকল শক্তিতে টানিয়াও তুলিতে পারিলেন না।

শিক্ষক মহাশয় তখন মাখনকে ডাকিয়া বলিলেন—তুমি তোমার জ্যেঠা মহাশয়কে বলিও, ইহাকে নীচের ক্লাশে নামাইয়া দেওয়া হইবে।"

শিক্ষক চলিয়া গেলে দীনেশ রাগে গর্জ্জাইতে লাগিল।

পণ্ডিত মহাশয় ক্লাশে আসিয়া বলিলেন—তোমাকে নীচের ক্লাশে নামিয়া যাইতে হইবে হে দীনেশ!"

দীনেশ গর্জ্জিয়া বলিল—যে ৬ মাসের বেতন দিয়াছি তা আমাকে ফেরত দিলে, আমি বাড়ীতেই চলিয়া যাইব।"

পণ্ডিত মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—"পাগল! আচ্ছা পড় দেখি তারপর বুঝা যাইবে।"

পণ্ডিত মহাশয়ের আদেশ মাত্র কালীনাথ দাঁড়াইয়া

পড়িতে আরম্ভ করিল—"উষ্ট্র স্তন্য পায়ী জন্তু—

পণ্ডিত মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—উষ্ট্র দেখিয়াছ কি ?"

কালীনাথ বলিল—"no Sir"

পণ্ডিত—"দীনেশ দেখিয়াছ ?"

দীনেশ দেখে নাই, এমন জিনিস ছিল না, কেননা না দেখিয়াও সে অনেক জিনিসের এমন বর্ণনা দিত যে, তাহা শুনিয়া যাহারা তাহা দেখে নাই তাহারা অভিভূত হইয়া পড়িত। পণ্ডিত মহাশয়ের প্রশ্নে সে সোৎসাহে বলিল—"উষ্ট্র দেখি নাই—বলেন কি ? উষ্ট্র যে উট—তা আবার দেখি নাই।"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"আচ্ছা বল দেখি—স্তন্যপায়ী কি ?"

দীনেশ ক্ষণকাল মাত্র চিন্তা করিয়া বলিল—উষ্ট্রের পায়ে স্তন—সেই জন্য উষ্ট্রকে স্তন্যপায়ী জন্তু বলে।"

পণ্ডিত মহাশয় উঠিয়া যাইয়া দীনেশের জর্জ্জরিত পৃষ্ঠে আর এক ঘা বসাইলেন। দীনেশ গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল—"ফের মারিবেন তো আপনার একদিন আর আমার একদিন।"

পণ্ডিত মহাশয় ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া হেড্ মাষ্টারের নিকট ছুটিলেন। ভবিষ্যতে আরও গুরুতর বিপদ আশঙ্কা করিয়া দীনেশও পুস্তক লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। বাড়ীর পুকুর পার আসিয়াই দীনেশ অসম্ভব রকম চীৎকার করিয়া পাড়াপ্রতিবেশীকে চমকাইয়া তুলিল—জয়মণি দীনেশের চীৎকার শুনিয়া সন্ত্রস্ত ভাবে বলিল—"গঙ্গা দেখ দেখি, নইনা তো আমার কাঁদিবার ছেলে নয়, নিশ্চয়ই কোন অঘটন ঘটিয়াছে"। এই বলিয়া বৃদ্ধা নাতির উদ্দেশে—ষাট্, ষাট্, নসি আমার, কি হইয়াছেরে ? কে কি করিয়াছেরে ?" বলিতে বলিতে অগ্রসর হইলেন।

দীনু ঠাকুর মা সম্মুখে দেখিয়া শ্লেট পেন্সিল দূরে ছড়াইয়া ফেলিয়া চীৎকারের মাত্রা আরও এক ফর্দ্দ চড়াইয়া তুলিয়া বলিল—"ঠাকুরমাগো, মাখ্‌না আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, মাখ্‌না হারামজাদা—" ঠাকুর মা তাহার নসিকে দুইহাতে বুকে চাপিয়া লইয়া পুকুরপাড়ের রাস্তাতেই বসিয়া পড়িলেন, তাহার তাহার অনবৃত পৃষ্ঠদেশে যে নির্দ্দয় প্রহারের চিহ্ন তখনও বর্ত্তমান ছিল তাহা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন "ও গঙ্গা দেখরে, তোর মাখনা আমার নসির কি সর্ব্বনাশ করিয়াছেরে—ও গঙ্গা কি উপায় হবেরে ? আমি আমার নসিরে লইয়া কৈ যামুরে—"ইত্যাদি।"

কোলাহল ও চীৎকার শুনিয়া কুসুম আসিল, পুঁঠি আসিল, পাড়ার লোক জমিয়া গেল। সে দিন গ্রামের হাটবার ছিল ; বলরাম ভট্টাচার্য্য হাটে যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছিলেন। দীনেশের চীৎকার তিনিও শুনিয়াছিলেন কিন্তু তাহা তাহার নিকট তেমন মনোযোগের বিষয় হইয়া ছিল না, সুতরাং তিনি তখনও বৌ ঠাকুরানীর সহিত বাজার বেসাতির ফর্দ্দ লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। ক্রমে তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এই ব্যাপারে মাখনের নাম জড়িত আছে শুনিয়া বলরাম জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হইয়াছে দীনেশ ?

দীনেশের অনাবৃত পৃষ্ঠদেশ দেখাইয়া জয়মণি উচ্চরবে বলিলেন—এই দেখ গো, তোমরা দেখ, তোমাদের আদরের মাখন আমার নসির কি করিয়াছে ! গঙ্গা, এমন ছিল তোর মনে ? দে, আজই নাও করিয়া দে, আমরা আমাদের পথ দেখি ; তোমরা তোমাদের দেওর, দেওর পুত লইয়া সুখে ঘর কর। আর না, মেয়ের বাড়ীতে যে সুখ, যে সম্মান তা আখরে আখরে শোধ হইল, আমার পেটের দোষ, আমার কপালের দোষ বলিয়া জয়মণি কপালে ও উদরে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বলরাম ও গঙ্গামণি উভয়েই দীনেশের পৃষ্ঠের সদ্য বেত্রাঘাতের দাগ গুলি দেখিলেন, কিন্তু কাহারও মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। মাখন যে মার-ধর করিবার মত ছেলে নয় তাহা সকলেই জানিত এদিকে দীনেশ যে নিশ্চয় মার খাইয়াছে, তাহা প্রমাণ সহ বর্ত্তমান। নানা দিক ভাবিয়া বলরাম বড় ঠাকুরাণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন 'এ তো দেখিলাম, এখন মধু ও মাখন আসুক, ততক্ষণে দাদাও স্কুল হইতে আসিবেন। তিনিই সাক্ষী সাবুদ লইয়া বিচার করিবেন। আমি বাজারে যাই, বাজারের বেলা যাইতেছে।"

বলরাম বধুঠাকুরাণীর সম্মতি লইয়া বাজারে চলিলেন গঙ্গামণি দেবরকে সহজে, বিনা বাক্য ব্যয়ে ছাড়িয়া দিলেন ;

দেখিয়া অমনি নিরাশ হইলেন। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন "গঙ্গা দে আমাদিগকে আজই পাঠাইয়া দে, আর না, আর অপমানের ভাত পেটে দিতে যেন না হয়"।

বলরাম দাঁড়াইয়া শুনিলেন, তারপর ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

(৪)

ইনিস্পেক্টারের স্কুল পরিদর্শন করিতে অনেক বিলম্ব ঘটিয়াছিল সে জন্য মাখন ও মধুর বাড়ীতে ফিরিতেও প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। মধু ও মাখনকে দেখিয়া নানা আশঙ্কায় বড় বধুর প্রাণ কাঁপিতে ছিল। তিনি মধুকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মাখন দীনেশকে মারিয়াছে কেনরে মধু"?

মধু অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। সেই ৮টার ভোরের ভাত খাইয়া স্কুলে গিয়াছে আর এখন প্রায় ৬টা সে বিরক্তির সহিত বলিল—"আগে খাইতে দাও মা, তার পর সকল কথাই শুনিও; বড় ক্ষুধা"—ক্ষুধায় মধুর মুখে কথা আসিতেছিল না। কিন্তু তথাপি স্কুলের ঘটনার কথা বলিবার তার যথেষ্ট কৌতুহল ছিল।সে মার পাছে পাছে রান্নাঘরে যাইতে যাইতে বলিল—"আজ দীনেশ দা যেমন মার খাইয়াছে; আমি হইলে মা, মরিয়াই যাইতাম, মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"দীনেশকে কেন মারিল মাখন"

মধু রান্নাঘরে ঢুকিয়া নিজহাতে পিড়িখানা লইয়া বসিয়া বলিল—'মাখনদা মারিবে কেন সে কি মারিবার ছেলে, সে যে আমাদের স্কুলের ফাষ্টবয়।"

মা "তবে দীনেশকে এরূপভাবে মারিল কেন?

মধু বিরক্তির সহিত বলিল—যাও, বুঝনা, শুননা, এখন খাবার দাও—দীনেশদাকে হরকুমার মাষ্টার ও পদার্থের পণ্ডিত বেত মারিয়াছে বেত্রাঘাত—বুঝলে। মাখনদা মারিবে কেন"?

মধুর কথায় গঙ্গামনির বুকে চাপা পাথর খানা যেন সরিয়া গেল। তিনি আরামের দীর্ঘ শ্বাস ফেলিয়া ছেলেদের খাবার পরিবেশন করিতে লাগিলেন।

কুসুম চুপটি করিয়া মধুর মুখ হইতে উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছিল। যখন শুনিল তাহার দাদাকে মাখন'দা মারে নাই, মাষ্টারেরা বেত মারিয়াছে তখন তাহারও মনের কাল মেঘ কাটিয়া গেল, সে ধীরে ধীরে মাখনদের ঘরে যাইয়া মাখনের সম্মুখে দাড়াইল।

ক্ষুধিত মাখন ও স্কুল হইতে আসিয়া নিতান্ত ক্লান্তভাবে হাত পা ছড়াইয়া বিছানায় পড়িয়া ছিল। ক্ষুধায় তাহারও মুখে কথা ফুটিতে ছিলনা। কুসুমকে নিকটে দেখিয়া মাখনের কথা কহিতে সাধ হইল। সে বলিল—"কাল পরশু দুইদিন স্কুল বন্ধ, আজ রাত্রিতে মনের সাধ মিটাইয়া গোলকধাম খেলা যাইবে। এখন দেখ দোখ জেঠাই মা রান্নাঘরে গিয়াছেন কি না?"

কুসুম বলিল—"আপনি আসুন, তিনি মধুদাকে খাবার দিতেছেন"।

মাখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া খরম পায়ে দিল। কুসুম জিজ্ঞাসা করিল—"দাদাকে মাষ্টার মারিল কেন?

মাখন বলিল—খাইতে খাইতে বলিব, চল।"

কুসুম তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কিছু করেন নাই তো?"

মাখন চলিতেছিল হঠাৎ দাঁড়াইয়া বলিল—,,কেন, সে আমার কথা কিছু বলিয়াছে নাকি?"

কুসুম—"হাঁ, আপনি মারিয়াছেন বলিয়াছে; আর আমাকে আপনার সঙ্গে খেলিতে নিষেধ করিয়াছে। তবে আপনি মারেন নাই?"

মাখন হাসিয়া বলিল—কিছুই না, তবে মার দেখিয়াছি; সে হবে খন। মাখন খাইতে গেল।

খাইতে খাইতে মধু তাহার মার নিকট সবিস্তারে দীনেশের বিদ্যাবুদ্ধি ও শেষ পলায়নের বিবরণ বিবৃত করিল। মাখন কুসুমের নিকট তাহার নামে দীনেশের নালিশের আভাস পাইয়াছিল সুতরাং সে একেবারে চুপ করিয়া রহিল। কুসুমও সকল কথা নিকটে বসিয়া শুনিল।

বড় বউ স্নেহের সহিত বলিলেন—"কিরে মাখন, দীনেশ তোর নাম বলে কেন রে?"

মাখন হাসিয়া বলিল—আমি কেমন করিয়া বলিব জেঠিমা! তবে আমার মনে হয় আমাদের চক্ষের সামনে ঘটনা হওয়ায় দীনুদা লজ্জা পাইয়াছে, তাই লজ্জা এড়াইতে

এরূপ বলিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে তার মনের ভাব আর কিছু নহে।"

মধু বলিল—"মাষ্টার যে মাখমদাকে ডাকিয়া নিয়া জানাইয়া দিয়াছে যে দীনেশদাকে নীচের ক্লাশে নামাইয়া দিবে, আর মাখমদাও ঘাড় পাতিয়া হাঁ করিয়া আসিল বোধ হয় তাই তার রাগ হইয়াছে; ও রাগ আজ রাত্রেই গোলমধার খেলায় বেমালুম চলিয়া যাইবে। কিন্তু মা! তুমি বলিলে বিশ্বাস করিবে না, কি যেমন মারটাই না দীনেশদা খাইল, আর সে কি বিকট চীৎকার! তবু জয়কুমার বাবু কিন্তু তাকে বেঞ্চের উপরে তুলিতে পারিল না; আমার হইলে কানটা প্রথম টানেই ছিঁড়িয়া যাইত। একটা হইয়াছে মা, দীনেশদার কাণের সব জমাট ময়লা উঠিয়া গিয়াছে।" দীর্ঘ কাহিনী শেষ করিয়া মধু কুসুমের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"দীনেশদা কোথায় রে কুসু?"

কুসুম বলিল—ঠাকুরমার নিকট হইতে পয়সা লইয়া বাজারে কড়ি খেলিতে গিয়াছে।"

মধু বলিল—"খুব শাস্তি হইয়াছে, কয়েকদিন চির শান্তিতে থাকা যাইবে।"

(৫)

সেদিন রাত্রিতে বলরাম দাদার নিকট বসিয়া তাঁহার পায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নত মস্তকে বলিলেন—"আমাদের জন্য আপনাকে এখন অহরহই যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, এ অবস্থায় আমাকে পৃথক করিয়া দেওয়াই আপনার পক্ষে......"

বলরামের শেষ কথা মুখ হইতে স্পষ্ট বাহির হইল না। রামকানাই স্কুল হইতে আসিয়া শাশুড়ীর উৎকট বাক্য বিন্যাস শ্রবণ করিয়াছিলেন। সংসারের জ্যেষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে যতদূর ধৈর্য্য থাকা প্রয়োজন রামকানাইর তাহা ছিল, সুতরাং তিনি এই সামান্য ব্যাপারে বিশেষ বিচলিত হন নাই। তিনি বলরামের প্রস্তাব শুনিয়া ধীরে ধীরে তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন—"সে ব্যবস্থা এখন আর হইতে পারে না।"

বলরাম বলিল—"আপনি মাথার উপর এইরূপ উৎকট ঝঞ্জাট আর কত সহ করিবেন? বিশেষ আপনি এতগুলি লোকের নিরাপদ আশ্রয় ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন না দেওয়াও......"

রামকানাই তাহাকে কথা বলিতে না দিয়া বলিলেন—"পারি না এ কথা তুমি কি করিয়া বুঝিলে? মানুষ সবই পারে সবই করে।"

"আমি সেরূপ কিছু মোটেই ইচ্ছা করি না।" "জ্যেষ্ঠ জীবিত থাকিতে কনিষ্ঠের ইচ্ছার মূল্য কি?" "না থাকিলেও জ্যেষ্ঠের সুখ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার অধিকার তার সর্ব্বদাই আছে।"

"একা একা নির্ঝঞ্জাটে থাকাই সুখ সুবিধা নহে, তাহাতে মনুষ্যত্ব পরীক্ষা হয় না।"

প্রতিদিন এইরূপ অভিযোগে মনের ভাব নষ্ট হইতে পারে; এবং তাহা হওয়াই স্বাভাবিক। তখন নিজেদের ভিতর হিংসা দ্বেষ সহজেই প্রবেশ করিতে অবসর পাইবে...'

রামকানাই বলিলেন—"সে আশঙ্কা আমি অনেক পূর্ব্বেই করিয়াছিলাম এবং সেই বলিয়াছিলামও তোমাকে। আপাততঃ যদি সেরূপ হয়, সহ্য করিতে হইবে, তাহা ব্যতীত এখন আর উপায় নাই। সহ্য করিবার দুটী উপায়, এক আত্মবিস্মৃতি, দ্বিতীয় ক্ষমা। কোন কথায়ই নিজকে অপমানিত মনে করিও না, কেহ অপরাধ করিলে ক্ষমা করিও।"

বলরাম ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"আমি সবই সহিতে পারি; সেতো হইল একদিকের ব্যবস্থা; সুধু একপক্ষ ঠিক রাখিলেই যে ষোল আনা ব্যবস্থা নীরবে চলিবে তা সকল সময় হয় না।"

বলরাম—যদি দুই পক্ষকেই শাসনে আনা যাইতে পারে তবে তো কোন কথারই প্রয়োজন হয় না। মূর্খ ও স্ত্রীলোকের শাসন নাই, অপরাধও তাহারা না করিতে পারে এমন কিছু নাই। সুব্যবস্থা তাহাদের জন্য নহে। তাহারা ব্যবস্থার বাহিরে সর্ব্বদাই, ব্যবস্থা আমাদের জন্য।

বলাই চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

বয়ন-শিল্প।

ভারতবর্ষেই বয়ন-শিল্পের জন্ম এ কথা জগতের সকল সুসভ্য জাতিই স্বীকার করিয়াছেন। খৃষ্টের জন্মের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে ভারতে কার্পাস-বস্ত্রের ব্যবহার চলিয়া আসিয়াছে। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ কোন বিষয়েই এই পরাধীন ভারতবর্ষের কৃতিত্বের কথা স্বীকার করিতে রাজি নহেন; কিন্তু বয়ন-শিল্প সম্বন্ধে তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে এ দেশের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। আমরা সুবিখ্যাত এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা পুস্তকে দেখিতে পাই যখন সমগ্র ইয়ুরোপ অসভ্য অবস্থায় ছিল—("whilst Eourope was in a state of bar-barism") তখনও ভারতবাসিগণ কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। "More than two thousand years before Europe or England had conceived the idea of applying modern industry to the manufcture of cotton, India had matured a a system of handspinning, weaving and dying."—(Ency Brt)

অর্থাৎ—"ইয়ুরোপ বিশেষতঃ ইংলণ্ড আধুনিক উপায়ে কার্পাস বস্ত্র বয়নের যখন কল্পনাও মনে স্থান দিতে পারে নাই, তাহার দুই সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ভারতবর্ষে হস্তদ্বারা সূত্র নির্ম্মাণ, বস্ত্রবয়ন এবং বস্ত্ররঞ্জনের উৎকৃষ্ট প্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল।"

আমরা বেদের বহুস্থানে কার্পাসবস্ত্র বয়নের উল্লেখ দেখিতে পাই। একস্থানে আছে ঋষি বলিতেছেন, "মূষিক যেমন সূত্র কাটিয়া নষ্ট করে, সেইরূপ হে শত ক্রতো আমি তোমার স্তোতা, দুঃখ আমাকে তেমনি দংশন করিতেছে।"*

সায়ন ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে তন্তুবায়ের সূত্রে মাড় দেওয়া থাকে বলিয়া ইন্দুরেরা উহা খাইতে ভালবাসে। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে এখনের প্রায় সেই বৈদিক কালেও মাড়দিয়া সূত্র দৃঢ় করিবার ব্যবস্থা ছিল। ঋকবেদের বহুস্থানে কার্পাস ও রেশম বস্ত্রের উল্লেখ আছে। তাহা উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের আয়তন বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক বোধ করিলাম। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে ঋকবেদ খৃষ্টের জন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, মনস্বী তিলক বলেন খৃষ্টের জন্মের অনূ্যন পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বেদ-মন্ত্র রচিত হইয়াছিল। যাহা হউক পাশ্চাত্য মত গ্রহণ করিলেও আমরা দেখিতে পাই প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ বস্ত্র-বয়ন করিয়া নিজ নিজ অভাব পূরণ করিতেন। বেদ রচনার কতকাল পূর্ব্ব হইতে বস্ত্র-বয়ন-শিল্প এদেশে প্রচলিত ছিল তাহা বলিবার উপায় নাই। গ্রীষ্ম প্রধান দেশের পক্ষে লোম নির্ম্মিত বস্ত্রাদি অপেক্ষা কার্পাস বস্ত্র অধিকতর উপযোগী বিধায় অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে কার্পাস বস্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। এবং এই শিল্পের উন্নতির জন্য এদেশে বিশেষ চেষ্টা হইয়াছে। প্রাচীন বহু গ্রন্থে তাহার আভাস পাওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় সূত্রে মাড় দিবার পরিমাণ সম্বন্ধে লিখিত আছে।

"শতে দশপল বৃদ্ধিরৌর্ণে কার্পাস সৌত্রিকে
মধ্যে পঞ্চপলা সূত্রে সূক্ষ্মেতু ত্রিপলামতা।"

২।১৮২

উর্ণা ও কার্পাস সূত্রে শতকরা মাড়দিয়া দশপল বৃদ্ধি করিবে, মধ্যম রকম কাপড়ে পাঁচ পল ও সূক্ষ্ম বস্ত্র হইলে তিনপল দিবে।

মনুসংহিতা রচনাকালে ভারতবর্ষে কার্পাস বস্ত্র বহুল পরিমাণে ক্রয় বিক্রয় হইত। মনুর সময়ে গৃহস্থেরাও সূতাকাটিয়া দু পয়সা উপার্জ্জন করিত। অন্তঃপুরচারিনী রমনীগণ অবসরকালে চড়কাদ্বারা সূতা কাটিতেন। নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতেন না। সংহিতায় লিখিত আছে—"তন্তোবায়গণ কাপড় বুনিবার জন্য গৃহস্থের নিকট হইতে ১০ পল সূতা লইলে মাড় দিবার জন্য গৃহস্থকে ১১ পল সূতা দিতে হইবে। ইহার অন্যথা করিলে দ্বাদশপল—দণ্ড হইবে। এই প্রথা বহুদিন পর্য্যন্ত এদেশে প্রচলিত ছিল। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও পল্লীর দরিদ্র বিধবাগণ সূতা কাটিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন এবং স্বীয় বস্ত্রাভাব দূর করিতে সমর্থ হইতেন। সূতা কাটিয়া অর্থ উপার্জ্জন করা তৎকালে কেহ অপমানের কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহারা অন্ন-বস্ত্রের জন্য পরমুখাপেক্ষী হওয়াই লজ্জার বিষয় বিবেচনা করিতেন। শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা তখন গৌরবের বিষয় ছিল।

* ১ম। ১০৫। ৮

চড়কার প্রশংসা সূচক বহু কবিতা আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। এই সকল কবিতা বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জিত নয়। বাদসাহী আমলে সূতা কাটিয়া বহুলোক ধনদৌলত করিয়াছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে কোম্পানীর আমলে একটী বিধবা অবসরমত সূতা কাটিয়া ৩।৪ জন লোকের বস্ত্রের অভাব দূর করিতে পারিতেন। তখন দেশের অভাব পূরণ করিয়া বিদেশে বহু লক্ষটাকার বস্ত্র রপ্তানী হইত। ডাক্তার বুকানন সাহেবের রিপোর্ট পাঠে জানাযায় কোম্পানীর আমলে সাহাবাদে ১৫৯৫০০ জন রমনী বৎসরে ১২½ লক্ষ টাকার সূতা কাটিত। গোরক্ষপুরে ১৭৫৬০০ জন স্ত্রীলোক চড়কা দ্বারা সূতা কাটিয়া দিন পাত করিত। দিনাজপুরে উচ্চবর্ণের বিধবা ও কৃষক রমনীগণ সূতা কাটিয়া বার্ষিক ব্যয়বাদে ৯১৫০০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতেন। পূর্ণিয়া জেলার রমনীগণ প্রতিবৎসর গড়ে আনুমানিক তিনলক্ষ টাকার কার্পাস ক্রয় করিয়া যে সূত্র প্রস্তুত করিতেন তাহা ১৩ লক্ষ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইত। বর্ত্তমান সময়ে মহিলারা অবসর কাল গল্পে কিম্বা নিদ্রায় নষ্ট করেন। যাহারা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিতা তাহারা আটআনা সংস্করণের উপন্যাস পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। আর সৌখিন পরিবারের মহিলাগণ সিঙ্গারের কলের সাহায্যে বিলাতি কাপড়ের নানাবিধ সাজসজ্জা প্রস্তুত করিয়া অর্থের অপব্যয় করেন।

খৃষ্টের জন্মের ২০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে এদেশের সূক্ষ্ম বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। তৎকালে মিশরদেশ অতি উন্নত ছিল। মিসরের প্রাচীন সভ্যতা জগতের ইতিহাসে এক স্মরনীয় অধ্যায়। মিসরবাসিগণ তৎকালে মৃতব্যক্তির দেহ নানাবিধ মসলায় পূর্ণ করিয়া বস্ত্রদ্বারা ঢাকিয়া সমাহিত করিত। সেই মৃত দেহ কোনকালেও পচিয়া যাইত না। খৃষ্টের জন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে সমাহিত মৃতদেহ কবর হইতে সম্প্রতি খুঁড়িয়া বাহির করিতে দেখা গিয়াছে, উহা ভারতীয় অতি সূক্ষ্ম মসলিন দ্বারা আবৃত রহিয়াছে।

"Mummies of Egyptian tomb from dating 2000 Bc. have been found wrapped in Indian muslin of finest quality." *

শিল্পবিদ্যাভিজ্ঞ পণ্ডিত সার জর্জ বার্ডউড্ (Sir George Birdwood) বলেন জগতবিখ্যাত রূপসী অমর হোমার পরিকীর্ত্তিতা ট্রয়ের রাণী হেলানাসুন্দরীর কমনীয় দেহলতিকায় ভারতের কিংখাপ বস্ত্র শোভা পাইত। বীরশ্রেষ্ঠ ইউলিসিস্, জ্ঞানীগণাগ্রগণ্য সলমন্, রাণী এসথার ও জুড়িয়ার রাজা হিরড্ এই সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া গৌরব বোধ করিতেন। ইউরোপের অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের রাজরাণীরা ভারতের জাতির কাজকরা বিবিধ রেশম বস্ত্রে সুশোভিত হইতেন।—

আরবী ভাষায় তুলার প্রতিশব্দ 'কতান'। ইটালীয় ভাষায় 'কতোন,' ফরাসী 'কোতান' এবং ইংরেজী 'কটন' (cotton) শব্দ একই অর্থ জ্ঞাপক। সুতরাং আরব দেশ হইতেই তুলাজাত দ্রব্য এবং তুলার প্রতিশব্দ ইয়ুরোপে বিস্তৃত হইয়াছে। পারসী 'কুরপাশ' এবং হিব্রু কাপাস' শব্দ যে সংস্কৃত কার্পাস শব্দেরই অপভ্রংশ তদ্বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই। গ্রীক্ ভাষায় তুলার প্রতিশব্দ 'সিন্ধন'। সিন্ধু প্রদেশ হইতে কার্পাসজাত বস্ত্রাদি ইয়ুরোপে রপ্তানি হইত বলিয়া গ্রীকগণ তুলার নাম সিন্ধন রাখিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

গ্রীক্ ঐতিহাসিক হিরোডোটাস্ স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন 'ভারতবর্ষ বন্যবৃক্ষের ফল হইতে এক প্রকার পশম পাওয়া যায়, এই বৃক্ষজাত পশম সৌন্দর্য্যে মেষ লোম হইতে উৎকৃষ্ট। ভারতবাসীরা উহা হইতে পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করে। ইম্পিরিয়েল গেজেটিয়ারে উল্লিখিত হইয়াছে :—

There was a very large consumption of Indian manufactures in Rome. This is confirmed by the elder Pliny. The muslins of Dacca were known to the Greeks under rhe name of Gangetika......Thus it may be safely concluded that in India the arts of cotton spinning and cotton weaving were in a high state of proficiency two thousand years ago.........Cotton

* Industrial commission Report 1916-18 Page 295.

weaving was only introduced into England in the seventeenth century.

I. Gazetteer of India Vol. III.

পূর্ব্বোদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে ২০০০ বৎসর পূর্ব্বেও ভারতবর্ষের লোক সূক্ষ্ম সূত্র নির্ম্মাণ ও বয়ন শিল্পে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। প্রাচীনকালে যে রোম সাম্রাজ্য শৌর্য্যবীর্য্য এবং সভ্যতায় জগতে অদ্বিতীয় ছিল সেই রোমের অধিবাসিগণ কার্পাস দ্রব্য বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিতেন। গঙ্গার তীরবর্ত্তী বঙ্গদেশকে গ্রীকগণ 'গঙ্গেটিক' নামে অভিহিত করিতেন। এই জন্য ঢাকার অতুলনীয় মস্‌লিন্ বস্ত্র গ্রীসের অধিবাসীদিগের নিকট 'গঙ্গেটিকা' নামে খ্যাত ছিল। যে ইংলণ্ড আজ আমাদের লজ্জা নিবারণ করিতেছে তথায় এই সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রথম বয়ন-শিল্প প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক 'প্লিনি' তাঁহার গ্রন্থে দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন যে ভারতবর্ষের বণিকগণ রোমরাজ্য হইতে বাণিজ্য উপলক্ষে প্রতিবৎসর বহু অর্থ লইয়া যাইতেছে। "Pliny complained that vast sums of money were annually absorbed by commerce with India." —Imp. Gazetteer of India vol III. এককালে ভারতের বহির্বাণিজ্য এইরূপ সুবিস্তৃত ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। সে দিনের কথা আজ স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়।

আলেকজেণ্ডারের নৌসেনাধ্যক্ষ নিয়ার্কাস্ ভারতবাসীর পরিধেয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "উহারা গাছের পশমের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া পরিধান করে। এই বস্ত্রে পায়ের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত আবৃত থাকে। ইহার উপর স্কন্ধদেশে একখানি চাদর এবং মস্তকে একটী উষ্ণীষ, ইহাই তাহাদের সম্পূর্ণ পোষাক"। এই সাদাসিদে পোষাক অনেকটা এখন পর্য্যন্তও চলিয়াছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে 'এরিয়ান' নামক একজন ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি লোহিত সাগরের উপকূলে ভারতীয় কার্পাস বস্ত্রের একটী সুবিস্তৃত বন্দর দেখিয়াছিলেন। আরবগণ ভারতবর্ষের বস্ত্র ক্রয় করিয়া তথায় ইউরোপীয় বণিকদিগের নিকট বিক্রয় করিত। ভারতবর্ষ হইতে আরব, পারস্য, মিসর গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশে কার্পাস বস্ত্র রপ্তানি হইত, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। চীনের সহিত অতি প্রাচীন কালেই ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতেই তথায় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে প্রথম কার্পাস বস্ত্র নীত হয়।

আমেরিকা এখন তুলার চাষের জন্য জগদ্বিখ্যাত। কলম্বস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করেন তখন তিনি তথায় কার্পাসবস্ত্র এবং কার্পাস বৃক্ষ দেখিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের বণিকগণ অর্ণবযানে সমুদ্র অতিক্রম করিয়া যাবা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইত তাহার প্রমাণ আছে। কিন্তু তাহারা আমেরিকা গিয়াছিল কিনা সে সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত নির্ভর যোগ্য প্রমাণের অভাব রহিয়াছে।

শিল্প-কলা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত সার জর্জ্জবার্ডউড (Sir G. Birdwod) লিখিয়াছেন ভারতীয় সূক্ষ্ম মস্‌লিন্ বস্ত্র বয়ন তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিয়াছে। "Filmy muslins comely as the curtain of Solomon is even older than the code of manu." মনুসংহিতা রচনার পূর্ব্বে ও অতি সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র এদেশ নির্ম্মিত হইত। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই এদেশের সূক্ষ্ম বস্ত্র মিসর, বাবিলন, গ্রীস, রোম প্রভৃতি সভ্যদেশে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। গ্রীসদেশীয় বণিকগণ বরোচ এবং মসুলিয়া (আধুনিক মসলিপত্তন) নামক স্থান হইতে কার্পাস বস্ত্র স্বদেশে লইয়া গিয়া ব্যবসায় করিত। তখন মসুলিপত্তন কার্পাস বস্ত্রের বিরাট বন্দর ছিল। মসলিপত্তন হইতেই 'মস্‌লিন' নাম হইয়াছে। সেই সময়ে সভ্য জগতের ধনীগণ ঢাকার ভুবন বিখ্যাত মস্‌লিন্ পরিধান করিয়া গৌরব বোধ করিতেন।

ইউরোপ শীত প্রধান দেশ বলিয়া তখনকার লোক মেষলোম-জাত পশমী বস্ত্রাদি ব্যবহার করিত। যখন ভারতবর্ষ হইতে কার্পাস বস্ত্র ইউরোপে আমদানি হইতে লাগিল তখন তাহারা ঐ সকল বস্ত্র দেখিয়া একবারে বিস্মিত হইয়া গেল। কার্পাস সম্বন্ধে নানাপ্রকার কাল্পনিক গল্প প্রচারিত হইতে লাগিল। এই সকল গল্পে ইউরোপের তৎকালীন অধিবাসীদের অজ্ঞতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। হেনরি লি, তাতারের উদ্ভিজ্জ মেষ (The vegetable

Lamb of Tartary) নামক একখানা গ্রন্থে ঐ সকল আজগুবি গল্প লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। একজন বলিয়াছেন ভারতবর্ষে একপ্রকার গাছের উপর মেষ শাবক জন্মিয়া থাকে। এই মেষের লোম হইতেই পূর্ব্বদেশবাসীরা বস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। আর একজন বলিয়াছেন—যখন কার্পাসের কোষগুলি ফাটিতে আরম্ভ করে তখন তাহার মধ্য হইতে মেষ শাবক নির্গত হয়। অপর একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলিয়াছেন—এই বৃক্ষের কাণ্ড এমন নমনীয় যে মেষ শিশু তাহার উপর হইতেই বৃক্ষতলস্থ শ্যামল তৃণরাজি ভক্ষণ করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবিত থাকে। সার জন মেণ্ডেভিল নামক একজন পর্য্যটক ভারত ভ্রমণান্তে ইংলণ্ডে গমন করিয়া এই অশ্রুতপূর্ব্ব বিটপি বিহারী মেষ শাবকের সম্বন্ধে গল্প করেন। তিনি ইহাও বলেন যে এই অদ্ভুত মেষের মাংস তিনি ভক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন। মেণ্ডেভিল সাহেব চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ভারত ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎকালে ইংলণ্ডের সাধারণ লোক এমন অজ্ঞ ছিল যে তাহারা এই গল্প অনায়াসে বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

স্বস্ত্যয়ন।

(১)

আজ মরুতে বইল বিমল জ্ঞান গঙ্গার ধারা,
চের পিপাসী ছুটে এল ভেঙ্গে আঁধার কারা।
চেউ লেগেছে তরুণ বুকে, তৃপ্ত হবে পরম সুখে,
প্রাণখোলা সব প্রাণের কথা বলছে পরস্পরে ;
সরস করে' চিত্ত এদের যাবে আপন ঘরে।

(২)

হৃদয়-কমণ্ডলু এরা পূর্ণ করি' নিবে,
এক ফোঁটাতে হাজার শুষ্ক জীবন মুঞ্জরিবে।
ছড়িয়ে আবার পড়বে দেশে, নানারূপে নানান্ বেশে
দুর্ব্যাভিক্ষে ভরবে জগৎ, গাহবে জাতির নাম ;
বুকের সুখে ফুটবে ভাষা, গাইবে যশোগান।

(৩)

অনেক মধু হেথা বঙ্কিম অনেক জগদীশ,
এদের মাঝে তপশ্চরণ করছে অহর্নিশ।
কেউবা না পেয়ে রবির কিরণ, নিদ্রাবেশে দেখছে স্বপন
ভোরের পাখীর সাড়া পেলেই তন্দ্রা যাবে ছুটে ;
এমন করে' গাইবে—মানুষ পড়বে পায়ে লুটে।

(৪)

আমরা যাকে তুচ্ছ ভাবি, তুচ্ছ সে তো নয়।
তিক্ত নিমের ফুলের গন্ধ চিত্ত কেড়ে লয়।
দর্ভ ফুলের শুভ্রতাতে, আজ নাগাদ্‌ও মনটা মাতে,
মৌমাছিদের খৈতাতী গান বেজায় ভাল লাগে ;
কচি ঘাসে ফেলতে চরণ বক্ষে ব্যথা জাগে।

(৫)

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুগুলিয়ে সিন্ধু নির্ম্মিত ;
ক্ষুদ্রকে তাই করতে হবে বিশেষ পরিচিত।
এই ছেলেরা কাঁচাকানা, গন্ধ এদের যাবে জানা,
ফুটবে যখন, গগন ভুবন হবে মাতোয়ারা ;
সফল হবে কবির স্বপন, হব পাগল-পারা।

(৬)

ওগো তরুণ, ওগো নবীন, জ্ঞানের দরিয়ায়
ঝাঁপিয়ে পড় পরম সুখে, কাজ কি নিরাশায়।
প্রলোভনের পথ বিপথে, অনেক সাজা এই মরতে,
একজনে যা করতে পারে করবে আরেক জনে ;
আসল কথা এই কথাটি রাখতে হবে মনে।

(৭)

তোমরা ছোট, হওনা ছোট, ভাব্‌না কিছু নাই ;
বীজের মাঝেই বনস্পতি দেখছি সর্ব্বদাই।
নিজের ঝুঁকি নিজের কাছে, শক্তি সবার আছেই আছে,
মানুষ হতে চেষ্টা কর, পুরাও মনস্কাম।
কালের বুকে চিহ্ন রাখ, অমর কর নাম।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

ওরিয়্যাণ্টাল কন্‌ফারেন্স।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তত্ত্বাবধানে বৎসর বৎসর বঙ্গদেশের সাহিত্যিকবৃন্দ সম্মিলিত হইয়া পরস্পর মধ্যে আলাপ পরিচয় এবং সৌহৃদ্য স্থাপন ও সাহিত্যের উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, গত তিন বৎসরের মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হয় নাই। সাহিত্য পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক রামেন্দ্রসুন্দর ও ব্যোমকেশের অকাল মৃত্যুই ইহার অন্যতম কারণ বলিয়া বোধ হয়। বঙ্গদেশের সাহিত্যিকগণ সম্মিলনের অভাব অনুভব করিতেছিলেন; এইরূপ সময় কলিকাতায় ওরিয়্যাণ্টাল কন্‌ফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন হওয়াতে বঙ্গদেশীয় শিক্ষিতগণের কেবল পরস্পর মধ্যে নহে অন্যান্য প্রদেশের সুধীবৃন্দের সহিতও আলাপ পরিচয় ও সৌহৃদ্য স্থাপনের সুযোগ ঘটিয়াছে এবং তজ্জন্য এই ওরিয়্যাণ্টাল কনফারেন্স তাঁহাদের নিকট অতিশয় প্রীতিকর হইয়াছে।

গত ১৯১৯ খৃঃ পুনানগরীতে প্রাচ্যবিদ্যার অন্যতম কেন্দ্র-ক্ষেত্র ভণ্ডারকর রিসার্চ সোসাইটির তত্ত্বাবধানে এই প্রাচ্যবিদ্যা সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে গত ২৮শে জানুয়ারী হইতে আরম্ভ করিয়া ১লা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত, এই পাঁচ দিন উক্ত সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটগৃহে ও দ্বারভাঙ্গা সৌধে হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদ অধ্যাপক ডাঃ সিলভিয়াঁ লেভি সভাপতি হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশ ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে প্রায় দুইশত প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। ২৮শে জানুয়ারী বেলা ১১টার সময় সভা আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ এবারকার অধিবেশনের পৃষ্ঠপোষক লর্ড রোনাল্‌ডসে সকলকে ভারতীয় প্রাচীন জ্ঞান ভাণ্ডারের অন্বেষণ জন্য মনোযোগী হইতে আহ্বান করিয়া নিম্নলিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন :—

"প্রাচ্য তত্ত্ববিদ্‌গণের এই সভার উদ্বোধন করিতে যাইয়া প্রথমেই সভার উদ্দেশ্যের কথা মনে পড়ে। সভার উদ্দেশ্য কি? অতীতের যে সূত্র ধরিয়া বিচিত্র ভারতীয় সভ্যতা পরিণতি লাভ করিয়াছে, সেই সূত্রের অনুসন্ধান করাই এই সভার উদ্দেশ্য। কালের বিচিত্র হস্তে এই সূত্রের বহু গ্রন্থি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই লুপ্ত গ্রন্থিগুলির কতদূর উদ্ধার হইয়াছে তাহা প্রচার করাও এই সভার উদ্দেশ্য। বহু মনীষী প্রাচ্যতত্ত্বের বহু-বিভাগের গবেষণায় নিযুক্ত থাকিয়া অতীতের জ্ঞান-বিজ্ঞানে আশা-আকাঙ্ক্ষা আমাদের সমক্ষে স্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি? শুধু কি মানুষের জ্ঞান-স্পৃহা তৃপ্তি করাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য—শুধু কি অতীতের জ্ঞান বিজ্ঞানের অদ্ভুত বিকাশ সন্দর্শন করিয়া উত্তরাধিকারীরূপে গর্ব্ব অনুভব করিবার জন্যই মনীষীগণ এই গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন? প্রকৃত পক্ষে এই দুইটীর মধ্যে একটীও এই গবেষণার উদ্দেশ্য নহে। যে সূত্র ধরিয়া, ভারতীয় সভ্যতা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সূত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যাহাতে তাহা অচিরে উন্নততর পথে অগ্রসর হয়, সমগ্র মানব-সভ্যতার বিকাশে সাহায্য করে, ইহাই এই সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

মানব-সভ্যতা বিচিত্র পন্থায়, বিচিত্র গতিতে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। কখন খরস্রোতা তটিনীর মত ক্ষিপ্র, আবার কখন বিপুল বারিধি-বক্ষের মত মন্থর-নিশ্চল। বর্ত্তমানে ভারতীয় সভ্যতা আবার তীব্র বেগে বিকাশের পথে অগ্রসর হইতেছে। বাঙ্গালাদেশে মানবের চিন্তাধারা আবার চঞ্চল-চরণে তাহার চরম লক্ষ্যের পথে চলিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির কার্য্যবিবরণীতে, অবনীন্দ্রনাথের ভারতীয় চিত্রকলায়, জগদীশের শিক্ষাগারে, রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-ভারতীতে ইহার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। অতীতের সভ্যতার ভিত্তির উপর আজ মহান জ্ঞান-মন্দির নির্ম্মাণের বিপুল উদ্যোগ আরম্ভ হইয়াছে।

ইয়ুরোপীয় সভ্যতা একের মধ্যে বহুর বিশ্লেষণে নিযুক্ত; অন্যপক্ষে ভারতীয় সভ্যতা এই বহুর মধ্যে একের সত্তা নির্ণয়ে নিযুক্ত। ইহাই হইয়াছে ইয়ুরোপীয় ও ভারতীয় সভ্যতার বিশেষত্ব। ইহারই ফলে ইয়ুরোপ আজ বিজ্ঞানের ক্রীড়াক্ষেত্র। কিন্তু ভারতের বিশেষত্ব এই যে সে বাহ্যিক জ্ঞানে সন্তুষ্ট নহে, অন্যে সন্তুষ্ট নহে; সে অন্যের মধ্যে, বহুর মধ্যে ভূমার সত্তা নির্ণয়ে ব্যস্ত। ভূমাতেই তাহার

অপার আনন্দ। ভারতের চিরন্তন জ্ঞান বিজ্ঞান ও দর্শনে আমি ইহার পরিচয় পাইয়াছি।

ইয়ুরোপ ও ভারতের এই যে পার্থক্য ইহার উদ্দেশ্য কি? আমার মনে হয়, এই দুইটী পন্থা বিভিন্ন হইলেও ইহারা একই উদ্দেশ্যে, একই চরম সত্যের জন্য ধাবিত হইতেছে। ইয়ুরোপের বাস্তব সত্য ভারতের ভাব গরিমায় অলঙ্কৃত হইয়া এক পূর্ণাঙ্গ সত্যের অবতারণা করিতেছে।

ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানে যে সত্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ভারতীয় দর্শনেও সেই একই সত্যের উপলব্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।

আমি শঙ্করের 'মায়ার' কথা বলিতেছি। বিশ্বজগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে যেরূপ ভাবে প্রতিফলিত হয়, বাস্তবিক পক্ষে তাহার প্রকৃত রূপ কি এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের মত? শঙ্কর বলিতেছেন—ইহা মায়া। মায়ার প্রকৃত অর্থ হইতেছে এই যে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রতিফলিত বিশ্বজগৎ সত্যও নহে, শূন্যও নহে। স্বর্গীয় অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন বলিয়াছেন যে, আমরা আমাদের ভাষা ও ভাবের দ্বারা বস্তুর প্রকৃত রূপ নির্ণয়ের অনবরত চেষ্টা করিতেছি। যখন দেখি, একটি ভাষা ও ভাবের দ্বারা কোন কিছুর প্রকৃত রূপের বর্ণনা করিতে পারিতেছিনা, তখন আমরা সেই ভাষা ও ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য একটী পূর্ণতর ভাষা ও ভাবের সাহায্যগ্রহণ করি। এটীও যখন অপর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয়, তখন আর একটী। এইরূপে পরিবর্ত্তন চলিতেছে। ইহা কখন শেষ হয় না। কারণ বস্তুর প্রকৃত রূপে আমরা কখন আসিয়া পৌছাইতে পারি না। কোন একটা পার্থিব জিনিষের কথা ধরিলেই উপর্য্যুক্ত কথাটীর মূল্য বুঝিতে পারিব। মনে করা যাক, একখানি চেয়ার বা একটা বাড়ী। চেয়ারখানা হইতেছে একটি বিশেষরূপবিশিষ্ট কঠিন কাষ্ঠখণ্ড। পূর্ব্বে মনে হইত যে এই কাষ্ঠখণ্ডই হইতেছে প্রকৃত বস্তু। তাহার পরে মনে হইল, না ইহা কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। তৎপরে মনে হইল যে ইহা কতকগুলি ক্ষুদ্র শক্তির সমন্বয়মাত্র। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এইরূপেই প্রকৃত সত্যের বিকাশ হইয়া থাকে। ব্যাপার হইতেছে এই যে ইয়ুরোপীয় জ্ঞান এবং ভারতীয় জ্ঞান—উভয়ে উভয়ের পূর্ণতা সম্পাদন করিতেছে।

আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে এই সভার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক। আপনাদের সভা ভারতের চিরন্তন ধারা বজায় রাখিয়া ভারতের উন্নতির পক্ষে সহায়ক হইবেন। আমার বিশ্বাস বর্ত্তমানে উন্নতির উপযুক্ত সুসময় উপস্থিত হইয়াছে। আপনারা এই আশা ও আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হউন। এই কয়েকটী কথা বলিয়া আমি এক্ষণে আপনাদের সভার উদ্বোধন করিলাম।

লাটবাহাদুরের বক্তৃতা শেষ হইলে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রতিনিধিবর্গকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তদুপলক্ষে ভারতবর্ষে প্রাচ্যবিদ্যা এবং ইতিহাস সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যে সকল কার্য্য হইয়াছে তাহার মনোজ্ঞ বিবরণ প্রদান করেন। তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ:—

দুই বৎসর পূর্ব্বে পুনা সহরে স্যার রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকারের নেতৃত্বে এই সভার প্রথম অধিবেশন হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাশের শিক্ষকগণের মুখপাত্রস্বরূপ আমি সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম। সেখানে আমি কলিকাতায় ইহার ২য় অধিবেশন হওয়ার জন্য প্রস্তাব করি। সভা সেই নিমন্ত্রণ সাগ্রহে গ্রহণ করে।

প্রাচ্যতত্ত্বের আলোচনা এবং অনুসন্ধানকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনেক উল্লেখ যোগ্য কার্য করিয়াছে। এবিষয়ে যাহাতে রীতিমত চর্চ্চা হয় তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে একটী স্বতন্ত্র-প্রাচ্যতত্ত্ববিভাগ সৃষ্টি করা হইয়াছে। সুশিক্ষা এবং তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য এখানে প্রচুর উৎসাহ দেওয়া হয়। মেধাবী ছাত্রগণের জন্য বিশেষ উপাধির বন্দোবস্তও এখানে আছে। পাশ্চাত্য দেশবাসী অনেক মেধাবী ছাত্র ভারতবর্ষে আসিয়া প্রাচ্যতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা উক্ত বিভাগে যেসব গবেষণাদির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে ভারতীয় ছাত্রগণের মনে একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। নানারূপ গবেষণা এবং উপাধিলাভ করিতে ভারতীয় ছাত্রগণ এখন বিশেষ মনযোগী হইয়া উঠিয়াছে। এ দেশে ইউরোপীয় ছাত্রগণ যদি ভারতীয় ছাত্রগণের সহিত আর একটু বেশী মিলিয়া মিশিয়া এই বিদ্যার চর্চ্চা করেন তবে ইহার আরও উন্নতি হইবে।

ডাক্তার ভিন্সেণ্ট স্মিথ, তাঁহার 'ভারতের প্রাচীন ইতিহাস' নামক পুস্তকে উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের পুরাতন

রাজনৈতিক ইতিহাসের একটী ধারাবাহিক আলোচনা করিয়াছেন। ভারতের প্রাচীন যুগের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস হইতে পারে না বলিয়া যে ধারণা লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল, তিনি তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিলাতের অক্সফার্ড বিশ্ববিদ্যালয় যেমন ইংলণ্ডের প্রাচীন এবং মধ্যযুগের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া 'এনসাইক্লোপিডিয়া' রচনা করিয়াছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও যে দিন সেই ধরণের একটী গ্রন্থ রচনা করিতে পারিবে সেই দিন বুঝা যাইবে যে প্রাচ্যতত্ত্ব আলোচনা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক চর্চ্চারও তেমনই দরকার। মিঃ আনন্দরাম বরুয়া এবং মিঃ নন্দলাল দে ভারতীয় ভূগোল সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে এখন রীতিমত পুস্তক রচনা করা দরকার।

প্রাচীন শিল্পের উপর নির্ভর করিয়াই ভারতের ইতিহাস গড়িতে হইবে। এই বিষয়ে অনেক গবেষণা ইতিমধ্যে হইয়া গিয়াছে জার্ম্মেণী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড এবং আমেরিকার বহু ছাত্র এই বিষয়ে বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। বহু ভারতীয় ছাত্রও এদিকে অনেক কার্য্য করিয়াছেন। ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কার্জ্জন মহোদয় ইহার একজন বড় পৃষ্টপোষক ছিলেন।

ভারতীয় প্রাচীন মুদ্রা হইতে ইতিহাস রচনারও অনেক চেষ্টা হইয়াছে। টোমাস এবং উইলসানের ন্যায় বহু মেধাবী মনীষী এই বিষয়ে অনেক গবেষণা করিয়াছেন।

বৌদ্ধ, জৈন এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ভারতে পাশাপাশি ভাবে বহু যুগ চলিয়াছে। ঐ সকল ধর্ম্মের নানা রকম চিত্র ভারতে বর্ত্তমান। এই চিত্র ও প্রতিমূর্ত্তি হইতেও ইতিহাস রচনা করা যাইতে পারে। এই সম্বন্ধে ধারাবাহিক কোন চেষ্টা এ যাবত হয় নাই সুতরাং এই দিকে মনযোগ দেওয়া উচিত।

ভারতের ললিত কলা ততটা উন্নত ছিল না বলিয়া অনেক ইউরোপীয় ললিত-কলাবিদের ধারণা ছিল। এ-বিষয়ে মিঃ হেবেল, প্রফেসার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মিঃ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সব গবেষণা করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ দিতে হইবে।

এই সকল নানা দিকের চর্চ্চা দ্বারা প্রাচ্যতত্ত্ব আলোচনা যাহাতে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় তাহাই বলিয়াছেন।

অতঃপর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির অক্ষয়কুমার মৈত্রের প্রস্তাবে ও মিঃ কৃষ্ণস্বামীর অনুমোদনে ডাঃ সিলভিয়াঁ লেভি সভাপতির পদে বৃত হন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় প্রাচ্যবিদ্যার বিপুলতা প্রদর্শন করিয়া সকলকে ইহার অনুশীলন ও চর্চ্চা করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার অভিভাষণের সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সভাপতির অভিভাষণ।

আমি যে ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য ভারতের নিকট হইতে কিছু শিক্ষালাভ করা। ভারতবর্ষকে কিছু জ্ঞান শিক্ষা দিব, এইরূপ অহং-ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া আমি এখানে পদার্পণ করি নাই।

আমাদের প্রাশ্চাত্য দেশে পাঠাগার সমূহে কত কি গ্রন্থাদি সংগৃহীত রহিয়াছে; কিন্তু তাহাতে প্রাণে কোনরূপ সাড়া দেয় না। পুরুষ পরম্পরাগত কিংবদন্তী হইতে সাধারণ লোকে পর্য্যন্ত যে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে, আমরা পুস্তকরাশির মধ্যে দিনরাত পড়িয়া থাকিলেও সেই রূপ সত্যের আলোক আমাদের হৃদয়ে প্রতিভাত হয় না। কয়েকমাস পূর্ব্বে আমি যখন প্রথমে ভারতবর্ষে পদার্পণ করি, তখন এই সম্বন্ধে আমার মনে একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মে। কলিকাতায় আগমনের উদ্দেশ্যে আমি কলম্বো সহরে অবতরণ করি। রাত্রিকালে ট্রেণযোগে সিংহলের নানাস্থান অতিক্রম করিয়া আমি একখানি খেয়া জাহাজে আরোহণ করি।

জাহাজযোগে ভোরবেলা আমি ধনুষ্কোট ও রামেশ্বরের সমীপবর্ত্তী হই। সংস্কৃতপাঠার্থী মাত্রেরই এই দুইটি প্রসিদ্ধ স্থানের নামের সহিত বিশেষ পরিচয় আছে।

আপনাদের মধ্যে হয়তো কেহ কেহ জানেন যে, আমি কিছুকাল যাবৎ রামায়ণ আলোচনায় নিরত আছি।

ঘটনাক্রমে একটা প্রাচীন বৌদ্ধ সূক্তের সহিত আমার পরিচয় হয়। সেই সূক্তটির মূল-বচন অনেক দিন হইতেই পাওয়া যাইতেছেনা। তবে চৈনিক ভাষায় ইহার অনুবাদ আছে। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এই সূক্তটি চৈনিক ভাষায়

অনুদিত হয়; আর ইহার প্রায় ৪।৫ শত বৎসর পরে তিব্বতীয় ভাষায়ও এই সূক্তটির অনুবাদ হইয়াছিল।

জনক-দুহিতা সীতার অন্বেষণে যে সকল কপি প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের নিকট সুগ্রীব পৃথিবীর যেরূপ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই অনুবাদে তাহা যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে।

সমগ্র মূল বচনটির দ্বারা সুন্দররূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সেই প্রাচীন যুগেও সুদূরবর্ত্তী প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জ ও সাগরাদির অবস্থান সম্বন্ধে ভারতবাসিগণের সবিশেষ জ্ঞান ছিল। আরো মনে হয়, মূল বচনটিতে সংস্কার সাধন বিশেষতঃ কাশ্মীরীয় সংস্কার সাধনের প্রতি বিশেষ ভাবে জোর দেওয়া হইয়াছে।

আমি ট্রেনে বসিয়া দেখিতে পাইতেছিলাম, অজানা-অচেনা বহু দরিদ্র যাত্রী দলে দলে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের সেই পবিত্র পদচিহ্নের পূজা করিতে ধাবিত হইয়াছে। ইহারা অতি দূরদেশ হইতে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের পূজা করিতে আসিয়াছে। ঠিক এই ভাবে এক দিন ফাহিয়েন, হিউয়েনসাং প্রমুখ বহু যাত্রী দেশদেশান্তর হইতে মরু পর্ব্বত প্রান্তর-সাগর অতিক্রম করিয়া পদব্রজে তাঁহাদের দেবতার পবিত্র চরণ কমল পূজিবার জন্য আসিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র ভারতের এক ক্ষুদ্র প্রান্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সমগ্র জগৎকে যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি মহান। তিনি সমগ্র জগতে এক অপূর্ব্ব ত্যাগ-ধর্ম্ম, ভক্তি ও দানশীলতার সুন্দর দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে সভ্যতার বিকাশ হয় না; যাহারা মনে করেন যে, যাহা কিছু আমাদের তাহা লইয়াই থাকিব, ঘরের বাহিরের বিদেশের যা-কিছু সবই বর্জ্জন করিব, তাহাদের যুক্তি বড়ই ক্ষতিজনক, অসার, বড়ই বালসুলভ। এই ভাবে জাতীয়তার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে পঁচিয়া মরিলে কোন লাভ নাই। বরং ইহাতে ঘোরতর অনিষ্টই হইয়া থাকে।

যে দেশের সভ্যতা ভব্যতার মধ্যে প্রেমের অতিমাত্র বিকাশ দেখা যায়, সেই দেশের সভ্যতাই প্রকৃত সভ্যতা; সেইরূপ সভ্যতা ভব্যতাই আদরণীয় ও গৌরবজনক। গ্রীক সভ্যতা ও ভব্যতার যে এত মান, তাহার কারণ এই যে, গ্রীকগণ নানাজাতি ও নানাদেশ হইতে তাহার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মিসর, এসিরিয়া, পারস্য, ফিনিসিয়া প্রভৃতি প্রাচীন কালের সভ্য দেশ সমূহ হইতে ইঁহারা জ্ঞান ও সভ্যতার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থে ভারতের বহু জিনিষ পাওয়া যাইতে পারে। চীন এবং তিব্বতে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বহু গ্রন্থ আছে। বাল্মীকি ভারতের আদি কবি। তাঁহার রচিত রামায়ণ একটী অতি উপাদেয় গ্রন্থ। তদ্ভিন্ন মহাভারত ভারতের একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃত গ্রন্থ। চীন পরিব্রাজক হিউয়েনস্থাং ভারতবর্ষে আসিয়া অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। চীন ভাষার প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে ভারতের কথা বহু স্থলে উল্লেখ করা হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জির ঐকান্তিক চেষ্টায় এই সকল বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল ভাষা শিক্ষা করিয়া কেবল ঐ ভাষায় কথা বলিতে শিখিলেই হইল না। ঐ সকল ভাষা শিক্ষা করিয়া যাহাতে ভিন্ন দেশীয় ভাষা হইতে নানারূপ তথ্য সংগ্রহ করা যায়, তাহা দেখা আবশ্যক। ইত্যাদি।

আলোচ্য বিষয়গুলিকে নিম্নলিখিত ত্রয়োদশ শাখায় বিভাগ করিয়া প্রত্যেক বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র অধিবেশন করা হইয়াছিল। এবং প্রত্যেক বিভাগে স্বতন্ত্র সভাপতি ছিলেন।

১। বেদ—ডাক্তার এস, কে, বেলভেলকার এম, এ, পি এইচ, ডি,—সভাপতি।

২। ইরাণী ভাষা ও সাহিত্য—সামসুল উলমা জীবনজী জমসেঠজী মোদী সি, আই ই, পি এইচ, ডি, —সভাপতি।

৩। উপকথা- রায়বাহাদুর অনন্তকৃষ্ণ আয়ার বি, এ, এল, টি,—সভাপতি।

৪। সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি।

৫। আর্কলজী—রাও বাহাদুর ডাঃ কৃষ্ণশাস্ত্রী।

৬। রাজনৈতিক ইতিহাস— রাওবাহাদুর আর, নরসিংহ চর।

৭। ধর্ম্ম ও সামাজিক ইতিহাস—ডাক্তার শ্যামশাস্ত্রী।

৮। ধর্ম্ম ও দর্শন—মিঃ কর্পূর স্বামী শাস্ত্রী।

৯। ভাষাবিজ্ঞান—ডাঃ তারাপুরওয়ালা।

১০। বৌদ্ধ বিভাগ—মিঃ অনগরিকা ধর্ম্মপাল।

১১। বিজ্ঞান—রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় এম, এ, বিদ্যানিধি।

১২। প্রাচীন ভূগোল—মিঃ কে, পি, জয়সবল এম, এ।

১৩। আরব ও পার্শি—জি, এস, হ্যাকিন—এম, এ, এম, ডি।

২৯, ৩০ ও ৩১শে জানুয়ারী প্রত্যেক দিন ১০টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত শাখা সভাগুলির অধিবেশন হইয়াছিল। যে যে বিভাগের কার্য্য এই কয়েক দিনে শেষ হইতে পারে নাই তাহা ১লা ফেব্রুয়ারী ১০টা হইতে ২টার মধ্যে সম্পন্ন হইয়াছিল।

১লা ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। অধ্যাপক ডাঃ লেভি সেদিন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাস্থলে কতিপয় প্রয়োজনীয় মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে। এই সকল মন্তব্য কার্য্যে পরিণত হইলে প্রাচ্যবিদ্যার আলোচনা ও অনুশীলনের সুবিধা হইবে বলিয়া আমরা ভরসা করি। কনফারেন্সের নাম পরিবর্ত্তনের জন্য একটী প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা পরিত্যাক্ত হইয়াছে। এখন প্রত্যেক দ্বিতীয় বৎসরে কনফারেন্সের অধিবেশন হওয়ার নিয়ম আছে; এই নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া প্রত্যেক বৎসর অধিবেশন করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। এই প্রস্তাবও পরিত্যাক্ত হইয়াছে।

অধ্যাপক লেভি অত্যন্ত বিনয়ী। তিনি প্রতিনিধিগণের সহিত অতি মহৎ ভাবে মিশিয়াছিলেন ও আলাপ পরিচয় করিয়াছিলেন। তাঁহার বিনম্র ব্যবহার বঙ্গদেশীয় সাহিত্যিকগণের সবিশেষ প্রণিধান ও অনুকরণ যোগ্য।

সভায় যে সমস্ত প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল তাহা সাধারণের নিকট নিরস বোধ হইতে পারে কিন্তু এই সকল বিষয়ের আলোচনা ও অনুশীলনে সুধীবৃন্দ বিমল আনন্দ ও রস ভোগ করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় যে আমাদের দেশের যে ইতিহাস এতদিন কোন কোন সহানুভূতি বিহীন বিদেশীয়গণের হস্তে স্থানে স্থানে কলঙ্কিত হইয়াছে তাহা দেশীয় বিদ্বৎ সমাজের এইরূপ সম্মেলন ও আলোচনার ফলে সত্য ও সুন্দর হইয়া উঠিবে।

প্রতিদিনই সভার কার্য্য অন্তে সভ্যগণের চিত্তবিনোদন ও জলযোগের সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

২৮শে তারিখ নাহার ভ্রাতৃদ্বয় আমন্ত্রণ করিয়া সকলকে তাঁহাদের শিল্পশালা প্রদর্শন ও জলযোগ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। এদিন সন্ধ্যার সময় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরেও প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত ছিল। ২৯শে—সভ্যগণ লাট বাহাদুরের "বাক্‌্‌েগু" ষ্টীমারে গঙ্গাবক্ষে জল বিহার করিতে বহির্গত হইয়াছিলেন। ষ্টীমারের উপরেই বৈকালিক জলযোগের সুবন্দোবস্ত ছিল। কাশিম বাজারের মহারাজা ও কুমার শরৎকুমার রায় সকলকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। পরদিন বৈকালে মিউজিয়ম পরিদর্শনের পর রাত্রিতে বঙ্গেশ্বর লর্ড রোনাল্ডসে তাঁহার গৃহে সন্ধ্যা সম্মিলনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর নাটকের ইংরেজী ভাষায় অভিনয় হইয়াছিল। পরদিন বৈকালে ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট গৃহে বৈকালিক জলযোগের পর ভারতীয় বিশেষ বাদ্য, সঙ্গীত ও সংস্কৃত নাট্য সভ্যদিগের মনোরঞ্জন করা হইয়াছিল। শেষ দিন সন্ধ্যায় অধ্যাপক কুলকর্ণি ও ভট্টাচার্য্যের লেণ্টার্ণ লেক্‌চার হয়।

দূরাগত অভ্যাগতগণ যাহাতে কলিকাতায় আরামে থাকিতে পারেন তজ্জন্য ধনী বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের গৃহে তাঁহাদের বাসস্থান ও আহারের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

আমরা সময় সময় যাহাদের দর্শন কামনা করিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এ সম্মেলনে আসিয়াছিলেন; কিন্তু আমাদের সে ইচ্ছা সফল হইয়াছে কি? কত জ্ঞানী গুণী আসিয়াছিলেন—দেখিলাম, কিন্তু চিনিবার সুবিধা কি ছিল? ভাবের আদান প্রদানে সম্প্রীতি ও চিন্তা গড়িয়া উঠে, পরিচয়ে সম্মেলনের সার্থকতা সম্পাদিত হয়। প্রত্যেক সম্মেলনে যাহাতে এই অসুবিধাটী দূর হইতে পারে তাহার দিকে সকলেরই লক্ষ্য থাকা উচিত।

মান্দ্রাজ ইউনিভারসিটির ভাইস চ্যান্সেলারের আমন্ত্রণ অনুসারে অরিয়্যান্টাল কনফারেন্সের তৃতীয় অধিবেশন মান্দ্রাজ হইবে ঠিক হইয়াছে।

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত।

অঞ্জলি।

চন্দ্রে মহাসমুদ্র।

ফ্রান্সের সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ মঁসিয়ে মারডেন বহুদিন যাবত চন্দ্রমণ্ডল সম্বন্ধে নানাবিধ গবেষণা করিতেছিলেন। তিনি নানা সময়ে চন্দ্রমণ্ডলের নানা রকম মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, নানারূপ ফটোগ্রাফ-চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ ক্রমাগত পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার ফল সম্প্রতি তিনি ফ্রান্সের রাজকীয় বিজ্ঞান পরিষদে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণায় তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে চন্দ্রমণ্ডলে ৫টী মহাসাগর বিদ্যমান আছে। তিনি মহাসাগরগুলির এক একটা নামও দিয়াছেন। প্রথম মহাসাগরের নাম অমৃত মহাসাগর; দ্বিতীয়—বাষ্প মহাসাগর; তৃতীয়—শীতল মহাসাগর; চতুর্থ—উষ্ণ মহাসাগর; পঞ্চম-ঝটিকা মহাসাগর।

এভারেস্ট যাত্রীর কথা।

কর্ণেল হাওয়ার্ডবেরী এভারেষ্ট-অভিযান করিয়াছিলেন। তিনি হিমালয়ের প্রায় বিশহাজার ফুট উচ্চে উঠিয়াছিলেন। শীতের জন্ত তাঁহার অভিযান এখন বন্ধ আছে। অভিযান যাত্রীরা এখন দেশে চলিয়া গিয়াছেন। কর্ণেল তিব্বতীয়দের সম্বন্ধে অনেক বিচিত্র কথা বলিয়াছেন। তাহারা নাকি মৃতদেহ দগ্ধও করে না, কবরেও প্রথিত করে না। প্রতি গ্রামেই মৃতের সৎকার জন্ত দুই এক ঘর করিয়া কসাই শ্রেণীর লোক আছে; কোন গৃহে লোক মরিলে ঐ শ্রেণীর লোককে ডাকা হয়, তাহারা আসিয়া মৃত দেহটাকে টুকরা টুকরা করিয়া পক্ষীর আধারে পরিণত করিয়া ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করে, মুহূর্ত্ত মধ্যে রাজ্যের পাখী আসিয়া তাহা আহার করিয়া যায়। এইরূপে মৃতের সৎকার শেষ হইয়া যায়। যদি সেই টুকরা কোন পক্ষীতে না খায়, তবে বুঝিতে হইবে, মৃত ব্যক্তি সৎ ও ধার্ম্মিক লোক ছিলেন না।

দির্ঘনিশ্বাস গ্রহণে স্বাস্থ্যলাভ।

ডাঃ ডেভিড পলসন বলেন—যে যত দীর্ঘ নিশ্বাস লইতে পারে সে তাহার জীবনকে তত দীর্ঘজীবী করিতে পারে; কারণ দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণের ফলে দেহের রক্ত সতেজ হইয়া সহজে তাহা সঞ্চালন পথে ধাবিত হইতে পারে এবং তাহার ফলে যকৃতের ক্রিয়া বর্দ্ধিত হইয়া পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তিনি বলেন, প্রতিদিন আহারের পর যত পারিবে দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করিবে এবং ক্রমে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে অভ্যাস করিবে। এরূপ করিলে রুগ্ন-ভগ্ন-দেহও সহজে এবং অল্প সময়ে সবল ও সতেজ হইয়া উঠিবে। ভগ্ন-স্বাস্থ্য যুবকগণ ইহার পরীক্ষা করিতে পারেন।

নিদ্রার নিয়ম।

"পাবলিক্ হেলথ" পত্রে নিদ্রা যাইবার প্রণালী নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। লেখক লিখিয়াছেন—গালের নীচে হাত রাখিয়া নিদ্রাগেলে চোখ বসিয়া যায় এবং মুখ বেঁকা হইয়া যায়। গোল হইয়া কুণ্ডলী আকারে নিদ্রা গেলে মেরুদণ্ডের অনিষ্ট সম্ভাবনা খুব প্রবল। খুব উঁচু বালিসেও মাথা রাখিয়া নিদ্রা যাওয়া উচিত নহে; ঐরূপে যে কাতে ঘুমাইবে সেদিকে নাসিকা বক্রতা প্রাপ্ত হইবে। বাম কাতে শুইলে হৃতপিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। চিৎ হইয়া ঘুমাইলে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হইয়া বোবায় ধরিবার সম্ভাবনা বেশী হয়। ডান কাতে শুইয়া নিদ্রা যাওয়াই খাদ্য হজম ও সুনিদ্রার পক্ষে উত্তম। এ উপদেশটী সহজেই পালন করা যাইতে পারে।

কুসংস্কার।

আমাদের দেশে যে সকল সংস্কার আছে আমরা উহাদিগকে কুসংস্কার বলিয়া থাকি। বস্তুত পক্ষে কোন দেশই এই কুসংস্কারের হাত এড়াইতে পারে নাই। এ স্থলে সুসভ্য আমেরিকার কয়েকটী কুসংস্কারের কথা উল্লেখ করা যাউক। সেখানে লোকের বিশ্বাস যদি সোমবারে বৃষ্টি হয় তবে সেই সপ্তাহে তিন দিন বৃষ্টি হইবে। যদি ইষ্টারের মধ্যে বৃষ্টি হয় তবে ক্রমাগত এক সপ্তাহ বৃষ্টি হইবে। যদি কোথাও যাইবার সময়ে কাল বিড়ালে পথ কাটিয়া যায় তাহা হইলে

যাত্রা অশুভ মনে করিতে হইবে। যদি চলিবার সময় বাম-দিকে খরগোস দেখা যায় তাহা হইলেও অশুভ হইবে। কিন্তু তাহা দক্ষিণ দিকে দেখিলে শুভ হইবে মনে করিতে হইবে। চন্দ্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলে অশুভ হয়। শনিবারে আমাবস্যা হইলে ঝড় বাতাস হইবে। ক্ষুরেতে চন্দ্রের কিরণ পড়িলে ক্ষুর ভোতা হইয়া যাইবে।

ইহার অনুরূপ কুসংস্কার সভ্য অসভ্য সকল দেশ এবং সকল সমাজেই দেখা যায়।

দবা খেলা।

আমাদের দেশে ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি খেলা সিল্ড্ মেচ্, কাপ মেচ্ ইত্যাদি হইয়া থাকে কিন্তু তাহাতে ১ মাস কিম্বা দেড় মাসের অধিক সময় লাগে না। কিছু দিন হয় অষ্ট্রেলিয়াতে এক দবা খেলার মেচ্ হইয়া গিয়াছে। এই খেলা সমাধা হইতে আড়াই বৎসর সময় লাগিয়াছে। খেলা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দুই জন খেলোয়ারের মৃত্যু হইয়াছে।

কাষ্ঠদ্রবণ।

লৌহ, তাম্র প্রভৃতি ধাতু দ্রব্যের মত কাষ্ঠকেও গলাইবার প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটী সুদৃঢ় পাত্রে ক্ষুদ্র২ কাষ্ঠখণ্ড ভরিয়া উহার বায়ু নিষ্কাসন করিয়া ফেলিতে হয়। তৎপর উহার মধ্য দিয়া অত্যুষ্ণ জলীয় বাষ্প প্রবেশ করাইতে হয়। এবং উহাকে ২৪৮ ফাঃ হিঃ তাপে ৩ ঘণ্টা রাখিতে হয়। ইহা দ্বারা কাষ্ঠের জলীয় ভাগ ও অপরাপর উড্ডীয়মান পদার্থ উড়িয়া যায় এবং তাহাদিগকে পাত্র হইতে যন্ত্র দ্বারা বাহির করিয়া ফেলা যায়। তখন কেবল মাত্র কাষ্ঠ তন্তু অবশিষ্ট থাকে। তখন উহা শীতল হইলে অপর একটী পাত্রে বন্ধ করিতে হয় এবং ঐ পাত্রের বায়ু বাহির করিয়া ফেলিয়া উহাতে নাইট্রজেন প্রবেশ করাইতে হয়। তখন উহাকে ১৫০০ ফাঃ হিঃ তাপে দুই ঘণ্টা রাখিলেই কাষ্ঠখণ্ড গলিয়া যায়।

মুক্তা।

শুক্তি হইতে মুক্তা বাহির হয়, ইহাই আমাদের আজন্ম সংস্কার। কিন্তু মুক্তা হইতে মুক্তা প্রসূত হয় কি না ইহা আমরা কখন চিন্তা করিবার অবসর পাই নাই। কিছু দিন হয় একখানা বৈজ্ঞানিক কাগজে বাহির হইয়াছে যে কোন ২ মুক্তা তণ্ডুলের ভিতরে রাখিয়া দিলে উহারা নূতন মুক্তা প্রসব করিয়া থাকে।

১৮৪০ সনে ভারতের বড় লাট লর্ড অক্লেণ্ডের ভগিনী শ্রীমতী এমেলী ইডেন বিলাতে এক মহিলাকে যে মুক্তা সম্বন্ধে একখানাপত্র লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল—"আমি আজ মুক্তা সম্বন্ধে তোমাকে এক অভিনব সংবাদ দিব। ভারতে এক মহিলার একটী মুক্তা আছে। উহা যদিও একটী বড় মুক্তা, তথাপি তোমারটীর মত বড় নহে। ইহার বিশেষত্ব এই যে ইহা বৎসরে দুইবার করিয়া নূতন মুক্তা প্রসব করিয়া থাকে। মহিলা এই নবজাত মুক্তাগুলি একত্র রাখিয়া দিয়াছেন। উহারা ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ফলে যেটী বয়ঃ জ্যেষ্ঠ সেটী বড় হইয়াছে, এবং তাহার কনিষ্ঠ তাহা হইতে ছোট হইয়াছে। উহা পরীক্ষা করিবার জন্য দুইজন ডাক্তার গিয়াছেন। ঐ মুক্তাটী একটী কাঠের বাক্সে কিছু চাউল রাখিয়া উহার মধ্যে রাখা হয়। কিছু দিন পরে আদি মুক্তার মধ্যে একটী কাল দাগ দৃষ্ট হয় এবং সময়ে ঐ স্থান হইতে এক টুকরা বিচ্ছিন্ন হইয়া তথায় নূতন মুক্তার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

চার্লস প্লাঙ্কেট নাম্নী এক মহিলার ১৯১৪ সনে মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি একটী বাক্সে একটী লকেট রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যাগণ বলিয়াছেন যে ঐ লকেট সংলগ্ন একটী কেশ গুচ্ছের মধ্যে বিন্দু বিন্দু ক্ষুদ্র মুক্তা সকল জন্মিয়াছে।

মালাক্কা দ্বীপবাসী ভিস্কা নামক এক সৈনিক বলিয়াছে যে বাল্যকালে তাহারা খালি মেচ্ বাক্সের ভিতরে তুলা দিয়া একরূপ ক্ষুদ্র মুক্তা পালন করিত, ঐ বাক্সের ভিতরে উহাদের বংশ বৃদ্ধি হইত কিন্তু ঐ বাক্সের ভিতরে চাউল দিয়া রাখিতে হইত। সে আরও বলিয়াছে, যে জলাভূমিতে ধান্য জন্মে ঐ জলাভূমিতে একরূপ শম্বুকের মধ্যে এইরূপ মুক্তা পাওয়া যায়। উহাও শুক্তির মুক্তা নহে।

বোর্ণীয়োর ভূতপূর্ব্ব গভর্ণার স্যার আবনেট বীর্চের স্ত্রী বলেন তাঁহারা বোর্ণীয়োতে থাকিতে একটী বোতলের মধ্যে কিছু মুক্তা ও চাউল রাখিয়া দিয়াছিলেন, ঐ মুক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং পুরাতন মুক্তার আকৃতি বড় হইয়াছে।

মুক্তা কোথা হইতে সংগৃহীত হয় বুঝিবার যো নাই কিন্তু পাঠকদের মধ্যে কেহ চাউলের সঙ্গে মুক্তা রাখিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন ঐ জাতীয় মুক্তা মিলে কি না।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

দেনা পানা।

দায়ীত্বহীনতারোগে ঘনশ্যামকে এমনি পাইয়া বসিয়াছিল যে 'টেষ্ট' পরীক্ষার দিন প্রাতঃকালটাতেও সে তাহার বর্শিটীর মায়া কাটাইয়া উঠিতে পারিল না। ফলে বর্শির মাছটী খেলাইয়া তুলিবার মোহে মাতোয়ারা হইয়া সে দিন যে ছিল তাহার ইংরেজী সাহিত্যের পরীক্ষার দিন, তাহা তাহা পর্য্যন্ত সে একেবারে ভুলিয়া গেল! সুতরাং সেবারও পরীক্ষায় 'এলাও' হইবার তাহার কোন আশা রহিল না।

পরীক্ষা দিতে পারিল না বলিয়া ঘনশ্যামকে বিশেষ চিন্তিত দেখা গেল না; বরং বর্শি খেলিবার যথেষ্ট অবকাশ হইল বলিয়া সে মনে মনে যেন বেশ স্বস্তিই বোধ করিতে লাগিল।

এই সময় ঘনশ্যাম বাড়ী হইতে তাহার মার এক চিঠি পাইল। সে চিঠিতে তাহার পিতার সাংঘাতিক কাতরের কথা ছিল; তাহার মা তাহাকে পরীক্ষার পর কাল বিলম্ব না করিয়া বাড়ী যাইতে লিখিয়াছেন।

ঘনশ্যামের বৃদ্ধ পিতা বারংবার যমকে ফাঁকি দিয়া ওয়াদা বাড়াইয়া আসিতেছিলেন। শুধু যমকে নহে—ঘনশ্যামের বিশ্বাস, তাহাকেও বারংবার ফাঁকি দিয়া বাড়ীতে নিতে চেষ্টা করিয়া তিনি মৃত্যুর ভান করিতেছিলেন। ঘনশ্যাম পরীক্ষার দোহাই দিয়া এ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল, পরীক্ষা যখন দেওয়া হইল না তখন মাতৃ আহ্বানকে সম্মানের সহিত শিরোধার্য্য করিয়া বর্শির ছিপটা হস্তে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

বাস্তবিকই ঘনশ্যামের পিতার অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছিল। বৃদ্ধের এই অন্তিম অবস্থায় সকলেই তাহার আগমন প্রত্যাশা করিতেছিল; সুতরাং পরীক্ষা সম্বন্ধীয় কোন কথাই আর উঠিল না।

ঘনশ্যাম পিতার শয্যা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার অবস্থা দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িল। বৃদ্ধ পুত্রের মুখ দেখিবার জন্যই যেন অপেক্ষা করিতেছিলেন। পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে বৃদ্ধের নাভিশ্বাস আরম্ভ হইল। পুত্রের হাত ধরিয়া তাহা নিজের বুকের উপর রাখিয়া বৃদ্ধ চক্ষু মুদিত করিলেন, তাহার মুখে কোন কথা ফুটিল না। দায়ীত্বজ্ঞানহীন পুত্রের স্কন্ধে অনিয়ক, পরিবারের দায়ীত্বের বোঝা রাখিয়া তাহাকে যে উপদেশটী তিনি দিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার সেই মনের কথা মনেই রহিয়া গেল। পিতা পুত্রকে শেষ দেখা দেখিলেন, পুত্রও পিতাকে শেষ দেখা দেখিল।

ঘনশ্যাম উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে পিতাকে তুলসীতলায় আনিল, মুখে গঙ্গাজল প্রদান করিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে পিতৃকর্ণে তারকব্রহ্ম নাম শুনাইয়া পিতার প্রতি পুত্রের শেষ কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি সম্পাদন করিল।

(২)

পিতার এই নীরব বিদায় ঘনশ্যামের জীবনের ধারা উলট পালট করিয়া দিয়াগেল। এরূপ উলট পালট এ সকল ঘটনায় যুবক জীবনে সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। ভাব প্রবণ উচ্ছৃঙ্খল জীবনে কর্ত্তব্যের সাড়া আসিলে সর্ব্বদাই তাহা এরূপ বিপরীত পথে চলিয়া থাকে। ঘনশ্যামেরও তাহাই হইল।

পিতা বিস্তর ঋণ রাখিয়া গিয়াছিলেন। পিতৃ বিদ্যমানে দায়ীত্বহীন পুত্র তাহার কোন খবরই রাখিত না। খবর রাখেনা অনেক যুবকই। খবর রাখেনা বলিয়াই যে অধিকাংশ যুবকের সাংসারিক আকস্মিক চাপ গুরুতর হইয়া দাঁড়ায় তাহা এ সংসারে নিত্য প্রত্যক্ষ হইতেছে।

কাছা গলায় পড়িয়া ঘনশ্যাম যখন শুনিল যে তাহার হবিষ্য করিবার অন্নটীও ঘরে নাই; এবং তাহার সংস্থান করিতে হইলে খত সম্পাদন করিয়া দিয়া ধার করা ব্যতীত উপায় নাই; এবং ধার করিতে বাহির হইয়া যখন

সে বুঝিল লোকে ধার দিতেও তাহাকে কুণ্ঠিত, তখন সে একেবারে থ হইয়া গেল।

পিতা যে ধার করিয়া আনিয়া তাহার পড়ার খরচ চালাইতেন, তাহা সে জানিত এবং তাহা পুত্রের প্রতি পিতার কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করিত। সেই পিতৃ-কার্য্যের ফলভোগ যে তাহাকেই করিতে হইবে, এবং সেই ফল যে এত সত্বর এরূপ বিষময় হইয়া দেখা দিবে, তাহা সে মোটেই চিন্তা করে নাই; করিলে বোধ হয় তাহার জীবনের শ্রী অন্যরূপে প্রকাশ পাইত।

পাড়া প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বগণের সহায়তায় কোন মতে উপস্থিত পিতৃদায় হইতে মুক্তি পাইতে না হইতেই ঘনশ্যামের চক্ষের সম্মুখে পঙ্গপালের মত দেওয়ানী আদালতের নোটীশ উড়িতে লাগিল।

আজ কমল চক্রবর্ত্তীর নালিশের রোবকারী, কাল রমণ ঠাকুরের ডিক্রির নোটীশ, পরশ্ব জগৎরায়ের ক্রোকের পরওয়ানা, তারপর জীবন চৌধুরীর নিলামের ইস্তাহার——দেখিয়া ঘনশ্যাম উপায়হীন ভাবে মাকে বলিল—"মা, চল আমরা মামার বাড়ী চলিয়া যাই।"

মা বলিলেন—"পৈত্রিক বাস্তুভিটা ছাড়িয়া কি কোথাও যাইতে আছে বাবা! আর অর্থহীন দুর্ভাগাকে কে স্থান দেয়? কে আদর করে? সম্মানে হউক অসম্মানে হউক পৈত্রিক বাস্তুই একমাত্র মাথা রাখিবার স্থান।"

ঘনশ্যাম বলিল—"পৈত্রিক ভিটা রক্ষা করিবারতো আমি কোনই উপায় দেখিতেছিনা। আত্মীয় স্বগণের পরীক্ষাও তো দুর্দ্দিনেই হইয়া থাকে।"

মা বুঝিলেন, ছেলে তাঁহার হঠাৎ বিপদে পড়িয়া দিশাহারা হইয়া গিয়াছে। তিনি জানিতেন, তাঁহাদের ঋণের পরিমাণ সম্পত্তির মূল্যের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল, তাই তিনি বিপদের গুরুত্ব দেখাইয়া কচি ছেলের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করিলেন না; তিনি তাহাকে সাহস দিয়া বলিলেন—বাবা, ভগবান দুঃখীর দুঃখের দিনও দেখেন, সুখীর সুখের দিনও দেখেন; তাঁহার দৃষ্টির অগোচর স্থান নাই, বিষয় নাই। তিনি এক রকমে আমাদিগকে চালাইবেনই। দৌড়াইলে বিপদ ফুরায় না, ভোগ সাথে২ দৌড়িয়া ফিরে। ভয় কি বাবা, তুমি সহরে যাও, যা কিছু পার রোজগার করিতে চেষ্টা কর। আমি এক রকমে, কোন মতে চলিব। ভগবান দিন দিলে পুনরায় আমাদের সব হইবে।"

পুত্রকে এইরূপে সাহস দিয়া মাতা বিধিলিপির দিকে চাহিয়া হৃদয় বাঁধিলেন এবং নিজ হাতের শেষ কপর্দ্দক পুত্রের প্রবাস বাসের খরচের জন্য দিয়া তাহাকে কায়মনবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ঘনশ্যাম জননীর পুণ্য আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া গৃহ ত্যাগ করিল।

(৩)

ঘনশ্যামের গৃহ ত্যাগের পর আজ তিন বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এই সময় মধ্যে পৈত্রিক ঋণে একে একে ঘনশ্যামের সকল সম্পত্তি নীলাম হইয়া গিয়াছে। বাকী রহিয়াছে কেবল বাস্তুভিটা খানা। তাহাও এত দিনে নীলাম হইয়া যাইত, হয় নাই কেবল বিধবার কাকুতি মিনতি ও চক্ষু জলের জোরে।

গ্রামের ধনী তালুকদার কমল চক্রবর্ত্তীর নিকট তাহা দায় আবদ্ধ ছিল। তিনি ডিক্রীজারি করিয়া তাহা নীলামে তুলিয়াছিলেন; বিধবার কাঁদা কাটিতে ও ঘনশ্যামের নিরুদ্দেশের জন্য তাহা এত দিন নীলাম হয় নাই, এই তারিখে নিশ্চয় হইয়া যাইবে।

ঘনশ্যাম সেই যে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে, তার পর আর গৃহে ফিরে নাই। প্রথম প্রথম সে তাহার মাকে চিঠি লিখিত; কিন্তু বাস্তুভিটা নীলামে উঠিয়াছে, এই সংবাদ পাইবার পর আর তাহার কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় না। ছেলের চিঠিপত্র না পাইয়া বিধবা কাঁদিয়া অস্থির হইলেন, তাঁহার এখন আর বাস্তুর দিকে লক্ষ্য নাই; তিনি চক্রবর্ত্তীকে বলিয়া পাঠাইলেন—"ঠাকুর আপনার যাহা ধর্ম্মে লয়, আপনি তাহাই করুণ। বাস্তুর জন্য আমি আমার ছেলে হারাইয়াছি। আপনি বাস্তু কিনিয়া রাখিয়া আমাকে স্থান দেন, থাকিব; না দেন, বিধাতা অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই হইবে। আমার দিকে চাহিয়া আপনি আর কত অপেক্ষা করিবেন।"

চক্রবর্ত্তীর হৃদয় কঠোর ছিল না। তিনি ৬ বৎসর মধ্যেই নালিস করিয়া তাহার প্রাপ্য সম্পূর্ণ টাকা আদায় করিতে পারিতেন। বিপন্ন পরিবারের দুর্দ্দিন মনে করিয়া

তিনি তাহা করেন নাই ; এখন সময় অন্তে নালিস করিয়া ক্ষতিগ্রস্থ হইতে বসিয়াছেন। তথাপি তিনি বিধবার কথার উত্তরে বলিয়া পাঠাইলেন :—

"সম্পত্তির মূল্য অপেক্ষা আমার পাওনা টাকার পরিমাণ অধিক হইয়া গিয়াছে, তবু আমি ঘনশ্যামের জন্ত অপেক্ষা করিব। জমি বাড়ী নিজে রাখিয়া দিতে চেষ্টা করিব ; সময়ে সুদ সহ আমার ন্যায্য পাওনা আমাকে দিলেই চলিবে।"

চক্রবর্ত্তীর সহৃদয় ব্যবহারে আশ্বস্ত হইয়া বিধবা পুত্রের উদ্দেশ্যে পূর্ব্ব ঠিকানায় চিঠি লিখিলেন :—"বাবা, তুমি আর এরূপ ভাবে নিরুদ্দেশ থাকিয়া আমাকে কাঁদাইও না। ভিটা রক্ষার আর আমাদের দরকার নাই ; এ ভিটা আমাদেরই থাকিবে। আমরা আপাততঃ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের রায়ত হইয়া থাকিব। তারপর ভগবান সুদিন দিলে এ ভূমি আমাদিগেরই হইবে, চক্রবর্ত্তী আমাদিগকে তাহা ফেরত দিবেন। আর তাহা না হইলেও সুদিন হইলে, ভগবানের অনুগ্রহ হইলে ভূমির অভাব হইবে না। তুমি সে বিষয় চিন্তা করিও না ; আমার কোলে আসিয়া আমার প্রাণ শীতল কর। তুমি না আসিলে, আমি অন্ন-জল ত্যাগ করিব। "

বিধবা যে কি অভাবে দিন কর্ত্তন করিতেছিলেন, পুত্রকে তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে দিলেন না। চিঠি গেল, কিন্তু কোন উত্তর আসিল না ; সেই চিঠিও ফেরত আসিল না।

(৪)

নীলামের দিন ঘনশ্যামের মা সারাদিন স্বামীর ভিটার দাওয়ায় কাঁদিয়া কাটাইলেন। সন্ধ্যার সময় সংবাদ পাওয়া গেল, বাড়ী জমি নীলাম হইয়া গিয়াছে। হটাৎ চক্রবর্ত্তীর এক অভাবনীয় বিপদ ঘটায় তিনি ক্ষতির উপর আর ক্ষতি দিতে সম্মত হইলেন না, সুতরাং জমি বাড়ী ৪২৫৲ টাকায় অপর এক ব্যক্তি কিনিয়া নিয়াছে।

চক্রবর্ত্তীর বিপদ—তাহার বড় ছেলে আদালতের কেশিয়ার। তাহার বাক্সে পাঁচশত টাকার নোট ছিল, হঠাৎ সে নোট বাক্স হইতে চুরি গিয়াছে। কে বা কাহারা নোট নিয়াছে, তাহার কোন নিশান নাই। এই আকস্মিক ক্ষতিতে চক্রবর্ত্তী বিষম ক্ষতিগ্রস্ত এবং অনুতপ্ত হইয়াছেন। এই ক্ষতির উপর তিনি ৫০০৲ টাকা মূল্য ফেলিয়া ঘনশ্যামের আয়হীন অথচ ভবিষ্যতের অপ্রিয়-সম্ভাবি সামান্ত বস্তু রাখিতে অসম্মত হইয়াছেন—তাহার অবহেলায় সম্পত্তিটা অপর এক তৃতীয় পক্ষ কিনিয়া লইয়া গিয়াছে।

সংবাদ শুনিয়া বিধবা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। নিরাশ্রয় অসহায়ের কান্না ব্যতীত দ্বিতীয় আশ্রয় কি আছে ?

(৫)

ঘনশ্যাম মাতৃ চরণ হইতে বিদায় হইয়া আসিয়া তাহার বশির সাথী বিপিনের শরণাগত হইয়াছিল। কারণ সে জানিত, বিপিনের অসাধ্য কিছু ছিল না, সে তাহার একটা পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারিবেই। বিপিন তাহা করিয়াছিল। বিপিনের প্রাণপণ চেষ্টায় ঘনশ্যাম এক ভদ্রলোকের একটী শিশু ছেলেকে ক খ পড়াইয়া তাঁহার অন্নে দিন গুজরানের সংস্থান করিয়াছিল। মেট্রিকুলেশন ক্লাসের অজগর বিদ্যা লইয়া যে নিজ পেটেই প্রতিপালন করা যায় না, বশিপ্রেমে উন্মত্ত ঘনশ্যামের এতদিন সে জ্ঞান ছিল না। দায়িত্বের বোঝা স্কন্ধে পড়ায় এখন তাহার সে বিষয়ে চক্ষু ফুটিয়াছে।

কিন্তু এইরূপ পেটে ভাতেই বা কত দিন চলিবে! এদিকে বাড়ীতেও একটী পয়সা দিয়া সাহায্য করিতে পারিতেছে না। লোকের মুখে মায়ের শোচনীয় অভাবের কথা শুনিয়া ঘনশ্যাম মাঝে মাঝে নীরবে বসিয়া কাঁদিত। এই রূপে ক্রমে তাহার জীবনে ধিক্কার আসিতে লাগিল—পুত্র হইয়া মাকে যে ভাত না দিতে পারে, সে হতভাগার জীবনের প্রয়োজন ?

দারুণ অভাবের ভিতর দিয়া দিন চালাইয়াও ঘনশ্যামের মাতা পুত্রকে তাহা জানিতে দিতেন না। তবু ঘনশ্যাম নিজ জীবনের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ক্রমে মায়ের নিকট চিঠি লিখিবার ব্যয় ও সংক্ষেপ করিয়া লইল। সে ব্যয়ই বা তাহার মিলিবার উপায় কি ?

এই সময় উদ্বাস্তু হইবার সংবাদ পাইয়া ঘনশ্যাম এত অধীর হইয়া পড়িয়াছিল যে সে গোপনে আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইবার সঙ্কল্প করিয়া বসিল।

বিপিন তাহার মনের গতি বুঝিয়া এক্ষেত্রেও তাহাকে রক্ষা করিল। বিপিনের ভগ্নিপতি পোষ্টাফিসে কার্য্য করিত; সে তাহার সাহায্যে ঘনশ্যামকে ইরাকে পোষ্টাফিসের চাকুরী লইয়া দিল।

ঘনশ্যাম দেড়শত টাকা মাসিক বেতনে মেসোপটমিয়ায় চাকুরি লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় চক্ষু জলে বক্ষ ভাসাইয়া বন্ধুর নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইল এবং মায়ের চিঠিগুলি তাহার নিকট রাখিয়া বলিল—"দেখিও ভাই, জীবনের কোন ভরসা রাখিয়া আমি সুদূর আরবের মরু প্রান্তরে যাইতেছি না। আমার মাকে তুমি দেখিও—বড় কাঙ্গালিনী মা আমার।"

(৬)

ঘনশ্যাম ইরাকে যাইয়া পঁহুছিবার কিছুদিন পরেই বিপিনের এক চিঠি পাইয়া বাড়ীর অবস্থা জানিতে পারিল। সে চিঠি খানা ছিল এইরূপ :—

প্রিয় ঘনশ্যাম,

তোমার বাস্তুভিটা সম্পর্কে আমাকে কোন কথা বলিয়া যাও নাই। তোমার মার চিঠি পড়িয়া তাহা জানিতে পারিয়া আমি আমার সাধ্যমত তাহার অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। আমার চেষ্টা সফল হইয়াছে। আমি তাহা আমার এক আত্মীয়ের নামে ডাকিয়া রাখিয়াছি। তোমার জন্ত আমি যে অপরাধ করিয়াছি তাহা গুরুতর। আমার দুঃসময়ে তুমি এক দিন আমার জন্ত বিপন্ন হইয়াছিলে, এ দুষ্কার্য্য দ্বারা আমি সে ঋণ শোধ করিতে চেষ্টা করিলাম। আমি চক্রবর্ত্তীর বড় ছেলে প্রবোধের বাক্স হইতে পাঁচ শত টাকার নোট বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়া লইয়া সেই টাকা দিয়াই নীলাম খরিদ করিয়া তোমার বাড়ী ঘর রাখিয়াছি। প্রবোধ আমাকে বিশ্বাস করিয়া আমার জিম্মায় তাহার বাক্সটী মুহূর্ত্তের জন্ত রাখিয়া গিয়াছিল। সেই মুহূর্ত্তের সুযোগে আমি নোট সরাইয়া নিয়াছিলাম।

আমি ধনীর স্তূপীকৃত অর্থে নিরাশ্রয়ের আশ্রয় রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সুতরাং অপরাধ গুরুতর হইলেও আমার অপরাধী হৃদয় আত্ম প্রসাদে ভরপুর ছিল।

নীলাম কিনিয়াও আমার হাতে কিছু টাকা রহিয়াছে; তাহা আমি তোমার মাকে দিব।

চক্রবর্ত্তীর এই টাকাটা কিন্তু ময় সুদ আগামী জুলাই মাসে ফেরত দিতে হইবে। এক টাকা করিয়া সুদ ধরিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে। তাহা হইলে এই গুরুতর অপরাধ করিয়াও আমার মন সততার গর্ব্বে উৎফুল্ল থাকিবে।

তুমি পাঁচমাসে একশত টাকা করিয়া জমাইয়া ৫২৫৲ টাকার নোট তাহার নিকট ইনসিওর করিয়া পাঠাইও; এ কথা যেন ঠিক থাকে।

তোমার মার জন্ত কোন চিন্তা করিও না। ভগবান দিন দিলে সবই হইবে। ভগবানই আমাদের একমাত্র ভরসা।

তোমার বিপিন।

জুলাইমাসে চক্রবর্ত্তীর বড় ছেলে প্রবোধের নিকট এক ইনসিওরেন্স আসিয়া পৌছিল। প্রবোধ বিস্ময়ের সহিত সেই লেপাফা কাটিয়া দেখিল, তাহাতে একখানা কাগজের টুকরার সহিত ৫২৫৲ টাকার নোট গাথা রহিয়াছে।

প্রবোধ এই ঘটনায় এত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল, যে সে সেই ক্ষুদ্র কাগজের টুকরায় কি লেখা রহিয়াছে, তাহা পর্য্যন্ত দেখিতে ভুলিয়া গেল।

বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী পরিপক্ক বিষয়ী লোক। তিনি পুত্রের হস্ত হইতে নোটগুলি টানিয়া নিয়া কাগজ খণ্ড পাঠ করিলেন। তাহাতে লেখা ছিল :—

Embarkton, 7. 7. 21.

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ ভাগে আপনার বাক্স হইতে যে ৫০০৲ শত টাকা নেওয়া হইয়াছিল, এই পাঁচমাসের সুদ সহ তাহা অদ্য আপনাকে প্রত্যর্পণ করা গেল। ভগবান দাতা, তিনিই আবার গৃহিতা। তিনি আপনাকে দিয়া আমাকে যে দান করিয়াছিলেন, আজ আমাকে দিয়া আপনাকে সেই দান প্রত্যর্পণ করিলেন। তাঁহার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হউক। ইতি।

চিঠিতে প্রেরকের নাম ছিল না। লেপাফার উপর যে নাম ছিল তাহাও বুঝা যাইতে ছিল না। বৃদ্ধ হর্ষ দীপ্ত আননে আশ্বাস্তর শ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—

"যাক্, ভগবান এইরূপেই জগতের দেনা পানা পরিশোধ করেন।"

মাথা গণ্তি।

এতদিনে গত আদম সুমারির পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। যখন বঙ্গদেশ আয়তনে বড় ছিল, তখন "সপ্ত-কোটি" কণ্ঠোত্থিত 'জয় জয়' নিনাদে ইহার শস্য-শ্যামল ক্ষেত্র প্রতিধ্বনিত হইত। সেই নিনাদ ক্রমশঃ একটুখানি কমিয়া আসিয়াছে; কারণ দেশের সীমানায় আদিবদল কাটছাট অনিবার্য্য। আজ বাংলার কোথায় সেই শ্রীহট্ট গোহট্ট আর কোথায় বা মল্লভূম (মানভূম), ধবলভূম ?

১৯২১ সনের সেন্সাস অনুসারে বর্ত্তমান বঙ্গের লোক সংখ্যা ৪৭,৫৯২,৪৬২।

অর্থাৎ সপ্তকোটির স্থলে পঞ্চকোটীও নহে, অনেক কম। দশ বৎসর পূর্ব্বে ১৯১১ সনে সারা বঙ্গের জনসংখ্যা ছিল ৪৬,৩০৬, ১৭০। সুতরাং এবারকার বাড়তি নাম মাত্র, শতকরা ২·৮ জন। ১৯১১ সনে শতকরা ৮ বৃদ্ধি পাওয়া গিয়াছিল। এবার হাওড়া ব্যতীত বর্দ্ধমান বিভাগের সমস্ত জেলার এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগের নদীয়া, মুরশিদাবাদ ও যশোহর এবং উত্তরবঙ্গের পাবনা ও মালদহ জেলার লোক সংখ্যা একদম কমিয়া গিয়াছে। তাহার কারণ ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও দারিদ্র্যের ত্র্যহস্পর্শ দোষ ব্যতীত আর কি হইতে পারে ? পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা বেশী, মুসলমান কম; ভাবিবার বিষয় বটে।

নিম্নে ঢাকা বিভাগের সংখ্যা উদ্ধৃত হইল।

জেলা	১৯২১ লোকসংখ্যা	১৯১১ লোকসংখ্যা	শতকরাবৃদ্ধি
ঢাকা	৩১২৫, ৯৬৭	২৮৮৭, ৪৭২	৮·৩
ফরিদপুর	২২৪৯, ৮৫৮	২১৪৫, ৮৫১	৪·৮
বাকরগঞ্জ	২৬২৩, ৭৫৬	২৪২৪, ৭৮২	৮·২
ময়মনসিংহ	৪৮৩৭, ৭৩০	৪৫২৬, ৪২২	৬·৯

আমরা এখন ময়মনসিংহ জেলার মোটামুটী স্থানীয় অঙ্ক লিখিতেছি। আয়তন ও অধিবাসীর সংখ্যার হিসাবে ময়মনসিংহ সমগ্র ভারতবর্ষ মধ্যে বৃহত্তম ব্রিটিশ জেলা। ১৯০১ সনের লোক গণনায় এ জেলায় শতকরা ১২·৭৫ বৃদ্ধি পাওয়া যায়; ১৯১১ সনে ১৫·৫৩; আর এবারমাত্র ৬·৯ জন। ইহার জনাকীর্ণ টাঙ্গাইল উপবিভাগ এখন ম্যালেরিয়া গ্রস্ত। অন্যান্য মহকুমায় ম্যালেরিয়ার "অত্যাচার" না হইলেও "অনাচার" যে আছে তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। নিম্নলিখিত মহকুমা ও থানা সমূহের অঙ্কগুলি একেবারে নির্ভুল নহে। একটু অদল বদল অঙ্কে সম্পূর্ণ নির্ভুল অঙ্কের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। পুরুষের সংখ্যা সর্ব্বত্র অর্দ্ধেকের বেশী এবং স্ত্রীলোক অর্দ্ধেকের কম।

উপবিভাগ	১৯২১ সনে	১৯১১ সনে
সদর	১২৮২, ০৬৯	১১৮৫, ৩৩০
নেত্রকোণা	৭১৮, ৪৯০	৬৫৫, ২৯৫
জামালপুর	৮৮৪, ১৩৯	৮১৩, ৩০৬
টাঙ্গাইল	১০৮৫, ৫৬৩	১০৪৯, ৭৭২
কিশোরগঞ্জ	৮৬৭, ৫৬৯	৮২২, ৭১৯

সদর মহকুমা।

ময়মনসিংহ	১২৭,৮৭৯
ঐ মিউনিশিপালিটী	২৫,২৮৭
মুক্তাগাছা	৯৩,০৭০
ঐ মিউনিসিপালিটী	৬,৭৭০
ত্রিশাল	৯১,৮২৪
ফুলবাড়িয়া	১২৫,৮৭২
গফরগাঁও	১৩৬,৪৯৯
ভালুকা	৬৬,৪৬৭
ঈশ্বরগঞ্জ	২২০,৭৬৪
নান্দাইল	১৩৩,৭০০
ফুলপুর	১৭৭,৯১১
হালুয়াঘাট	৩৩,৮০৬
মোট—	১২৮২০৬৯

নেত্রকোণা মহকুমা।

নেত্রকোণা	৭৭৮৬২
ঐ মিউনিসিপালিটী	৮৬৮৭
বারহাট্টা	৫২,৭৭৫
পূর্ব্বধলা	৭৭২৭৮
আটপাড়া	৬৩৫৮৭
মোহনগঞ্জ (খাড়িসিমূল)	৫৫,৯০৫
কেন্দুয়া	১৩৮,৬৯৯
খালিয়াজুড়ি	৩০১২১
আকশ্রী (মদন)	৬০৪৪২
দুর্গাপুর	৯৫০২৬
কলমাকাঁদা	৫৮৩০৮
মোট—	৭১৮৪৯০

জামালপুর মহকুমা।

জামালপুর	১৬৯,৭১৭
ঐ মিউনিসিপালিটী	২৩,১১৩
সেরপুর	১০১,১০৩
ঐ মিউনিসিপালিটী	১৭,৮১৩
মেলন্দ	৭৯,৬৩৩
মাদারগঞ্জ	৭৩,১৪৯
শ্রীবর্দ্দি	৮৭,৮৮৮
নালিতাবাড়ী	৮৮,৮২১
নোকলা	৫৪,৩৮০
দেওয়ানগঞ্জ	৯১,১৯৯
ইসলামপুর	৯৭,৩২৩
	মোট—৮৮৪,১৩৯

টাঙ্গাইল মহকুমা

টাঙ্গাইল	১৫৫,৯৪২
ঐ মিউনিসিপালিটী	১৪৩০৫
বাঁশাইল	৯৬২৯১
নাগরপুর	১১১,৭৮২
মৃজাপুর	১২৬৫৭৭
কালিহাতী	১৬২,৮৯১
ঘাটাইল	১০৬,৯৭৮
গোপালপুর	১৫৫০৭২
মধুপুর	৮২৩২৭
সরিসাবাড়ী	৭৩,৩৯৮
	মোট—১০৮৫৫৬৩

কিশোরগঞ্জ মহকুমা।

কিশোরগঞ্জ	৭৮,৯২৪
ঐ মিউনিসিপালিটী	১৯,৫১৮
বাজিতপুর	৬৬,০৪৬
ঐ মিউনিসিপালিটী	১১,৫৬৮
ইটনা	৫৫,২৪০
তাড়াইল	৫৫,৩৪০
করিমগঞ্জ	৯৩,৯৩০
হোসেনপুর	৫৮,০৪২
কটিয়াদি	১০৭,৯৩৭
পাকুণ্ডিয়া	৮০,৮২৭
কুলিয়ারচর	৫০,৮০০
ভৈরব-বাজার	৯৬,৭১৪
নিকলি	৩৩,৬২১
অষ্টগ্রাম	৪২,৮৮০
ঢাকি (মিটামৈন)	৫৮,০৮২
	মোট—৮,৬৭,৪৬৯

আয়তনের হিসাবে এ জেলায় টাঙ্গাইলের অনেক থানা এবং নান্দাইল, কেন্দুয়া, জামালপুর ও কটিয়াদি থানায় খুব ঘন বসতি। জন সংখ্যার যাহা একটু বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা বোধ হয় প্রবল মুসলমান জাতির প্রাপ্য। সকলে প্রণিধান করেন কি না, জানি না, স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে ইঁহাদের রোজা-উপবাস-বিধি আত্মরক্ষার নিরুপদ্রব অস্ত্র। হিন্দুরা বিধবা-বিবাহ করে না; তার উপর নিম্ন শ্রেণী হইতে ধর্ম্মের রপ্তানি আছে, বিশেষতঃ উত্তর অঞ্চলে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টানের খতিয়ান পরে জানা যাইবে। বার আনা মুসলমান এবং চারি আনা হিন্দু ও অন্যান্য জাতি হইবারই কথা।

রাহু-কেতু।

হিন্দু ধর্ম্মের প্রামাণ্য গ্রন্থ বেদ। যাহা বেদ বিরোধী তাহা হিন্দু ধর্ম্মে অনুমোদিত হইতে পারে না। তন্ত্র, স্মৃতি, সংহিতা, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থও বিভিন্ন মত প্রকাশে বেদেরই দোহাই দিয়া থাকে, কেননা কোন না কোন প্রকারে তাহার ভিত্তি বেদ হইতে প্রমাণিত না হইলে তাহা হিন্দু সমাজে অগ্রাহ্য। কিন্তু কালক্রমে বেদের পঠন পাঠন দুরূহ হওয়ায় বেদের আলোচনা একপ্রকার লোপ পাওয়ার মধ্যে গিয়াছে। সুতরাং পুরাণপ্রোক্ত ধর্ম্মাদি বেদবিরোধী কি না বা অসংখ্য পুরাণাদির মধ্যে অন্ততঃ ২।১টী বিষয়ও বেদ বিরোধী কি না তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। পুরাণের প্রভাব হিন্দু সমাজে এত বেশী যে এখন হিন্দুরা বৈদিক না হইয়া প্রায় পৌরাণিক হইয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে রাহু কেতুর আলোচনায় ও এই পুরাণের মহিমাই দেখিতে পাইব।

অনেকেরই ধারণা রাহু কেতু গ্রহ নহে। পাশ্চাত্য জ্যোতিষে উহারা গ্রহ বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। রাহু পৃথিবীর ছায়া মাত্র, কেতু উক্ত ছায়ারও ছায়া। বেদে রাহু কেতুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—কিন্তু উহা বিভিন্ন অর্থে যথা "অপ্ স্বস্ত গবাং জনিত্র্যাকৃত প্রকেতুং" (ঋক্ ১।১২৪।৫) সায়নাচার্য্য এক স্থানে লিখিয়াছেন "কেতুং গমনাগমনাদি রূপং কর্ম্ম"॥ হিন্দুদিগের গণিত জ্যোতিষের অবিসংবাদি প্রামাণ্য গ্রন্থ ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে রাহুর

পরিচয়ে লিখিত হইয়াছে—কুমুদিনীপতিপাতো রাহুঃ। অর্থাৎ চন্দ্রের গমনাগমনের পথের নাম রাহু।

পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদগণের মতে চন্দ্র কক্ষ ক্রান্তি রেখা উত্তরে যে দুই বিন্দুতে সম্মিলিত হইয়াছে সেই দুইটীর যেটী হইতে চন্দ্র উর্দ্ধগ হয় তাহাকে উর্দ্ধগপাত এবং যেবিন্দু হইতে অধোগ হয় তাহাকে অধোগপাত বলা হয়। ভারতবর্ষীয় সিদ্ধান্তবেত্তারা এই উর্দ্ধগ পাতের নাম রাহু এবং অধোগপাতের নাম কেতু নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

জ্যোতির্গণ যেমন জড়পদার্থ বলিয়া গ্রহ ও তারকা নামে অভিহিত হয় রাহু কেতু তেমন জড় পদার্থ নহে; তাহারা আকাশমার্গের নির্ণীত দুইটি চিহ্নমাত্র। গ্রহদিগের সহিত তাহাদের এই মাত্র সাদৃশ্য যে গ্রহের যেরূপ ভিন্ন ২ পরিমিত গতি আছে, নানাকারণে ক্রান্তি ও কক্ষ সকলের অল্প অল্প ব্যতিক্রম বশতঃ ঐ সকল সম্পাত স্থানে সেইরূপ গতি বিশিষ্ট হয়। এই গতিকে পাতগতি বলে। চন্দ্রের দুই পাতস্থানের (অর্থাৎ রাহু কেতুর) যে গতি, তাহা চন্দ্রের এক একবার ভূপ্রদক্ষিণ সময়ে অধিকাংশই প্রাতলয়ণ, অগ্রসরণ তদপেক্ষা অতি অল্প।

"রাশিচক্রে গ্রহ সন্নিবেশ যাহারা লক্ষ্য করিয়াছেন তাহারা জানেন যে কেতু চিরকাল রাহুর সম্মুখে বিপরীত রাশিতে অবস্থান করে এবং উভয়ে ঠিক সমান অংশে (ডিগ্রেতে) সর্ব্বদা অবস্থান করে। সুতরাং উহা পাশ্চাত্য জ্যোতিষের সেই উর্দ্ধগপাত ও অধোগ পাত ভিন্ন আর কিছুই নহে—ইহা স্পষ্টই বুঝাযায়। যাঁহারা গ্রহ সংস্থান সামান্যরূপেও অবগত আছেন তাহারা জানেন, যে রাহু কেতুর গতি সর্ব্বদাই বিপরীত অর্থাৎ অন্যান্য গ্রহ যেদিগে যায়—ইহারা তাহার বিপরীত দিগে গমন করিয়া থাকে। অন্যান্য গ্রহ সময় সময় বক্রী হয়, কিন্তু ইহারা চিরকাল বক্রী। পাশ্চত্য জ্যোতিষেও আমরা পাইতেছি যে উক্ত গতিদ্বয়ের গতি সর্ব্বদাই প্রতিসয়ন সুতরাং উভয় মতে কোন বিরোধ নাই।

উল্লিখিত অংশ পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে ভারতবর্ষীয় সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ এবং পাশ্চাত্য জ্যোতিষে রাহু কেতু সম্বন্ধে নামের পার্থক্য ভিন্ন আর কিছুরই বিরোধ দৃষ্ট হয়না।

এখন দেখা যাউক পুরাণ কি বলেন। পুরাণ বলিতেছেন; রাহু কেতু সিংহিকা নামক কোন রাক্ষসীর পুত্র সে অমৃতের লোভে দেবগণকে ছলনা করিয়া ছিল, চন্দ্র ও সূর্য্য তাহা বিষ্ণুর গোচর করিলে বিষ্ণু সুদর্শন চক্রদ্বারা তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করেন। অমৃত ভক্ষণ করায় রাহু-কেতু অমর হইয়াছেন। সুতরাং দ্বিখণ্ডিত অংশের এক ভাগ মস্তক রাহু, এবং অপর ভাগ কেতু নামে চিরজীবী হইয়া প্রতিহিংসা নিবৃত্তির জন্য মাঝে চন্দ্র ও সূর্য্যকে গ্রাস ও উদ্গিরণ করিতেছে; উহাই গ্রহণ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় রাক্ষস হইয়া ও তাহারা পঞ্জিকা দেখিয়া পূর্ণিমা অমাবস্যা ভিন্ন যখন তখন সে প্রতিশোধ গ্রহণ করেনা। পুরাণেমাত্র নির্দ্দিষ্ট তিথির উল্লেখ দ্বারাই জ্যোতিষের সম্মান রক্ষিত হইয়াছে। সকলেই জানেন চন্দ্র গ্রহণ পূর্ণিমায় এবং সূর্য্যগ্রহণ অমাবস্যায় হয়। পুরাণ এই খানেই ক্ষান্ত হয় নাই। উক্ত রাহু চণ্ডাল জাতীয়, চন্দ্র ও সূর্য্য ব্রাহ্মণ জাতীয়। সুতরাং চণ্ডালের দ্বারা ব্রাহ্মণ আক্রান্ত হওয়ায় সমস্ত হিন্দু সমাজকে অশৌচ পালন করিতে হয়। স্মৃতিশাস্ত্রেও তাহার প্রমাণ আছে যথা:—"সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং সূতকং রাহু দর্শনে। স্নাত্বা কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত শৃতমন্নং বিবর্জ্জয়েৎ। গ্রহণে শাবমাশৌচং বিমুক্তৌ সৌতকং স্মৃতম্। তয়োঃ সম্পাত্ত মাত্রেন উপস্পৃশ্য ক্রিয়া ক্রমঃ॥" সাধারণতঃ অশৌচ হইলে পূর্ব্বপক্ক অন্নাদি সব পরিত্যাগ করিতে হয়। গ্রহণাশৌচেও সেইরূপ অন্নাদি ত্যাগ করিতে হয় এবং গ্রহণের পর স্নান করিলেই অশৌচান্ত হয়।

উল্লিখিত অংশ পাঠ করিলে পুরাণ আমাদের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা আর বেশী করিয়া কিছু বলিতে হইবে না। ব্রাহ্মণ দেবতা চন্দ্র সূর্য্যের এই দৈব দুর্ব্বিপাকে সমস্ত হিন্দু সমাজ বিক্ষুব্ধ ও ক্লিষ্ট হইয়া অত্যন্ত দুঃখিতভাবে করজোড়ে রাহুকে মিনতি করিয়া প্রার্থনা করে—

উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহো ত্যজ্যতাং চন্দ্রসঙ্গমঃ
কর্ম্মচণ্ডাল যোগোত্থং কুরুপাপক্ষয়ং মম।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ, কাব্যরত্ন
জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত।

ময়মনসিংহ লিলিপ্রেসে—শ্রীরামচন্দ্র অ ন্ত কর্তৃক
মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত।

সৌরভ
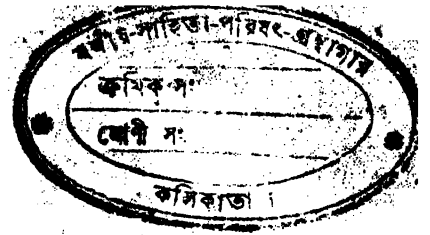
দশম বর্ষ। } ময়মনসিংহ, চৈত্র, ১৩২৮। { ৩য় সংখ্যা।

জগতের উৎপত্তি।

ব্রহ্মাণ্ডের বিরাট নাট্যশালায় যে দিন মানবের প্রথম আবির্ভাব হইল, যে দিন আদিম মানব বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে বিশ্বের অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য প্রথম দর্শন করিল সেই দিন তাহাদের সরল হৃদয়ে যে কি অসীম আনন্দ ও অনির্ব্বচনীয় কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়াছিল তাহা আমরা কল্পনাও করিতে অসমর্থ। পদতলে অতুল শোভা সম্পদ-শালিনী ধরণী; ঊর্দ্ধে দিগন্ত বিস্তৃত নীল নভোমণ্ডল! দশ দিকে অভিনব মাধুর্য্যের উৎস উছলিয়া পড়িতেছে! তাহারা প্রতিদিন বিস্ময় পুলকিত চিত্তে দেখিতে লাগিল "জবাকুসুম সঙ্কাশ" আরক্তিম তপন প্রভাতে পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়া সারাদিন উজ্জ্বল আলোক বিতরণ করে এবং তৎপর ক্ষীণ-রশ্মি হইয়া ধীরে ধীরে অস্তাচলে অদৃশ্য হইয়া যায়। দেখিতে-দেখিতে রজনীর অন্ধকার পৃথিবী সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে! তখন আকাশের চারুচন্দ্রাতপে একটী একটী করিয়া সহস্র সহস্র নক্ষত্রমালা প্রস্ফুটিত হয়। এইরূপ অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য ও অসীম বৈচিত্র্যের মধ্যে আদিম মানব মণ্ডলীর দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে আদিম কালের সরল অধিবাসীদিগের কৌতূহল-উদ্দীপ্ত-হৃদয়ে অত্যাশ্চর্য্য প্রাকৃতিক পদার্থ সম্বন্ধে নানা প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল। এই যে তেজোপুঞ্জ সূর্য্য যাহার উদয়ে জগত আলোকিত হয় এবং যাহার অস্তাচল গমনে পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়, ইহা কি পদার্থ? কোথা হইতে আসিল? এই যে রাত্রিকালে পরিদৃশ্যমান স্নিগ্ধ করোজ্জ্বল চন্দ্রমা ইহা কে নির্ম্মাণ করিল? এই যে নয়নাভিরাম দীপ্তিমান কোটি কোটি নক্ষত্র নিচয়; ইহারা কি? কে উহাদিগকে আকাশে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে? বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নভোমণ্ডল শোভিত জ্যোতিষ্ক সমূহ দর্শন করিয়া জগতের আদিম অধিবাসিগণ হৃদয়ে যে অসামান্য বিস্ময় ও অদম্য কৌতূহল অনুভব করিয়াছিল, তাহাতেই জ্যোতিষ শাস্ত্রের বীজ নিহিত ছিল। তৎকালেই জগতে বিজ্ঞানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তারপর বহু শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে, বহু জাতির অভ্যুদয় ও বিলোপ হইয়াছে। কিন্তু বিশ্বরহস্য উদ্ঘাটনের যে বলবতী আকাঙ্ক্ষায় আদিম অধিবাসিগণ অনুপ্রাণিত হইয়াছিল তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া বিজ্ঞানের ভিত্তি সুবিস্তৃত ও সুদৃঢ় করিয়াছে। আজ যে জ্যোতিষশাস্ত্রের এত উন্নতি তাহা বহু সহস্র বর্ষব্যাপী পর্য্যালোচনা ও বহু শতাব্দীর আবিষ্কারের ফল। ইহার ক্রম বিকাশ বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির গবেষণাপ্রসূত।

ভূস্তর নিহিত কঙ্কালরাশি প্রত্যক্ষ ও পর্য্যালোচনা করিয়া প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ যেমন জীব জগতের ক্রম বিকাশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সেই রূপ কোন জাতির সাহিত্যের স্তরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবরাশি সংগ্রহ করিয়া মোটামুটি চিন্তার অভিব্যক্তির একটী ধারা নির্ণয় করা যাইতে পারে। কোন্ বিষয়ে কোন জাতি কিরূপ আলোচনা করিয়াছেন, কোন্ দেশে কোন্ সমস্যার কিরূপ সমাধান হইয়াছিল তাহা প্রাচীন সাহিত্য পাঠে অবগত হওয়া যায়। চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র শোভিত বিরাট বিশ্বের

উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন সভ্যজাতির মনীষিগণ কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন আমরা সেই সকল জাতির সাহিত্যে তাহার অল্পাধিক আভাস প্রাপ্ত হই। ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণ জগতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছিলেন, প্রাচীন গ্রন্থে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। সেই আলোচনার ফলে আর্য্য মনীষিগণ এই জটিল বিষয়ে বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন বিচার করিয়া দেখিলে নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্য তাহা সম্পূর্ণ রূপে সমর্থন করিবে।

বিজ্ঞানের মধ্যে জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা সকল দেশেই সর্ব্বাগ্রে আরম্ভ হইয়াছিল। কারণ সৃষ্ট পদার্থ সকলের মধ্যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সকলই আদিম অধিবাসীদিগের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এই জন্য ভারতবর্ষ চাল্‌ডিয়া, মিসর, গ্রীস, আরব ও চীন এই কয়েকটী প্রাচীন সভ্য জাতির ইতিহাসে জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ বলেন চাল্‌ডিয়ার আকাশ মেঘ নির্ম্মুক্ত ও নির্ম্মল এবং তথায় বহু সংখ্যক সুবিস্তৃত সমতল প্রান্তর অবস্থিত বলিয়া চাল্‌ডিয়ার অধিবাসীগণ অতি প্রাচীন কালেই জ্যোতিষ্ক সকলের গতিবিধি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছিল। তাহারই ফলে জ্যোতিষ শাস্ত্রের চর্চ্চার সূত্রপাত হয়। চাল্‌ডিয়া হইতে ক্রমে মিসরে, মিসর হইতে গ্রীসে জ্যোতিষ শাস্ত্রের জ্ঞান বিস্তৃত হইয়াছে। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, খৃষ্টের জন্মের প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে চীন দেশে চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের তালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল; ঐ তালিকা দেখিয়া তাহারা গ্রহণের দিন নির্দ্দেশ করিতে পারিত। সেই সময়েই ৩৬৫ দিনে বৎসর গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। প্রাচীন চাল্‌ডিয়া ও মিসরের জ্যোতির্ব্বিদগণ গ্রহণের ও ঋতু পরিবর্ত্তনের কারণ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন এবং কতগুলি নক্ষত্র ও নক্ষত্রমণ্ডলীর গতি বিধি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐসকল বিষয়ের সংস্রব আমাদের এই প্রবন্ধের কোন সম্বন্ধ নাই।

জগতের উৎপত্তি ও ক্রম বিকাশ সম্বন্ধে ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোন প্রাচীন জাতির গ্রন্থে উল্লেখযোগ্য কোন কথা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। চাল্‌ডিয়া, মিসর চীন ও আরব দেশে জগতের উৎপত্তি ও ক্রম বিকাশের যে সকল বৃত্তান্ত প্রচলিত আছে তাহা অসার কল্পনা বলিয়া পণ্ডিতগণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রাচীনকালে গ্রীসদেশে অনেক প্রতিভাবান মনীষীর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারাও এই দুরূহ প্রশ্নের সমাধান করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাহার ফলে বহু সংখ্যক কাল্পনিক গল্পের (Legends) সৃষ্টি হইয়াছিল। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ থেলস (Thales) নামক একজন গ্রীক পাণ্ডিতের গ্রন্থে জগতের ক্রম বিকাশের প্রকৃত তত্ত্ব নিহিত আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে থেল্‌স্‌ই সর্ব্বপ্রথম জগত কারণের আভাস প্রদান করিয়াছেন। থেল্‌স্‌ খৃষ্টের জন্মের ৬০০শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীসদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রচার করেন যে জগতের যাবতীয় পদার্থই এককালে তরল ছিল। সেই তরল অবস্থা হইতে ক্রমে ব্রহ্মাণ্ড বহু বৎসরে বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়াছে। অতঃপর থেল্‌সের এনাক্সিমেণ্ডার (Anaximander) নামক জনৈক শিষ্য প্রাণী জগতের অভিব্যক্তি সম্পর্কে বলেন যে জড় পদার্থ হইতে বহু বিবর্ত্তনের ফলে জীবোৎপত্তি হইয়াছে। তিনি আরও একটী কথা বলিয়াছেন যে মানুষ এককালে মৎস্যরূপে অবস্থিত ছিল। হিরাক্লিটাস (Heracletes) নামক অন্য একজন গ্রীক পণ্ডিত বলিয়াছেন, অগ্নি হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। এই কয়েকটী গ্রীক পণ্ডিত যাহা অনুমান করিয়াছেন তাহাতে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য থাকিলেও এত ক্ষীণ ও এত অস্পষ্ট যে উহার উপর নির্ভর করা যায় না। তথাপি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাদিগের নাম জগতের অভিব্যক্তির ইতিহাসে চির স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতীয় মনীষিগণের নাম তাঁহাদের কোন গ্রন্থে স্থান পায় নাই।

পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহার অতিরিক্ত প্রাচীন পাশ্চত্য সাহিত্যে জগত উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ যোগ্য কথাই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মধ্যযোগে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তে কল্পনার বিকাশ আছে বটে কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক সত্য নাই। ভারতীয় আর্য্য মনীষিগণ জগতের অভিব্যক্তি সম্পর্কে কিরূপ সিদ্ধান্তে

চনা করিয়া ছিলেন এবং তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক দিগের হিসাবে কত দূর সত্য তাহাই এই প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়।

আধ্যাত্মিক তত্ত্বালোচনায় হিন্দু জাতি এক সময়ে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ছিলেন। তাহার প্রমাণ আছে। সাহিত্য ও দর্শনে হিন্দু ঋষিদিগের প্রতিভার কথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ও মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তন করিতেছেন। কিন্তু জড় বিজ্ঞানে হিন্দুর কৃতিত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহার কারণ নির্দ্ধারণ করা কঠিন নহে। যে দেশে আধ্যাত্মিকতার অতিশয় প্রাবল্য সেই দেশে জড় বিজ্ঞানের বিকাশ এক প্রকার অসম্ভব। আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনের জন্য জড় বিজ্ঞানের যতদূর প্রয়োজন ছিল আর্য্য ঋষিগণ ততদূরই অনুশীলন করিয়াছিলেন, ইহার অধিক অগ্রসর হন নাই। বাস্তবিক আধ্যাত্মিকতার গুরু চাপে প্রাচীন ভারতে জড় বিজ্ঞানের বিকাশ হইতে পারে নাই। এই প্রতিকূল কারণ সত্বেও প্রাচীন গ্রন্থের স্থানেং বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভারতীয় পণ্ডিতগণের প্রগাঢ় গবেষণার ক্ষীণ আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে শাস্ত্র জ্ঞানের অভাবে এ সকল তথ্য আমাদিগের নিকট নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ আর্য্যঋষিগণের আবিষ্কৃত নিগূঢ়তত্ত্ব সমূহ বিচিত্র রূপকের কঠিন আবরণে নিবদ্ধ থাকায় তাহা আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট অতিশয় দুরধিগম্য হইয়াছে। এই কারণে প্রাচীন গ্রন্থ সকলে আমরা জড় বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সকল বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হই তাহা অসার কাল্পনিক গল্প বলিয়া প্রত্যাখ্যান করি।

আমাদের শাস্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্ব ও জগতের ক্রম বিকাশ সম্বন্ধে অনেক কথাই অতি বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। বেদ হইতে মনুসংহিতা পর্য্যন্ত, পুরাণ হইতে তন্ত্রশাস্ত্র পর্য্যন্ত প্রায় সকল ধর্ম্ম গ্রন্থের প্রারম্ভেই সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বিবরণ অসার অপ্রাকৃত কাহিনী বলিয়া চির উপেক্ষিত হইতেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে এখনে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার আভাস প্রদান করিয়া এই সিদ্ধান্তের সহিত প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদিগের সিদ্ধান্তের তুলনা করিব। তাহা হইলে পাঠক দেখিতে পাইবেন এই উভয়ের মধ্যে কিরূপ নিকট সাদৃশ্য রহিয়াছে।

আকাশে নীহারিকা (Nebula) নামক জলন্ত বাষ্পময় কতগুলি পদার্থ আছে। ইহারা পৃথিবী হইতে অতিশয় দূরে অবস্থিত। খুব উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ ব্যতীত এই সকল নীহারিকার আকৃতি ও অবয়ব দৃষ্টিগোচর হয় না। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে এই সকল জলন্ত বাষ্পময় নীহারিকা হইতে কোটি কোটি নক্ষত্র ও গ্রহাদি জ্যোতিষ্কের উৎপত্তি হইয়াছে। সর্ব্ব প্রথমে সুবিখ্যাত জর্ম্মাণ পণ্ডিত কাণ্ট (Kant) (জন্ম ১৭২৭ মৃত্যু ১৮০৪) প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে নীহারিকা হইতে জগত উৎপত্তির কথা প্রচার করেন। কাণ্টের এই অত্যাশ্চর্য্য অভিনব মতের উপর তৎকালের বিজ্ঞমণ্ডলী অধিক আস্থা স্থাপন করেন নাই। পরবর্ত্তীকালে অসামান্য ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত লাপ্‌লাস্ (Laplace) কাণ্টের মত অনুমোদন করেন। এবং আকাশস্থ জলন্ত নীহারিকা বাষ্প হইতে সূর্য্য গ্রহাদি জ্যোতিষ্কের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী সুচিন্তিত ও বিজ্ঞানানুমোদিত সিদ্ধান্ত প্রচার করেন। ইহাই জ্যোতিষ শাস্ত্রে নীহারিকা-বাদ (Nebular Theory) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। লাপ্‌লাস যে ভাবে নীহারিকা হইতে উহাদের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা আধুনিক পণ্ডিতগণ সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন নাই বটে কিন্তু এই কথা সকলেই স্বীকার করিয়াছিলেন যে জলন্ত বাষ্পময় নীহারিকা হইতেই নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কের উৎপত্তি হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন আকাশস্থ জলন্ত বাষ্প ক্রমশঃ শীতল ও ঘনীভূত হইয়া তরল পদার্থে পরিণত হইয়াছে। অতঃপর সেই তরল পদার্থ সমূহের ক্রমশঃ সঙ্কুচন ফলে পৃথিব্যাদি কঠি গ্রহ ও উপগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে। ক্রমে ভূপৃষ্ঠ অধিকতর শীতল হইলে তাহাতে উদ্ভিদ্ ও প্রাণীগণের আবির্ভাব হইয়াছে।

আর্য্য ঋষিগণ সৃষ্টি তত্ত্ব সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন তাহাই এখানে আলোচনা করিব। ভারতের বেদ জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। বেদের মন্ত্র কখন প্রণীত হইয়াছিল, তাহা এ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদ মন্ত্র রচনা কাল এখন হইতে ৩৫০০

হাজার বৎসর পূর্ব্বে স্থির করিয়াছেন।* ভারতীয় পণ্ডিতগণ বেদকে অধিকতর প্রাচীন বলিয়া বিবেচনা করেন। যাহা হউক বেদ যখন রচিত হইয়াছিল তখন গ্রীস রোম প্রভৃতি প্রাচীন ইউরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্র সকল মহারণ্যে আবৃত ছিল। মিসর বাবিলন ও এশিরিয়া প্রভৃতি দেশে সভ্যতার আলোক প্রবেশ করে নাই। বেদ জ্যোতিষ শাস্ত্র নহে। সুতরাং জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্পর্কিত কোন তত্ত্ব বেদে আলোচিত হইবার কারন নাই। তবে অন্য প্রসঙ্গ উপলক্ষে জ্যোতিষ শাস্ত্রের অবিকৃত তত্ত্ব বেদের নানা স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদের সরল হৃদয় আর্য্য ঋষিগণের মনে এককালে প্রশ্ন হইয়াছিল—এই সুন্দর জগৎ কোথা হইতে আসিল? এই নদনদী গিরিমালা কে সৃজন করিল? এই পৃথিবী কি কেহ সৃজন করিয়াছে না উহা চিরকাল এই মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে? যদি সৃষ্টি করিয়া থাকে তবে সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থা কিরূপ ছিল? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে গম্ভীর ভাবে ঋগ্বেদের ঋষি বলিতেছেন:—

নাসদাসীৎ নো সদাসীৎ তদানীং
নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্
অম্ভঃ কিমাসীৎ গহনং গভীরম্॥

১ | ১২৯ | ১০ম

সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ এমন কোন বস্তু ছিল না, সৎ কোন বস্তুও ছিল না। এই যে অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র প্রকাশ করিতেছে, তাহাও তখন বর্ত্তমান ছিল না। তদপেক্ষা উন্নত ব্যোমেরও তখন অস্তিত্ব ছিল না। কোথায় কাহার গৃহ ছিল? আর গৃহেরই বা কি প্রয়োজন ছিল? গৃহে বাস করিবে এমন কেহই যখন ছিলনা সুতরাং কাহাকে উহা আচ্ছাদিত করিবে? এমন কি সেই সময়ে গহন ও গভীর সমুদ্র পর্য্যন্তও বিদ্যমান ছিল না।

ন মৃত্যুরাসীৎ অমৃতং ন তর্হি
ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদ বাতং স্বধয়া তদেকং
তস্মাৎ হান্যৎ ন পরঃ কিঞ্চনাস॥

২ | ১২৯ | ১০ম

সৃষ্টির পূর্ব্বে মৃত্যুও ছিল না অমরত্ব (জীবন)ও ছিলনা। তখন রাত্রি ও দিনে কোন পার্থক্য ছিলনা। তৎকালে সেই এক পরমাত্মা বায়ুর সহায়তা ব্যতীত আত্ম শক্তিতে জীবিত ছিলেন। তিনি ভিন্ন অন্য কেহই ছিল না।

তখন "তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে" ৩ | ১২৯ | ১০ম

অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার সমাচ্ছাদিত ছিল। অর্থাৎ চারিদিকে কেবল গভীর অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। আমরা বুঝিতে পারিলাম জগত সৃষ্টির পূর্ব্বে এই যে অগণিত নদনদী গিরিমালা সমাকীর্ণ পৃথিবী, তাহার অস্তিত্ব মাত্রও ছিল না। এই যে প্রখর উজ্জ্বল সূর্য্য এবং জ্যোৎস্না প্রদীপ্ত চন্দ্র—উহারাও তখন ছিল না। কোটি কোটি নক্ষত্রমালাও তখন নভোমণ্ডলে শোভা পাইত না। তরুলতাদি উদ্ভিদ সকল সেই সময়ে জন্মে নাই, কোন জন প্রাণীরই তখন সৃষ্টি হয় নাই। এই জন্য তখন মৃত্যু ও ছিল না; জীবনও ছিল না। সূর্য্যাদি কোন জ্যোতিষ্কই ছিল না তাই তৎকালে দিবা রাত্রির প্রভেদ ছিল না। চারিদিক কেবল সূচীভেদ্য অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল। ছিলেন তখন কেবল আত্মারূপ পরমেশ্বর। তাঁহার জীবন ধারণের জন্য বায়ু অথবা অন্য কোন উপাদানেরই প্রয়োজন ছিল না। সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা যাহা এখানে বর্ণিত হইল কল্পনার সাহায্যে এইরূপ সিদ্ধান্তে আসা অসম্ভব। এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই আর্য্য ঋষিদিগের গভীর গবেষণা প্রসূত জ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভগবান যখন গভীর অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হইয়া মহাশূন্যের মধ্যে বিরাজ করিতে ছিলেন তখন সহসা—

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্তাধি,
মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতোবন্ধুমসতি নিরবিন্দন্
হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা॥ ৪।১২৯।১০ম

* One thing is certain, there is nothing more ancient and primitive not only in India but in the whole Aryan world than the hymns of the Rig Veda—Maxmuller.

প্রথম পরমেশ্বরের মনে এই কাম বা ইচ্ছা হইল যে আমি জগত সৃষ্টি করিব।" পরমেশ্বরকে কেহ প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্টি করিতে দেখে নাই কিন্তু মনীষিগণ স্ব স্ব বুদ্ধিবলে বিচার করিয়া ইহাই জানিতে পারিয়াছেন যে সৃষ্টির কোন উপাদান বিদ্যমান না থাকিলেও (অসতি), (সেতঃ) সৎ বা বিদ্যমান বস্তু সকল সৃষ্টি করিবার জন্য (বন্ধুং, বন্ধমিতুম) তিনি সর্ব্ব প্রথমে রেতঃ অর্থাৎ সকল বস্তুর মূল উপাদান (তন্মাত্র সকল) উৎপাদন করিলেন।

আমরা প্রথমে বুঝিলাম জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। অনাদি কাল হইতে ইহা এইরূপে চলিয়া আসে নাই। আচ্ছা যদি জগত সৃষ্ট হইয়া থাকে তবে নিশ্চয়ই ইহার একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন। সামান্য ঘটপটাদি একজন সৃষ্টিকর্ত্তা ব্যতীত হয় না আর এই গগন বিহারী অগনিত বিরাট জ্যোতিষ্ক রাজির কি সৃষ্টিকর্ত্তা নাই? ঋকবেদের ঋষিগণ বলিতেছেন পরমেশ্বর এই বিশাল জগত সৃষ্টি করিয়াছেন। এখন ভগবানের মনে জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইল। তখন কিছুই ছিলনা কি দিয়া তিনি জগত সৃষ্টি করিবেন। তাই জগতের মূল উপাদান সকল তিনি সৃজন করিলেন।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এ মূল উপাদান কোথা হইতে আসিল তাহা বলিতে অসমর্থ। তাঁহারা মূল উপাদান হইতে কিরূপে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিন্তু মূল উপাদান কোথা হইতে আসিল তাহা নির্দ্ধারণ করা অসাধ্য স্বীকার করিয়াছেন। যাহারা ঈশ্বর বিশ্বাসী তাঁহারা বলেন ভগবান জগতের মূল উপাদান সৃজন করিয়াছেন। আর একশ্রেণীর নিরীশ্বর বাদীরা বলেন প্রকৃতি হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়া বিশিষ্ট নিয়মে উহা চলিতেছে। এক বৃক্ষ আর এক বৃক্ষের ফলে উৎপন্ন সেই বৃক্ষ অন্য বৃক্ষের ফলে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু আদিম বীজ কোথা হইতে আসিল? জগতের আদি জন্মের স্রষ্টা একজনকে স্বীকার করিতেই হইবে। ঋকবেদের ঋষিগণ বলিতেছেন পরমেশ্বর সর্ব্বপ্রথমে অতি সূক্ষ্ম মূল উপাদান (রেতঃ Primordial elemnt) সৃজন করিয়াছিলেন। সেই মূল উপাদান হইতে বিবর্ত্তনের ফলে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। কিরূপে জগতের ক্রমবিকাশ হইল তাহা অতি সংক্ষেপে ঋষিরা বলিয়াছেন :—

তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষাম
অধঃস্বিদাসীৎ উপরিস্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্ মহিমান আসন,
স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃপরস্তাৎ॥ ৫ | ১২৯ | ১০ম—

অনন্তর পূর্ব্বোক্ত রেতঃ বা মূল উপাদান সকল একত্র সম্মিলিত হইয়া জ্যোতিষ্ক রাজির উৎপত্তি হইয়াছিল। তাহারা সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে মহিমান্বিত হইল। উহাদিগের মধ্যে কাহারও রশ্মি সকল চক্রভাবে নানা পার্শ্বে ও উপরেরদিকে এবং অধোদিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। আর পৃথিব্যাদি গ্রহে যে সকল শস্য উৎপন্ন হইল উহারা ভোক্তার অধীনতায় নিম্নে স্থান পাইল। অর্থাৎ খাদ্যের উপর খাদকের প্রাধান্য স্থাপন করিল।

এই স্থানে অতি পরিমিত ভাষায় একটী শ্লোকে মূল উপাদানের সংযোগে জগতের উৎপত্তি হইতে জীবের আবির্ভাব পর্য্যন্ত সকল অবস্থা বিবৃত হইয়াছে। বোধ হয় তৎকালে এই বিবর্ত্তন বাদ সুপরিচিত ছিল তাই এখানে বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয় নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন জলন্ত বাষ্প (Nebula) হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে ঋষিরা তাহা বলেন কৈ? বাষ্প পদার্থের সূক্ষ্ম অবস্থা। কঠিন পদার্থ সকল উত্তপ্ত হইলে তরল হয়। তরল অবস্থা হইতেই বাষ্পের উৎপত্তি। ঋষিরা যে রেতঃ বা মূল উপাদান হইতে জগতের উৎপত্তির কথা বলিয়াছিল তাহা "সূক্ষ্ম পঞ্চভূত" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মনু প্রভৃতি সংহিতা কার এবং পুরাণকারগণ তাহার অনেক বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। আচ্ছা বুঝিলাম মূল উপাদান বাষ্পময় ছিল কিন্তু উহা যে জলন্ত ছিল, তাহা ত উল্লিখিত হয় নাই। পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোকে উক্ত হইয়াছে মূল উপাদান হইতে যখন গ্রহাদির উৎপত্তি হইয়াছিল তখন উহাদের জ্যোতিঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। সুতরাং মূল উপাদান যে জলন্ত ছিল তাহা বুঝা যাইতেছে।

আর একটী শ্লোকে আরও পরিষ্কার ভাবে এই কথাটী উক্ত হইয়াছে :—

"মূর্দ্ধাদিবো নাভি রগ্নিঃ পৃথিব্যা।" ১ | ৫৯ | ২য়—
অগ্নিই আকাশস্থ জ্যোতিষ্ক সকলের আদি কারণ

(মূর্দ্ধা-শিরবৎ প্রধান ভূতো ভবতি,—সায়ণ) এবং অগ্নিই পৃথিবীর উৎপত্তি স্থান (নাভি) এখন আর সন্দেহের কোন কারণ থাকিতে পারে না। আদিতে জলন্ত বাষ্প (Nebula) হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং কালক্রমে নানা বিবর্ত্তনের ফলে সূর্য্য চন্দ্র এবং গ্রহ নক্ষত্রাদি বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়াছে। কিরূপ পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া জ্যোতিষ্ক সকল বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়াছে তাহাও ঋষিগণ বিবৃত করিয়াছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের সহিত তাঁহাদের মতের অসাধারণ ঐক্য রহিয়াছে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

স্নেহের দান।

(৪)

সন্ধ্যার পর মাখন তাহাদের নিজ ঘরে বসিয়া একটা কাগজে তাহার নিজ কল্পনাকে নানা রকমে বিচিত্র করিয়া একটা গোলকধাম খেলার ছক আঁকিতেছিল। মধু আসিয়া তাহাকে বলিল "চল না মাখন দা, ও'বাজ গোলক ধাম খেলি, কাল পরশু তো স্কুল বন্ধই আছে!"

মাখন তাহার সেই বিস্তৃত কাগজের উপর লালকালিতে রুল টানিতে টানিতে বলিল—"ছক প্রস্তুত করিয়া নেই তারপর খেলিব। দেখ্ দেখি কেমন অরিজিনেল আমার কল্পনা। আজ রাত্রিতেই শেষ হইবে—যত রাত হয়..."

মধু সাগ্রহে মাটিতে পাতা ধারি ও পাটীর বিছানায় বসিয়া বলিল—দেখি কেমন, কি করিতেছ?"

মাখন—"এখনও করি নাই, মাত্র লাইন টানিয়া ঘর করিয়া রুল আঁকিতেছি, তারপর অক্ষর বসাইব।"

মধু বলিল—"তোমার মুখস্থ আছে কি? বসো আমি নিয়া আসি দীনেশ দার ছকটা।"

মধু উঠিতেছিল মাখন বলিল—"না ওটা আনিবার কোন প্রয়োজন নাই। দীনেশের সহিত আমি আর খেলিব না, তাই নিজেই ছক করিতেছি। আমার প্লেন দীনেশের ছকের অনুকরণে নহে। আমি নিজের কল্পনায় এ ছক প্রস্তুত করি। দেখিবে কাল, খুব অরিজিনেল হইবে। আজ রাতই শেষ করিয়া তবে শুইব।"

মধু মাখনের অবসর নাই দেখিয়া কুসুমকে ডাকিল কুসুম তখন মাছ কাটিতেছিল; দীনেশ তখনও আইসে নাই। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া মধু পুঁঠিকে লইয়াই খেলিতে প্রবৃত্ত হইল।

মধু ও পুঁঠি খেলিতে আরম্ভ করিবার কিছু পরেই চুপচাপ করিয়া দীনেশও আসিয়া উপস্থিত হইল। লজ্জায় অথবা ভয়ে—যে কারণেই হউক দীনেশ আজ চুপ করিয়া ঘরে আসিয়া নীরবে মধু ও পুঁঠির সহিত খেলায় বসিয়া গেল।

মাছ কাটিয়া, মাছ ধুইয়া, মসল্লা পিসিয়া, পিসিমার রান্নার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিয়া দিয়া কুসুম ঠাকুর মার ঘরে আসিল। ঠাকুরমার সন্ধ্যার স্নান করিয়া তাঁহার প্রয়োজনীয় মালার পেটিকা ইত্যাদি সে পূর্ব্বেই যথাস্থানে রাখিয়া গিয়াছিল। ঠাকুর মা তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া মালা জপিতেছিলেন; কুসুম ধীরে ধীরে আসিয়া পুঁঠির পার্শ্বে বসিল।

মাখনদা খেলোয়ারের দলে নাই দেখিয়া কুসুমের খেলার দিকে ঝুঁক ছিল না। সে চুপ করিয়া বসিয়া পুঁঠির খেলা দেখিতেছিল। কুসুমকে দেখিয়া মধু বলিল—পুঁঠি তুই উঠ, কুসু খেলিবে; আয় কুসু।"

পুঁঠি কাঁদ কাঁদ গলায় বলিল—আমিও খেলিব, দিদিও খেলিবে—হেঁ "দাদা—"

কুসুম বলিল—"আমি খেলিব না।

দীনেশের পক্ষে এতক্ষণ চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব, সে গর্জ্জিয়া উঠিয়া ভেংচি দিয়া বলিল—তাই তাঁর মাখনদা না হইলে খেলিবে না! রতন যুড়া! হারামজাদী ছেমরী ন্যাকেকো।"

দীনেশের কথায় কুসুম মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিল। এরূপ সম্ভাষণ দীনেশের নিকট হইতে কুসুম ও ঠাকুর মা পূর্ব্বে প্রতিনিয়ত পাইতেন, এখানে আসিয়া মাত্র কমিয়াছে মাত্র। সুতরাং সেরূপ বিজাতীয় সম্ভাষণে ঠাকুর মা বা কুসুমের বিশেষ কোন ভাবান্তর লক্ষিত হইল না; কুসুম লজ্জায় মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিল মাত্র।

মধুর ঘৃণা হইল, সে বলিল—"ছি দীনেশ দা, তুমি বড় ইতরের মত বক! আপনার মার পেটের বোনকে কি

হারামজাদী বলিতে আছে ?"

দীনেশ সেইরূপ মোটা গলাতেই বলিল—দেখলি না টুপিড্ তামাসা। উনি 'লভে' পড়িয়াছেন; মাখন দা না হইলে ওর নাচ্ হইবে না ..."

মধু উত্তেজিত ভাবে বলিল—কুসুম কি তা বলিয়াছে যে সে মাখন দা না হইলে খেলিবে না ? তুমি এরূপ ইতরামী করিলে আমিও তোমার সঙ্গে খেলিব না।

এই কথা বলিয়াই মধু কড়িগুলি হাত হইতে ফেলিয়া দিয়া ফিরিয়া বসিল।

দীনেশ চটিয়া গিয়া পেষ্টবোর্ডে আটা খেলার ছকটা খপ্ করিয়া টানিয়া লইয়া বলিল—"যা হারামজাদা, তুই না খেলিলে আমার ঘণ্টা হইবে। সে আবার আমাকে বলে ইতর! সালগ্রাম চাবাইয়া খাইলাম, এখন তিনি—কোথাকার—কে ?"

"চল যাই—এই ইতরের সঙ্গ, ভদ্রলোকের মেয়েছেলেদের অনুপযুক্ত।" বলিয়া মধু উঠিয়া পুঁটি ও কুসুমকে দুই হাতে টানিয়া লইয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়িল।

রান্নাঘর খানা উত্তরের ভিটার ও পূর্ব্ব ভিটার ঘরের মাঝখানে স্থিত। দীনেশের কথাগুলি সে ঘর হইতে বেশ স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল, সুতরাং বড়বউ বাদানুবাদের প্রথম হইতেই কাণ পাতিয়া নিজ পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা বার্ত্তা শুনিতেছিলেন। তিনি সে ঘর হইতে মধুকে ডাকিতেছিলেন। গোলমালে মধু তাহা শুনিতে পায় নাই। এদিকে মালা জপে বসিয়া জয়মণিও সকল কথা শুনিতেছিলেন। তিনি কিন্তু চিরাচরিত প্রথার বশবর্ত্তিনী হইয়া কিছুই বলিতেছিলেন না।

রামকানাই যখন বাহেরবাড়ী হইতে উঠিয়া ভিতরের উঠানের মধ্যখানে আসিয়াছেন—এই সময় দীনেশের কর্কশ কণ্ঠ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল।

দীনেশের সেই উৎকট অভিনয়ের পর তাহার সহিত আর বাড়ীর কর্ত্তাপক্ষের কাহারও সাক্ষাৎ হয় নাই। দীনেশের উচ্চ কণ্ঠের সম্ভাষণ শুনিয়া রামকানাই ডাকিলেন—দীনু আর দেখি, এদিকে। তুই কি ভদ্রলোকের ছেলে না ? পাজি..."

দীনেশ ঘর হইতেই বলিল—"মধু আমার ছোট ভাই হইয়া আমাকে যা মুখে আসে তাই বলিয়া গাল দিল, আর দোষের বেলা বুঝি—সব দোষ আমার ?

রামকানাই তাঁহার কোন ছেলেপেলেকেই কিছু বলেন না। এইজন্য তার ছেলেপেলে যে বড়ই উশৃঙ্খল স্বভাবের হইয়াছিল, তাহা নয়। লেখা পড়ায় তেমন ভাল না হইলেও তাহাদের চরিত্র পিতার এবং খুল্লতাতের ন্যায় সৎ স্বভাবান্বিত ছিল। দীনেশকেও তিনি কোন দিন কিছু বলেন নাই। কিন্তু আজকার ঘটনায় দীনেশের উপর তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। হঠাৎ বিরক্ত হইয়া মূর্খকে শাসন করিলে যে তাহা হইতে কোন দিনই সুফল উৎপন্ন হয় না তাহা তিনি বেশ জানিতেন; সেজন্যই শান্ত ভাবে দীনেশকে ডাকিয়া—মাখনও দীনেশের ভিতর ঠিক কোন জায়গায় বিরোধী ভাব সঞ্চিত হইয়া তাহাতে গলদ বাঁধিয়াছে তাহা আবিষ্কার করিয়া তাহাতেই ঔষধ সেক করিবেন চিন্তা করিয়াছিলেন। এখন উপস্থিত ঘটনায় সে ব্যবস্থার গোলমাল হইয়া গেল।

দীনেশের উত্তর শুনিয়া তিনি বলিলেন—আমি তার বিচার করিব; তুমি এ ঘরে আইস।"

রামকানাই নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। কুসুম ও পুঁটিকে লইয়া মধু তখনও বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। তাহারাও মাখনদের ঘরে চলিয়া গেল।

দীনেশ দ্বিপ্রহরের ঘটনায় ও উপস্থিত ঘটনায় জবাব চিন্তা করিতেছিল। মধুও এখন শত্রু হইয়া পড়িল বুঝিয়া দীনেশ উপায় হীন হইয়া ঠাকুরমাকে বলিল—"দেখ ঠাকুমা, এই যে মাখনা ছোকরা অত্যন্ত বদমাইস; তোমরা লক্ষ্য কর না, কিন্তু আমার চক্ষে কিছুই অগোচর থাকে না। ও ছোক্‌রা কিন্তু কুসুকে নষ্ট করিল। আমি সব কথা এখন খুলিয়া বলিব, তুমি সঙ্গে আইস—মোটকথা আমাদের আর এই সংশ্রবে থাকা হইবে না। শাস্ত্রে আছে স্বগৃহে নিধনঃশ্রেয়, পরগৃহ ভয়াবহ।"

জয়মণির চক্ষে ইতিমধ্যেই জলধারা দেখা দিয়াছিল। দীনুর কথায় তাহা উপচাইয়া পড়িল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—গঙ্গা তোর এমন ইচ্ছা তা আগে বলিলেই তো হইত; আমার কি আর স্থান ছিল না, না ভাত ছিল না। জামাইর হাতে লাঞ্ছনা অপমান। আমার

নদীর রাজসংসার ছারেখারে গিয়াছে। আমার নদীরে গরম অম্বলে দধি করিতো রে গঙ্গা—আর তারে লইয়া আমি আজ দোয়ারে দোয়ারে কাঙ্গাল...

গঙ্গামণি দীনেশকে দিয়া ক্ষমা চাওয়াইবেন স্থির করিয়াছিলেন। সেজন্য যখন বলরাম ভট্টাচার্য্য দীনেশকে ডাকিয়াছিলেন সেই সময় তাড়াতাড়ি আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়াছিলেন; এখন বৃদ্ধা মায়ের অভিমানের কান্না শুনিয়া বিষম বিভ্রাট গণিলেন।

এ ক্ষেত্রে তাঁহার ত্রিশঙ্কট। এদিকে মাতা ও ভাইপো ওদিকে দেবুর ও দেবর পো তিনি মাতাকে থামাইতে গিয়া বলিলেন—"তুমিও কি পাগল হইলে মা, এই নির্ব্বোধের কথায় নিজের হিতাহিত চিন্তা কর না। তুমিই তো মুখ দিয়া ছেলেটার পরকালটা নষ্ট করিলে। ওকে একাই যাইতে দেও; গিয়া কিজন্য স্কুল হইতে আসিয়া এরূপ করিয়াছিল তাহার কিছু বলিবার থাকিলে বলিবে, না থাকিলে ত্রুটী স্বীকার করিয়া আসুক। তুমি কি আমার পর যে তোমাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিব। দেখিলে তোমার নদী কেমন তোমার মুখ রাখিল। এরূপ করিয়া কি মূর্খকে নাই দিতে আছে?"

অতঃপর তিনি দীনেশকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—চিৎ হইয়া থুথু ফেলিলে নিজের বুকের উপরই পড়ে। য সেই ঘরে একা যা; একা গিয়া যা বলিতে হয় বল, কুলাঙ্গার।"

দীনেশ পিসীমার কথা শুনিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"আমি কুলাঙ্গার, আর তোমার মধু মাখন কুলরত্ন না? বুঝবে যখন জাতি যায়, মুখে চুণ কালি পড়ে! আচ্ছা আমি যাই দেখি কি হয়।"

বলিয়া দীনেশ হন্ হন করিয়া চলিয়া গেল। পিসীমা পাছে পাছে গেলেন।

মাখন ততক্ষণে মধুর নিকট শুনিয়াছিল স্কুলের ঘটনার বিচার হইবে বলিয়া দীনেশকে উত্তরের ঘরে ডাকা হইয়াছে। সে এতক্ষণ দরজা বন্ধ করিয়া তাহার নিজের কল্পনার বিভোর ছিল; তাহাদের কোন কথাই তাহার কর্ণে যায় নাই।

এইবার মধু সকল বলিয়া যখন বলিল—চল, মাখন দা শুনি গিয়া দীনেশ দা কি Explanationটা দেয়—তখন মাখন তাহার কাগজপত্র জড় করিয়া কুসুমের জিম্মায় রাখিয়া তাহাকে বসিতে অনুরোধ করিয়া মধুর আগে দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল—জেঠা মহাশয়, দীনেশদার বিরুদ্ধে আমার কিন্তু কোন নালিশ নাই।"

রামকানাই হাসিয়া বলিল—"বেশ! কিন্তু কেন দীনেশ মাখনের বিরুদ্ধে আসিয়া এরূপ বলিল এবং স্কুলেই বা কি ঘটনা হইয়াছিল, সে সকল কথা আমি তাহার নিজের মুখ হইতে শুনিতে চাই। তাই তার প্রায়শ্চিত্ত।"

দীনেশ বলিল—"মাখনই আমার বিরুদ্ধে মাষ্টারের কাছে নানা কথা বলিয়া তাহার কাণভার করিয়া দিয়া আমাকে আজ মার খাওয়াইয়াছে। আর ছেলেদের ডাকিয়া আনিয়া তামসা দেখাইয়াছে।

রামকানাই—"কেমন মাখন, একথা কি ঠিক?"

মাখন বলিল—"আজ্ঞা জেঠা মহাশয় ওর চীৎকারেই ছাত্র জমিয়াছিল, মধুও গিয়াছিল—তাকেই জিজ্ঞাসা করুন না!"

মাখনকে ডাকিয়া হেড্ মাষ্টার যাহা যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, সে সমস্ত কথা, মধু সম্মুখে দাঁড়াইয়া শুনিয়াছিল। মধু একটী একটী করিয়া এইবার তাহার পিতার নিকট বলিল। "স্তন্যপায়ী" শব্দের অর্থটীও সে বাদ রাখিল না।

শুনিয়া দীনেশ চীৎকার করিয়া বলিল—'চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা। আপনারা দেখিতেছেন না পিসা মহাশয়, এই মধুর পরামর্শে মাখনা কুসুমের সর্ব্বনাশ করিতেছে,—জাত গেলে, মুখে চুণ কালি পড়িলে তবে বুঝিবেন আমি কি জন্য মাখনার শত্রু। তখন বুঝিবেন "অকপাম যদা লক্ষ্মী নারিকেল ফলাম্বুবৎ ঠিক কিনা।"

মাখনের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। সে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িল। তাহার চক্ষের সম্মুখে যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ উড়িতেছিল। মাথা যেন ঘুরিতেছিল। মাখন বয়সে ছোট হইলেও সে দেহে বলিষ্ঠ পালোয়ান। দীনেশ তাহার এক হাতের ভর সহিতে না। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, টানিয়া ধরিয়া দীনেশের জিহ্বাটা ছিঁড়িয়া ফেলে। কিন্তু তাহাতে কি এ উচ্চারিত কলঙ্ক কথার উচ্ছেদ হইবে?
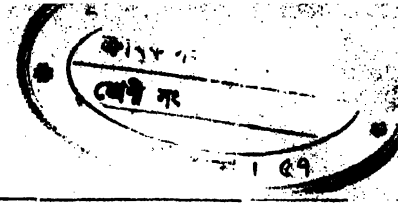
মাখনের অবস্থা বুঝিয়া মধু বলিল—"ছি-ছি-দীনেশ দা, তুমি ভদ্রলোকের সংসর্গ করিবার একেবারে অযোগ্য। তোমার অপেক্ষা কি কুসুম আমার কম আপন? তুমি এ কি বলিলে? লোকে শুনিলে কি বলিবে?"

দীনেশের এই উক্তি যে আত্মরক্ষার মিথ্যা ছলনা তাহা রামকানাই বেশ্ বুঝিয়াছিলেন; এই হতভাগাকে এই কথা লইয়া শাসন করিলে যে এই কথার রটনাতেই সাহায্য হইবে, তাহাও তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাই তিনি মধুকে ধমক দিয়া বলিলেন—"তোমরা এখানে আসিলে কেন? তোমরা দুজনকে তো আমি এখানে ডাকি নাই।"

মধু পিতার কথা শুনিয়া মাখনের হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। মাখনও যেন একটা সুগভীর মূর্চ্ছার ভিতর হইতে হটাৎ জাগ্রত হইয়া উঠিয়া তারপরেই পুনরায় অচেতন হইয়া পড়িল।

তাহার ঘরে যাইয়া সে যে শয্যায় শুইল, তারপর যেন আর তাহার কোন বিষয়ে চৈতন্য রহিল না।

জেঠা মহাশয়ের আদেশ, উপদেশ, জেঠাইমার অনুরোধ কিছুই তাহার অবশ অচেতন হৃদয়কে সচেতন ও সন্তুষ্ট করিতে পারিল না। কুসুম এঘটনার কিছুই জানিত না। সুতরাং পিসিমার সঙ্গে সেও আসিয়া কত অনুনয় বিনয় করিল; কিছুতেই কিছু হইল না। সেই ধিক্কারের আঘাত তাহাকে তাহার লজ্জার পরিবেষ্টনের ভিতর এমনতর গুম্ করিয়া রাখিয়াছিল যে কিছুতেই আর কেহ তাহাকে তাহা হইতে বাহির করিতে সমর্থ হইল না।

নারীর আদর।

জগতের মাঝে আছে কোন্ জাতি
আমাদের চেয়ে ধন্য?
মোরা যা' ক'রেছি আমাদের দেবী—
গৃহিনীগণের জন্য!
হিয়ার মাঝারে পুরিয়া রাখিতে—
পারিলে মিটিত শোকটা!
কিন্তু সেথায় ধরে না যে হায়
অত বড় গোটা লোকটা!
প্রাচীরে ঘেরিয়া, বাঁচিয়ে আমরা,
তবু জাগে সদা বক্ষে;
গ্রহ তারাগুলি যদি কোনো দিন
চাহে কলুসিত চক্ষে!
আলোকে বাতাসে গ'লে যদি যায়?
সদা জাগে মনে ধন্দ!
তাই মড়্‌দা রংএর পর্দ্দায় করি
দরজা জানালা বন্ধ!
প্রকৃতির শোভা হেরিতে চাহিলে,
রাখিনা তা'দেরে শুস্থ;
সুধু চিকের আড়ালে ফিকে করে দেই
আকাশের শশী-সূর্য্য!
ঘরের বাহির করিবার কালে
বেঁধে যায় বড় গোল টা;
তাইত' দিয়েছি আগাগোড়া ঢাকা
বোড়্কা রূপিণী খোলটা!

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

অদ্বৈত বেদান্ত বনাম ধীরেন্দ্রনাথ।*

শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ মহোদয় মহা বীর বেশে 'নারায়ণের' পুণ্যক্ষেত্রে ভীষণ সমরানল প্রজ্জলিত করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই হুতাশনে শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্ত এবং তার সমর্থনকারিগণকে সবংশে আহুতি দিয়া ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করিয়া নিজের জন্য স্বর্গদ্বার অনর্গল করেন। আমি ক্ষত্রিয় নই, অস্ত্রব্যবসায় (সে অস্ত্র লেখনীই হউক, জিহ্বাগ্র হউক, কিম্বা Machine gun হউক) আমার ব্যবসায় নয়। তথাপি যুদ্ধে আহুত হইয়া তাহাতে

---

* এই প্রতিবাদ প্রবন্ধটি "নারায়ণ" পত্রেই প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এই প্রবন্ধে আমার বক্তব্য সম্যকরূপে বুঝিতে হইলে গত ভাদ্রের 'নারায়ণে' প্রকাশিত আমার "শঙ্করের দর্শন কি স্ববিরোধি" এবং কার্ত্তিকের নারায়ণে ধীরেন্দ্র বাবুর প্রতিবাদ প্রবন্ধটিও এই সঙ্গে পাঠ করিবার জন্য পাঠককে অনুরোধ করি।—লেখক।

বিমুখ হইবার কাপুরুষতাইবা কিরূপে স্বীকার করিয়া লই? অতএব এই 'যদৃচ্ছয়াচোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতং' যুদ্ধকে অনিচ্ছায়ই বরণ করিয়া লই। যেহেতু মহারথীদের হাতে পরাজয়ও কম গৌরবের বিষয় নহে।

শাঙ্কর দর্শনের বিরুদ্ধে ধীরেন্দ্র বাবুর মন্তব্যাদির অমূলকতা প্রদর্শন করিবার জন্য গত ভাদ্রের 'নারায়ণে' আমি যে সকল যুক্তি প্রমাণ দিয়াছিলাম তাহাতে নাকি ধীরেন্দ্র বাবুর কথাই সমর্থিত হইয়াছে। তাই তিনি "মায়াবাদ ও অদ্বৈত তত্ত্ব" নামক প্রবন্ধের গোড়াতেই নিজেকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। কিন্তু পাঠককে বলিয়াদিতে হইবে না যে তার্কিকেরা,--যাঁহারা শুধু তর্কের আনন্দটুকুর জন্যই তর্ক করেন, তত্ত্ব নির্দ্ধারণের জন্য নহে,—আজ পর্য্যন্ত কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট পরাজয় স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা প্রতিপক্ষের যুক্তি প্রমাণে চিরদিনই স্বপক্ষের সমর্থন লাভ করিয়া থাকেন। কারণ, 'হেত্বাভাস' 'ছল' 'জল্প' প্রভৃতি ন্যায়শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মাস্ত্রগুলির প্রয়োগে তাঁহারা সিদ্ধহস্ত। তাই নিরীহ শ্রোতা বা পাঠকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার সাহসের তাহাদের অন্ত নাই। ধীরেন্দ্র বাবুর নজীর অনুসরণ করিয়া আমিও বলিতে পারি যে তাঁহার ('নারায়ণে' প্রকাশিত) সমগ্র প্রবন্ধটিতে তাঁর নিজের স্বরূপের যে সুস্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছে তাহাতেই তাঁহার অদ্বৈত-তত্ত্বখণ্ডনের প্রয়াসকে খণ্ডিত করিয়াছে। কারণ, ঐ স্বরূপ-চিত্রে ধীরেন্দ্রনাথকে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞানের আধার রূপে দেখিতে পাই—ঐ সকলের বিন্দু-বিসর্গও আর কাহারও জন্য অবশিষ্ট আছে বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ মানুষের অহং-এর এরূপ সর্ব্বগ্রাসকারিণী মূর্ত্তি পাপনেত্রে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছি। বেদান্তবর্ণিত স্বারাজ্যসিদ্ধি আর কাহাকে বলে! যাহাদের এ বিষয়ে সংশয়মাত্র জন্মিবে তাহাদের জন্য ধীরেন্দ্র বাবু "abnormal Psychology-ওয়ালাদের" পরীক্ষাগার (Observatory) ব্যবস্থা করিবেন। অতএব সাবধান!

ইংরাজী Logic (ন্যায়) শাস্ত্রের অধ্যাপক ধীরেন্দ্র বাবু তাহে পড়িয়া ইংরাজী পড়ার সমর্থন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন "ইংরাজীপড়ো হইলেই যে শ্রদ্ধাহীন হইতে হয়, তিনি (অর্থাৎ এ দীন লেখক) নিজেই সেকথার প্রতিবাদ"।— ইংরাজী পড়িলেই শ্রদ্ধাহীন হয় একথা কে বলিল? আমাদের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের স্থান অতি নগণ্য এবং তজ্জন্য এ শাস্ত্রে আমাদের বিদ্যার দৌড়ও সেই পরিমাণ। এ জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলাম। আর উক্ত কারণে (জাতীয় সাধনার উপর আমাদের প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায়) ইংরাজীপড়া তার অভীপ্সিত সুফলটুকু না দিয়া আমাদের পক্ষে পাশ্চাত্য জড়বাদের বাহনস্বরূপ মাত্র হইয়াছে। এই কথাটাই প্রসঙ্গত আমি বলিয়াছিলাম। ধীরেন্দ্র বাবুর "বিলাত আপীলের" খোটার ভয় সত্ত্বেও পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিই, এই সেদিন Lord Ronald shay কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শনের এই অস্বাভাবিক অনাদর একটা Profound anomaly বলিয়া সেনেট্ সভায় সমাগত ইংরাজীপড়োদের মুখের উপর কশাঘাত করিলেন। এই ঘটনা ধীরেন্দ্র বাবু ভুলিয়া থাকিবেন। দায়ে পড়িলে অথবা জেদের বশে অনেক স্থলেই স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হইয়া যায়। যাহাহউক, পাঠক দেখিলেন রণক্ষেত্রের প্রবেশপথেই আমাদের ক্ষত্রবীরও Ignoratio Elanchi নামক ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া ধর্ম্ম-যুদ্ধ-নীতির পরিচয় দিলেন। উক্ত হেত্বাভাসের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত পাই ধীরেন্দ্র বাবু যখন অদ্বৈতবাদ ছাড়া ভারতবর্ষে আরও দার্শনিকবাদ প্রচলিত ছিল ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য চৈতন্য চরিতামৃত হইতে গাঁদা গাঁদা বাক্য উদ্ধার করিতে প্রাণান্ত প্রয়াস পাইয়াছেন। দার্শনিক তত্ত্বের জন্মভূমি ভারতবর্ষে বহুবিচিত্র দার্শনিক মতবাদ প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে এই সর্ব্বজনবিদিত কথাটা কে অস্বীকার করিয়াছে যে তাহা সপ্রমাণ করা এত আবশ্যক হইয়া পড়িল? তবে ধীরেন্দ্র বাবুর পক্ষ হইতে স্বীকৃত ও সুবিজ্ঞাত বিষয়কে প্রমাণিত করিবার বিশিষ্ট সার্থকতা আছে। যথা—

আচার্য্যের দোষ নহি ঈশ্বর আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥

[চৈঃ চঃ]

ইংরাজী ন্যায়শাস্ত্রের অনুরাগী ধীরেন্দ্রনাথ, যিনি authority বা আপ্ত বাক্যকে প্রামাণের মধ্যে গণ্য করেন না, চৈতন্যদেবের উক্ত বাক্যটি উদ্ধার করিয়া কেন Argumentum ad verecundiam নামক হেত্বাভাসের পাপ অর্জ্জন করিলেন জানেন? উদ্ধৃত বাক্যের নিম্নরেখ শব্দ গুলি হইতে এ প্রশ্নের সদুত্তর পাইবেন। কারণ, ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে (১) শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত দর্শন "নাস্তিক শাস্ত্র" এবং (২) তাহা কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর ধীরেন্দ্রবাবুও প্রবাসীতে প্রকাশিত প্রবন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে শঙ্করের অদ্বৈততত্ত্ব এক কল্পিত (abstract) একত্ব। এখন তিনিও চৈতন্যদেবের সঙ্গে সুর মিশাইয়া নূতন করিয়া বলিলেন—"প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া মায়াবাদের যে নিন্দাও। ভিত্তিহীন নহে (নারায়ণ ১৩২৮ বাং ১১৯৮ পৃঃ)। কিন্তু পাঠক লক্ষ্য করিবেন অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই অর্থাৎ ১১৯৩ পৃষ্ঠায় ধীরেন্দ্র বাবু শুভক্ষণে অকস্মাৎ বলিয়া ফেলিয়াছেন—"আচার্য্য শঙ্কর আসিয়াছিলেন বৌদ্ধনাস্তিকতা দলনের জন্য"। অর্থাৎ শঙ্করের দার্শনিক মত স্বরূপতঃ বৌদ্ধ শূন্যবাদ হইতে অভিন্ন, আবার তাহা দ্বারাই শঙ্কর বৌদ্ধ-নাস্তিকতা দলন করিয়াছেন। "বিরুদ্ধ হেত্বাভাসের" এরূপ সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত কোন দার্শনিকের লেখনীমুখে আর কখনও বাহির হইয়াছে কি? তবে এই অভূতপূর্ব্ব যুক্তিজালের মূলে যে Psychology (ধীরেন্দ্র বাবু নিশ্চিন্ত থাকুন, Psychopathology বলিব না) রহিয়াছে তার সন্ধান পাইতে বেশীদূর গিয়া হয়রান হইতে হইবে না। যে শঙ্করকে ধীরেন্দ্র বাবু গত ফাল্গুনের 'প্রবাসীর' পৃষ্ঠায় শ্লেষ, বিদ্রূপ ও অবজ্ঞার প্রখর বাণে বিদ্ধ করিয়া আচার্য্যের আসন হইতে বিচ্যুত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, যে শঙ্করের দর্শন আধুনিক আলোকপ্রাপ্ত ধীরেন্দ্রবাবুর চক্ষে 'মায়াফল ভক্ষণজনিত সদ্‌ভ্রমির' ফল মাত্র, সেই শঙ্করই আজ সেই ধীরেন্দ্রবাবুর মতে "পূজ্যপাদ, আচার্য্য" আখ্যা পাইবার যোগ্য হইয়াছেন। সেই শঙ্করই আবার ধীরেন্দ্র বাবুর মতে "প্রাচীনকালের যাঁহাদের স্মৃতি মানুষ ধরিয়া রাখিয়াছে" এবং যাঁহারা "বিশেষ কার্য্যের জন্য আসিয়াছিলেন" তাঁহাদের মধ্যে একজন! What a tremendous contradiction is man! প্রাকৃতজনের মধ্যে এই বিরাট্ স্ববিরোধিতা আছে বলিয়াই শঙ্কর বলেন এ জগৎটা মায়ার খেলা এবং এই মায়া সদসৎ দ্বারা অনির্ব্বাচ্য।

মোট কথা—"নিরপেক্ষঃ ভায় পিয়াইবে বিষ তারে বিষ পাত্র যায়।" কর্ম্মের ফল কে খণ্ডাবে? তাই ধীরেন্দ্র বাবু শঙ্করের বিরুদ্ধে যে হলাহল উদ্গীরণ করিয়াছিলেন তাহার প্রতিক্রিয়া কতকাংশে তাঁর নিজের মধ্যে আরম্ভ হইয়াছে। তাই আজ তিনি 'আচার্য্য শঙ্করের মায়াবাদের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে বাধ্য হইলেও "আচার্য্যের কাছে ধর্ম্ম বা সত্যের ঋণ যে অপরিশোধ্য" তাহা স্বীকার করিয়াছেন। যে ধর্ম্ম বা সত্যের ঋণ ধীরেন্ বাবু স্বীকার করিলেন তাহা কি আচার্য্যের ব্যাখ্যাত মায়াবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে? অথচ মায়াবাদের বিরুদ্ধ সমালোচনা তিনিই করিতেছেন। আবার, যে ধর্ম্ম বা সত্য প্রচারের জন্য ধীরেন্দ্র বাবুর এই চক্ষুষ্মতী ভক্তি এখন উথলিয়া উঠিয়াছে তাহা কি অদ্বৈততত্ত্ব নহে? তাই দাঁড়াইতেছে শঙ্করের অদ্বৈততত্ত্ব সিদ্ধ ও অসিদ্ধ, সত্য ও অসত্য। এইরূপ যুক্তির বলেই ধীরেন্দ্র বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন Aconsistent mayavad must be speechless। যাই হউক, ধীরেন্দ্র বাবু যখন তাঁহার ভাষার ধরণে দোষ থাকিবার সম্ভাবনা এবং মানুষ বলিয়া তিনি "আপনার ছায়াকে (মায়াকে নয়?) অতিক্রম করিতে পারেন নাই বলিয়া স্বীকার করিয়া পাঠকের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়াছেন তখন আমার অক্ষম লেখনী-ধারণও সার্থক হইয়াছে মনে করিতে পারি।

যে অদ্বৈত বেদান্তকে শঙ্করের স্বদেশবাসী কোন কোন আধুনিক দার্শনিক দর্শন রূপে অসমর্থনীয় এবং ধর্ম্মতত্ত্ব রূপে বিষবৎ হেয় মনে করেন তাহা কোন কোন পাশ্চাত্য মনীষীর নিকট কিরূপ উপাদেয়, শ্রেয়স্কর বলিয়া গৃহীত হইয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য Maxmuller এর The six systems of Indian Philosophy (New Impression, 1912) Chapter IV p 170 হইতে উদ্ধৃত করিয়াছিলাম:— It (the true vedanta Philosophy) rests chiefly on the tremendous Synthesis of the subject & object, the identification of cause &

effect of the I and the It" etc. অধ্যাপক ধীরেন্দ্র নাথ উত্তরে বলিয়াছেন যে আমি বুঝিতেই পারি নাই ম্যাক্সমূলর True vedanta বলিয়া কোন Philosophyর প্রশংসা করিয়াছেন। কারণ, পণ্ডিতবর নাকি যাহাকে True vedanta বলেন তাহা মায়াবাদ-বিধ্বংসী। পাঠক উক্ত গ্রন্থখানা আবার খুলিয়া দেখিবেন ইহার ৪র্থ অধ্যায়ে ম্যাক্সমূলর ভূমিকা স্বরূপে বেদান্তের মূল উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতির কথা বলিয়া ১৫১ হইতে ১৮৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত শঙ্করানুযায়ী অদ্বৈত বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং পরে সংক্ষেপতঃ ১৮৬পৃঃ হইতে ১৯২ পৃঃ পর্য্যন্ত রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যে বাক্যগুলি আমি উদ্ধার করিয়াছিলাম তাহা The two Brahmans এই Sub head প্রসঙ্গে অর্থাৎ শাঙ্কর দর্শনোক্ত মায়োপহিত সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্মের কথা প্রসঙ্গে পণ্ডিতবর বলিয়াছেন। গ্রন্থের উক্ত অংশে অদ্বৈত বেদান্ত ছাড়া অন্য কোন বেদান্তের ব্যাখ্যার প্রসঙ্গ মাত্র নাই। ধীরেন্দ্র বাবু অবশ্যই উক্ত গ্রন্থ মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন। তবে সময় বিশেষে স্মৃতিস্খলন খুব কাজে আসে। পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কা সত্ত্বেও ধীরেন্দ্রবাবুর স্মৃতিটাকে একটু প্রখর করিয়া দিবার জন্য উক্ত গ্রন্থের ১৭০ পৃষ্ঠার প্রায় সমগ্র অংশই উদ্ধার করিয়া দিতে বাধ্য হইলাম :—

"We shall thus understand the distinction which the Vedantists and other Indian philosophers also make between the Brahman, ro ovtws ov, and the Brahman as Isvara, the Personal God, worshipped under different names, as creator, preserver, and dissolver of the universe. This Isvara exists, just as everything else exists, as phenomenally only, not as absolutely real. Most important acts are ascribed to him, and whatever he may appear to be, he is always Brahman. When personified by the power of Avidya or Nescience, he rules the world, though it is a phenomenal world, and determines though he does not cause, rewards and punishments. These are produced directly by the acts themselves. But it is He through whose grace deeds are followed by rewards, and man at last obtains true knowledge and Mukti, though this mukti involves by necessity the disappearance of Iswara as a merely phenomenal God.

It must be clear to any one who has once mastered the framework of the true Vedanta philosophy, as I have here tried to explain it, that there is really but little room in it for psychology or kosmology, nay even for ethics. The soul and the world both belong to the realm of things which are not real, and have little if anything to do with the true Vedanta in its highest and truest form. This consists in the complete surrender of all we are and know. It rests chiefly on the tremendous synthesis of subject and object, the identification of cause and effect, of the I and the it. This constitutes the unique character of the Vedanta, * * * this identity of subject and object or this complete absorption of the object by the Subject."

এখন ধীরেন্দ্রবাবু স্বীকার করিবেন কি যে ম্যাক্সমূলর মায়াবাদবিধ্বংসী কোন বেদান্তকে True vedanta Philosophy বলেন নাই ?

ধীরেন্দ্র বাবুর এই বিস্মৃতির মূল তাঁহার বুদ্ধির প্রখরতা এবং অকাট্য যুক্তিপ্রয়োগ-কুশলতা। শঙ্করের মতে আত্মাই একমাত্র সৎবস্তু, জগতের কোন বস্তু-সত্তা নাই। অথচ ম্যাক্সমূলর Synthesis of the Subject & object বলিতেছেন। অতএব যে বেদান্তের কথা উক্ত পণ্ডিত বলিয়াছেন তাহা অদ্বৈত বেদান্ত নহে ; যেহেতু Synthesis বলিতে দুই বা ততোধিক বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ বিশেষ বুঝায়— এই ত ধীরেন্দ্র বাবুর যুক্তি। তিনি Synthesis কথাটি হাতের কাছে পাইয়া আহ্লাদে লাফাইয়া উঠিয়াছেন। কারণ Synthesis কথার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ Placing together. কিন্তু যে অর্থে আলোচ্য স্থলে এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা দুই বস্তুর পাশাপাশি অবস্থান নহে—ইহা বুঝিবার পক্ষে (ধীরেন্দ্র বাবু ছাড়া) কাহারও কষ্ট

স্বীকার করিতে হইবে না। কারণ, Synthesis of the subject and object বলিয়াই ঐ কথাটা আরও পরিষ্কার করিবার জন্য বলা হইল—the identification of the cause and effect, of the 'I' and the 'It'. অতএব আলোচ্যস্থলে Synthesis = identification অর্থাৎ অনন্যত্ব। শব্দের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ বিভাগের কথা ধীরেন্দ্রবাবু ভুলিয়া গেলেন কেন? Synthesis কথাটার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ থাকে এই আশঙ্কায় ঐ কথাটাই শব্দান্তর দ্বারা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইল— "this identity of the Subject and object, or this complete absorption of the object by the subject. অতএব Synthesis = Complete absorption. ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রে যাহাকে উপচারচ্ছল বলে ধীরেন্দ্র বাবু যদি স্বেচ্ছাক্রমে এ স্থলে ন্যায়ের সেই চাতুরি খেলিয়া না থাকেন তবে পাঠক "অপ্রতি-পত্তিমূলক নিগ্রহস্থানের" উদাহরণ পাইলেন। তবে বিজ্ঞ অধ্যাপক ধর্ম্মযুদ্ধে আমাকে আহ্বান করিয়া স্বেচ্ছায় অন্যায়াচরণ করিয়াছেন ও বলিব কেন? অতএব পাঠক, যুদ্ধে কার জয় এবং কার পরাজয় নিশ্চয় করুন। আচ্ছা, ধীরেন্দ্র বাবুর True Vedanta Philosophyর মতে জগৎও সৎ, ব্রহ্মও সৎ। অথচ জগৎ জড়, ব্রহ্ম চিৎপদার্থ। জড়ে ও চিৎপদার্থে সমন্বয় হয় কি? যদি বল, হয়, তবে বলিতে হয় হাঁ ও না-তে সমন্বয় হয় অর্থাৎ দুই বিরুদ্ধধর্ম্ম সত্তার মধ্যে কোন বিরোধ নাই! অতএব ধীরেন্দ্রবাবুর এই True Vedanta need not be consistent. অথবা ইহা 'প্রচ্ছন্ন জড়বাদ মাত্র।

অদ্বৈততত্ত্ব ও মায়াবাদ পরস্পর বিরুদ্ধ—ধীরেন্দ্র বাবুর এই প্রতিজ্ঞার স্পষ্ট প্রমাণ তিনি আমার যুক্তি হইতেই নাকি পাইয়াছেন। তাঁহার যুক্তির নমুনা সংক্ষেপতঃ এই:—(১) মায়া বিদ্যার অভাব মাত্র নহে, কিন্তু আবরণী বীজশক্তি বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। অতএব ইহা সৎ বলিয়াই স্বীকার করা হইল। যাহা শক্তিশব্দ বাচ্য তাহা সৎ ছাড়া আর কি হইতে পারে? (২) মায়াকে অনাদি কিন্তু সান্ত বলা হইয়াছে। অতএব "অনাদিকাল হইতে অন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মায়াকে সৎ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইল, এবং যত দিন না অন্ত হয়, ততদিন, ব্রহ্মের অদ্বৈতত্বকে ব্যাহত করিতে তাহার কোন বাধা রহিল না। কোন সময়ে তার অন্ত হইবে, এই উক্তিই প্রমাণ করিতেছে, যে মায়া আছে অর্থাৎ সৎ। যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ইহার পারমার্থিক সত্তাই স্বীকার করিতেছ। সুতরাং জগৎ মিথ্যা নয়, নশ্বর। এ সত্তা ব্যবহারিক বলিতে পারিবে না, কেন না ব্যবহারিক ভাবে সংসার-বৃক্ষের অন্ত নাই" ইত্যাদি। —পাঠক, প্রথমতঃ দেখিবেন ধীরেন্দ্র বাবুর এম যুক্তিতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, যাহা অসৎ নহে তাহাই সৎ। সৎ এবং অসতের মাঝামাঝি কিছুর ধারণা ধীরেন বাবু করিতে পারিতেছেন না, তাই 'সৎ' কিম্বা 'অসৎ' দ্বারা 'অনির্ব্বাচ্য' কথাটাতে তাঁহার মনে ধাঁধা লাগিয়াছে। দৃষ্টান্ত দিন? একমাত্র সৎ-(নির্গুণ) ব্রহ্ম; অসৎ, যথা শশবিষাণ, কবন্ধের শির, বন্ধ্যা-পুত্র ইত্যাদি। সৎ কিম্বা অসৎ বলা যায় না, যথা, এই পরিণামশীল জগৎ এবং জীবের দেহ, অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণ। দ্বিতীয়তঃ, মায়াকে আবরণী শক্তি বলাতে তাহা যে সৎ অর্থাৎ পারমার্থিক সত্তা হয় না ইহা পূর্ব্ব প্রবন্ধেই দেখাইয়াছি। এখন এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এই মায়া শক্তি নির্গুণ ব্রহ্মের নহে, ইহা মায়োপহিত সগুণ ব্রহ্মের; আর এই শেষোক্ত ব্রহ্মও পারমার্থিক সৎ অর্থাৎ Absolute Reality নহে। যতক্ষণ জগৎ সত্য বলিয়া ভ্রান্তি আছে ততক্ষণই তার সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তার ও তাঁহার শক্তির কল্পনা আবশ্যক কিন্তু যাহার এই ভ্রান্তি দূর হইয়া প্রমাতৃ-প্রমেয়-প্রমাণ ভেদ দূর হইয়াছে তাহার পক্ষে জগৎ বা জগৎ-কর্ত্তা কিছুই থাকেনা। তাই সৎ ব্রহ্মের সম্পর্কে মায়াশক্তি বা জগতের সম্বন্ধের কথাও উঠে না। শক্তি বলিতেই ধীরেন্দ্রবাবু সদ্বস্তুর শক্তি বুঝিয়া থাকেন। মরুভূমে দৃষ্ট মরীচিকার, কিম্বা স্বপ্ন দৃশ্যের, বা রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের পারমার্থিক সত্তা তিনি স্বীকার করেন কি? অথচ ইহাদের শক্তির প্রভাব (যত অল্প সময়ের জন্যই হউক) ভুক্তভোগী অস্বীকার করিবে কি করিয়া? মরীচিকা দর্শনে তৃষ্ণার্ত্তের বারিপান-পিপাসা তীব্রতর হইয়া তাহাকে যন্ত্রণার অধীর করিয়া তোলে, দুঃস্বপ্ন দর্শনে নেত্রপথে অশ্রু বহিতে কিম্বা মুখ-বিবর হইতে ভীতির উচ্চরব বাহির হইতে দেখা যায়;

এবং সর্প-ভ্রমের ফলে ভ্রান্ত জনকে লম্ফ প্রদানে প্রাণরক্ষায় চেষ্টিত দেখা গিয়াছে। তারপর, ধীরেন্দ্র বাবুর দ্বিতীয় যুক্তিটি আমাদের দেশীয় ন্যায়শাস্ত্রে যাহাকে 'বাক্ছল' বলে তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইংরেজী ন্যায়ের ভাষায় ইহাকে fallacy of equivocationও বলিতে পার। শঙ্করের 'সৎ' কথার নিরুক্তি,—যাহার স্বরূপের কোনওকালে কোন অবস্থায় ব্যাভিচার নাই, যাহা কোনওকালে বাধিত হয় না। এই কথাটা ইচ্ছা করিয়াই আমার * পূর্ব্ব প্রবন্ধে বারং উল্লেখ করিয়াছি, কারণ, শঙ্করদর্শনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিবার ইহা চাবী-স্বরূপ; অথচ ধীরেন্দ্র বাবু অবলীলাক্রমে 'সৎ' কথার শঙ্কর-ব্যবহৃত বিশেষ অর্থটিই ডিঙ্গাইয়া গিয়াছেন। তা' না করিলে মহাভারত যে উদ্যোগ পর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করে। উপরে কোটেশন চিহ্নে (" ") চিহ্নিত ধীরেন্দ্র বাবুর কথাগুলির শেষ কয় পংক্তির ("যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ইহার পারমার্থিক সত্তাই" হইতে "সংসার বৃক্ষের অন্ত নাই" পর্য্যন্ত) যুক্তির সারবত্তা, সুসঙ্গতি ও অর্থ-যুক্ততা সম্বন্ধে বিজ্ঞ পাঠককে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। এখন ধীরেন্দ্র বাবু হইতে শিখিয়া রাখুন, যাহার "পারমার্থিক" সত্তা আছে তাহা "নশ্বর," এবং জগতের সত্তা ব্যবহারিক" বলিতে পার না, যেহেতু জগৎপ্রবাহ অনাদিঅনন্ত। 'নশ্বর' কথাটার অর্থ কি 'এই আছে, এই নাই' অর্থাৎ 'পরিণামশীল' নহে? শঙ্কর যে ব্যবহারিক phenominal বলিতে তাই বুঝেন, এবং সেই জন্যই এই পরিণামি দৃশ্য জগৎ প্রপঞ্চকে তিনি সৎও বলেন না অসৎও বলেন না। এখন ধীরেন্দ্রবাবু দেখিবেন, "মায়াকে অলীক বলিয়া আমরা যতই পরিহাস করিনা কেন তাহার দুঃখদায়িনী শক্তি কি নিদারুণভাবে সত্য তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন" আমার এই উক্তিটিতে আমার "চিন্তার ধারায়" কোনরূপ ব্যাঘাত জন্মায় নাই, এবং ইহাতে তাঁহার বিজয়-গর্ব্বটা নিরর্থক। মায়াকে আমি কোনও অলীক বলিয়া বিশেষিত করি নাই, শুধু শঙ্করের বিরুদ্ধবাদীদের পরিহাস বা কদর্থের (misinterpretation এর) প্রতি লক্ষ্য করিয়াই যে উপরোক্ত স্থলে "মায়াকে অলীক বলিয়া" ইত্যাদি বলা হইয়াছে তাহা সূক্ষ্মবুদ্ধি পাঠককে বলা বাহুল্য। ধীরেন্দ্রবাবু যদি পথে ঘাটে, সর্ব্বত্র mental dissociation এর স্বপ্ন দেখেন তবে তার সুব্যবস্থা আমার হাতে নাই।

জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম নয় ইহা প্রমাণ করিবার জন্য ধীরেন্দ্র বাবু পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে সে যে পরিমাণে সকল ছাড়িতেছে, সাধন ভজন করিতেছে সেই পরিমাণেই প্রমাণিত হইতেছে সে ব্রহ্ম নহে। ইহার সোজা অর্থ এই যে সাধন ভজন ও ত্যাগের পরিমাণ যত বাড়িবে ততই জীব ও ব্রহ্মের মধ্যকার দূরত্ব বাড়িয়া যাইবে, অবশেষে সাধনের শেষ সীমায় যখন পঁহুছিয়া সে সিদ্ধ হইবে তখন জীবও ব্রহ্মের মধ্যে চিরন্তন বিচ্ছেদের অলঙ্ঘ্য প্রাচীর সৃষ্ট হইবে। অর্থাৎ সাধন ভজনের ফলে জীব শিবত্বলাভ না করিয়া জড়ত্ব প্রাপ্ত হইবে। এখন কিন্তু কথাটাকে আর একটু ঘুরাইয়া (Fallacy of shifting ground?) খোলাসা করিয়া মনের আসল ভাবটা বলিতেছেন :—"মানুষ যখন কিছু ছাড়িতেছে, সাধন ভজন করিতেছে তখন কিরূপে বলিবে যে সে ব্রহ্ম × × তার এই সাধন ভজনই কি প্রমাণ করিতেছে না যে সে ব্রহ্ম নহে?" তা ইহাই যদি বলিবার অভিপ্রায় ছিল তবে "যে পরিমাণে" "সেই পরিমাণেই" এই কথাগুলি মূল প্রবন্ধে উহ্য রাখিলেইত চলিত। এখন বুঝা গেল এই কথাগুলি নিরর্থক অর্থাৎ ইহারা পাদপূরণে ব্যবহৃত হইয়া ছিল। যাক্ সেকথা। এখন জিজ্ঞাস্য এই—দেহেন্দ্রিয় সুখাদি উপাধিযুক্ত জীবকে কেহ ব্রহ্ম বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে কি, যে এই প্রতিজ্ঞাটি অপ্রমাণিত করিবার জন্য ধীরেন্দ্র বাবু এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন? জীব যখন শম দমাদি সাধন সম্পদসহ শ্রবণ, মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা সকল উপাধিমুক্ত হইয়া আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সে ব্রহ্মত্ব লাভ করে ইহাই শঙ্করের মত এবং শ্রুতির উপদিষ্ট পুরুষার্থসিদ্ধি। যথা—অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতম-ভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি, তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি। —ছাঃ উঃ ৮ম অধ্যায়, ৩য় খণ্ড।

পাঠক, অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন যে অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে ধীরেন্দ্র বাবুর বর্ত্তমান সংশোধিত যুক্তিটির মর্ম্ম এই যে, যেহেতু জীব সাধনভজন করে, অতএব সিদ্ধ হইলে

* ১৩২৮ সনের ভাদ্রসংখ্যক "নারায়ণ"।

সে ব্রহ্ম নহে। কিন্তু ধীরেন্দ্রবাবু বলিবেন কি, নিরেট্ জড় পদার্থ সাধন ভজন করে না কেন? ব্রহ্মের সঙ্গে জড়ের জীবের অপেক্ষা অধিকতর সারূপ্য আছে বলিয়া নাকি? ভারতের আবাল বৃদ্ধ বনিতা জানে—যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। আর সাধনা দ্বারা কিছু হওয়া বুঝায়, বাহির হইতে কিছু পাওয়া নয়। যে যাহা নয় সে তাহা হইতে পারেনা, যেমন তিলই তৈল হয়, বালুকা নহে। মানুষ স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বলিয়াই ব্রহ্মকে ভাবনা করিয়া ব্রহ্ম হয়। ধীরেন্দ্র বাবুর স্বীকৃত জীবের 'ছায়া'টা যখন শূন্যে মিলাইয়া গিয়া তাহার আলোটা মাত্র অবশিষ্ট থাকে তখনই জীব যে শিব তাহাতে সন্দেহ মাত্র থাকে না।

এখন শঙ্করের অদ্বৈততত্ত্ব এক কল্পিত, abstract একত্ব—ধীরেন্দ্র বাবুর এই উক্তি কিরূপ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটু পরখ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করি। তাঁহার ১ম যুক্তি এই :—"বহু হইতে একেকে বিচ্ছিন্ন করিলে তাহা সত্য সত্যই abstract এক। বহুর ধারণাকে নিঃশেষ করিলে এক শূন্যে পরিণত হয়। বহুকে 'ন স্যাৎ' করিলে একের কোন মূল্য থাকেনা, এক তখন শূন্য হয়।" তাঁর দ্বিতীয় যুক্তিটা ঠিক যুক্তি, কি, ধীরেন্দ্রবাবুর 'ফলস্' বাক্য বলা কঠিন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন—"নেতি নেতি পথে বিষয় জগতের সর্ব্ব নিঃশেষ করিয়া যাহারা গিয়াছেন" তাহাদের ভাগ্যে মিলে "অমাবস্যার অন্ধকার।" ঐ যে গোড়াতেই বলিয়াছি, ধীরেন্দ্র বাবু অদ্বিতীয় অহংএর বিগ্রহ—পাঠক তার পরিচয় পাইবেন। আলোকের বা পূর্ণচন্দ্রের তত্ত্ব তিনি কতদূর অবগত সে বিষয়ে কোন কোন মূঢ়মতির সংশয় থাকিলেও অমাবস্যার অন্ধকার-তত্ত্ব বিষয়ে যে তিনি সর্ব্বজ্ঞ তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। পাঠক ধীরেন্দ্রবাবুর এই গুরুগম্ভীর গুরুবাক্য শিরোধার্য্য করিবেন, কি উপনিষদের ঋষি-বাক্য গ্রহণ করিবেন স্থির করিয়া লউন। ঋষিদিগের পথ কিন্তু অমানিশার তিমির-সদন! ধীরেন্ বাবু ক্রোধান্ধ হইয়া বলিয়াছেন—"আমি কথন ত্যাগের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না?" কিন্তু তাঁর সেই অমৃতটাকি এক সঙ্গে খুলিয়া বলিয়া দিলে অনেকের কল্যাণ হইত। প্রাচীন ঋষি কিন্তু স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—'যোবৈ ভূমা তদমৃতম্, "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা।" এখন প্রথম যুক্তিটাতে আসুন। একের পাছে বহু না থাকিলে একের মূল্য থাকেনা, ১=০ হইয়া যায়, এই নূতন সর্ব্ববিপ্লবকারী আবিষ্ক্রিয়ার জন্য গণিতশাস্ত্র ও ন্যায়শাস্ত্রবিদ্‌গণ আবিষ্কর্ত্তার যথাযোগ্য সম্মান করিতে পারিবেন কি না জানি না। এতকাল যে ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল শূন্যের আগে এক (১) না থাকিলে শূন্যেরই মূল্য থাকে না! তারপর ধীরেন্দ্র বাবুর ত জানা আছে ঐ বহু হইতে বিচ্ছিন্ন abstract একই শঙ্করের দার্শনিক সত্তা এবং তৎপ্রাপ্তিই শঙ্করের ধর্ম্ম সাধনের লক্ষ্য। তবে কি করিয়া তিনি আচার্য্যের প্রতি 'অনন্ধ' ভক্তি দেখাইবার বেলায় "আচার্য্যের কাছে ধর্ম্ম বা সত্যের ঋণ যে অপরিশোধ্য" ইহা স্বীকার করিলেন? অতএব, হয় ভক্তিটা কপট, নয় যুক্তিটা অসৎ। ধীরেন্দ্র বাবু যে 'নেতিকে' এত ভয় করেন, তিনি কি প্রকৃতই মনে করেন যে 'ইদং', concrete বা বিশেষই সত্য, তদ্ব্যতিরিক্ত যা 'কিছু তা' কাল্পনিকতা বা abstraction? তিনি তাঁহার সুসঙ্গত দার্শনিক তত্ত্বের আভাস দিয়া বলিয়াছেন—* "আমি যদি বলি, ব্রহ্ম এক নির্ব্বিশেষ স্বগত ভেদহীন সত্তা হইয়াও এই বহুত্বপূর্ণ জগৎ সৃষ্টি করিয়া আপনার মধ্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।" এই বাক্যটিই প্রমাণ করিতেছে না কি যে ধীরেন বাবু শুধু যে 'ইদং' ব্যতিরিক্ত সৎ স্বীকার করেন তাহা নহে, এই বহুত্বপূর্ণ জগতের আদি আছে এবং তাহা এক নির্ব্বিশেষ স্বগত ভেদহীন ব্রহ্ম সৃষ্টি করিয়াছেন ইহাও তাঁহার স্বীকৃত। অতএব ধীরেন্ বাবুর সৃষ্টির পূর্ব্বকার ব্রহ্মও যদি 'শূন্য,' 'কল্পিত' বা 'abstract' না হইয়া সত্য হইয়া থাকেন তবে শঙ্করের নির্ব্বিশেষ স্বগত বিজাতীয় ভেদহীন ব্রহ্মের সৎ হইতে আপত্তি কি? কারণ, এই দুই ব্রহ্মের কোন ব্রহ্মের সঙ্গেইত বহুর সংযোগ হয় নাই? ধীরেন্দ্র বাবুর এই 'অবিশিষ্ট দ্বৈতবাদের' মধ্যে inconsistency কি irrationality আছে

* "যদি" কথার পর্দ্দায় ঘেরা এই বাক্যগুলিকেই ধীরেন্দ্র বাবুর দার্শনিক তত্ত্বের আভাস বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম। কারণ, উক্ত তত্ত্বের পরিপূর্ণ স্বরূপ "স্থানান্তরে" কি মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে তাহা দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই।

কি না এই প্রশ্ন তুলিব না, কিন্তু তাঁহার সেই চিৎ-স্বরূপ ব্রহ্ম এই জড় জগৎটাকে "আপনার মধ্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন" এই কথা লিখিবার সময় তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে কয়েক ছত্র পূর্ব্বেই আমি ব্রহ্মকে "একমাত্র অদ্বিতীয় সর্ব্বব্যাপী সত্তা" বলায় তাঁহার হাস্য-রসের উদ্রেক হইয়াছিল। "সর্ব্বব্যাপী, কথাটাতেই ধীরেন্দ্র বাবুর খটকা লাগিয়াছে। কারণ জগৎ ত সৎ নহে যে ব্রহ্ম তাহাতে ব্যাপ্ত থাকিবেন? ধীরেন্দ্র বাবুকে 'লক্ষণার' কথা আবার স্মরণ করাইয়া দিতে হইতেছে। 'সর্ব্বব্যাপী' কথার পূর্ব্ববর্ত্তি 'এক মাত্র অনন্ত' কথাগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝিবেন যে উক্ত স্থলে সর্ব্বব্যাপিত্ব দ্বারা অদ্বিতীয়ত্ব, অনন্তত্ব, ভূমত্ব মাত্র লক্ষিত হইতেছে, বহুর সত্তা স্বীকৃত হইতেছে না,-যেমন পূর্ব্ব-কথিত ন্যায়সূত্রের ব্যবহৃত Synthesis এর অর্থ identity.

অতএব দাঁড়াইল এই যে, শঙ্করের অদ্বৈত তত্ত্ব কল্পিত নহে। ইহা চিৎস্বরূপ অতএব ইন্দ্রিয়াতীত বলিয়া এই বহুত্বের, ইন্দ্রিয়ের, পরিণামের রাজ্যে তাহার সঙ্গে উপমা দিবার কিছু নাই বলিয়া বেদান্ত শাস্ত্র 'নেতি' নেতি' বলিয়া জড়ত্বের নিরাস করিয়া ব্রহ্মের পরিণামবিহীন চিৎস্বরূপত্বের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন। তাই শঙ্কর বলেন—নহি শাস্ত্রমিদন্তয়া বিষয়ীভূতং ব্রহ্ম প্রতিপিপাদয়িষতি। প্রত্যগাত্মত্বেন অবিষয়তয়া প্রতিপাদয়দবিদ্যাকল্পিতং বেদ্যবেদিতৃ-বেদনাদিভেদমপনয়তি' ইত্যাদি। ধীরেন্দ্র বাবু বার বার আমাকে চোখ রাঙ্গাইয়া [Argument of the cudgel] জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কে বলিয়াছিল ব্রহ্মকে সৎ ও জগৎকে অসৎ বলিতে? এ প্রশ্নের উত্তর বোধ করি এখন তিনি পাইলেন, অর্থাৎ ব্রহ্মই সৎ এবং জগৎ সৎ নহে বলিয়া।

কিন্তু সমালোচক আর এক ধূয়া তুলিয়াছেন যে সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্য যে আসনে বসিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন সেখান হইতে তাঁহাকে না নামাইলে জগদ্বিবর্ত্তনের স্রোতঃ-মুখে বাধা পড়িবে, এবং শঙ্করোপদিষ্ট অদ্বৈততত্ত্বরূপ abstraction আমাদের জাতীয় অধঃপতনের মূল কারণ। এই সকল প্রশ্ন আলোচ্য বিষয় প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। আর ইহাদের যথোচিত উত্তর দিতে হইলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের অবতারণা করিতে হয়। যদি কোন পাঠকের মনে ধীরেন্দ্র বাবুর কথায় সন্দেহ জাগিয়া থাকে তবে তাহাকে স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞানযোগ গ্রন্থের 'The Freedom of the Soul নামক বক্তৃতা এবং 'The Practical Vedanta' শীর্ষক বক্তৃতা চতুষ্টয় পুনর্ব্বার পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এ স্থলে এই মাত্র বলিব যে সত্য চিরন্তন পদার্থ, তার সত্তাত্ব বাহ্যিক অবস্থার উপর নির্ভর করে না। তবে বাহ্যিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের ফলে সমাজ কখন সত্য গ্রহণের অধিকতর যোগ্য হয়, কখন বা কম হয়, এই যা পার্থক্য। যদি অবসর ঘটে তবে ভবিষ্যতে বেদান্তের অদ্বৈত তত্ত্বই যে বর্ত্তমান যুগের সামাজিক ব্যাধির একমাত্র মহৌষধ, এবং অদ্বৈত বেদান্তই ভারতীয় দর্শনের রত্নভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠতম রত্ন তাহা প্রদর্শন করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর।

জাতকর্ম্ম গয়রহ।

হিন্দুরা অশুদ্ধ ও অস্পৃশ্য মনে করিয়া প্রসূতির জন্য একটী ক্ষুদ্র অস্বাস্থ্যকর কুটির নির্ম্মাণ করেন উহার নাম অশৌচঘর বা আঁতুড়। সেই ঘরে থাকিয়া নবজাত শিশুকে বহুদিন ব্যাপী জন্ম-মৃত্যু নামক একটা কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষায় পাশ বা ছাড়-পত্র মিলিলে পরে তাহার এক সময়ে "গৃহ প্রবেশে" অধিকার হয়। বলা বাহুল্য, ছয় দিনের মধ্যেই অনেকে "ফেল" হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করে। পবিত্র এসলাম ধর্ম্ম এবিষয়ে অতি উদার। মুসলমানগণ তাঁহাদের বাস গৃহের অভ্যন্তরেই নবজাত শিশুর অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে জুদা আঁতুড় নির্ম্মাণের প্রথা নাই। প্রসূতির শয্যা সাতদিন আলাহিদা থাকে, কিন্তু স্পর্শদোষ নাই।

পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হইলে বাড়ীর কর্ত্তা তৎক্ষণাৎ অজু করিয়া গৃহপ্রাঙ্গণ হইতে উচ্চৈস্বরে তিন বার আজান দেন। "লা-ইলাহা-ইল্-আল্লাহ্" রবে জন্মবার্ত্তা বিঘোষিত হয়। ভগবানের নাম শ্রবণ করিয়া বেহেস্তের শিশু বোধ হয় ক্ষণকাল ক্রন্দন স্থগিত করিয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়। ছেলে হইলে তিনবার আজান। এবং কন্যা হইলে দুইবার। কিন্তু এদেশে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে কন্যা সন্তানের জননে আজান দিবার বিধি প্রচলিত নাই।

ময়মনসিংহ অতি বৃহৎ জেলা। সমস্ত অধিবাসী সংখ্যার বার আনা মুসলমান এবং প্রায় সকলেই কৃষিজীবি।

একবড়-জেলার নিরক্ষরদের মধ্যে লোকাচার সর্ব্বত্র ঠিক একরূপ হইতে পারে না। নিয়ে সদর উত্তর মহকুমার ঈশ্বরগঞ্জ-এলাকার জাতকর্ম্মের রেওয়াজ সংক্ষেপে লিখিত হইল।

ছালি জুড়ানি।

সপ্তম দিবসে নাপিত আসিয়া প্রসূতির নখচ্ছেদন ও নবজাত শিশুর মস্তক মুণ্ডন করিয়া থাকে। হজমাতের পর প্রসূতি ধোপাবাড়ী হইতে সংগৃহীত ছালি (ক্ষার) লইয়া প্রসব স্থলে ছালির জল ছিটাইয়া থাকেন। তৎপর ঐ ক্ষার দ্বারা বস্ত্রাদি প্রক্ষালণ করিয়া নিকটবর্ত্তী পুকুরে গোসল করেন। এই সময় পাড়ার কমসিন ছেলেপিলে-দের হাতে চিনি বা গুড় মিশ্রিত পানীয় (সরবৎ) ও কিছু আতপ চাউল দেওয়া হইয়া থাকে।

চড়ি।

রোজ মজকুর বিকালে আসরের নামাজের পর হামসায়া খেসগণকে সঙ্গে করিয়া খালা, ফুফি, সই, মামানী, বুবু, ভাবীসাহেব আত্মীয়বর্গ প্রসূতীর প্রসাধন কার্য্যে যোগদান করেন, এবং শিশুর মুখনিরীক্ষণের সঙ্গে তাহাকে অবস্থানু-যায়ী হরেক রকমের শিউলি (উপহার) প্রদান করিয়া দুয়া করেন। ইহাই চড়ির কেচ্ছা। মুসলমান বেটা ছেলেদের সোণা রূপা গহনা পরিতে নাই। কেহ কেহ সামান্ত আংটি পরেন, কিন্তু তাহা চারি আনা মূল্যের বেশী হওয়া দোষাবহ।

আকিকা।

অশৌচান্ত বা "আকিকা' প্রথা প্রসব হইতে সাত, পনের বা একুশ দিনের শেষে হইয়া থাকে। সকলের এক ওয়াদা নহে, যার যেরূপ পারিবারিক নিয়ম। ছেলে হইলে দুইটা খাসি বা দুইটা বকরী জবাই করিতে হয়। মেয়ে হইলে কেবল একটা খাসী বা একটা বকরী। গোস্ত প্রতিবেশী বা দীন দরিদ্রদের মধ্যে খয়রাতি করিয়া বাকী নিজ বাড়ীতে রসুই হইবে। কিন্তু শিশুর পিতা মাতার পক্ষে এই গোস্ত ভক্ষণ হালাল নহে। আকিকা কর্ম্মে জবাই করা পশুর মাংস যতদূর সম্ভব হাড় হইতে ছিন্ন করিয়া লইতে হইবে? হাড়-গোড় পরিত্যাগ করিতে হইবে। সমাংস হাড় মাটিতে পুঁতিয়া ফেলার নিয়ম। জবাই মন্ত্র পাঠের সময় মোল্লা ছেলের প্রদত্ত নামটি উচ্চারণ করিয়া উৎসর্গ করিয়া থাকে। আকিকা আঞ্জাম হইয়া গেলে প্রসূতি সাধারণ গৃহ কার্য্যে যোগদিতে পারেন।

ভাত ছোঁয়ানি বা খীর খিলাই।

শিশুর ৯ মাস অথবা ১৮ মাস বয়সে অন্নারম্ভ হইয়া থাকে। এই কর্ম্মে শুক্রবার কি পীরবার (সোমবার) প্রশস্ত। শুক্রবার হইলে জুম্মার নামাজের পর বাড়ীর কর্ত্তা বা একজন মৌলবীগোছের মাতব্বর লোক শিশুকে কোলে করিয়া বসিয়া তাহার মুখে পরমান্ন ক্ষীর স্পর্শ করাইয়া থাকেন। তৎপর জিয়াফতে বহুত মেজমানের তমাম দিন খানা পিনার আনন্দে কাটিয়া যায়। গ্রামে দলাদলির প্রাচুর্য্য। সুতরাং জিয়াফতের অপূর্ত্তে জহরের উৎপত্তি বিরল ঘটনা নহে। খামাখা একটা কসুরের অছিলায় পংক্তি ভোজন পরিত্যাগ হামেসাই হইয়া থাকে। আর তখন অপমানের প্রতিশোধ জন্ত নালিয়া (পাট) বেচিয়াই হোক, কর্জ্জ করিয়াই হোক,—যা থাকে বরাতে ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয়ের দৃঢ়সঙ্কল্প সগজে বহন করিয়া ৫০০ ধারার জন্য মাননীয় মেজমানের ৱাজবারে ছুটাছুটির জলন্ত উৎসাহ দর্শনে সকলে ধন্ত ধন্ত করিয়া থাকেন; মোক্তার মহাশয়েরাও করেন।

হাতে তক্তি

হিন্দুদের যেমন পঞ্চমবর্ষ বয়সে হাতে খড়ি হয়, তেমনি মুসলমান বালকদের ঐ বয়সে "হাতে তক্তি" দেওয়া হয়। এক খণ্ড তক্তায় আলিফ, বে, পে হরফগুলি লেখাইতে হয়।

সুন্নত বা খৎনা।

৪ হইতে ১২ বৎসর বয়স মধ্যে বালকের মুসলমানী সুন্নত হওয়া চাই। সচরাচর এতদ্দেশে ৬। ৭ বৎসর বয়সে এই কর্ম্ম হয়। খতনা সোমবার জহরের অক্তে দেওয়া "সুন্নত"। রবিবারে নিষেধ (মকরু)। ত্বকচ্ছেদন (Circumcision) পৃথিবীর অতি প্রাচীন প্রথা। এ দেশে, দাই জাতীয় লোক (হাজাম বা "গুণী") এ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া চাকু দ্বারা আবরণ চর্ম্মের অগ্রাংশ ছেদন করে।

অগ্রচর্ম্ম যতদূর সম্ভব সম্মুখে আকর্ষণ করিতে হয় এবং সেই সময় চোখ মুখ বস্ত্রাবরণে ঢাকিয়া ছেলেকে পেছন দিক হইতে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখা হয়। আয়োজন দেখিয়া অজ্ঞাত আতঙ্কে ও ত্রাসে ছেলেটী থরথরি কাঁপিতে থাকে। কিন্তু হিন্দুর কর্ণভেদের ন্যায় জ্বালা যন্ত্রণা নাই; রক্ত পতন হয় না। এই সময়ে ছেলের জননী অদূরে এক জলপূর্ণ মৃৎভাণ্ডে (পাতিলে) ধান ও দুর্ব্বা ভিজাইয়া তাহার ভিতর নিজ দুই হাত আড়া-আড়ি ভাবে ডুবাইয়া রাখেন। কার্য্য আরাম হইবা মাত্র তিনি ধানের মুঠাশুদ্ধ দুই হাত তুলিয়া ঐ ধান শুকাইতে দেন। ধান শুকাইবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের ঘাও শুকাইবে, ইহাই মায়ের মনোগত-বাঞ্ছা। ছিন্ন অগ্রচর্ম্ম রান্নাঘরের চালের বাতায় কাঠিবায় গুজিয়া রাখিতে হয়, উহা যেখানে সেখানে ফেলিয়া দিতে নাই। শিশুর চর্ম্ম স্বভাবতঃ হ্রস্ব হইলে খতনা না করিয়া কেবল ছুরী স্পর্শ করিয়াই নিয়ম রক্ষা হইয়া থাকে। ইহার নাম খতনার বদলে ছোঁয়াকাম।

সুন্নত না হইলে রোজা-নামাজে অধিকার হয় না। এই প্রকার স্থলে শারীরিক পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্য নিহিত আছে, তাহা কোরাণশরীফের সুরা হইতে সমর্থন হয়।

শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়।

মধু গোয়ালা।

ঘৃতে চর্ব্বি এবং দুধে জল মিশাইয়া বিক্রয় করিতে করিতে যখন মধু গোয়ালার বড়ই লোভ বাড়িয়া গেল, তখন সে তিল তৈলে খনিজ সাদা তৈল মিশাইয়া বিক্রয়ের আর একটী নূতন আরত খুলিয়া দিল।...

অনেকের মুখেই শুনিয়াছি লক্ষ্মী দেবীর নাসিকায় নাকি বিদ্যাবুদ্ধির গন্ধ সয়না। বস্তুতঃ মধুগোয়ালার বাড়ী ঘর, কাজ-কর্ম্ম দেখিয়া কথাটীর সত্যতাটুকু একবারেই চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভাজিয়া দিয়াছিল।

যাহারা উহার ব্যবসায়ের গুহ তত্ত্ব জানিত না, তাহারাই উহার ঘৃত দুগ্ধ খাইয়া নিন্দা বা প্রসংসা করিত। কিন্তু, তাহা একবারের বেশী নহে। এই সকল বাড়াট গোলমালে কখনো কখনো মধু বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িত। কিন্তু লক্ষ্মী মায়ের কৃপা এতটুকুও কমিল না। বরং হাল চাল আড়ম্বর দেখিয়া নিন্দুকেরাও অসাক্ষাতে বলিয়া বেড়াইত যে, ধর্ম্ম না থাকিলে কি লক্ষ্মীর দৃষ্টি পড়ে? ধর্ম্ম আর লক্ষ্মী দুটী ভাই বোন যে।"

(২)

বৎসরের প্রথম দিনে হাল খাতায় নাম করিয়া সহরের ভদ্রাভদ্র প্রায় সকল লোকেরই উহার দোকানে পায়ের ধুলি ঢালিবার নিমন্ত্রণ হইত; এমনকি কখনো কখনো পথের লোক অবধি ধরিয়া আনিয়া জোর জবরে দোকানের ভিটায় পায়ের ধুলি ঝাড়িয়া রাখিতেও অনেকে তাহাকে দেখিয়াছে। এই ধুলির মূল্য স্বরূপে সকলকেই মিষ্টিমুখ করিতে হইত। ইহার ফল হইত এই যে, যাহারা মিষ্টান্ন হজম করিতে পারিলেও চক্ষু লজ্জাটীকে পরিপাক করিতে পারিত না, তাহারাই নূতন খাতায় নাম লিখাইয়া, ভেজাল দেওয়া ঘৃত তৈল দুগ্ধ প্রভৃতি খরিদ করিত।

বৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছি, উঠিলেই নামিতে হয়। ইহার ভাগ্যেও তাহাই হইল। কি একটা পার্ব্বণ দিনে এক বৃদ্ধ ভক্ত সহরের জগন্নাথদেবের বাড়ী ভোগ লাগাইবার জন্য দুধের বায়না করিয়া, শতবার মধুর হাতে ধরিয়া বলিয়া গেলেন, দুধটী যেন খাটিই হয়। মধু গোয়ালা দন্তে জিব কাটিয়া, বৃদ্ধের পা ছুইয়া বলিল আজ্ঞে অমন কথা বলতে নাই। আমি কি খৃষ্টান যে—"বলিয়াই থামিয়া গেল। বৃদ্ধ ইহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

(৩)

সুবুদ্ধি আর কুবুদ্ধি দুটী বস্তুই নিতান্ত বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইলেও ভাই বোনের মত হাত ধরাধরি করিয়া বেড়ায় কিন্তু উহাদের সন্ধি পত্রের চুক্তিটী এমনই পাকা যে, সুবুদ্ধি কাহারো ঘরে মাথা গুঁজিলে কুবুদ্ধি যাইয়া দরওয়াজা ধরিয়া টানাটানি করে না। বা কুবুদ্ধিও সুবুদ্ধির অজ্ঞাতে দুয়ার ভাজিয়া ঘরে ঢুকেনা।

এখানেও তাহাই হইল। মধু গোয়ালা ঐ বৃদ্ধের কাছে দন্তে জিব কাটিয়া যাহা কিছু বলিল, ইহাতেই কুবুদ্ধিটী রাগিয়া গিয়া উহার মাথায় ধরিয়া এমন একটা ঝাকুনি দিল যে, তাহাতেই সুবুদ্ধির ছায়ামাত্রও যেখানে রহিতে পারিল না; সুতরাং পর মুহূর্ত্তেই যেই মধু সেই মধুই হইয়া দাঁড়াইল! পূর্ব্বেও যে অনুপাতে জল মিশাইয়া লোক ঠকাইত আজ জগন্নাথ দেবের নাম করিয়াও সেই অনুপাতেই জল মিশাইতে দ্বিধা বোধ করিল না।

(৪)

বেলা দশটার সময় মধু তাহার ভৃত্য সহ কলসী ভরিয়া দুধ আনিয়া ঠাকুরবাড়ীর প্রকাণ্ড আঙ্গিনায় নামাইল। বৃদ্ধ ভক্ত দেখিয়া আনন্দে প্রণিপাত করিতে করিতে ঠাকুরের অশেষ গুণগান করিতে লাগিল।

দুধ রাখিয়া মধু গোয়ালা গল্পে যোগ দিল এবং তামাক সাজিতে সাজিতে আজকার বাজারে দুধের হিসাবে সে কিরূপ লাভ করিতে পারিয়াছে মনে মনে তাহারই হিসাব খতিয়ান করিতে লাগিল। ইতি মধ্যে কোথা হইতে এক রোগগ্রস্ত উন্মাদ আসিয়া ঐ কলসী গুলার মাঝখানে দাঁড়াইয়া গঙ্গা ভাগীরথীর নাম করিতে করিতে কলসী ভরা দুধ নিজ মাথায় ঢালিয়া দিল।

যাহারা বাহিরে বসিয়া গল্প করিতেছিল, তাহাকে সকলেই আসিতে দেখিয়াছে, কিন্তু, তাহার পরিণামটা যে এই হইয়া দাঁড়াইবে, ততটা কাহারো বুঝিতে আসে নাই। তাই এই ব্যাপারে সকলেই কিয়ৎকাল হতভম্ব হইয়া থাকিয়া পরে পাগলের পাছে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল।

(৫)

মধুর মানসিক ভাব এই ব্যাপারে একটুকুও পরিবর্ত্তিত হইল না। এই লোকসানটায় প্রকৃতই যে উহার কোন লোকসান হইয়াছে, তাহা তাহার মুখে প্রকাশ পাইল না। সে কেবল একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল, তারপর ঠাকুরের মূর্তির সম্মুখীন হইয়া "তুমি আছ" বলিয়া ষষ্টাঙ্গে গড়াগড়ি দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

কথাটী যাহারই কাণে প্রবেশ করিল, সেই বুঝিল-"এই তুমি আছ" কথাটী কোন পথ ধরিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু কেহই উহাকে সাহস করিয়া কোন কথা বলিল না।

• দোকানে যাইয়াই সে তাহার যাহা কিছু ভেজাল দেওয়া ঘৃত-তৈল ছিল নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিয়া সুবুদ্ধির পূর্ণ প্রবেশের পথ খুলিয়া ধরিল এবং পর দিবস দেখা গেল মধু তাহার নিজ ব্যয়ে, গত দিনের দ্বিগুণ দুগ্ধ ঠাকুরবাড়ী পাঠাইয়া দিয়া কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে।

শ্রীসতীশচন্দ্র গাঙ্গুলী।

গোবিন্দ দাসের কাব্যে ব্যঙ্গ ও প্রেম।

ব্যঙ্গ রচনায়, সরস কৌতুকে, মর্ম্মভেদী কথাঘাতে আততায়ীকে আক্রমণ করিতে কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাসের ভাষা শরীরী হইয়া উঠিত। রহস্য রচনায় তাঁহার পটুতা অসাধারণ। বক্তব্য বিষয় অসঙ্কোচে এবং একটুও গোপন বা ইতস্ততঃ না করিয়া প্রকাশ করিতে গোবিন্দ দাস ভারত চন্দ্রের অব্যবহিত পরবর্ত্তী একথা বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না; যাঁহারা ভারতচন্দ্রের রচনাকে অশ্লীল বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান—ভারতচন্দ্র কুরুক্ষেত্রে ধনঞ্জয়কে গীতার বাণী শুনাইতে বসেন নাই। তাঁহার উদ্দিষ্ট বিষয় বর্ণনায় তিনি সফলতা লাভ করিতে পারিলেন কিনা তাহাই মাত্র দেখিতে হইবে। নগ্ন মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে হইলে সর্ব্বাঙ্গ অঙ্কনই আবশ্যক। সেখানে রুচির বিচার চলিবে না। চিত্রকর হুবহু অঙ্কনে সমর্থ হইলেই তাঁহার গৌরব লাভ হইল। গোবিন্দদাসও অনেক সময় প্রকৃত বর্ণনায় আত্ম ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিয়া তথাকথিত রুচিবাগীশগণের সমালোচনায় আদিরসাশ্রিত কাব্য, অশ্লীল কবিতা বলিয়া গোবিন্দকে অভিনন্দ বা নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া চিন্তা করিবেন, গোবিন্দ তাঁহার বক্তব্য বর্ণনায় সফলকাম হইয়াছেন কি না?

ব্যঙ্গ কৌতুকে ও প্রবল আক্রমণে গোবিন্দ চন্দ্রের "মগেরমুলুক" বঙ্গসাহিত্যে উচ্চশ্রেণীতে স্থান পাইতে পারে। নানা কারণে "মগের মুলুক" দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। মগের মুলুকে

"পূর্ব্ববঙ্গে আছে এক স্বর্ণপুর গ্রাম।
গাছ গাছলায় ঢাকা তাহা নবীন ঘন শ্যাম॥
রাঙ্গামাটী পলা কাটি খাঁটি সোনার মত।
টিলায় টিলায় ভ্রম হয়ে যায় মৈনাক শত শত॥
উত্তরেতে রূপার রেখা ধবল স্রোতস্বতী।
মন্দাকিনীর মত তাহার মন্দ মন্দ গতি॥"

যখন পাঠ করি, তখন স্থানটী চিনিতে আর একটুও বিলম্ব হয় না। স্থানের বর্ণনায় কবির একটুও কার্পণ্য নাই। সরস সরল মধোরের বর্ণনা।

"পুবের দিকে পদ্ম ভরা বিলের সীমা নাই।
পিপি ডাকে, কোঁড়া ডাকে কালেম কড়ু গাই॥
উত্তরে তার কাতার কাতার বিশাল গজারবন।
বাঘ ভালুকে বেড়ায় সুখে খেলায় হরিণগণ॥
গাছে গাছে ময়ূর নাচে পেকম ধরে কত।
পুচ্ছে তাহার তুচ্ছ করে ইন্দ্রধনু শত॥
বার মাসই ফুলের হাসি হয় না বাসি তার।
ছায়া ঢাকা স্নেহ মাখা মায়ের মতন প্রায়।
নানান্ ছন্দে নানান গন্ধে শীতল বায়ু বয়।
নন্দনে চন্দন বনে মলয় মনে লয়॥"

ইত্যাদি বর্ণনা পড়িলে কি বুকের ভিতর একটা সুন্দর চিত্রের ছাপ উঠেনা?' 'মগের মুলুকের' এই সরল সূত্র পাতের পাশেই ভীষণ আক্রমণ।

প্রতিহিংসা মানুষকে অন্ধ করে—কিন্তু নির্য্যাতিতের সান্ত্বনা মনের দুঃখ পরের নিকট কহিয়াই শেষ হয়। ইহা ভাল কি মন্দ, ইহা সমালোচনায় কিরূপ দাঁড়াইবে, ইহার ইউটিলিটির ফল কি এতটা ভাবিবার সময় নিষ্পেষিতের থাকেনা, অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তি ধীরে সুস্থে ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া কাজ করিবার অবসর পায় না। গোবিন্দ চন্দ্র ও অগ্নিদষ্ট কাউইর মত উন্মাদের ন্যায় চলিয়া গিয়াছিলেন। যে বৃশ্চিক দংশনে তিনি উন্মত্ত হইয়াছিলেন, তাহা আর কেহ বুঝিবেন না;—বুঝিবার অবস্থা যেন শত্রুরও না হয়। এবং বুঝাইবার লোকও আর নাই। তবে যাঁহারা গোবিন্দ দাসের সেই মর্ম্মদাহী দুঃখের বিবরণ জানেন তাঁহারা "মগের মুলুক" লেখকের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন না করিয়া পারিবেন না।

গালাগালির নরকার জনক বিষ উদ্গিরণ আমরা সমর্থন যোগ্য মনে করি না; * কিন্তু ইহাও সত্য যে—

"কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

এই খানেই আমরা "মগের মুলুক" আলোচনা বন্ধ করিলাম। যে কবি একদিন—

"কি সুন্দর কিশোরীর কোমল স্বভাব
নিদারুণ নিদাঘের নেয়াপাতি ভাব"

লিখিয়া ব্যঙ্গরসের অবতারণা করিয়াছিলেন, এবং সমালোচক "সাহিত্য" সম্পাদক সমাজপতিকে লক্ষ্য করিয়া "সম আলোচক রজক 'সাহিত্য' পটে আছড়াইয়া আমার ময়লা কাপড় ধুইয়া দিয়াছে—ব—তুই ধোপা!" আক্রমণ করিয়াছিলেন; সেই গোবিন্দচন্দ্রের তীব্র কষাঘাতে তখনকার প্রবল প্রতাপান্বিত সাময়িক পত্র "বঙ্গবাসীও" জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন।

মনে পড়ে, সে অনেক দিনের কথা, যখন বঙ্গবাসীতে ভারতের জাতীয় মহাসমিতিকে লক্ষ্য করিয়া পঞ্চানন্দ

"কঙ্গরসের রঙ্গরসে দাদার আমোদ ভারী"

লিখিয়া কাতুকুতু দেওয়া হাসির মত দন্ত বিকাশ করিয়াছিলেন, তখন ১৩০৩ সনের পৌষ মাসে গোবিন্দ দাস এই নিন্দক-ক প্রবলবেগে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সে চাবুক তদানীন্তন পাঠক উপভোগ করিয়াছিলেন। এখন অনেকের মনে নাই।—

"কি বল্‌হে ব্যঙ্গভাষী একি কঙ্গরস?
ভুমিত বোঝনা অজ্ঞ
এ মহা জাতীয় যজ্ঞ
ধমনী চোয়ান নাহি চিন সোমরস!
এ যে মহা মাতৃপূজা
নহে সর্বে শরভুজা
নহে মেড়া নারিকেল তিল-তিল রস!
কাণে তালা, চক্ষে ঠুলি,
একবার দেখ খুলি,
এনহে সে "কেঁড় কেঁড়" কঠোর কর্কশ!
এ নহে ...... বাঁশী
...... ভুল পন্নী

* প্রবন্ধ লেখকের এই কথার সায় দিয়া আমরাও তাঁহার প্রবন্ধটী হইতে মগের মুলুকের বিস্তৃত আলোচনা পরিত্যাগ করিলাম। স্বর্গীয় কবিবরের সহিত এরূপ সাহিত্য প্রচার সম্বন্ধে আমাদের যে মত ভেদ ছিল তাহা এই প্রবন্ধ লেখক মহাশয়ের জানা থাকা সত্ত্বেও তিনি যে কেন এতদিন পরে সেই নষ্ট কাসন্দি ঘাটিতে গেলেন আমরা তার কারণ মোটেই বুঝিতে সমর্থ হইলামনা। প্রবন্ধের উত্তমাঙ্গ বা শীর্ষ ভাগ পরিত্যাগ করায় প্রবন্ধটী কবন্ধে পরিণত হইয়াছে; সে জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছি।

সৌরভ সম্পাদক।

এ নহে সে ঘানি গাছ তেলের কলস।
চীনা সোম এত নহে,
যে গন্ধ মাখানে রহে
আবিষ্কার করেছে যা কৃষ্ণ কলম্বস।"

এই ঘটনার কিছু দিন পূর্ব্বেই বঙ্গবাসীর সম্পাদক, স্বত্বাধিকারী ম্যানেজার ও প্রিন্টারের হাজতবাস ঘটিয়াছিল। তাই গোবিন্দচন্দ্র খুব জোরে যোগেন্দ্র বসুকে চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। যখন পত্রিকা চালান কষ্টসাধ্য দেখিয়া যোগেন্দ্র বসু দোকান ফাঁদিবার বন্দোবস্ত করেন যখন ছবি আঁকার নীচে ছড়া কাটার উত্তরে উপযুক্ত সংযোগী

"শুনছি না কি আবাগের বেটা পটল তুলেছে"

বলিয়া বঙ্গবাসীর উত্তর দিয়াছিল, তারই সমকালে গোবিন্দচন্দ্র তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে তাহাকে বিদ্ধ করেন। সে ব্যঙ্গে ব্যঙ্গভাষী আনন্দ অনুভব করেন নাই। তখনকার দিনের যাঁহারা সংবাদ রাখেন তাঁহারা সে সকল কথা জানেন। কংগ্রেস কে বিদ্রূপ করায় গোবিন্দ দাসের জাতীয়তায় আঘাত লাগিল। তিনি লিখিলেন,

"যারা খায় জুতা লাথি
জাগে সেই মৃত জাতি
তাদেরি বিজয় কেতু উড়ে দিক্ দশ!
কি বলিছে ব্যঙ্গভাষী একি ব্যঙ্গ রস?
... ...
একবার দেখ খুলি
গোচর্ম্ম চক্ষের ঠুলি
দেখ একবার খুলি মূর্খতা মুখস!
... ...
জান না জাতীয় যাগে
অস্থির সমিধ লাগে
হবির্মেধ, মহাচরু মজ্জার পায়স!
হিমাদ্রি এ মহাযূপ
আত্মদ্রোহী পশুরূপ,
তোমার মাংস লাগে গণ্ডা দুই দশ!

গোবিন্দচন্দ্র কিরূপ নিদারুণ আক্রমণ করিয়াছেন তাহা এই কবিতাংশ পাঠ করিলেই বোধগম্য হয়।

ব্যক্তি বিশেষের কাপুরুষতা লক্ষ্য করিয়া গোবিন্দচন্দ্র লিখিলেন

"দৈবে আমি যাঁর যদি
তার লাগি নিরবধি
করেছিস্ কত নাকি মারণের ক্রম!
করেছিস্ তন্ত্রমন্ত্র
কত নাকি ষড়যন্ত্র
গোবরের শিব গড়ি—পূজিস্ অধম!
... ...
যারে ভগবান রাখে
কে পারে মারিতে তাকে
আপনি তাহারে দেখে ভয় করে যম!
আমি যে বুঝিতে নারি
কি করে পাকালি দাঁড়ি,
এ বুড়া বয়সে তোর ঘুচিল না ভ্রম!
... ...
চারি দিকে ব্যঙ্গভাষী
বাজাইবে ঢোল কাঁসী
জামাতা বান্ধবা দিবে আজ অনুপম!
কিন্তু বল নারী চোরা
এতে কি লাগিবে যোড়া
সে যে রে কেটেছে নাক বড়ই বিষম!

গোবিন্দচন্দ্রের (বিক্রমপুরের বসন্ত) ও তেমনই ব্যঙ্গরসের আধার! যদিও সুধাংশুশেখর গোবিন্দ বাবুকে দ্বৈরথ সমরে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাতেই বোধ হয় গোবিন্দচন্দ্রের রচনা সার্থক হইয়াছে।

কোন্ নারী গিয়াছে বনে, বেত্রবনে তার
পাণ্ডবের গাণ্ডীবের মত রেখে আঁখি ঠার।
গাবের গাছে নূতন পাতা সিঁদুর যেন লাল
প্রেমের যেমন শেষ কালটা, কয়্‌টেতরে গাল॥
... ...
কাকের শব্দে কোকিল ভ্রম, কাকের কা কা খালি।
ননদের যেন চির সনদ বউকে দিচ্ছে গালি॥
... ...
পথের ধারে খালের পারে বিষ্ঠা বিক্ষেপণ
প্রাণয় ভেবে পালায়ে যায় মলয় সমীরণ।

অলি যাছি নাই এ দেশে, গুরের মাছি উড়ে

... ...

বাড়ীর পাশে খানা খন্দ অদ্ধ দাম দলে

তাইতে বাঁধা পারখানাটী পূর্ণ পচা মলে।

... ...

ছেলে আছে হিজল গাছে বাঁশের সিঁড়ি লাগা।

মেয়ে বুড়া বউ ঝি দেয় সে গাছের আগে কাগা॥

... ...

পয়দা হীনা ময়দা মেয়ে পদ্মা নদীর প্রায়

ভাল কথায় মন্দ অর্থে বিষম মল্লিনাথ

গন্ধে তাহার বন্ধ্যা নারীর ভয় যে গর্ভপাত।

... ...

বিশ্ববোবা এমন বোবা ত্রিভুবনে নাই।

কবি নিজ প্রণয়িণীর সঙ্গে ব্যঙ্গরস ছড়াইয়াই বেশী আনন্দ অনুভব করিয়াছিল।

"তুমি সাতরাজার ধন

তোমার বুকে পিঠে দুদিক মিঠে কাচামিঠে মন।

তোমায় লিখ্‌তে গিয়ে হাত খানিক্

ফুরায়ে গেছে মুক্তা মাণিক

উষা খানিক জোছনা খানিক

জলছে না তেমন।

... ...

তোমায় যদি দেখ্‌ত করি,

করে মিত চুরি করি।

কি ছার কৌস্তুভ তার— কণ্ঠ আভরণ

তুমি, সাতরাজার ধন।

শিশুপুত্র ভোলাকে বুকে লইয়া তাহার জননী নিদ্রামগ্না। কবি আনন্দে বিভোর হইয়া লিখিলেন—

"আরেক নূতন শশী উঠিয়াছে পুনরায়"

চাঁদের কোলেতে আহা চাঁদ কিবা শোভা পায়।

আবার উল্লাসে কেপে

সজোরে হৃদয়ে চেপে

সোহাগে সে সোনামুখী সোনামুখে চুমা খায়

এ দৃশ্য দেখিয়া সুখে

কি হিংসা জাগিল বুকে,

চুমিল উন্মাদ কবি ভোলা ও ভোলার মায়।

এই শ্রেণীর প্রেম কবিতা গোবিন্দদাসের অনেক আছে। তাঁহার কবিতায় চাপাচাপি ঢাকাঢাকি নাই, খোলা কথা। যাহা করিতে পারিবেন, তাহা বলিতে গোবিন্দদাসের বিন্দুমাত্রও দ্বিধা নাই। অবশ্য সমাজ এ সকল কার্য্য সমর্থন করেন না, কিন্তু কবির সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ কম। তিনি সমাজ ও সংসারের অনেক উপরে। প্রেমে ধ্যানমগ্ন কবি বলেন,—

"আমি দেখি বসুন্ধরা, কেবলি তোমাতে ভরা

আছি তব বিশ্বরূপে ডুবে অকূলে

অতুল আনন্দ তাই, শোক নাই দুঃখ নাই,

ভাক্তভরে যাহা পাই দিতেছি তুলে॥

সুতরাং লজ্জা সরম ভরম তাঁহার ত আর নাই। তিনি তখন এ সকলের অনেক উপরে। কারণ তিনিই বলিয়াছেন

পুরাতন প্রেম ... ...

বেদনার স্থানে হৃদয়ে মাখিলে

... অমৃত হয়। ...

নহিলে কি আর "ভোলার সাথে আড়ি দিতে পারিতেন। এমন প্রেমোন্মত্ত না হইলে কি আর মুখ ফুটিয়া কহিতে পারিতেন—

"কত যে ধরিয়া পায়, কাঁদিয়াছি হায় হায়

সরলা! আছে কি আজি স্মরণ তোমার?

"পায়ে ধরি সাধার সুখ" অনেক প্রেমিকের জানা আছে, "দেহি পদ পল্লব মুদারম্" মানভাঙ্গাইবার চরমচেষ্টা, ইহাও অনেকেই জানেন,—মুখ ফুটিয়া বলিয়াছেন গোবিন্দদাস তারপর আরো একটু উঠিয়াছেন; বোধ হয় দোজবরেদের অদৃষ্টে তাই ঘটে—

আয় বালিকা খেলবি যদি এই এক নূতন খেলা।

পুতুল টুতুল রেখে দিয়ে

চল বকুলের বনে গিয়ে

বৌ বৌ বৌ খেলি মোরা ফুলল সন্ধ্যে বেলা।

না ভাই তুমি ছুই বড়

আচল টেনে আকুল কর,

তোমায় কেবল ঘোম্‌টা খুলে উদলা করে ফেলা।

চখে মুখে বুকে তুমি ফুল দে মার ডেলা॥

তারপর যখন বালিকার এতাবটী একটু ঘুরিয়া গেল তখন সে নিজ মুখেই বলিল—

তোমার মনে গেছে ভাই।
সকাল আসতে ভুলে যাই।

ইহাই প্রেমের ধারা। এ সকল কবিতায় অশ্লীলতা নাই, তবে সত্য বলা আছে। যাঁরা বলেন সকল সত্য বলিতে নাই, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। যাহারা গোবিন্দদাসের কবিতা শুনিবার ভয়ে ঢাকা সংহিতা সম্মিলনের আসর পর্য্যন্ত কতক্ষণের জন্ত ত্যাগ করিয়া সুরুচির কুটীরে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ॥ (অবশ্য শ্রদ্ধেয় লেখক গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী যেরূপ তারস্বরে গোবিন্দদাস প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ছিলেন—তাহাতে অনেক সুরুচির দুর্ত্তেরই কাণে মধুবর্ষণ করিয়াছিল)।

প্রেমিক কবি বলিতেছেন

"দেখে যেন সবঠাই
তুমি ভিন্ন কিছু নাই॥

তোমার জন্যে—

বিদেশে প্রবাসে হায়, নিত্য ব্যাধি যন্ত্রনায়
সহিলাম কত কষ্ট দুখ দুনিবার
মানুষের যা মহত্ব চিত্তের স্বাধীন স্বত্ব
স্বর্ণলোভে করিয়াছি বিনিময় তার।
সকলি সহিয়াছিরে, প্রাণময়ী প্রেয়সীরে
কেবল চক্ষের জল মুছিতে তোমার।
কেবল তোমার তরে, সুখশান্তি অকাতরে
জীবনের যত আশা করি পরিহার,
হায় এ সন্ন্যাসীবেশে, ফিরিয়াছি দেশে দেশে
প্রাণময়ী প্রেয়সিরে কাঙ্গাল তোমার।

স্বর্ণলতা প্রিয়তমার স্বরূপ বর্ণনায়ও কবি পশ্চাৎপদ হন নাই।

"তুমিগো মাটীর মেয়ে, আছ মাটী পানে চেয়ে
মাটীর শরীরে সব সকলি তোমার।"

কবিপত্নী সারদাসুন্দরীর শোচনীয় মৃত্যুর পর শ্মশানে বসিয়া কবির ক্রন্দন "কি দেখিতে আসিয়াছ ওহে শশধর" কোন কোন সমালোচক বন্ধু বড় অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মৃতপত্নীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পাঁচ পৃষ্ঠা কবিতা রচনা করা সম্ভবও নয়—প্রেমিক পত্রের লক্ষণও নয়। কথাটা কবিকে জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন—"কবিতাটী সারদার মৃত্যুর দশদিন পরে লেখা। শ্মশান চিত্রটী ভাবিতে ভাবিতে শেষ রাত্রিতে বসিয়া কবিতাটী লিখিয়াছিলাম। বস—ফুরাইল সমালোচকের আপীল। কবি মানস নয়নে যে চিত্র—চিতায় দর্শন করিয়াছেন—তার সঙ্গে সাক্ষাৎ চিতার পার্থক্য কোথায়? পত্নী বর্ত্তমান থাকা অবস্থায় যে কি করিয়া কবি শ্রীযুত কুমুদরঞ্জন মল্লিক—

"ভিড়ায়ো না চলুক তরী নদী মাঝে
তরী হেথা বাঁধব না কো আজকে সাঁঝে।
... .
এই নদীর ওই ঘাটেতে তটিনীর অই শ্যামল কূলে
দিছি আমার স্বর্ণলতার আপন হাতে চিতায় তুলে

গানটী অশ্রুপ্লাবিত কণ্ঠে গাহিলেন,—তাহা আমাদের মত লোকের বুদ্ধির অগোচর। কবিরা সব পারেন,—এবং সব পারেন বলিয়াই তাঁহারা কবি।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

অঞ্জলি।

সম্রাট নন্দিনীর উদ্বাহ।

আগেকার দিনের রাজা মহারাজাদের এক একটী মেয়ের স্বয়ম্বর উপলক্ষে কত বিরাট ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইত!

কন্যা বরয়তে রূপং মাতাবিত্তং পিতা শ্রুতং
বান্ধবাকুল মিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ॥

সাধারণ লোকের এই মিষ্টান্ন লালসা মিটাইতে বড় বড় পুকুর কাটিয়া কোনটাতে ঘি, কোন পুকুরে দই, কোন পুকুরে ক্ষীর বোঝাই হইত। কিন্তু সেদিন পৃথিবীতে যে রাজ্যের সূর্য্য অস্ত যায় না সে রাজ্যের রাজার মেয়ের বিবাহ হইয়া গেল আর আমরা প্রজারা মিষ্টান্ন খাওয়া দূরে

থাক গন্ধও পাইলাম না। যদি কেহুই কেহ না লইয়া থাকেন সেজন্য লিখিতেছি যে ভাইকাউন্ট লেসেলির সহিত আমাদের সুন্দরী নন্দিনী মেরীর শুভোবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে।

অন্যান্য বাণিজ্যের মত অবাধ প্রেম যেখানে প্রচলিত সেখানেও কিন্তু রাজার মেয়েদের বেলায় বড় বেশী পিড়াপিড়ি। এই জ্বালায় নাকি রাণী এলিজাবেথ চিরকুমারী ছিলেন।

একুশ বৎসরের নীচে বয়স হইলে ইংরেজ কন্যার বিবাহে পিতার সম্মতি লইতে হয় তৎপরে দরকার হয় না কিন্তু ইংলণ্ডে রাজ্যের মেয়ের বিবাহ পিতার সম্মতি ভিন্ন কিছুতেই হইতে পারে না। এই বিষয়ে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় জর্জ্জের রাজত্ব সময়ে যে আইন হইয়াছিল অদ্যাপি তাহার একচুল ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু এই আইনের শেষ অংশটুকু আরও মজার—রাজ পরিবারের কেহ কেহ এই আইন অমান্য করিয়া পিতার সম্মতি ব্যতিরেকে বিবাহ করিবে, যে এই বিবাহে সাহায্য করিবে, অথবা ঐরূপ বিবাহে উপস্থিত থাকিবে তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে এবং রাজার ইচ্ছানুযায়ী সময় পর্য্যন্ত কারারুদ্ধ থাকিবে যদি কেহ বলিতে চাহ যে উক্ত বিবাহকারী বা তাহার সন্তানসন্ততি ইংলণ্ডের সিংহাসন পাইতে পারে তবে তাহারও উক্তরূপ দণ্ড ব্যবস্থা॥

রাজা তৃতীয় জর্জ্জের কনিষ্ঠ পুত্র মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাকা সাসেক্স এর ডিউক পিতার অনুমতি না লইয়া দুইবার বিবাহের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। প্রথমবার রোমে যাইয়া কোন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ললনার পানি গ্রহণ করিয়াছিল ডিউকের মৃত্যুর পর তাহার একমাত্র পুত্র লর্ড উপাধি গ্রহণ করিয়া আভিজাত্যের দাবী করিলে তাহার পক্ষের কাউন্সেল যুক্তি দেখাইলেন যে এই আইন বিদেশে অনুষ্ঠিত বিবাহের প্রতি প্রযুজ্য নহে। কিন্তু লর্ড সভা উক্ত প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। পৃথিবীর যে কোনও স্থানে অনুষ্ঠিত বিবাহে এই আইন খাটিবে তাহারা ইহাই শেষ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের রাজপরিবারের মেয়েদের যাবৎ ইউরোপের রাজা রাজ বিবাহেই বিবাহ করিবার প্রথা চলিয়া আসিতে ছিল। তাহাতে প্রজাতন্ত্রের রাজ্যে প্রজারা নানাপ্রকার রাজনীতির অসুবিধা পোষণ করিত। বর্ত্তমান বিবাহ ইংলণ্ডেরই শ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত ঘরে অনুষ্ঠিত হওয়ায় ইংলণ্ডের লোকের বেশী আনন্দ হইয়াছে। যদিও এ বিবাহ রাজার ছেলের সহিত না হওয়ায় চিরাগত প্রথার ব্যতিক্রম হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম বলা যায় না কারণ বর ও কন্যার শরীরে একই পূর্ব্ব পুরুষের রক্ত প্রবাহিত। কারণ রাজা সপ্তম হেনরী হইতে উভয়েরই বংশোদ্ভব ঘটিয়াছে। ভিন্নমতে সপ্তমহেনরী উভয়েরই বীজী পুরুষ। রাজকন্যা সপ্তমহেনরী হইতে পঞ্চদশ পুরুষ এবং লর্ডলেসেলি ষোড়শ পুরুষ। সুতরাং রাজবংশে বিবাহ হয় নাই ইহা জোর করিয়া বলা যায় না।

নব দম্পতীর মধু যামিনী (Honeymoon) যাপনের জন্য যে স্থান নির্ব্বাচিত হইয়াছে তাহার সহিত বাহিরের কোনও সংশ্রব নাই, ২১ জন ভিন্ন পরিচারক ও অন্য বাহিরের কোনও সংবাদ লইয়া তাহাদের নির্জ্জনতা ও নির্ব্বোধ শান্তি ভঙ্গ না করে এ জন্য টেলিফোন তার পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। নব দম্পতি বিভিন্ন স্থান হইতে যে উপহার রাশি পাইয়াছেন তাহার মূল্যাদি কোটী মুদ্রার ও বেশী হইবে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত।

প্রেরণা।

ভাবি কিছু লিখিব না—গাহিব না গান
করিব নীরব রহি শুধু অপমান
ঋতুরাজ বসন্তের! তবুরে যখন
কোন্ জনমের মোর সুখের স্বপন
জাগায়ে নিভৃত চিতে কোকিল কুহরে,
সুধীরে মলয় বয়, উঠেগো শিহরে
মুকুলিত আম্র-শাখা, কুসুমিত বন,—
তখনি আকুল হৃদি উথলে কেমন
নাহি মানে অভিমান! রুদ্ধ সাধ যায়
গাঁথি মালা, রত হই মাধুরী পূজায়,
ভুলে যাই সব কথা! জানি আয়োজন
বৃথা হবে, তবু হায়, করি নিবেদন
আপনা স্মরিয়ে ভুলি! কার এ প্রেরণা
প্রিয়া-হারা মৃত-প্রাণে জাগায় চেতনা।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।
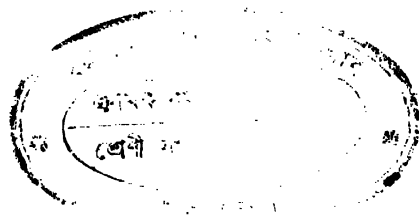
স্বর্গীয় মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর।

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা।

সৌরভ

দশম বর্ষ। | ময়মনসিংহ, বৈশাখ, ১৩২৯ সন। | চতুর্থ সংখ্যা।

মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুরের শিকার কাহিনী।

সাপের মুখে হরিণ।

১

আজ off day—আজ আর শিকারে বাহির হইব না। আজ আমাদের পূর্ণ বিশ্রামের দিন। শিকারী মাত্রেরই সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন off day নির্দ্ধারিত থাকে। যাঁহারা হাতীতে শিকার করেন, তাঁহাদের প্রায় একদিনে কুলোয় না; দুইদিন তাঁহারা বিশ্রাম করিয়া থাকেন; নতুবা গায়ের ব্যথা কমে না, ঘুরঘুরোণ দূর হয় না। আমার প্রথম বয়স, হাল্‌কা শরীর, শিকারের জুস্‌ ও খুব প্রবল ছিল। সুতরাং আমি সপ্তাহে একদিনই বিশ্রামের জন্ত নির্দ্ধারিত করিয়া লইয়াছিলাম।

বসন্তের প্রভাত বেলা; ৭টা বাজিয়া গিয়াছে। শয্যায় পড়িয়া সাহেবের সঙ্গে নানারূপ গল্প জুড়িয়া আলস্ত ভঙ্গ করিতেছি। Boy চায়ের সরঞ্জাম লইয়া হুকুম অপেক্ষায় পার্শে দাঁড়াইয়া আছে। এমন সময় অনতিদূর হইতে এক ভীষণ চীৎকার ধ্বনিত হইল। Boy চমকিয়া উঠিল, চায়ের পেয়ালা স্থান ভ্রষ্ট হইয়া গেল; আমি চকিতে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলাম। আবার চীৎকার!—সাহেব এক লম্ফে তাঁহার শয্যা ছাড়িয়া তাঁবুর বাহির হইয়া পড়িলেন। ঘন ঘন চীৎকার হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ মধ্যেই বেশ বুঝিতে পারিলাম—এ হরিণের চীৎকার। খুজি মিঞার ডাক পড়িল কিন্তু তাহার সাক্ষাৎ নাই। বিউগল দেওয়ার ৫। ৭ মিনিট পরে বৃদ্ধ খুজি সাহেব গাম্‌ছা মুড়ি দিয়া, এক বদ্‌না হস্তে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। খুজি পাকা শিকারী খুব হুঁসিয়ার লোক, চীৎকার শুনিয়াই পিলখানায় যাইয়া দুটী হাতী শিকারের জন্ত প্রস্তুত হইয়া তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে হুকুম দিয়া আসিয়াছে।

চীৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করায় খুজিসাহেব বলিল,—"হরিণের চীৎকার, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু হরিণ কোন ফেসাদে পড়িয়াছে মহারাজ। খুব সম্ভব, বাঘে তাড়া করিয়াছে। জঙ্গলে নিশ্চয়ই বাঘ আছে, মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই আবার ঘন ঘন চীৎকার হইতে লাগিল। খুজি কাণ পাতিয়া কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অশ্মশ্রু বদন নাড়িয়া বলিল,—"না হুজুর বাঘে এতক্ষণ হরিণ লইয়া খেলা করে না। দু চার মিনিটের মধ্যেই কার্য্য ফতে করিয়া দেয়। এত বিলম্ব বাঘের হয়ই না,—বাঘ রক্ত দেখিলেই ক্ষেপিয়া যায়, ইহাই হুজুর বাঘের প্রবৃত্তি। ইহা অন্ত রকম ব্যাপার। হুজুর, নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে নূতন কোন মজা আছে। আপনারা তৈয়ারী হউন,—আমি চীৎকার শুনিয়াই পিলখানায় হাতী সাজাইতে বলিয়া আসিয়াছি; স্তর-জমিনে গেলে তদন্ত ঠিক হইবে। —"বিলের বেড়" হইতে শব্দ হইতেছে। বড় বেশী দূরও নয়; তাঁবু হইতে এক মাইল মধ্যেই মাজরা স্থান। আর সময় নষ্ট করিয়া কাজ নাই, ঝটিতে তৈয়ারী হউন হুজুর"!

আটটার হাতী দুটী তাম্বুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। চা পান শেষ করিয়া আমরাও হাতীতে উঠিলাম। আমার হাতীতে খুজি মিঞা, আর সাহেবের হাতীতে রহিম নামে একজন মাঠিয়া পালোয়ান উৎকৃষ্ট শিকারী। এই শ্রেণীর মাঠিয়া পালোয়ান, কুস্তীর পালোয়ান নয়;

ইহারা শিকার ব্যবসায়ী, অর্থাৎ বিনা শোয়ারে মাটিতে দাঁড়া শিকার করিয়া থাকে।

আমরা চীৎকার লক্ষ্য করিয়া দ্রুত গতিতে বিলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

এইস্থানে,—"বিলের বেড়ের" সামান্ত একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

তাম্বুর সম্মুখ দিয়া একটি ক্ষুদ্র ঝরণা প্রবাহিত হইতেছিল, তাহার অপর পারে কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়াই প্রায় অর্দ্ধ মাইল বিস্তৃত লম্বা রকমের এক প্রকাণ্ড বিল। নিকট পাশে লোক জনের বস বাস নাই। গভীর নলবন প্রাচীরের মত বিলের চারিদিকে ঘেরিয়া আছে। আর মাঝে মাঝে দু-চারিটী পলাশ ফুলের গাছ। এ স্থানটী মধুপুরের গড়ে—"বিলের বেড়" নামে প্রসিদ্ধ।

অতি সন্তর্পণে, চীৎকার লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে বিলের পূর্ব্ব পারে উপস্থিত হইলাম। চীৎকার তখনও হইতেছে, কিন্তু ঘন-ঘন নহে, ততটা জোরেও নহে; যেন অতি অবশ চীৎকার।

সংখ্যা নাই, কিন্তু এ ক্ষেত্রে এই শিকার ব্যপদেশে যে অচিন্তনীয়, অদ্ভুত এবং অঘটনীয় ব্যাপার আমাদের দৃষ্টি পথে পতিত হইয়াছে, তাহা শুনিয়া আপনারা স্তম্ভিত হইবেন, এবং পশু চরিত্রের মধ্যে যে মানবীয় উচ্চ বৃত্তি—স্নেহ-দয়া প্রভৃতি বীজ নিহিত ও লুক্কাইত আছে, তাহার উন্মেষ দেখিয়া আপনারা একান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

নলবন ভাঙ্গিয়া আমরা ধীরে ধীরে বিলের দিকে অগ্রসর হইতেছি। গভীর জল চারি দিকে নানাবিধ বন্য কণ্টক লতায় সমাবৃত। হাতী আর অগ্রসর হইতে চায় না, মাহুৎ বেচারী অতি কষ্টে ছিন্ন বিছিন্ন দেহে অঙ্কুশের উপর অঙ্কুশ মারিয়া, হাতী চালাইতে লাগিল, প্রায় দশ মিনিট এইরূপে গমনের পর, ঘটনাস্থলের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। স্থানটি অপেক্ষাকৃত পরিস্কার। একটী প্রকাণ্ড নিষ্পত্র পলাশ বৃক্ষ রক্ত কুসুম সম্ভারে সজ্জিত হইয়া, ফুলের ডালি মাথায় করিয়া যেন অঞ্জলির অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। দুটি 'দয়েল" শাখায় বসিয়া স্তুতিগান করিতেছে। বৃক্ষটির সম্মুখ দিয়া জলাশয়ের সন্নিকট ভাগে নূতন ঘাস গজাইয়া উঠিয়াছে। স্থানটী বেশ পরিস্কার বটে; কিন্তু মাঝে মাঝে নলের ঝোপ থাকার দরুণ, ব্যাপার কি দৃষ্টি পথে পতিত হইতেছে না। হরিণের চীৎকার লক্ষ্য করিলে মনে হয়, যেন জলাশয়ের মধ্য হইতেই সেই বিপন্ন জীব চীৎকার করিতেছে।

বিলবেড়—মধুপুর।

হাতী দাঁড় করাইয়া খুজিমিঞা, তাহার বন্দুকটী এবং রহিম তাহার সেই মান্ধাতার আমলের পুরানো বন্দুকটী হাতে লইয়া হাতী হইতে অবতীর্ণ হইল। আমরা ধীরে ধীরে তাহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিলাম। পলাশ গাছের বেড় ঘুড়িয়াই খুঁজি মিঞা ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া

(২)

পাঠকগণ, আরব্য উপন্যাসে, এবং নবন্যাসে আপনারা কত আজগুবী গল্প শুনিয়াছেন, স্বপ্নের ঘোরে কত সময় কত যে অলৌকিক দৃশ্য দর্শন করিয়াছেন, তাহার

দাঁড়াইয়া থাকিয়া আমাদের প্রতি ইঙ্গিত করিল, আমরা তাহার ইঙ্গিত অনুসরণ করিতে না করিতেই, রহিম গুড়ুম করিয়া বন্দুক আওয়াজ করিল। সাহেব বন্দুক তুলিতে না তুলিতে আমাদের পাশ কাটিয়া এক প্রকাণ্ড নেকড়া বাঘ লম্ফ দিয়া গভীর নলবনের মধ্যে প্রবেশ করিল। সাহেব হাতী ঘুরাইলেন, তখনও হরিণের অস্পষ্ট শব্দ শোনা যাইতেছিল। আমি পথ রোধ করিয়া, "জানে দাও" বলিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইলাম।

জলাভূমির সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম,—একটী হরিণ কর্দ্দমে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। তাহার সম্মুখ ভাগ ডাঙ্গায় আর পশ্চাদার্দ্ধ কর্দ্দমে নিমজ্জিত। জল তথায় অল্প বলিয়াই বোধ হইল; হাতী আর অগ্রসর হইতে পারিতেছেনা। কর্দ্দমে পা বসিয়া যায়, সাহেব নামিতে চাহিলেন, কিন্তু বাঘ দেখা গিয়াছে বলিয়া আমি সাহেবকে নামিতে না দিয়া,—"বিউগল" দিলাম, অমন্‌ তদূর হইতে সাঙ্কেতিক শব্দ হইল। —বুঝিলাম খুজি এবং রহিম কাছেই আছে। তাহাদের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া হরিণের "কাতরাণী" দেখিতেছি। মনে বড়ই কষ্ট হইল, হায়! বেচারী কর্দ্দমে পড়িয়া জীবন সঙ্কট করিয়া তুলিয়াছে। সাহেব ঐ অবস্থায়ই গুলি চালাইতে চাহিলেন; আমি, বিপন্ন জীবনের প্রতি এতটা নির্দ্দয় হইতে অক্ষম হইয়া সাহেবকে বাধা দিলাম।

ইতি মধ্যেই সদ্যোজাত একটী মৃগ শাবক কোলে লইয়া রহিম আসিয়া হাজির হইল। তাহার পশ্চাতে;—খুজি মিঞা।

খুজি মিঞা সসব্যস্তে বলিল—"হুজুর আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! এমন আর জীবনে কখন দেখিও নাই, শুনিও নাই। বাঘের মুখে হরিণের ছা।"

হরিণের বাচ্চাটী আমাদের সম্মুখে স্থাপিত হইলে সেই কর্দ্দমে পতিত হরিণী শিশুটীর প্রতি চাহিয়া, এমনই করুণ স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল যে আমাদের মন তাহার সে আর্ত্তনাদে মুহূর্ত্তে গলিয়া গেল। আমরা বুঝিলাম এ তাহারই, সদ্য প্রসূত শিশু। হয় ত প্রত্যুষে বেচারী জল পান করিতে গিয়া কর্দ্দমে পা বসাইয়া এই দৈব বিড়ম্বনা ভোগ করিতেছে। হৃদয়কে নির্দ্দয়তার আবরণে ঢাকিয়াই শিকারে বাহির হইয়াছি। কিন্তু সম্মুখে এই অবস্থাটী প্রত্যক্ষ করিয়া হৃদয় কে আর কঠোর করিয়া রাখিতে পারিলাম না। প্রাণের গভীরতম প্রদেশে তখন করুণ বীণার শিথিল তার অলক্ষিতে যেন আপনিই ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। হাতী হইতে নামিয়া মৃগ শিশুটীকে নিজে তুলিয়া কোলে লইয়া পলাশ গাছের নীচে দাঁড়াইলাম। আমার দেখাদেখি, সাহেবও আগ্রহের সহিত নীচে নামিয়া আসিলেন। আমি বলিলাম—"যে জীবিত অবস্থায় হরিণীকে উদ্ধার করিয়া আনিতে পারিবে, বিশ টাকা তাহার বকৃশিস।" হরিণ বেচারী তখন বড়ই অবসাদ গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

রহিম খুব জোয়ান যুবক, সে দুহাতে সেলাম করিয়া অমনি বল্লমে ভর করিয়া কর্দ্দমের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল। সে কয়েক পা অগ্রসর হইয়াই "বাপরে" বলিয়া ভীষণ চীৎকারে আবার বল্লমের উপর ভর করিয়া পলট খাইয়া আসিয়া মাথায় হাতদিয়া বসিয়া পড়িল। বাতাহত কদলি পত্রের ন্যায় তাহার শরীর কাঁপিতেছিল; সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল;—"হুজুর; তালগাছ, তালগাছ! —এত বড় সাপ কখনও দেখিনাই। কালীয় দমন! সাপটা হরিণটাকে ধরিয়াছে, হরিণের পাছা পা টা সাপে একেবারে গিলিয়া ফেলিয়াছে। হুজুর শীঘ্র গুলি করুন, দুজনে এক সঙ্গে,—একা নয়;—এক গুলিতে এতবড় সাপ পড়িবেনা। হরিণের পাছার দিকেই সাপের মাথা, ভয়ানক অজগর! কাল মিছি—কালীয় দমন!"

সাহেব এবং আমি ত্বরিতে রাইফেলে বিশমবরী বড় কার্টুজ পুরিয়া,—বিপন্ন হরিণ বেচারীকে যথা সম্ভব

বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়া দুদিক হইতে এক সঙ্গে গুলি করিলাম, কিন্তু কিছুই হইল না। হরিণ আরও চীৎকার করিতে লাগিল,—তখন খুজি মিঞা ক্ষিপ্র করে লগ্গ টানিয়া নিজেই হরিণের সম্মুখীন হইল। খুজি কাদার উপর তক্তা ফেলিয়া সহজেই অগ্রসর হইয়াছিল। তখন অজগর শিকার উদ্গীরণ করিবার চেষ্টা করিয়া, জলের দিকে ভাসিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহার ইঙ্গিতে আমরা দুইজনে অগ্রসর হইয়া আবার উপর্য্যোপরি দুধার হইতে গুলি করিলাম; হরিণটা ছিটকাইয়া একটু সম্মুখে আসিয়া পড়িল। অজগর, তিন চারি হাত পর্য্যন্ত মাথা উত্তোলন করিয়া গভীর জলের মধ্যে ঘুরিয়া পড়িল। দেখিলাম,প্রকাণ্ড সাপ, যথার্থ ই তাল গাছের মত, কালো মিহি! বুঝিলাম, সাপের উপর গুলি লাগিয়াছে; নতুবা হরিণটা এই ভাবে ছিটকাইয়া পড়িত না।

সাপের আর সন্ধান পাওয়া গেল না। আমরা হরিণটীকে বাঁচাইবার চেষ্টায় অগ্রসর হইলাম।

হরিণটীকে কাছে আনাইয়া কর্দ্দম ধৌত করাইলাম। দেখিলাম, তাহার পশ্চাতের পা খানার যতটা সাপে গিলিয়াছিল, যেন সিদ্ধ হইয়া সাদা হইয়া গিয়াছে। উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তি নাই। শক্তি হীন নির্জ্জীব অবস্থায় বাচ্চাটীর প্রতি তাহার সস্নেহ দৃষ্টি রাখিয়া বেচারি পড়িয়া রহিল। বাচ্চাটী তাহার সম্মুখে আনিয়া রাখিলে মুমূর্ষু মৃগী শিশুটিকে নিকটে পাইয়া যেন সঞ্জীবন বলে, ঐ বিকলাঙ্গ অবস্থায়ই শিশুটির গা চাটিতে লাগিল, হায়' মাতৃস্নেহ কি অপার্থিব স্বর্গীয় বস্তু। প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়িল, ক্ষণকাল নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তখন ঐ বিপন্নজীবকে বাঁচাইবার জন্ত প্রাণে একটা অসীম আগ্রহ জাগিয়া উঠিল;—খুজিকে জিজ্ঞাসা করিলাম;—"হরিণ বাঁচিবে কি?" খুজি মাথা নাড়িয়া বলিল;—"না হুজুর, সাপের আধার বাঁচে না।"

আমার প্রাণে তখন এই বলবতী বাসনা জাগিয়া উঠিল, হরিণটাকে বাঁচাইতে পারি কিনা। সতর্কযত্নে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবই দেখিব।" হরিণটীকে হাতীতে তুলিয়া তাঁবুতে ফিরিতে মনস্থ করিলাম।

(৩)

খুজি জোর হাতে সেলাম করিয়া বলিল—"হুজুর, আশ্চর্য্য তামাসা।" বলিয়া উল্লিখিত পলাশ গাছের নীচে যেখানে বাঘের উপর রহিম গুলি করিয়াছিল,—আমাদিগকে সেইখানে লইয়া গেল! গাছের উত্তর দিক ঘুরিয়া একটী বনের ঝোপ দেখাইয়া বলিল, "এই বাচ্চাটী লইয়া 'বাঘ এখানে খেলা করিতেছিল। আমরা স্পষ্ট দেখিয়াছি, বাচ্চাটী ছুটিয়া ছুটিয়া জলের ধারে যাইতে চায়, আর তখনই বাঘ সাম্‌না আগুলিয়া তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়, দুহাতে আঁজা করিয়া বাচ্চটিকে বুকে টানিয়া নেয়।

তাজ্জব ব্যাপার! হুজুর, তাজ্জব ব্যাপার! বাঘের মতলব খারাপ থাকিলে এই বাচ্চাটি এই ভাবে ধরিতে পারিতাম না। দেখুন হুজুর, বাচ্চার গায়ে, নখির দাগ বা আক্রমণের কোনরূপ চিহ্নই নাই। আল্লার কদ্রৎ!"

সংসারে আমরা কত দেখি, কতগুনি, এবং কত বিষয়ই যে অবস্থা বিশেষে ভাবিয়া থাকি, তাহার স্মৃতি কই! এ সংসার প্রহেলিকার এক অসম্পূর্ণ গ্রন্থ, এ গ্রন্থের শেষ যে কোথায়, জ্ঞানী বিজ্ঞ মানব সমাজ আজ পর্য্যন্ত তাহার মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। আমি শিকারী পাশব বৃত্তি লইয়া জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াই, আমারতো কোন কথাই নাই।

যথা সময়ে আমরা হরিণ লইয়া তাবুতে ফিরিলাম। বহু চেষ্টায়ও হরিণ বাঁচিল না। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বেচারী ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, এবং সন্ধ্যার পরেই শিশুটির প্রতি চাহিয়া থাকিতে থাকিতে, অশ্রুধারায় মাতৃ-স্নেহের শেষ নিষ্প্রভ দীপ নির্ব্বাণ করিয়া মৃগ জীবনের লীলা খেলা সমাপ্ত করিল।

বিষাদ মনে আমরা রাত্রি কর্ত্তন করিলাম। ভাল নিদ্রা হইল না। কেবলই হরিণের চীৎকার! ঘুমের ঘোরেও চীৎকার শুনিলাম। পরদিন প্রাতে সংবাদ আসিল, মরা সাপ বিলের জলে ভাসিয়া উঠিয়াছে। প্রকাণ্ড সাপ; মানুষে আনিতে পারিবে না। হাতী চাই। হাতী এবং লোক লস্কর পাঠান হইল। আগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বেলা দশটার সময় কাছিতে বাঁধিয়া,

হাতীতে টানিয়া সাপ আনিয়া তাম্বুর সাম্‌নে ফেলিল। জঙ্গলে মেলা বসিয়া গেল, তামিলদিগেরে হৈ চৈ ব্যাপার! চিড়া গুড়ে যথাসম্ভব, ফলাহারের ব্যবস্থা করিয়া জনতা সন্তুষ্ট করিলাম।

সাপটী দৈর্ঘ্যে তেইশ ফুটের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধ এবং পরিধিতে ছয় ফুট ছিল। পরদিন সাপ সহরে পাঠাইয়া দিলাম। সাপ দেখিবার জন্য সহর ভাঙ্গিয়া তামিলদিগের জমিয়াছিল।

এদিকে হরিণের বাচ্চা লইয়া আমি বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলাম। আমি নিজেই তাহার লালন পালনের ভার গ্রহণ করিলাম। ভৃত্য দিয়া বিশ্বাস নাই, তাহারা এ সকল কার্য্যে সর্ব্বদাই অযত্ন করে। সুতরাং নিজেই সাম্‌নে বসিয়া তাহার আহার যোগাইতাম। স্নানের বেলা নিজেই কাছে গিয়া স্নান করাইয়া দিতাম। শিশুটীও আমাকে পাইলে,—হারাণো মাণিক পুনঃ প্রাপ্তির মত আহ্লাদে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিত। লাফাইয়া আমার পথ আগুলিয়া ধরিত। ব্যাপার গুরুতর! আমি সংসারী জীব ঘোর বিষয় লিপ্ত! জড়ভরত হইবার আশঙ্কায় শেষটা উহাকে পিঞ্জরায় পুড়িবার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইলাম।

শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

স্নেহের দান।

(৫)

মুকুলটী যেমন ধীরে ধীরে রূপ-রস-গন্ধ-মাধুর্য্যে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়া উদ্যান স্বামীর মন বিমুগ্ধ করে, বালিকা কুসুমও সেইরূপ রূপ-রস ও কোমলতা-মাধুর্য্যে মাখনের হৃদয় তেমনি ধীরে ধীরে মুঞ্জরিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইহাদের একটীকে যেন আর একটী না দেখিলে মুহূর্ত্ত থাকিতে পারিত না। এই যে আকর্ষণ, ইহা প্রেমের আকর্ষণ নহে, ইহা ছিল প্রীতির আকর্ষণ। বাড়ীশুদ্ধ সকলেই ইহা জানিত। এবং সকলে ইহাও জানিত যে ইহার মধ্যে আবিলতার লেস মাত্রও নাই।

কিন্তু আজ জেঠা মহাশয় এবং জেঠাইমার সম্মুখে দীনেশ যখন অতি ইতরের ভাষায় তাহার উপর চাপাইয়া দিল, এই বিশ্বাস ঘাতকতার লজ্জাজনক দোষারূপ, তখন সেই নিরপরাধ কিশোর বালকের অবস্থা যে কিরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা সে নিজেই টের করিয়া উঠিতে পারিয়াছিল না। জেঠা মহাশয় এবং জেঠাই মাও যে দীনেশের কথা অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন, তেমনও সে মনে করিতে পারিতেছিল না। বরং জেঠা মহাশয় যে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন, সেই কথাই মাখনের পুনঃ পুনঃ মনে হইতেছিল।

যে পর্য্যন্ত বাড়ীর সকলের আহার শেষ না হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত মাখনকে কেহ নিস্তার দেয় নাই। সকলেই তাহাকে আসিয়া খাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। যদু গ্রামান্তরে গিয়াছিল; সে এ সকল ব্যাপারের কিছুই জানিত না। বাড়ীতে আসিয়া মায়ের নিকট শুনিয়া সেও আসিয়া মাখনকে অনুরোধ করিয়া গেল। বলরাম সন্ধ্যার পর হাট হইতে আসিয়া হাত মুখ ধুইয়া পাড়ায় গিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া মধুর নিকট শুনিলেন মাখনের পরামর্শে মাষ্টার দীনেশকে মারিয়াছে,—দীনেশ এরূপ বলায় মাখন রাগ করিয়াছে।

কুসুম সম্বন্ধীয় অপবাদ-কথা কেবল দীনেশের মুখ হইতেই যাহা বাহির হইয়াছিল। তারপর সে কথা চাপা পড়িয়া গিয়াছে; অন্য কেহ সে কথা শোনে নাই।

বলরাম খাইতে বসিয়া বউ ঠাকুরাণীকে বলিলেন—"মাখন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই যখন খাইয়াছে, তখন আর তাহাকে বিরক্ত করিয়া কাজ নাই; আপনারা খাইয়া ফেলুন।"

বউ ঠাকুরাণ বলিলেন—"তাহাকে রাগ করাইয়া অভুক্ত রাখিয়া আমি খাইব—একি হয়?"

বলরাম বলিলেন—"তা খুব হয়; কনিষ্ঠের জন্য জ্যেষ্ঠের কষ্ট, কনিষ্ঠের অকল্যান করে; বিশেষ আপনাকে কালও লাগাত দ্বিপ্রহর খাটিতে হইবে; আপনি কদাপি অনাহারে থাকিবেন না। সে ছেলে মানুষ, আজ খায়নাই রাগে, কাল খাইবে সবার আগে। আর জিদের উপর ক্ষুধার চোট্ লাগে না।"

বউ ঠাকুরাণী—"আপনিও একবার মাখনকে বলিয়া দেখুন।"

বলরাম—"দাদার আদেশে ও আপনার অনুরোধে যে স্থলে কাজ হয় নাই, সে স্থলে আমার চেষ্টায় হওয়াও আমি সঙ্গত মনে করি না।"

বউ ঠাকুরাণী—"মধুও মাখনের সহিত পোঁ ধরিয়াছে।"

বলরাম—"বেশ তবেতো আর কোন কথাই নাই। কাল ভোরে খাইতে দিবেন। এ নিয়া আর সাধাসাধি নিষ্প্রয়োজন।"

দেবরের উপদেশে বড়বধূ আহার সমাপন করিয়া পুনরায় আসিয়া মাখন ও মধুকে যথা সাধ্য অনুরোধ-উপরোধ, সাধ্য-সাধনা করিলেন এবং অকৃতকার্য্য হইয়া যাইয়া শয়ন করিলেন।

মধু মাখনের সহিতই রহিল। বলরাম শয্যাটী একটু বাড়াইয়া বড় করিয়া লইয়া এক ধারে শুইলেন।

(৬)

বলরাম পূজার ফুল তুলিবার জন্য প্রতিদিনই খুব প্রত্যুষে উঠিয়া থাকেন। আজও নিয়মিত সময় উঠিয়া দরজা খুলিতে যাইয়া দেখিলেন, ঘরের কপাট খোলা। খোলা দরজা টানিয়া ধরাতে মাঝ ঘরের বিছানার উপর আলো পড়িল। বলরাম দেখিলেন—সেখানে মাখন নাই; মধু একাই একধারে ঘুমাইয়া রহিয়াছে।

পিতার মন পুত্রের জন্য নানা আশঙ্কায় কাতর হইয়া পড়া স্বাভাবিক। বলরাম ব্যস্ততার সহিত মধুকে ডাকিয়া তুলিয়া মাখনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মধু উঠিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিল; সে কোন কথাই বলিতে পারিল না। রামকানাই উঠিলেন; বড়বউ একটু পূর্ব্বেই উঠিয়াছিলেন, তিনি যদুকে ডাকিয়া তুলিলেন। সকলেরই মুখে এক কথা—"মাখন গেল কোথায়?"

বড়বউ কান্না রাখিতে পারিলেন না, তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তখন রামকানাই, যদু, মধু সকলেই—যার যে দিক ইচ্ছা খুজিতে বাহির হইয়া গেল।

বলরামের মনে হইতেছিল—তাহার অভিমানী ছেলে অপমান ও অন্যায় আচরণ সহ্য করিতে না পারিয়া হয়ত বা জলে ডুবিয়াই মরিয়াছে—তাঁহার শঙ্কিত হৃদয় ভয়ে ও ছেলের স্নেহে এই পাপ চিন্তা মুখে ফুটাইয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না। অথচ তাহার বিশ্বাস হইতেছিল—একটা অঘটন কিছু—সংঘটন হইয়াছে নিশ্চয়।

বলরাম হতাশ ভাবে পুকুরের শুদ্ধ জলরাশির দিকে চাহিয়া চাহিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। স্ত্রী হীন, পুত্র হীন, বন্ধু হীন, একটা ভিষণ বিভিষিকাময় নগ্ন নিষ্ঠুর ভবিষ্যতের ধূ ধূ মরু চিত্র মনে হইয়া বলরামের হৃদয়কে ক্ষণে ক্ষণে কাঁপাইয়া তুলিতেছিল। কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া হঠাৎ একা একাই তিনি বলিয়া উঠিলেন—"না! মাখন এরূপ জঘন্য কাজ কখনই করিতে পারে না। কখনই করিবে না। নারায়ণ দেখি, তোমার কি ইচ্ছা বাবা? তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।"

বলরাম পুকুরে নামিয়া স্নান করিয়া আসিয়া নিয়মিত ফুল তুলিলেন, তারপর ঠাকুর ঘরে যাইয়া গলদশ্রু নয়নে নারায়ণ বিগ্রহের নিকট প্রার্থনা করিলেন—বড় বিপদে পড়িয়া ডাকিতেছি ঠাকুর! আমার সকল সুখ ভাঙ্গিয়া দাও, সকল গর্ব্ব ডুবাইয়া দাও,তৃণের মত ভাসাইয়া নিয়া আমাকে শিক্ষাদাও প্রভো! এ জগতে তুমিই সার, আর কেহ কিছু নয়। স্ত্রী গিয়াছে, পুত্রও চাই না, আমাকেও লইয়া যাও! তোমার শুভ ইচ্ছা—হে আমার মঙ্গলময় গৃহ দেবতা—পূর্ণ হউক।"

বলরাম একাগ্রমনে নারায়ণকে নিজ প্রার্থনা নিবেদন করিয়া পূজায় নিযুক্ত হইলেন।

কুসুম মাখনদের ঘরে যাইয়া বাহের বাড়ীর দিকে জানালার কাছে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে সে কোন মতেই তাহার চক্ষের জল রোধ করিতে পারিতেছিল না। আঁচলে সে যতই মুছিতেছিল, চক্ষু ততই ভরিয়া উঠিতেছিল। সে যত মুছে, তাহার অফুরন্ত চখের জল ততই দরদর ধারে প্রবাহিত হয়।

কুসুম কেবলি ভাবিতেছিল, মাখন দা আজ এমন রাগ করিল কেন? দাদার সহিত এমন ঝগড়াঝাটীতে তাহার প্রায়ই হয়—"

কুসুম জানিত না, মাখনের হৃদয়ের ভিতর কত খানি ক্ষত আজ তাহাকে বেদনা দিয়া অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল; তাই কুসুম তাহার চিন্তার কোন কুল কিনারা পাইল না।

পুঁঠি কাদা-গোবর লইয়া ঠাকুর ঘর লেপিয়া আসিয়াছে দেখিয়া সে আর বৃথা দাঁড়াইয়া থাকা সমীচীন মনে করিল না। সে তাহার ঠাকুরমার আহ্নিকের স্থান লেপিয়া দিয়া তাহাতে কুশাসন ফেলিয়া ও তাহার নিকটে মালার পেটিকাটী রাখিয়া কাদার ভাণ্ড লইয়া গিয়া বড় ঘর লেপিতে আরম্ভ করিল।

বলরাম পূজায় বসিবার পূর্ব্বেই পুঠিঠাকুর ঘর লেপিয়া ফেলিল। তারপর ধীরে ধীরে মাকে জিজ্ঞাসা করিল —"গোবর ছিটা দিয়াছ মা।"

বড় বউ মধ্য উঠানে দুইহাত হাটুতে ও মাথায় ঠেকাইয়া রাখিয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন, মেয়ের কথায় তিনি বাম হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনি সংযোগে নাসিকা হইতে কতগুলি শ্লেষ্মা ফেলিয়া বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু ও নাসিকা মুছিয়া কম্পিত স্বরে বলিলেন "বাড়ীর পাছে ও এই আঙ্গিনায় ছিটা দিয়াছি; ঘাটের পথে ও বাহিরের আঙ্গিনায় দেই নাই।"

উঠানেই গোবর জলের ঘটিটী পড়িয়াছিল, তাহাতে আরও জল ও গোবর লইয়া পুঁঠী ঘাটে-পথে গোবর জল ছড়াইয়া দিতে লাগিল।

বড়বৌ ধীরে ধীরে উঠিয়া বলরামের ঘরে গেলেন। ঘরের মেঝে তখনো বিছানা পাতা রহিয়াছে। বরাবর পুঁঠি কিম্বা মাখন তাহা তুলিত; আজ গোলমালে কেহ এ পর্য্যন্ত তাহা উঠায় নাই। পুঁঠি বা কুসুম যাহারই কাজ আগে শেষ হয়, সেই এ ঘরও লেপিয়া ফেলিতে পারিবে, ভাবিয়া বড়বৌ বিছানাটা তুলিতে লাগিলেন।

বড় বউ বিছানা তুলিতে গিয়া দেখিলেন, একখণ্ড কাগজ বালিশের নীচে পড়িয়া আছে। তিনি তাহা তুলিয়া লইয়া দেখিলেন, তাহাতে পেন্সিলের লেখা। তিনি লেখাপড়া জানিতেন না। কুসুমকে ডাকিলেন। কুসুম আসিয়া কাগজখানা হাতে লইয়া অল্প পড়িয়াই বলিল—"এ যে মাখন দার চিঠি পিসি মা; তিনি ছোট দাদাকে লিখিয়া গিয়াছেন...

বড় বৌ আগ্রহের সহিত বলিলেন—"পড়্ দেখি, পড়্ দেখি! বাবা নারায়ণ রক্ষা কর বাবা......"

কুসুম পড়িল—

"ভাই মধু, রাত ভরিয়া ভাবিয়াও কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারি নাই। আমার জন্য চিন্তা করিও না। আমি হেড মাষ্টার কিশোরী বাবুর নিকট চলিলাম। তিনি যে উপদেশ দিবেন তদনুসারেই কার্য্য করিব। তিনি আশ্রয় না দিলে, আমার গতি কোন দিকে হইবে ভগবান জানেন। আমাকে তুমি যত জান, তত বোধ হয় আর কেহ জানে না। সুতরাং তোমাকে আমার মুখ দেখাইতে লজ্জা নাই। দ্বিপ্রহরে একবার হেডমাষ্টার বাবুর বাসায় অনুসন্ধান করিও। অনেক কথা। জেঠা মহাশয় ও জেঠাইমাকে আর মুখ দেখাইতে ইচ্ছা করি না। তাঁহারা যেন আমার কথা একেবারেই ভুলিয়া যান।

তোমার মাখন দা।"

কম্পিত হস্তে চিঠি লইয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বড় বউ ঠাকুর ঘরে যাইয়া দেখিলেন—বলরাম ধ্যানে বসিয়াছেন। বড় বউ ঠাকুর প্রণাম করিয়া গলা পরিস্কার করিয়া লইয়া বলিলেন—"মাখনের চিঠি পাওয়া গিয়াছে —সে তাহাদের হেড মাষ্টরের নিকট গিয়াছে.. ..."

বলরাম তন্ময় চিত্তে ভগবানে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন। বিপদই যে ভগবানকে ডাকিবার ও পাইবার একমাত্র উপায়, তাহা তিনি আর একদিন বুঝিয়াছিলেন। ভগবান পাওয়া যাইবার বা ধরা দিবার জিনিস নহেন; কিন্তু তাহাতে আত্ম সমর্পণ করিতে পারিলে যে প্রকৃত শান্তি লাভ হয় এবং সেই শান্তিই যে প্রকৃত তাঁহাকে পাওয়া, তাহার শক্তি লাভ ও স্বরূপ লাভ, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে দিন তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন।

চক্ষের জল না ফেলিলে কি কারো ভিতরে ভগবান জাগিতে পারেন? মাখনও যে ভগবানের কোন শুভ উদ্দেশ্য সাধন জন্যই স্থানান্তরিত, হইয়াছে ইহা বলরামের বিশ্বাস হইয়াছিল; কেননা স্থানান্তরিত হওয়াই এখন তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। তথাপি পিতার মন ক্ষণে ক্ষণে অশুভ কল্পনায় ভরিয়া উঠিতেছিল —পাছে অভিমানী ছেলে একটা অঘটন কিছু করিয়া বসে। সে চিন্তা মন হইতে দূরে রাখিবার জন্যই বলরাম নিবিষ্টভাবে আজ নারায়ণের পূজায় নিযুক্ত হইয়াছেন।

বড় বধূর কথা প্রথম তাঁহার কর্ণে পঁহুছায় নাই। বড় বউ পুনরায় যখন বড় গলায় বলিলেন—তখন বলরাম ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—

"মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

(৭)

মধু ঘুম হইতে উঠিয়াই স্কুলের দিকে চলিয়া গিয়াছিল। তাহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল—স্কুলের বোর্ডিংএ গেলেই মাখনের খোজ জানিতে পারিবে।

তাহাই হইয়াছে। মধু বোর্ডিংএ আসিয়া জানিল, মাখন তথায় আসিয়াছিল; এখন সে হেডমাষ্টারের বাসায় আছে।

দৌড়াইয়া পরিশ্রান্ত হইয়াও মধুর মনে এতক্ষণ পর্য্যন্ত রাগের ভাব উদয় হয় নাই। এইবার মাখনের সংবাদ পাইয়া তাহার অত্যন্ত রাগ জন্মিয়া গেল। কিন্তু হেডমাষ্টার বাবুর বাসায় আসিয়া সে যখন তাহার মাখন দার সেই চির হাস্যোজ্জল সুন্দর মুখখানি জাগরণ ও উপবাসের ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন এবং লজ্জার করুণ আবরণে ম্লান ও অবসন্ন দেখিল,তখন সে তাহাকে আর কোন শক্ত কথা শুনাইয়া দিতে পারিল না। মধু কেবল বলিল—তুমি বড়ই কাপুরুষ মাখন দা..."

এ কথাটী বলিয়াও মধুর মনে কষ্ট হইল।

মাখন মধুর মুখের উপর হইতে দৃষ্টি নীচের দিকে ফিরাইয়া লইয়া বলিল"—এ কথাটা কি তুমি আজ এত দিনে জানিলে ভাই?"

মধু আরও নরম হইয়া বলিল—"তবু একবারে কিছুই না বলিয়া চলিয়া আসিলে..."

মাখনের চক্ষে জল দেখা দিল। সে মাটির দিকে মুখ নত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"মা পথ দেখাইয়া লইয়া আসিয়াছেন—তবু তাড়াতাড়ি এক টুকরা কাগজে তোমাকে লিখিয়া রাখিয়া আসিয়াছি..."

মধু বুঝিল—মাখনের মাথা গোলমাল হইয়াগিয়াছে। সে চিরদিনই গোলমাল হইতে দূরে থাকিবার লোক। বিপদ বা গোলমালের নিকট দিয়া পথ চলিতে তার কোন দিনই সাহস নাই। তাই আজ হটাৎ নিজকে অত্যন্ত বেশী বিপন্ন মনে করিয়া যা মুখে আসিতেছে, তাই বকিতেছে। কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া সহানুভূতির সুরে মধু বলিল—"কালরাত্রিতে কিছু খাও নাই, বোধ হয় ঘুমও হয় নাই। স্নান কর, আমি হেডমাষ্টার বাবুর বাড়ীতে খাওয়ার যোগাড় করি। এদিকে কাহাকেও বাড়ীতে পাঠাইয়া খবর দেই। বাড়ীতে কাঁদাকাটি লাগিয়াছে; বাবা, দাদা তোমার খোজে কে কোথায় যে গিয়াছেন তার ঠিক নাই...

মাখন বলিল—"কেন; আমি যে একটুকরা কাগজে তোমাকে এখানে আসিবার জন্য লিখিয়া বালিসের নীচে রাখিয়া আসিয়াছি, তাহা কি তুমি দেখ নাই? সে দোষ কি আমার?"

মধু বলিল—"আমি দেখি নাই, আমাকে ডাকিয়া সঙ্গে লইয়া আসিলেইতো ভাল হইত।"

ততক্ষণে মধুর হাত ধরিয়া আসিয়া মাখন একটা বৃহৎ জাম গাছের ছায়ায় দূর্ব্বার উপর বসিয়া পড়িল।

বসন্তের রৌদ্রতপ্ত প্রভাত বায়ু ঈষৎ শীতের পরশ লইয়া মুক্ত মাঠের উপর দিয়া বহিতেছিল, মধুর ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত দেহ সেই ছায়া-শীতল সমীরণ স্পর্শে একটু আরাম বোধ হইতেছিল।

মধু বলিল—"তবে স্নান কর, খাও, তারপর চল বাড়ী যাই!'

মাখন আরামে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আসিব এ কথা মনে ছিল না। প্রথম রাত্রিতে একেবারেই ঘুম হয় নাই। শেষ রাত্রিতে কখন যে হটাৎ ঘুম ধরিয়াছিল, পরিষ্কার মনে হয় না। তার পরই দেখি, মা আসিয়াছেন।...

মাখনের চক্ষু হইতে দরদর ধারে জল পড়িতে লাগিল। হাতের তালুতে দুই চক্ষু মুছিয়া লইয়া মাখন বলিতে লগিল মা অনেক কথা বলিলেন, তারপর আমাকে তাহার পাছে পাছে যাইতে বলিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন। আমি বলিলাম—মা, কাহাকেও না বলিয়া যাইব! মা বলিলেন—বলিলে যাইতে দিবে না। আমি বলিলাম, কি করিব তবে? মা আমার হাতে কাগজ পেন্সিল দিয়া বলিলেন মধুর নিকট ঠিকানা লিখিয়া বালিসের নিচে রাখিয়া আয়। চল আমার সঙ্গে একে বারে কিশোরী বাবুর বাসায়। মা অন্তর্দ্ধান করিলেন।"

মাখন পুনরায় কাঁদিতে লাগিল। মাখনের অবস্থা দেখিয়া মধুরও শরীর শিহরিয়া উঠিল। তার চক্ষেও জল দেখা দিল। চক্ষের জল মুছিয়া মধু বলিল—"তার পর?"

মাখন বলিল সেইস্থানে অন্ধকারে বসিয়াই তোমার নিকট সামান্য কয়েক লাইন লিখিয়া তাহা বালিসের নীচে রাখিয়া আমি মার অনুসরণ করিলাম। ভাই, আমি মাকে বড়ই ভাল বাসিতাম। যাঁহাকে মানুষ কখনও ভুলিতে পারেনা তাহাকে পাইলে মানুষ অন্য সকল ভুলিয়া যায়। আমি কিন্তু তথাপি তোমাকে ভুলি নাই। মা আমাকে কাহাকেও ভুলাইয়া আনেন নাই?

মধু আগ্রহের সহিত বলিল—"ঘুমে দেখিয়া ছিলে কি জাগিয়াই দেখিয়াছিলে?"

মাখন বলিল—"সে কথা এখন মনে নাই।"

মধু এরূপ তুমি আরও দেখিয়াছ কি?'

মাখন—"যে দিনই মার কথা মনে হয়, সেই দিনই ঘুমে তাঁহাকে দেখিতে পাই। মা আমাকে অনেক কথা বলিয়া যান।"

মধু" আরতো কোন দিন এরূপ কথা বল নাই।'

মাখন—"যাকে দেখিয়া যে সুখ পাই, তার কথা শুনিয়াও যে সুখ পাই, আর কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করিলে তেমন সুখ পাইবনা স্বপ্নেও বলি না।

মধু—"আজ যে বলিলে?"

মাখন সকলকে অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছি, তাই বলিলাম। তুমি শুনিয়া ক্ষমা করিবে, তাই বলিলাম।"

মধু সন্দিগ্ধ ভাবে বলিল—"খুড়িমা আসেন এবং তোমার সাথে আলাপ করেন—তুমি বিশ্বাস কর?"

মাখন—"বিশ্বাস করিয়া সান্ত্বনা পাই, করিব না কেন? আমার অনুরোধ, তুমিও আমার কথাগুলি বিশ্বাস করিও।"

মধু বলিল—"তোমার কথা খুব বিশ্বাস করি, কিন্তু" মধু আর বলিতে পারিল না। তাহার বলিবার ইচ্ছা ছিল, তুমি যাহা দেখ, তাহা প্রত্যক্ষ সত্য নহে স্বপ্ন। এবং স্বপ্ন অমূলক চিন্তা মাত্র। কিন্তু তাহা প্রকাশ করিয়া মাখনের সরল মাতৃ ভক্ত প্রাণে আঘাত দেওয়া সঙ্গত মনে করিল না।

মাখন বলিল—"ভাই ইহার ভিতর আর কিন্তু টিন্তু নাই। এ সকল ব্যাপার লোক-মতেরও অপেক্ষা করে না—মনের শান্তি, চিত্তের প্রীতি, শোক দুঃখে সান্ত্বনা—এরূপ মিথ্যা বা ভ্রমের ভিতর দিয়াও যদি হয়, তবে যে ফলটী লাভ করে তাহার নিকট তাহা অগ্রাহ্য নহে।"

মধু আর কোন প্রতিবাদ না করিয়া বলিল—"ঠিক কথা! মনের শান্তি যাহাতে হয়. তাহা নির্দ্দোষ হইলে তাহাও যে সত্য তাহাতে আর ভুল কি?

মাখনের কথা শুনিয়া শুনিয়া মধু বাড়ীর ব্যাপার ভুলিয়া গিয়াছিল। সে কথা স্মরণ হওয়ায় মধু বলিল—"বাড়ীর সকলেই চিন্তিত, আমি এখনই চলিয়া যাইব। তুমি কখন যাইবে।"

মাখন—"মাতৃ আজ্ঞায় বাহির হইয়াছি, মাতৃ আজ্ঞা পাইলেই ঘরে যাইব।"

মধুর নিকট কথাটা মোটেই ভাল লাগিল না। তাহার তখনও বিশ্বাস ছিল—স্বপ্ন দেখিয়া মাখনের মাথায় একটা খেয়াল ক্রিয়া করিতেছে।

সে বলিল—"তবে আমি যাই, বাড়ীতে সকলেই ব্যস্ত। তুমি স্নান করিয়া এখানেই আহার কর এবং একটু ঘুমাও। বাবা কি কাকা আসিয়া বিকালে তোমাকে লইয়া যাইবেন।"

মাখনের মুখ যেন লজ্জায় লাল হইয়া গেল। সে বলিল জেঠা মহাশয়কে পাঠাইয়া আমার মুখে আর চুণ কালি মাখাইও না—আমার জীবনকে আর বিপন্ন করিও না। তাঁহাকে আমি মুখ দেখাইতে পারিব না। তিনি আসিলে, আমি এক দিকে চলিয়া যাইব।"

মধু নিরাশ হইয়া বলিল—"তবে কি তুমি আর বাড়ী যাইবে না?"

মাখন—"যাইব বই কি? যাইব, যে দিন সে দিন নিজ হইতেই যাইব।

মধু—"কাকা, বাবা, মা কি তোমাকে এরূপে গৃহ ত্যাগী করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিবেন?"

মাখন একটু কঠোর ভাবে বলিল—"আমি গৃহত্যাগি হইনাই। পরীক্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হেড মাষ্টার বাবুর নিকট থাকিয়া পড়িব। ইহার পূর্ব্বে আমাকে অন্য কোন

সম্বন্ধ সংশ্রব ভাঙ্গিতে দিও না– যদি তাঁহারা অনাবশ্যক স্নেহ দেখাইতে চেষ্টা করেন, আমাকে তখন বাধ্য হইয়া গৃহত্যাগী হইতে হইবে; জেঠা মহাশয় এবং জেঠাইমাকে তাহা তুমি ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিবা। কুসুমের...

মাখন থামিয়া গেল খানিক পরে বলিল—"কুসুমের বিবাহের পূর্ব্বে তাহার সহিত আমার আর সাক্ষাৎ হয়—এ ইচ্ছাও আমার নাই ইহা তাহার পক্ষেও শুভ নহে। তুমি আমার পক্ষে জেঠা মহাশয়কে এগুলি বুঝাইয়া বলিও।"

মধু বলিল—"তুমি যাহা বলিলে ঠিক। এখানে থাকিয়া ৮।১০ মাস পড়িয়া পরীক্ষা দিলে যে তুমি স্কলারসিপটা লইয়া যাইতে পারিবে, সেটা ঠিক।"

মাখন কথার মধ্যেই বাধা দিয়া বলিল—"তাহা হইলে আমার মত দরিদ্রকে সেরূপ ভাবে চলিতে তোমাদের সকলেরই দেওয়া উচিত। বরং তুমিও যদি সে সংশ্রব ত্যাগ করিতে পার, সেটাই করিবা।

মধু বলিল—"তবু তুমি একবার যাইয়া তাঁহাদের সম্মতি লইয়া আসিলেই ছিল ভাল। দীনেশদার কথাটাই যে বেদবাক্য হইয়া থাকিবে সেটাই কি ঠিক?"

মাখন বলিল—"যার মাথায় ও হৃদয়ে পদার্থ নাই, নিজের মার পেটের বোনের হিতাহিত বুঝিতে যে অসমর্থ, তার কথায় প্রতিবাদ চলে না; আর এমন কথার প্রতিবাদইবা কি আছে ভাই? প্রতিবাদ করিতে যাওয়া যে নিজের কলঙ্কেরই পুনরালোচনা ও রটনা করা। আমার এ সম্বন্ধেও যেন বাড়ীতে কোন আলোচনা হয় না ইহাই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—জেঠা মহাশয় ও জেঠাইমাকে জানাইবা।"

মধু উঠিয়া বলিল—"তবে চল তোমাকে স্নান করাইয়া যাই।"

মাখন ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"এক দিনের নিদ্রা আহার বা স্নানের অভাবে এ স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার নয় মধু! একদিনের কৃচ্ছ্র সাধনায় যদি চিরদিনের শান্তি পাওয়া যায়; একদিনের অশ্রু বিনময়ে যদি চির দিনের হাসি লাভ হয়, কে না তাহা করে ভাই? তুমি যাও, আমাকে যেন তাহারা আসিয়া অশান্ত করিয়া না তুলেন. একটী তুমি কেবল দেখিও! তোমার সহিত তো প্রতিদিনই স্কুলে দেখা হইবে।"

মধু সূর্য্যের দিকে চাহিয়া বলিল—"অনেকটা বেলা হইয়াছে, তবে এখন যাই।"

মাখন মধুকে বুকে টানিয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিল—"জেঠা মহাশয় ও জেঠিমাকে কথাগুলি মুলায়েম করিয়া বলিও কিন্তু! আর আমার কাপড় ও পুস্তকগুলি পাঠাইয়া দিতে বলিও আমি বোর্ডিংএ থাকিব কি তাঁহার বাসায় থাকিব, তাহা হেড্‌মাষ্টার বাবু স্থির করিবেন। তাহাকে সকল কথাই আমি বলিয়াছি।"

মধু বিদায় হইল। ক্রমশঃ—

ধর্ম্মপাল।

বাঙ্গলা বহু কালের সভ্য দেশ। কিন্তু বাঙ্গালীর বড় নিন্দা তাঁহার অনেক অপবাদ। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অপবাদ এই যে, বাঙ্গালী ভীরু কাপুরুষ, বাঙ্গালী প্রাণভয়ে সপ্তদশ অশ্বারোহীর হাতে জন্মভূমি সমর্পন করিয়াছিল। স্বদেশ প্রাণ কবি গভীর মর্ম্ম বেদনায় লিখিয়াছেন—

> কোন্ রাজ্য তুমি শাসিয়াছ ভাল?
> কোন মারাখনে ধরিয়াছ ঢাল?
> এই বল তুমি একাল সেকাল
> অরণ্য অরণ্য অরণ্য ময়!

কিন্তু বাঙ্গালী কি বাস্তবিকই ভীরু কাপুরুষ? অতীতের গাঢ় অন্ধকারে বর্ত্তিকা হস্তে প্রবেশ করিলে আমরা বহু বীরপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করি। তাঁহারা বঙ্গ জননীর কোল আলোকিত করিয়াছেন। এই বরেণ্য বীর কুলে মহারাজ ধর্ম্মপাল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন পূর্ব্বক আমাদের লেখনী বাঙ্গালীর অপবাদ অপনোদনের সহায়তা করিয়া ধন্য হউক।

বঙ্গদেশ দীর্ঘকাল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গুপ্ত শাসন ধ্বংস প্রাপ্ত হইল বঙ্গদেশে "মাৎস্য ন্যায়" উপস্থিত হয়—সবল কর্ত্তৃক দুর্ব্বলের উৎপীড়ন হইতে থাকে।

ফুলদানী।

কর্ত্তব্য।

হয়ে মানুষ হৃদয় খোলা—
সবকে মানুষ গড়ে তোলা;
পাপ-বাসনা পিষে যারা
উদারতায় আত্মহারা;
দশের সাথে চলা ফেরা
দেশকে ভাবা স্বর্গ-সেরা
এই জগতের হিতের তরে-
প্রাণ বিলানো ঘরে ঘরে।

—পল্লী কবি—

ফুলবাগানে ধানের ক্ষেত
বিজন পথে বেড়ায় যেতে
ঝিমায় ফুলে পর্‌জাপতি,
তা দেখে প্রাণ ব্যাকুল অতি।
জ্যোৎস্নাকে সে আঁক্‌ড়ে ধরে,
শাওন মেঘে নয়ন ঝরে;
পাখীর গানে পাগল-পারা,
ঘরের দুখে আত্মহারা।

—মহিলা মজলিস—

"আমরা প্রসব-যন্ত্র-বিশেষ।
মানুষ কোথায়? হায় পরমেশ!
কই পুরুষের পবিত্রতা?
মোদের বেলায় পর্দ্দাপ্রথা।
হলাম ক্রমে বোচ্‌কা-সামিল,
শাস্ত্র-শাসন করছি তামিল।
যাচ্ছে এদেশ অধঃপাতে,
চলবো না কি সবার সাথে?"

পল্লী-পুরুষ

পীলে পেটে,—গর্ভবতী-!
জরের জ্বালায় শান্ত অতি!
পরের সুখে ফেটে মরে,
ঝগড়া ঝাঁটি পরস্পরে,
একটা ভীষণ সংকীর্ণতা,
খরচ করে ব্যর্থ কথা!
কথায় কথায় ভাগ্য মানে,
হাত পা ছেড়ে মর্‌তে জানে!

—সহরে মানুষ—

কেউ বা হাতি, রুগ্ন কেহ,
খেটে খেটে ক্লান্ত দেহ;
দেশ বিদেশের খবর রাখে,
দিচ্ছে সাড়া দেশের ডাকে;
কম্‌তি বেশী সব বিলাসী
আমোদ প্রমোদ ঠাট্টা হাসি;
সাত সমুদ্দুর তের গাঙে,
ভাগ্য তারা গড়ে ভাঙে।

রাজ বাড়ী—

একটা বিকট বার্‌-ফুটানি;
হুজুর শুনায় মূল্য জানি!
আম্‌লা ইয়ার খান্‌সামাতে
যাচ্ছে ক্রমে অধঃপাতে!
মন্দিরেতে ভোরে সাঁঝে
মিছাই কাঁশি ঘণ্টা বাজে!
এই যে বাগান দালান কোটা,
প্রজার জমাট্‌ রক্ত ফোঁটা!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

সায়ন কি নিরয়ণ?

জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর উত্তরমেরু ও দক্ষিণ মেরুকে সমান দূরে রাখিয়া পৃথিবীর মধ্য দিয়া একটী রেখা কল্পনাপূর্ব্বক পৃথিবীকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন উহাকে মধ্য রেখা বা মধ্য রেখা ভূমি কহে। ঐ মধ্য রেখা হইতে প্রাচীনকালে অক্ষ গণনার আরম্ভ হইত। উক্ত মধ্য রেখার ঊর্দ্ধ সমসূত্রপাতে যে রেখার কল্পনা করা হয় তাহার নাম বিষুব রেখা। যখন সূর্য্য ঐ রেখাতে উপস্থিত হয়, তখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র দিন ও রাত্রি-

মান সমান হইয়া থাকে ; অর্থাৎ ৩০ ত্রিশ দণ্ড বা ১২ ঘণ্টা দিবা এবং ৩০ দণ্ড বা ১২ ঘণ্টা রাত্রি হয়। তৎকালে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় মধ্য রেখার উপর ছায়া মাত্রও দৃষ্ট হয় না। গ্রহগণ নিরন্তর রাশিচক্র মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে। ঐ রাশিচক্রের কোন স্থানকেই আরম্ভ বলিতে পারা যায় না। তবে সূর্য্যমার্গের যে দুইটী স্থানে সূর্য্যের আগমনে দিবা ও রাত্রিমান সমান হইবে এবং যে দুটী স্থানে অয়ণ শেষ হইবে, এই চারিটী স্থানের যে কোন স্থান হইতে রাশিচক্রের আরম্ভ বলা যাইতে পারে। কিন্তু আবহমান-কাল হইতে বিষুব রেখার যে স্থানে সূর্য্যের আগমনে দিবা-মান বৃদ্ধি ও বৃক্ষ লতাদি নূতন পল্লব পত্রাদির উদ্গম হইতে দেখা যায় ঐ স্থান হইতেই রাশিচ ক্রর প্রারম্ভ প্রচলিত হইয়াছে। জ্যোতিষগণনার প্রথম আরম্ভকালে আকাশমণ্ডলের চিহ্নিত মেষরাশি রাশিস্থিত অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রারম্ভে দিবা ও রাত্রিমান সমান স্বীকৃত হইয়াছিল। ঐ স্থান হইতে সূর্য্যমার্গকে ৩৬০ অংশে (ডিগ্রী) বিভক্ত করিয়া তাহার প্রথম ৩০ অংশ মেষ, তৎপর ৩০ অংশ বৃষ ইত্যাদি ক্রমে কল্পনা করিয়া যে লগ্নস্ফুট ও গ্রহস্ফুট গণনা করা যায় তাহার নাম সায়ন গণনা।

বিষুবরেখা হইতে প্রতি বৎসর অশ্বিনী নক্ষত্র সরিয়া যায়। উক্ত দূরত্ব কমিয়া অবশিষ্ট অংশে গ্রহাদির স্থিতি ধরিয়া এবং রবির আগমনে সেই দিবসকেই বৎসরের প্রথম দিন কল্পনা করিয়া যে লগ্নস্ফুট ও গ্রহস্ফুট গণনা তাহার নাম নিরয়ণ গণনা।

হিন্দু জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণের মতে প্রতি বৎসর বিকলা চক্র ৫৪টি সরিয়া থাকে। ৬৬ বৎসর ৮ মাসে রাশিচক্র বিষুবরেখা হইতে এক অংশ করিয়া সরিতেছে। প্রতিলোম ও অনুলোম গতিদ্বারা রাশিচক্র ক্রমশঃ আবার বিষুবরেখার স্থানে মিলিত হয়।

সূর্য্যের মেষ রাশি সংক্রমনের পূর্ব্ব ও পশ্চাৎ প্রতিলোম ও অনুলোম গতি দ্বারা ২৭ দিনের মধ্যে বিষুবারম্ভন হইয়া থাকে। যে দিবস বিষুবারম্ভন অর্থাৎ সূর্য্য বিষুবরেখার পূর্ব্ব পশ্চিম স্পর্শ বিন্দুর মধ্যগত হইবে সে দিন দিবারাত্র সমান ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময় রাশি চক্রের বিলোমগতি চলিতেছে। এখন দেখা যাউক বর্ত্তমানে রাশিচক্র কত অংশ সরিয়াছে, কেননা উহা ব্যতীত বিষুবারম্ভনের দিন নির্ণীত হইবে না এবং কোন দিন দিবারাত্র সমান তাহাও জানা যাইবে না।

সূর্য্য সিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে যে সৃষ্টির আরম্ভ কালে যে স্থানে অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রারম্ভে রাশিচক্র সন্নিবেশিত ছিল তথা হইতে সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে অর্থাৎ উত্তরে ২৭ অংশ গমনাগমনে ৫৪ অংশ এবং দক্ষিণে ২৭ অংশ গমনাগমনে ৫৪ অংশ সমুদয়ে অনুলোম ও প্রতিলোম গমনাগমনে ১০৮ অংশ ৭২০০ বর্ষে একবার আবৃত্তি হয়। অতএব উক্ত ১০৮ অংশের প্রত্যেক এক অংশকে অয়নাংশ কহে। এক্ষণে ৭২০০÷১০৮=৬৬ বৎসর ৮মাস। রাশি চক্রের এই অয়ণ গতিবশতঃ দিন ও রাত্রিমানের হ্রাস বৃদ্ধির কারণ সমুদ্ভূত হয় এবং ৬৬ বৎসর ৮ মাস অন্তর অয়নাংশ পরিবর্ত্তিত হওয়ায় মেষাদি দ্বাদশ লগ্নমানেরও হ্রাস বৃদ্ধি হয়।

পূর্ব্বোক্ত প্রণালী মতে গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে বর্ত্তমানে দ্বাবিংশতি অয়নাংশ চলিতেছে। বর্ত্তমানে বিলোম গতিবশতঃ উহা পিছন দিকে সরায় ৩০শে চৈত্র দিবারাত্রি সমান না হইয়া ২১ দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ ৯ই চৈত্রে বিষুবারম্ভন হওয়ায় দিবারাত্রি সমান হইতেছে। ভারতবর্ষ ভিন্ন ইউরোপ প্রভৃতি অন্য সমস্ত দেশে উক্ত তারিখ হইতে বিষুবারম্ভন ধরিয়া সমস্ত গণনা হয়, কিন্তু একমাত্র ভারতবর্ষে ২১ দিন পরে বিষুবারম্ভন ধরিয়া মাঝখানে আমাদের ৩০শে চৈত্র মহাবিষুব সংক্রান্তি ধরা হইতেছে।

পূর্ব্বোল্লিখিত সমস্ত অংশটুকু বিবেচনা করিলে ইহাই প্রতীত হইবে যে ৯ই চৈত্র বিষুবারম্ভন ধরিয়া গণনার নাম সায়ন গণনা, এবং ৩০শে চৈত্র বিষুবারম্ভন ধরিয়া গণনার মত নিরয়ণ মত।

আমাদের দেশে যদি সায়ণ গণনা প্রচলিত থাকিত তবে বর্ত্তমান প্রচলিত ৯ই চৈত্রই মহাবিষুব সংক্রান্তি ধরিয়া ১০ই হইতে ১লা বৈশাখ ধরিতে হইত। সূর্য্য সিদ্ধান্ত প্রভৃতি সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের মতে উহাই বিশুদ্ধ ; কেননা ঐ দিনই প্রকৃতপক্ষে বিষুবারম্ভন হয় এবং দিবা রাত্র সমান হয়।

সায়ণ ও নিরয়ণ মতের গণনা প্রত্যেক বিষয়েই ২১ অংশ (ডিগ্রী) তফাৎ হইবে। সুতরাং পাশ্চাত্য মতে বৃহস্পতি প্রভৃতির স্থান যেখানে নির্ণীত হইবে আমাদের দেশে তাহা ২১ অংশ পূর্ব্বে নির্ণীত হইবে। সর্ব্বত্রই অয়নাংশ বিয়োগ করিতে হইবে।

বৃহস্পতি শুক্রাদি রাশির কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিলে শুভাশুভের জন্য বাধাভেদি হইয়া থাকে এখনে উক্ত সায়ণ মতে শুভকাল হইলে নিরয়ণ মতে অশুভ হইতে পারে আবার নিরমতে শুভকাল সায়ণ মতে অশুভ হইতে পারে। কাল শুভ বা অশুভের উপর হিন্দু ধর্ম্মের অনেক ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ভর করে সুতরাং সায়ণ নিরয়ণ গণনার উপর হিন্দুর ধর্ম্মকার্য্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। মহাবিষুব সংক্রান্তিতে হিন্দু ধর্ম্মে অনুষ্ঠান বিশেষ আছে। সায়ণ ও নিরয়ণ মতে ২১ দিন অগ্র পশ্চাৎ সংক্রান্তি হওয়ায় ইহাতেও ধর্ম্মানুষ্ঠানের গোল যোগের আশঙ্কা আছে। সুতরাং সায়ণ ও নিরয়ণ মত উপেক্ষার বিষয় নহে। *

প্রাচীন পুস্তক বশিষ্ঠ সিদ্ধান্তে লিখিত আছে চল সংক্রান্তি অর্থাৎ সায়ণ সংক্রান্তিতেই স্নান, দান, জপ, হোম, শ্রাদ্ধ, ও ব্রতাদি অনুষ্ঠিত হইলে অক্ষয় ফল ভোগ হয়। পুলস্ত্য মুনিরও ঐ মত। তাঁহারা সায়ণ মতই গ্রাহ্য করিয়াছেন।

রোমক সিদ্ধান্তে অনুরূপ দৃষ্ট হয়। অন্যান্য কেহ কেহ নিরয়ণ সংক্রান্তিই গ্রাহ্য করিয়াছেন। এই মতই অস্মদ্দেশে প্রচলিত। নানা মুনির নানা মত। কিন্তু যুক্তি অনুসারে সায়ণ মতই প্রবল হয় তাহা পাঠক লক্ষ্য করিয়াছেন। বশিষ্ঠ লিখিয়াছেন "অজাগলস্তন ইবরাশি সংক্রান্তি রুগাতে। পুণ্যদাং রাশি সংক্রান্তিং কেচিদ্দহু মনীষিণঃ। নৈতদ্যাম মতং যথাস্পৃশেৎ ক্রান্ত কথায়" ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ মিঃ কিথ লিখিয়াছেন :—

'Now the Hindu Astrology rests on the Nerayana Phutom of the planets, and modern tables gives us the correction Sayana Phutom so that if the length of the Ayanamsa is correctly known it may be subtracted from the Sayana Phutom and the remainder will be the Nirayana Phutom required. But the exact length of the Ayanausa is not known and it can not be ascertained by direct observation Because the star Rebati has disappeared."

সুতরাং মিঃ কিথের মতে নিরয়ণ গণনা শুদ্ধ হইতে পারে না। আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ গড্ডলিকা প্রবাহে নিরয়ণ মতেই সায় দিয়া গিয়াছেন, ইহার কোনও মীমাংসা করেন নাই। ভট্টপল্লীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণ জ্যোতিভূর্ষণ মহাশয় তাঁহার হোরা বিজ্ঞানে সায়ণ নিরয়ণ মত আলোচনা করিয়া উপসংহারে লিখিয়াছেন—

"সায়ণ ও নিরয়ণ মতের কোন্‌টী ঠিক নির্ণয় করা দুরূহ। নানা মুনির নানা মত। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং॥"

ইহার উপর টীকা অনাবশ্যক। *

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ কাব্যরত্ন
জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত।

অঞ্জলি।

শুক্তির স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব।

জীবতত্ত্ববিদগণ বলেন শুক্তি জন্মিবামাত্রে তাহা পুরুষ রূপে জন্মগ্রহণ করে. ক্রমে তাহা স্ত্রীত্বে পরিণত হয়। এইরূপ যৌন সম্বন্ধ পরিবর্ত্তন শুক্তি জীবনে একবারই হয় না পুনঃ পুনঃ হইতে দেখা যায়। প্রাইমাউথের সামুদ্রিক জীবতত্ত্ব বিষয়ে পরীক্ষাগারে দেখা গিয়াছে যে সাতাশ দিনের মধ্যে একটা ঝিনুক দশ লক্ষ ডিম্ব জন্মাইয়া আবার পুরুষ হইয়াছিল।

* ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েও সায়ণ ও নিরয়ণ মতে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কোষ্ঠী গণনা সায়ণ ও নিরয়ণ মতে অনেক তফাৎ হয়। লগ্ন ও গ্রহসংস্থানের ২১ অংশ তফাৎ সোজা কথা নহে, কাজেই ফল বিচারে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে।

বরফের দেশের লোক।

লেপ লেণ্ডের এস্কিমোদের মধ্যে জমিদার-প্রজা সম্পর্ক নাই অথবা গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য একে অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে না। সেই বরফের দেশে সকলেরই আবাস স্থান আছে এবং তাহা তাহারা নিজেই প্রস্তুত করিয়া নেয় কোন মজুরী কিংবা ঘরামীর দরকার হয়না। ইহারা প্রতি শীতে নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করে এবং একটী নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিতে ৮ ঘণ্টা সময় লাগে। একমাত্র বরফই এই গৃহ নির্ম্মাণের মাল মসল্লা কাজেই উহা খরিদ করিতে হয় না। এই বরফের বিশেষত্ব এই যে ইহা এক দিনের তুফানেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই এক ঝড়ে উৎপন্ন বরফের চাপটীর উপাদান সমভাবাপন্ন ও শক্ত হয়।

এই গৃহ নির্ম্মাণ করিবার সময় হইলে এস্কিমো সাহায্য করার জন্য পরিবারের আর এক জনকে লইয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। ইহাদের একজন বরফের চাক কাটিয়া দেয় এবং অপর ব্যক্তি গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। এই বরফের এক এক খানা খণ্ডের পরিমাণ ৩ ৪ ফুট লম্বা ২ ফুট পাশ এবং ৮ ইঞ্চি উচ্চ। ইহা ইষ্টকের মত সমভাবে উপর্য্যুপরি স্থাপন করে না। ঐ খণ্ডগুলিকে পেচান তারের মত সাজাইয়া রাখে এবং ক্রমে উহাকে একটী গুম্বজের মত প্রস্তুত করে। উপরের ছাদের কার্য্য ২।৩ টী ত্রিকোনাকার খণ্ডের দ্বারা হইয়া থাকে। ফাকগুলি একরূপ বরফের দ্বারা লেপিয়া দেয় তাহাতে বাহিরের বাতাস প্রবেশ করিতে না পারায় গৃহটী গরম থাকে। এইরূপ এক একটী গৃহ ১০।১২ ফুট উচ্চ এবং পরিধি ১২ হইতে ১৫ ফুট হইয়া থাকে। গৃহে একটী মাত্র জানালা থাকে। এবং তাহা এক অদ্ভুত কপাট দ্বারা বন্ধ করে। শীল মৎস্যের নাড়ী ভুঁড়ি শেলাই করিয়া এই কপাট প্রস্তুত হয়। এবং তাহার ভিতর দিয়া যথাসম্ভব আলো প্রবেশ করিতে পারে। এই কপাটের অভাবে, আমরা যেরূপ বরফ খাইয়া থাকি ঐরূপ এক খণ্ড মিঠা জলের বরফ দিয়া কার্য্য সারিয়া নেয়। আমার মিঠা জল বলার উদ্দেশ্য সমুদ্রের লোণা জল ভিন্ন অপর জল যাহা আমরা পান করিতে পারি। কারণ উহা সহজে গলিয়া যায় না এবং উহা একখানা আয়নার দরজার মত স্বচ্ছ হয়। এই গৃহে প্রবেশ করিবার জন্য মাটির ভিতর দিয়া একটী সুরঙ্গ খুঁড়িয়া নেয়। এই সুরঙ্গ পথে গৃহপালিত কুকুর বাস করে। সুরঙ্গটী এত বড় হয় যে এক জন ৫ ফুট লম্বা লোক এই পথে সোজা হইয়া হাটীয়া প্রবেশ করিতে পারে। শয়ন কক্ষে একখানা বরফের বেঞ্চ থাকে এবং উহাই শোয়ার জন্য চৌকি রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহার উপরে লতা পাতা এবং তদোপরি কয়েকখান হরিণের চাম বিছাইয়া শয্যা প্রস্তুত হয়। গৃহের অন্য দিকে পাকের চৌকা কিম্বা লেম্প থাকে। এই চৌকা একটী তৈলাধারের মধ্যে শীল মৎস্যের চর্ব্বি ও ন্যাকড়ার পলিতাযোগে প্রস্তুত হয়। ইহা দ্বারা গৃহের উত্তাপ রক্ষা হয় এবং রন্ধন ও আলোকের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়।

গরমের দিনে ইহারা চর্ম্ম নির্ম্মিত তাবুতে বাস করে এবং ইহা দেখিতে অনেকটা কলার মোচার খোলের মত। এই তাবুর পিছনের দিকে বিছানা থাকে এবং সমুখের খোলা জায়গায় মশক তাড়াইবার জন্য দিবা রাত্রি আতস জ্বালিয়া রাখে।

সম্প্রতি গ্রীনলণ্ডের এস্কিমোরা তথায় প্রেস স্থাপন করিয়া একখানা উৎকৃষ্ট সচিত্র পত্রিকা পরিচালন করিতেছে।

তিমি মৎস্য।

জীব জগতে তিমি মৎস্য যে আয়তন হিসাবে একরূপ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। অদ্য এইরূপ একটী বিশালকায় তিমির অকাল মৃত্যুর কথা বর্ণনা করিব। পানামা যেখানে যোজকে পরিণত হইয়াছে তাহা সকলেই জানেন। কিছু দিন হয় যুক্তরাজ্যে সৈনিক বিভাগ হইতে খবর পাওয়া যায় যে পানামা খালের যে মুখ আটলান্টিক মহাসাগরে খুলিয়াছে তথায় একটী অতিকায় তিমি অল্প জলে আটকিয়া যাওয়ায় তথাকার অধিবাসীদের এক ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। এই মৎস্যটী দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮০ হাত এবং ওজনে অনুমান ৩৪৩৭ মণ। ওয়াশিংটন হইতে সংবাদ পাওয়া গেল যে জল কম থাকায় মৎস্যটী নড়া চড়া

করিতে পারিতেছে না। এবং উহার মাথার কতক অংশ এবং পীঠ জলের উপরে ভাসিয়া রহিয়াছে। তখন কেনেলের কর্ম্মচারীগণ উহাকে ঐ স্থান হইতে সরাইবার চেষ্টা করে। উহারা একখান ছোট জাহাজ হইতে মেকসিম্ গান দ্বারা উহাকে মারিয়া ৬নং জেটিতে গিয়া ৭৫ টনের একটী ইঞ্জিনের ক্রেনদ্বারা উহাকে উঠাইতে চেষ্টা করে কিন্তু তাহাতে অসমর্থ হয় ক্রমে উহা পচিতে আরম্ভ করায় অন্য একখানা জাহাজ দ্বারা উহাকে টানিয়া তীর হইতে সমুদ্রের মধ্যে ২০ মাইল দূরে লইয়া যায় এবং উপরে এরোপ্লেন হইতে উহার উপর দুই মণ ওজনের ২টী বোম ১০০০ ফুট উচ্চ হইতে ফেলিয়া উহাকে চূর্ণ করে। বর্ত্তমান উন্নত বিজ্ঞানের দিনে এই বিশাল মৎস্যটী নিয়া যেরূপ বিভ্রাটে পড়িতে হইয়াছিল, তাহাতেই অনুমাণ করা যায় বিজ্ঞান অনভিজ্ঞের দেশে এই একটী মৎস্যই কতিপয় গ্রাম মহামারিতে উৎসন্ন করিত।

প্রবাল।

১০ বৎসর পূর্ব্বে প্রবাল দ্বীপ সম্বন্ধে ডারউইনের মতই প্রবল বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে সে সম্বন্ধে লোকের নানারূপ সন্দেহ হইতেছে। ডারউইন্ বলিতেন যে নিমজ্জমান দ্বীপের উপরে প্রবাল জন্মিয়া প্রবাল দ্বীপ প্রস্তুত করে। কিন্তু সার জন মারে (Sir John Murray) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন সমুদ্র গহ্বর হইতে যে দ্বীপ উপরে উঠিতে থাকে তাহাতেই প্রবাল জন্মিয়া থাকে। উভয় পক্ষেই বিস্তর প্রমাণ আছে এবং তাহাতে উভয়ের সিদ্ধান্তই প্রমাণিত হয়। ডার উইনের মত ঠিক প্রবাল দ্বীপের বহু নিম্ন স্তর পর্য্যন্ত প্রবাল পাওয়ার কথা। ওয়াশিংটনের কার্ণেগি ইন্‌ষ্টিটিউট্ হইতে যে পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে ডার-উইনের সিদ্ধান্তই ঠিক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে কিন্তু মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অধ্যাপক হবস্ (Professor W. H. Hobbs) এ সম্বন্ধে এখনও অনুসন্ধান করিতেছেন।

প্রবাল একরূপ ক্ষুদ্র সামুদ্রিক জীবের কঙ্কাল বিশেষ। কিন্তু ইহারা যে বিশাল স্তূপ প্রস্তুত করে তাহা বস্তুতঃই আশ্চর্য্যজনক। এই প্রবাল সম্বন্ধে বহুকাল যাবৎ লোকের নানারূপ ভুল ধারণা ছিল। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে লোকে ইহাকে একরূপ সামুদ্রিক ফুল বলিয়া জানিত। সে জন্য পুরাতন গ্রন্থাদিতে উহার ঐরূপ বর্ণনাই পাওয়া যায়। প্রবাল ফুল বলিয়া যাহাদের ধারণা ছিল তাহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যাইত যে "প্রবাল ফুল হইলে ইহা হাড়ের মত শক্ত হয় কেন?" তাহারা তৎক্ষণাৎ উত্তর করিত, "বা! উহারা জলের ভিতরে নরমই থাকে, কেবলমাত্র উপরে আসিয়া বাতাস লাগিলেই শক্ত হইয়া যায়।" বহুকাল এ সম্বন্ধে কেহ কোন সন্ধানই করেন নাই। অবশেষে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ইহার অনুসন্ধান করিয়া স্থির করেন যে সমুদ্রগর্ভেও প্রবাল শক্ত থাকে।

জলাভাব

সময়ে সময়ে বৈজ্ঞানিকগণ নানারূপ যুক্তি বলে পৃথিবী ধ্বংসের এক একটী অভিনব পন্থা দেখাইয়া থাকেন। বর্ত্তমানে একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক অনুমান করেন যে পৃথিবী দিন দিন জলশূন্য হইতেছে। যে সকল নদী হইতে আমরা পানীয় জল প্রাপ্ত হইয়া থাকি তাহারা ক্রমে ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া ফল্গুর আকার ধারণ করিতেছে দেখিয়াই তাঁহার ঐ রূপ অনুমান। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে পৃথিবীর শেষ অধিবাসী যাহারা থাকিবে তাহারা খনির গহ্বরে প্রবেশ করিয়া দিবারাত্রি কূপ ইত্যাদির খনন করিয়া পানীয় জল উত্তোলনের চেষ্টা করিবে আমরা এরূপ কল্পনা করিতে পারি। ফরাসী ভূতত্ত্ববিৎ ই. এ মার্ ঘেল্, (E. A. Martel) একখানা ফরাসী বিজ্ঞান গ্রন্থের কিয়দংশে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহার একটী তরজমা সাইণ্টিফিক্ এমেরিকানে (Scientific American বাহির হইয়াছে। পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে জলধারা বহুদিন যাবৎই ক্রমে ক্রমে ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে কিন্তু এই ব্যাপার বর্ত্তমানেও চলিতেছে কিনা তাহাই বিচার্য্য। অনেক বৈজ্ঞানিক বলেন এক সময়ে সাহারার ভূগর্ভে বহুজল সঞ্চিত ছিল, মধ্য এসিয়া এবং আফ্রিকার লবণ হ্রদ প্রভৃতি বহু জলাশয়ের জল যে কমিয়াছে তাহার বিস্তর প্রমাণ আছে। বর্ত্তমানে ভূগর্ভে যেরূপ জলধারা পাওয়া যায় তাহা দ্বারা ইহা একরূপ স্থির করা যায় যে স্রোতস্বতী সকল ভূপৃষ্ঠ হইতে ক্রমে ভূগর্ভে প্রবেশ করিতেছে।

মার্টেল এরূপ বহু আশ্চর্য্য জনক দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন যাহা দ্বারা প্রমানিত হয় যে জল, প্রস্রবণ শুকাইয়া গিয়াছে। ভূগর্ভস্থ নদী গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করিতেছে। সুগভীর কূপ ইত্যাদি জলহীন হইয়াছে এবং উহা দ্বারাই মনে হয় পৃথিবী ক্রমে রসশূন্য হইতেছে। তিনি বলেন জীবগণের তৃষ্ণার সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত।" পাইরেনিজের (Pyrenees) অনেক গহ্বরে দেখা গিয়াছে যে তথা হইতে জল ভূগর্ভের গভীরতর প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে। কেনটাকির বৃহৎ গহ্বর (Mamomth cave of Kentucky) যাহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ তাহার উপরের স্তরে বিশাল ছিদ্র সকল বর্ত্তমান আছে যাহা দ্বারা জল নিম্নতর প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে এইরূপ ছিদ্র স্তরে ২ রহিয়া গিয়াছে তাহা দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে জল নিম্ন হইতে নিম্নতর প্রদেশে চলিয়া যাইতেছে। এ সকল পরিবর্ত্তন কেহ ২ বলেন প্রাগ ঐতিহাসিক যোগেই হইয়াছে! বর্ত্তমানে উহা হইতেছে কিনা তাহাতে মতদ্বৈধ আছে। ইহার কারণ সম্বন্ধেও নানারূপ মত আছে। মারটেল প্রভৃতি ভূতত্ত্ববিৎগণ বলেন ভূগর্ভের কাটল সমূহের বিস্তার ও অল্প বৃষ্টিই ইহার কারণ। কেহ ২ কেবল মাত্র বৃষ্টির অল্পতাকেই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া থাকেন। বন প্রদেশ ধ্বংসকে আবার এই বৃষ্টির অল্পতার কারণ বলা হইয়া থাকে।

—::—

সমুদ্র-জল।

সাধারণ আলো সমুদ্রগর্ভে ২৫২ ফিটের নিম্নে প্রবেশ করিতে পারে না। অন্য কথায় বলিতে গেলে বলা যায় সমুদ্রে ৪২ ফেদম জলের নীচে ঘোর অন্ধকার। জল যতই পরিষ্কার হউক না কেন ২৫২ ফিটের নিম্নে আলো প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু যে আলো ফটোগ্রাফের প্লেটের উপরে কাজ করে অর্থাৎ যাহাকে একটিনিক আলো (Actinic Rays) বলা হইয়া থাকে, উহা অনেক গভীর তর প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারে। পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে ১৫০০ ফিট বা ২৫০ ফেদম জলের নিম্নেও ফটো প্লেটের উপরে আলো ক্রিয়া করিয়া থাকে।

জল মন্দতাপচালক বিধায় বাতাস কিম্বা ভূপৃষ্ঠ হইতে সমুদ্রগর্ভে তাপের অনেকটা সমতা রক্ষা হয়। মেরু প্রদেশে বাতাস কিম্বা ভূপৃষ্ঠের তুলনায় সমুদ্রগর্ভে উত্তাপ অপেক্ষাকৃত অধিক। সেরূপ বিষুব রেখার নিকটে স্থল হইতে সমুদ্রজল অপেক্ষাকৃত শীতল, তথায় সমুদ্রের তাপ ৮২ কিম্বা ৮৩ডিগ্রি সাধারণ এবং কোন সময়ে ৮৮ ডিগ্রিও দেখা গিয়াছে কিন্তু তথায় ভূপৃষ্ঠের উত্তাপ ১৩০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

লবণ এবং অন্যান্য কঠিন পদার্থের পরিমাণ ভিন্ন ২ সমুদ্রে ভিন্ন ২ রূপ দেখা যায়। আটলান্টিক মহাসাগরের জল শত করা ৮৬ ভাগ বাল্টিক সাগরে মাত্র ০·৫ ভাগ কিন্তু ডেড্ সিতে (Dead Sea) আবার শত ২২ ভাগ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। এইজন্যই ঘোর লবণাক্ত ডেড্ সির জলে জিনিষ সহজে ভাসিয়া থাকে। সমুদ্রের জল রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে ৩০ সের অধিক রকমের ধাতব পদার্থ পাওয়া যায় এমণ কি স্বর্ণ পর্য্যন্ত উহাতে বর্ত্তমান আছে। যদি কেহ মনে করেন সমুদ্র জল হইতে লবণের স্বর্ণ বাহির করিয়া নিলেইত প্রচুর স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া সহজে বড় লোক হওয়া যায় কিন্তু উহা বাহির করা একটু ব্যয়সাধ্য। ১ পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ বাহির করিতে মাত্র ২০ পাউণ্ড খরচ হয় এই মুস্কিল।

সমুদ্র জলে বস্ত্র ধৌত করিলে উহা শুকাইতে সময় লাগে কারণ উহাতে মেগনেসিয়াম আছে এই মেগনেসিয়াম সহজে জল শুকাইতে দেয় না। অধিকন্তু ইহা বাতাস হইতেও জলিয় বাষ্প গ্রহণ করে। আমাদের খাওয়ার লবণেও কিছু মেগনেসিয়াম (Magnesium) থাকে বলিয়াই বর্ষার সময়ে বাতাস হইতে জলিয় বাষ্প গ্রহণ করিয়া উহা জল হইয়া যায়। সমুদ্রের জলে সহজে সাবানে ফেনা না হইবার কারণ উহাতে সল্‌ফেট অব কেলসিয়াম এবং মেগনেসিয়াম আছে। (Sulphates Calcium and Magnasium)

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

—::—

অতিথি।

বিপদের শেষ সীমায় পৌঁছিয়া যখন পুলিশের চাকুরি গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন ভাবি নাই যে ৫৲ টাকার কনেষ্টবল হইতে ৫০০৲ টাকার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পর্য্যন্ত আমার অদৃষ্টের গতি ভগবান নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ক্রমে যতই অধঃপাতে যাইতে লাগিলাম ততই পদোন্নতি হইতে লাগিল। দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রীতি, বলিয়া যে কতকগুলি গুণ মানুষকে মানুষ করিয়া রাখে আমি ক্রমে ক্রমে তাহা হইতে দূরে সরিতে লাগিলাম। ক্রমে সমাজ, গৃহ দেশ ছাড়িয়া এক অজানা অচেনা রাজ্যে চলিতে লাগিলাম। তখন সার বুঝিলাম—চাকুরি।

অধঃপাতের চরম সীমায় নামিয়া এই রূপে যখন পদোন্নতির ঊর্দ্ধ সীমায় দাঁড়াইলাম, তখন ধীরে ধীরে একটী উপাধি আসিয়া আমার নামের অগ্র পশ্চাৎ জুড়িয়া বসিল। আর আক জ্ঞ পূরণের কিছুই বাকী রহিল না।

সেই সময় পুরীর সমুদ্র সৈকতে আমার কার্য্যস্থল নিরূপিত হইল; ভাবিলাম এইবার সমুদ্রের বিশালতা দেখিয়া জগৎস্বামীর চরণে মাথা রাখিয়া জীবন সমুদ্র পারি দিব; দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা রূপ মনুষ্যোচিত বৃত্তিগুলিকে পুনরায় সাদরে বরণ করিয়া লইব। এখন আর কিসের অভাব।

পুলিশে কাজ করিয়া প্রভুর ও দশের চক্ষুশূল হইয়া আছি। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবও কেহ বড় প্রীতির চক্ষে দেখে না; তদুপরি পৃথিবীর চোখ রাঙানি ত লাগিয়াই আছে। এই সব দলে মিলিয়া মিশিয়া প্রাণটা বড়ই অশান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। শান্তিকামী মন তাই কিছুদিন হইতে রোজ সন্ধ্যায় আমাকে সমুদ্রতীরে টানিয়া আনিত।

পুরীর সমুদ্র সৈকতে তরল গলিত সোণায় রঞ্জিত নীল জলের আকুল উচ্ছ্বাস দেখিবার জন্য প্রত্যহ সকালে বিকালে যেমন নর নারী সমাগম হয়, সে দিনও তেমনি ভিড় হইয়াছিল।

নির্জ্জনে নরনারীর কোলাহল হইতে একটু পিছনে থাকিতেই প্রাণ চাহিত, যেমন পথেই চলিতাম। সে দিনও তাহাই করিতেছিলাম সঙ্গে আমার কন্যা অমিয়া ছিল।

হটাৎ দূরে সৈকত ভূমি হইতে একটা মিষ্ট সুরের ঝঙ্কার আসিয়া আমাদের কাণে পৌঁছিল। আমরা উভয়েই সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ক্রমে সে সুর আমাদের কাণে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল।

আমরা শুনিলাম:—

"মাঝি, তরী হেথা বাধবো নাকো আজকে সাঁঝে
তরী ভিড়িও নাকো চলুক তরী নদীর মাঝে।"

এই গানটী নিয়া আজ দু'দিন ভরিয়া অমিয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল, কিছুতেই সুর ঠিক করিয়া গাহিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সহসা তাহার আকাঙ্ক্ষিত গানটী সে শুনিতে পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

গায়কের সুমিষ্ট সুর ও ঝঙ্কার আমাদের উভয়কেই মুগ্ধ করিয়াছিল। আমরা উভয়েই গায়কের সমীপবর্ত্তী হইয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ধীরে পদাচরণ করিতে করিতে যুবকের সুন্দর মিষ্ট সুরের ঝঙ্কারে কর্ণ পরিতৃপ্ত করিতেছিলাম, অমিয়া যুবকের সুরের সঙ্গে মনে মনে সুর টানিয়া তাহার নিজ ত্রুটীর স্থানগুলি সংশোধন করিতেছিল।

যুবক একা বালুচরে বসিয়া গান গাহিতেছিল। আমাদিগকে দেখিয়া গানের বেগ কমাইয়া কমাইয়া তার পর শেষ সুর টানিয়া উঠিয়া পড়িল।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া বালুচরের উপর জোৎস্নার রজত শুভ্র আস্তরণ পড়িয়া গিয়াছে।

অমিয়া আমাকে বলিল—"আর একবার গানটা গাহিলেই হইত। ভাল করিয়া গানটা ধরিয়া লইতে পারিলাম না।" অমিয়ার মনের ভাব বুঝিয়া আমি যুবকের সম্মুখীন হইয়া বলিলাম—"বেশ মিষ্টি সুরটী তোমার গানটী আর একবার গাইলে হয় না?"

যুবক আমার দিকে এবং অমিয়ার দিকে সরল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল "স্বচ্ছন্দে গাইতে পারি—তবে গলাটা শুকিয়ে গেছে একটু জল হলেই হতো।"

অমিয়া আমাকে ইঙ্গিতে যুবকটীকে আমাদের বাসায় লইয়া যাইয়া হারমোনিয়মের সহিত মিলাইয়া গানটী

গাহিবার জন্য অনুরোধ করিতে বলিল ; আমি যুবককে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম "তুমি এখানে কোথায় থাক ?

যুবক উত্তর করিল—"আজই এখানে এসেছি, জগন্নাথ দর্শনে ; পাণ্ডা ঠাকুরের আশ্রয়েই আছি।"

আমি সাগ্রহে বলিলাম—"আপাত্ত না থাকিলে আমাদের বাড়ীতেই চল না—মেয়েটীর ইচ্ছা তোমার গানটী ভাল করে সমঝে নেয়। যে কয়দিন এখানে থাক, আমাদের সঙ্গেই থাকিবে।

যুবক সরল ভাবে বলিল—"কোন আপত্তিই নাই।"

(২)

পথ চলিতে চলিতে সে যুবকটী আমাকে বার বার দেখিয়া লইল ; নিশ্চয় আমার বিজাতীয় পোষাকই তাহার সরল ভাবকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। আমরা পুলিশের লোক, মানুষের নাড়ী নক্ষত্র সহজে ধরিতে পারি। তাই তাহার মনের ভাব চাকতে বুঝিয়া লইয়া সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া চলিতে লাগিলাম।

সমুদ্রের বালুচরেই আমার বাড়ী। বাড়ীটী সাহেবী ধরণের বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সম্মুখে দিগন্তব্যাপী বালুকারাশী ধূ ধূ করিতেছে। বাড়ীর চারিদিকে রেলিং ঘেড়ান। মাঠের মধ্যদিয়া বাংলায় যাইবার রাস্তা। আমরা বাড়ীর গেটে পৌছিলাম। সম্মুখে দপ দপ করিয়া আলো জলিতেছিল। গেটে একজন পুলিশও দাঁড়ান ছিল। পুলিশ পাহাড়া দেখিয়া যেন যুবকটী একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। আমি তাহাকে হাত ধরিয়া লইয়া আমাদের বাংলায় প্রবেশ করিলাম।

সান্ধ্যভ্রমণের পর চা এর ব্যবস্থা ছিল। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে যুবককে কিছু জলযোগ করান হইল। তারপর অমিয়া তাহার নিজ কোঠায় যাইয়া পিয়ানতে সুর দিল। যুবকটী গান ধরিল। কি মিষ্ট তার স্বর। গানের সঙ্গে সঙ্গে আমার বাড়ী আলোড়িত হইয়া উঠিল—বাড়ীর মেয়ে পুরুষ সকলেই কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া তাহার পার্শ্বেজড় হইল। মেয়েটী তাহার গানে দেখিলাম বড়ই মাতিয়া উঠিয়াছে। অল্প সময়ের মধ্যে সে বাড়ীর সকলের হৃদয়ে স্থান করিয়া লইল। আমি অবাক হইলাম। জানা নাই শোনা নাই, অথচ একেবারে চির পরিচিতের মত ভাব। কোন সঙ্কোচনাই, কোন দ্বিধা নাই, বরং সঙ্কোচ যদি কাহারও হইয়া থাকে সেত আমারি। সত্যই সে আমাকে অবাক করিয়া দিয়াছে

স্বদেশী গানের তুফান বহিতে লাগিল। অমিয়াও গাহিল। তারপর আহারের তাগিদ আসিল সকলেই একত্র আহারে বসিলাম। গৃহিনী স্বয়ং পরিবেশন করিলেন।

আমার আহারের পর মুহুর্ত্তে নিদ্রা যাইবার অভ্যাস। সুতরাং আর ভদ্রতা করিতে পারিলাম না বিছানায় শুইয়া পড়িলাম।

* * * *

হটাৎ উচ্চরোলে আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। শুনিলাম তখনও মাঝের কোঠায় তর্ক চলিতেছে। দেশের কথা, সমাজের কথা, রাজনীতির কথা. তারপর আয়র্লণ্ডের কথা, মিসরের কথা. ঝড়ের মত সে যুবক বলিয়া যাইতেছে। বুঝিলাম ছেলেটার বিজ্ঞতা আছে, বাগ্মীতাও আছে। এই অল্প সময় মধ্যে আমার গৃহ খানাকে সে আভভূত করিয়া ফেলিয়াছে। কখনও কখনও অমিয়া দুই একটা তর্ক তুলিলেও তাহার মুখের সম্মুখে তাহা টিকতে ছিল না। আমি নিজেও তাহার পাণ্ডিত্য ও বিজ্ঞতায় মুগ্ধ হইলাম।

পরদিন সকালে উঠিয়া কাগজ পত্র লইয়া বসিয়াছি। একটা চীফ তদারকের রিপোর্টগুলি মনোযোগের সহিত দেখিতেছিলাম।

তখন ভিতরের কোঠায় শুনিলাম অমিয়া যুবকটীকে বলিতেছে "নেহাৎ যদি যাবেন— তবে আর কি বলিব। তবে অনুরোধ মাসে, মাসে আসিবেন।"

যুবক উত্তর করিল "জগবন্ধু দর্শন করিতে আসিয়াছি, দর্শন হলেই ফিরে যাব।

তারপর যুবক আমার ঘরে ঢুকিয়া প্রণাম করিয়া বলিল "তবে আসি—

আমি বলিলাম "এখন কোথায় যাবে ?

সে উত্তর করিল— "জগন্নাথ দর্শনে আসিয়াছি সেখানে যাই ; তারপর দেশে ফিরে যাব।

সে চলিয়া গেল। অমিয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তৃষেত যেমন আগ্রহে জলপান করে, তেমনি সে ব্যাকুল ভাবে তাহার পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কতক্ষণ চাহিয়া রহিল তারপর যখন চক্ষু ফিরাইল, তখন দুই গণ্ড সিক্ত করিয়া জল ধারা বহিতেছে। আজ তাহাকে এই নূতন প্রেম মূর্ত্তিতে দেখিয়া আমার মাথা নত হইয়া আসিতে লাগিল।

* * * * *

(৩)

আমি আবার একটা জটীল বিষয়ে রিপোর্ট করিতে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিলাম এমন সময় গৃহিনী পূর্ব্বরাত্রের ডাকের বাসকেটটি আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া দাঁড়াইলেন। আমি রিপোর্টে কলম চালাইতে চালাইতে জিজ্ঞাসা করিলাম এতক্ষণে ডাক আসিলে জরুরী কোন কাগজ আছে কি ? আমার সরকারী বে সরকারী সকল চিঠি পত্রই অমিয়া অথবা আমার স্ত্রী খুলিয়া পড়িয়া দরকারী অদরকারী আগে পরে রাখিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত করেন।

আমার প্রশ্নের উত্তরে স্ত্রী বিশেষ কোন উত্তর দিলেন না। দেখিয়া আমার মনোযোগ রিপোর্টটীর উপরই রহিয়া গেল।

রিপোর্টের কাজ শেষ করিয়া ডাকের বাসকেট টানিয়া লইলাম। উপরে কোন জরুরী চিঠি ছিল না। সুতরাং মনটা একটু পাতলা বোধ হইতেছিল।

হঠাৎ ৪।৫ খানা কাগজের নীচে একটা Aurgent লেফাফা দেখিয়া তাহা টানিয়া লইলাম। চিঠি খুলিয়া দেখিলাম—সতীশচন্দ্র মিত্র কালকাতা মোটর ডাকাতি করিয়া অত্ত পুরীর পথে যাত্রা করিয়াছেন। তাহার ফটো এই সঙ্গে প্রেরিত হইল—সে পুরাতন দাগী আসামী তাহার অনুসন্ধানে কোন ভাল লোক নিযুক্ত করা হউক। লেফাপায় ফটো খানা পাইলাম না। অমিয়াকে ডাকিলাম। ডাক শুনিয়া স্ত্রী আসিলেন।

আমি উত্তেজিত স্বরে বলিলাম "ফটো কোথায় ?" গৃহিনী একটু কোমল স্বরে বলিলেন ;—আছে সেখানা দিবখন ; এখন না দেখলেই কি নয় ? আমি একটু বিরক্তির ভাবে বলিলাম "অত্যন্ত জরুরী যে সেটা ? এত নীচেই বা লেফাফাটা রাখিলে কেন ?" এখনি যে অপরাধিকে ধরিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে ?"

গৃহিনী স্বর আরো একটু মুলায়েম করিয়া বলিলেন—"অতিথি দেবতা, তাকে ঘরে পেয়ে অপমান করিতে নাই। তাই শুভে কুশলে বিদায় করিয়া দিয়াছি।" আমি বলিলাম "এই ছোকরাটাই কি তবে যতীশচন্দ্র ? গিন্নি বলিলেন হাঁ এই যতীশচন্দ্র ! এখন উপায় কি ? গিন্নি আর বলিতে পারিলনা।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তোমরা বুঝিলে কেমন করিয়া এ ছেলেরই যে ফটোগ্রাফ ?

স্ত্রী বলিলেন—অমিয়া দেখিয়াই, আমাকে বলিয়াছিল, তার পর সে ছেলেও দিখিয়াছে। এবং তার উপর যে এরূপ সন্দেহ পুলিসের আছে তা সে স্বীকার পাইয়াছে।"

আমি অস্থির ভাবে বলিলাম—"তবে কি সে ছোকরা আমার সর্ব্বনাশ করিয়া ফটো খানাও লইয়া গিয়াছে ?

গৃহিনী আমার অস্থিরতা দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন—এত ভয় কিসের ? ফটো যায় নাই। চাকরী যাবে না। ফটো আছে ও কাগজ পত্রের নীচেই আছে। ও ছেলেটাকে যেতে দাও ওকে ফাঁসি কাঠে তুলে আর পদোন্নতির দরকার নাই।"

ফটো খানার জন্ম মাথা গরম হইয়া গিয়াছিল। গৃহিনীর আশ্বাসে মেজাজ ঠাণ্ডা করিয়া তাহা কাগজের নীচ হইতে খুঁজিয়া বাহির করিলাম।

গৃহিনীই আমার সর্ব্বকার্য্যে পরামর্শ দাতা।

জিজ্ঞাসা করিলাম "এখন কি করা যায় ? ছেলেটা তো ডাকাত…" গৃহিনী বলিলেন— ডাকাত জগৎ শুদ্ধ সবাই কেবল ছেলেটাই ডাকাত হবে কেন ? ডাকাত তুমি, ডাকাত আমি, ডাকাত না কে ?

"তবে কি করণীয় ?"

গৃহিনী বলিলেন— "এখন পেন্সন লইয়া জগবন্ধুর চরণ চিন্তাই প্রধান করণীয়।

সরকারী কাগজ পত্রের উপর প্রয়োজনীয় হুকুম

লিখিয়া বাক্সেটটা তখনি আফিসে পাঠাইয়া দিলাম।

তার পর যথাবিধি আফিসে যাইয়া দুই বৎসরের কার্য্যের দরখাস্ত করিলাম।

ইহার পর মাসে মাসে রাত্রিতে সে ছোকরার গান শুনিতাম। সে গান আমার কঠোর হৃদয়কে এত অভিভূত করিয়াছিল যে গায়কের ভীষণ প্রকৃতিটাও আমার নিকট উপেক্ষার বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

নামাজের মসলা।

সাবেক কর্ত্তাদের আমলে হিন্দুরা সকলেই ফারশী ভাষা শিক্ষা করিতেন। এখন না-বালেগ বালকেরাও ইংরাজীতে বিশেষ ফাজিল (কৃত-বিদ্য) হইয়া উঠিতেছে। ইউনিভার্সিটির উচ্চ ইলেমের ফেশাদে পড়িয়া কাহারও এখন ফারশী পড়িবার ফুরসৎ হয় না। নানা ওজুহাতে (হেতুবাদে) আমরা আমাদের প্রিয় প্রতিবাসী মুসলেম ভ্রাতাদের শিক্ষা সুহবত (সুসংসর্গ) হারাইয়া তাঁহাদের সুন্দর বোল-চাল, আদব কায়দা, পূর্ব্ব-পরিচিত গার্হস্থ্য রীতি নীতি ভুলিয়া যাইতেছি। ইহা কম আফ্‌শোষের বিষয় নহে ময়মনসিংহ জেলার প্রচলিত উঁহাদের জাত-কর্ম্মাদির স্থূল-বিবরণ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি নিম্নে নামাজের মসলা মোটামুটি ভাবে লিখিত হইল। ভুল ভ্রান্ত হইবারই কথা। তজ্জন্য সহৃদয় ঈমানদার মহাশয়দের সমীপে কসুর-মাফের আরজ জানাইতেছি

পবিত্র এসলাম ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের একটা ক্রম বিভাগ নির্দ্ধারিত আছে। সেই অর্থবাচক শব্দগুলি প্রথমে জানিয়া রাখা দরকার। (১) ফরজ। যে কার্য্য ঈশ্বরের আদিষ্ট। (২) ওয়াজেব। যাহা ঈশ্বরাদেশের ন্যায় মান্য। (৩) সুন্নত যাহা হজরত মহম্মদ (সঃ—তিনি শান্তিতে থাকুন) খোদ (স্বয়ং) করিয়াছেন কিম্বা করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। যথা, মস্তক মুণ্ডন বা নেড়া হওয়া, গোঁফ ছাটিয়া ফেলা, দাড়ি রাখা, খতনা (circumcisim) করা ইত্যাদি বহু আচরণ সুন্নত। (৪) মস্তাহাব, যাহা তিনি মাঝে মাঝে করিতেন। (৫) হালাল, শুদ্ধ কর্ম্ম। (৬) জায়েজ, বিধেয়, সঙ্গত। (৭) মোবাহ, যাহা পাপও নহে, পুণ্যও নহে। (৮) মকরু তঞ্জি, যাহা অনুমোদিত বলা যাইতে পারে না। (৯) মকরু তহরিমা, যে কার্য্য আদবেই অনুমোদিত নহে। (১০) হারাম, অতি অশুদ্ধ কর্ম্ম। (১১) দুরস্ত, ঠিক, নির্ভুল, প্রকৃত। (১২) গোনাহ, যাহা দূষিত, বেহুদা।

প্রত্যেক ভক্ত মুসলমান দিনে পাঁচবার নামাজ আদায় করিবেন। আদায় শব্দের অর্থ to perform a duty, to discharge a debt; যথা, রাজার নিকট প্রজা খাজানা আদায় করে। উল্টা বলা দুরস্ত নয়। পাঁচ অক্ত নামাজ যথা, (১) ফজর, প্রত্যুষে 'সোবে সাদক' অর্থাৎ পূবের আশমান সাফ হইয়া লালচে আসেজ হইলে। কিন্তু "ঠাকুর" (গ্রামদেশে সূর্য্যের চলিত নাম) লালবর্ণ হইয়া দেখা দিলে নামাজ পড়া মকরু তঞ্জি কিছু আঁধার থা কতেই শয্যা ত্যাগ করা চাই কাক কোকিলের ডাকে যাহাদের হুস হয় না, সতর্ক প্রহরী মোওয়েনেরা গলা ফুলাইয়া অতি উচ্চ রবে "ফজর রে! ওঠ্‌" হাঁক দিয়া তাহাদের প্রতি যন্ত্র ভাবী ও তলব দিয়া থাকে। আর না উঠিয়া পরিত্রাণ নাই! মুসলমান ভ্রাতাদের স্বাস্থ্য যে অনেকাংশে ভাল, স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে রোজার উপবাস ও প্রতিরোজ নিয়মমত ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে প্রাতরুত্থান ও উপাসনা তাহার অন্যতম কারণ। (২) জোহর, দুই প্রহরের পর সূর্য্যের মধ্যাহ্ন গগন হইতে পশ্চিমে হেলাইলেই জোহর ওক্ত আরম্ভ হয়। এই সময় প্রতি শুক্রবার সহরের জুমামসজিদে আমীর উমরা গরীব গুরবা উচ্চনীচ ভেদাভেদ না মানিয়া একত্র পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। সে দৃশ্য বর্ণনাতীত। এত লোকের সম্মিলিত প্রার্থনা গগণ ভেদ করিয়া স্বর্গদ্বারে উত্থিত হয়, তাহা নিশ্চিত। সহরের জন্যই জমামসজিদ, জায়েজ, গ্রামের জন্য নয়। জুমা নামাজের বিশিষ্টতা এই খোতবা পড়া

হয়। এশানের খোতবা পড়িবার সময় কেহ কোন কথা বলিতে পারিবে না। (৩) আসর, অপরাহ্ণে এক সময়ে, কিন্তু সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে। মগরের, সূর্য্য ডুবিয়া গেলে যতক্ষণ পশ্চিমাকাশ লালবর্ণ থাকে। (৫) এশার, সায়ংকালের পর ও রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্বে।

প্রাতঃকালে নামাজ নাই প্রভাতে আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই "নাস্তা" ভক্ষণ পূর্ব্বক সাংসারিক কার্য্য সমাধা করিয়া, দ্বিপ্রহরের পাক অন্ন ভোজন করেন। সম্পন্ন গৃহে পরিষ্কার শয্যায় বসিয়া পবিত্রভাবে ভোজন কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। পশ্চিমে লালাকায়স্থ হিন্দু ভদ্রপরিবার মধ্যেও ঐরূপ ভোজন ক্রিয়া। বাস্তবিক ভুক্তাবশেষ ব্যতীত অভুক্ত খাদ্যদ্রব্য উচ্ছিষ্ট বা "মগড়ি" হইতে পারে না। যা মুখের অন্ন, তাহা মহাভারত তুল্য শুদ্ধ।

উক্ত পাঁচ অক্তের নামাজ ছাড়া, যাঁহারা বৃদ্ধ এবং ভগবদুপাসনায় অবশিষ্ট জীবন যাপন করিতে চাহেন, তাঁহাদের জন্য আরও অনেক নামাজের ব্যবস্থা আছে। যেমন সূর্য্যোদয়ের পর "এসরাক," বেলা ৮টার সময় "চাহাস্ত" বেশী রাত্রে "তাহজ্জদ" ইত্যাদি।

কথিত আছে স্বর্গ দূতে জেব্রিল কর্ত্তৃক আনীত পক্ষীরাজ ঘোটকে আরোহণ পূর্ব্বক মহাম্মদ (দং) সপ্তম স্বর্গে গিয়া ঈশ্বরের সন্দর্শন লাভ করেন। একথা সে কথার পর মানবের মুক্তির উপায় বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল। ঈশ্বর প্রত্যহ ৫০ বার নামাজের আদেশ করেন। ফিরিবার পথে হজরতের সঙ্গে মুসার (Moser) দেখা হইল। মুসা বলিলেন ২৪ ঘণ্টায় ৫০ বার উপাসনা করিলে মানুষের আহার নিদ্রার অবসর কোথায়। অগত্যা মহম্মদ পুনরায় ঈশ্বর সমীপে গমন করিয়া অন্যূন ৪০ বার নামাজের ব্যবস্থা পাইলেন। কিন্তু মুসা পুনরায় আপত্তি করাতে মহম্মদ ক্রমাগত স্বর্গে যাতায়াত করিয়া অবশেষে ৫ বার নামাজের আদেশ করিলেন। কিন্তু মুসার মন উঠিল না; তিনি বলিলেন মানুষের ৩ বার উপাসনাই যথেষ্ট। কারণ "একবার নাম লইলে যত পাপ হরে, মহাপাপীর সাধ্য নাই এত পাপ করে।" কিন্তু মহম্মদ লজ্জিত হইলেন, পুনরায় স্বর্গে গিয়া সংখ্যা কমাইতে যাইয়া হইল না। তদবধি মুসলমানের পাঁচ উক্ত নামাজ।

নামাজের প্রথমে ওজু করিতে হয়। মুখ হস্ত পদ প্রক্ষালনের নাম ওজু, আমাদের আচমনের ন্যায়। শরীরের ময়লা দূর করিয়া দেহ মন শুদ্ধ জ্ঞান হওয়া চাই। যেমন আমরা আচমনান্তে পুণ্ডরীকাক্ষ স্মরণ করিয়া বাহ্য ও অভ্যন্তর শুচি জ্ঞান করিয়া থাকি। যাঁহার দাড়ি আছে, তাঁহার দাড়ি ধোওয়া কর্ত্তব্য। ওজু করিয়া বিস্‌মিল্লা পাঠ সুন্নত বটে। বিস্‌মিল্লার অর্থ আমাদের "অয়সারম্ভ শুভায় ভবতু"। ওজু অন্তে লোটা বদনাতে যদি একটু পানি বাঁচে, তাহা দাঁড়াইয়া পান করা মস্তাহার বলিয়া গণ্য। জলের অভাবে (যেমন রেল ভ্রমণে) অনুকল্পে "তৈয়ম্মম" বিধি।

তৎপর খোদাতায়ালার নাম স্মরণপূর্ব্বক পশ্চিমাস্য (কাবার দিকে মুখ) হইয়া ঠিক সিধা খাড়া দাঁড়াইবে, এবং দুই হাত দুই পাশে ছাড়িয়া দিবে। এই অবস্থানের নাম কেয়াম। এখন নিয়েতের সঙ্গে দোয়া পাঠ করিয়া "আল্লাহো আকবার" (তকবির) বলিয়া দুই হাত উত্তোলন পূর্ব্বক বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা দুই কানের নিম্নস্থান স্পর্শ করিবে। পরে পেটের উপরে বাম হাত এবং তার পিঠে ডান হাত সংযুক্ত করিয়া পূর্ব্ববৎ খাড়া থাকিবে। (আনানা মতে স্ত্রীলোকেরা বুকের উপরে দুই হাত রাখে)। তারপর যথাবিহিত সুরা পাঠ করিয়া দুই হাতে দুই হাঁটুতে ভর রাখিয়া নত হইবে। এইরূপ হেটভাবে অবস্থানের নাম রুকু। আবার খাড়া অবস্থান (কুমা)। অতঃপর ভূমিতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম বা "সেজদা" পুনরায় খাড়া হইয়া দণ্ডায়মান। প্রত্যেক অবস্থানেই যথাবিহিত সুরা বা স্তোত্র পাঠ বিধি, তাহা বলা বাহুল্য। প্রত্যেক নামাজ ফরজ ও সুন্নত বিধানমতে গঠিত ও বিমিশ্রিত। প্রত্যেক অক্তে আমাদের ত্রিসন্ধ্যা মন্ত্রের ন্যায় আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন ও "রাকাত" সংখ্যার তারতম্য নির্দ্দিষ্ট আছে। "সেজদা" অবস্থায় দুই হস্ত তল সম্মুখে মেলিয়া মোনাজাত (প্রার্থনা মন্ত্র) পাঠ করিতে হয়। মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে কেরামন্‌ ও কাতেবিন্‌ নামক দুই ফেরেস্তা মানুষের দক্ষিণ ও বাম স্কন্ধে সতত

বসিয়া থাকিয়া তাহার কৃত পুণ্য ও পাপের খতিয়ান প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এইজন্য বিশ্বাসী মুসলমানগণ মোনাজাতের পূর্ব্বে ডান ও বাঁ কাঁধের দিকে চাহিয়া উক্ত দুই ফেরেস্তার উদ্দেশে সেলাম জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। নামাজের সময় কোন সুরা বড় গলায়, কোন সুরা চুপে চুপে পড়িবার নিয়ম। কিন্তু জানানার স্ত্রীলোকদের নীরবে পড়া বিধি।

বাঙ্গালী হিন্দুদের মাথার উপর টুপির আধিপত্য নাই কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে অতি যে মিসকিন (যার কিছু নাই) গরীব, তাকেও অন্ততঃ একটা টুপির মালেক হওয়া চাই। আবার অবস্থাপন্ন মালদার মুসলমানেরও খাটো মোটা অল্প দামের লুঙ্গির প্রতি মমতা বিদ্যমান। ইহার কারণ এই, খালি মাথায় নামাজ পড়া মকরুহ। দুই দিনেই ময়লা ও তৈলাক্ত হইয়া যায় বলিয়া এ জেলার নিম্নশ্রেণীর তৈল-পরায়ণ মুসলমানগণ পাতলা কাপড়ের "কিস্তি" টুপির পরিবর্ত্তে বেত-নির্ম্মিত এক প্রকার টুপি ব্যবহার করিয়া থাকেন। দিনে পাঁচবার নামাজ পড়িতে হইবে সুতরাং টুপি অষ্ট প্রহর মাথায় রাখিয়া দেওয়াই সুবিধা। এইরূপ কারণে মুসলমান সমাজে কাছাহীন লুঙ্গিও "আটপেড়ে" হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ এই বস্ত্রের দুর্দ্দিনে। নাভি হইতে পা পর্য্যন্ত ঢাকিয়া নামাজ পড়া ফরজ। কিন্তু কাছা দিয়া ধুতি পরিলে হাটুর পশ্চাৎ ভাগ ঢাকা পড়ে না, ইহা বিজ্ঞ মৌলবীদের চোখে বাজে। এজন্য শরীরের আপাদ লজ্জা স্থান মোটাবস্ত্রে ঢাকিবার শাস্ত্রীয় আদেশ জানিয়া মুসলমানগণ লুঙ্গি পরিধান করা বিশেষ কর্ত্তব্য বোধ করেন।

পশ্চিমদিককে কাবা বলিয়া শাস্ত্রমতে ঐ মুখে হইয়া গোসল করা ঠিক নয়, কারণ গোসলের সময় শরীরের ময়লা মার্জ্জনা করিতে হয়। কিন্তু এত টা কড়া শাসন এ অঞ্চলে মান্য হয় না। কিন্তু কেহই পূর্ব্বে পশ্চিমে বসিয়া পাইখানায় শৌচে বসিবে না। এই কারণে হিন্দু সহরে মুসলমান ভাড়াটিয়াদের পাকা বাড়ীতে কিছু অসুবিধা থাকিলে তাহা দুরস্ত করিয়া লইতে হয়।

সূর্য্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণ সময়ে বহুলোক একত্র হইয়া কসুফ ও খসুফ্ নামক নামাজ উপাসনা করিয়া থাকেন। তবেই দেখ, কেবল হিন্দুরাই নয়।

খবরদার, হিন্দুই হও কি মুসলমানই হও কেহ যেন ভ্রমক্রমেও নামাজীর সম্মুখ দিয়া চলিয়া যেয়ো না; নহিলে শক্ত গোনাগারী হইতে হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়।

সাহিত্য সংবাদ।

আমরা গভীর শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে জানাইতেছি চট্টল জননীর সুসন্তান কবি জীবেন্দ্রকুমার আর ইহ জগতে নাই। বাঙ্গালা সাহিত্য কুঞ্জে আর একটী সুকণ্ঠ কোকিলের অভাব হইল। কবি জীবেন্দ্রকুমার এ বয়সে প্রকাশ না হইলেও তাঁহার লেখনী নিঃসৃত কবিতা সমূহে কাব্য রসের আস্বাদন পাওয়া যাইত। গত ২৮শে ফাল্গুন রাত্রিতে তাঁহার "সাধনাকুঞ্জে দেহান্তর ঘটিয়াছে। জীবেন্দ্রকুমার স্বভাব কবি ছিলেন তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলিই তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিবে।

১লা, ২রা ও ৩রা বৈশাখ ইষ্টারের ছুটীতে মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন হইবে। উক্ত সম্মিলনের মূলসভার সভাপতি—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ ভক্তিভূষণ এম, এ, বি, এল।
সাহিত্য শাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন এম, এ।

ইতিহাস শাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।

দর্শন শাখার সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, বি, এল।

বিজ্ঞান শাখার সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু, বাহাদুর, রসায়নাচার্য্য, আই, এস, ও এম্ বি, এফ সি, এস।

প্রত্যেক অনুষ্ঠানের বিবর ও নির্দ্ধারিত সময় প্রতিদিন সম্মিলন মণ্ডপে বিজ্ঞাপিত হইবে

আগামী ১৭ই বৈশাখ রবিবার হাওড়া সহরে বেদ সভার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হইবে মাননীয় স্যার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 'স আই ই মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। এই উপলক্ষে বিভিন্ন প্রদেশের বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ সম্মিলিত হইবেন।

সৌরভ সম্পাদক প্রণীত "স্রোতের ফুল" বাহির হইয়াছে। মূল্য ১৲। ভিপিতে লইলে ১॥০ দের টাকা শ্রীসুন্দরম সিংহকে পাঠান।

ময়মনসিংহ "লিলি প্রেস" হইতে পল্লিশ্রী নামক এক খানা সচিত্র মাসিক পত্র বৈশাখ মাস হইতে বাহির হইবে। আমরা সহযোগীকে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

আটীয়ার ইতিহাসের মুদ্রাণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় করটীয়ার লোক বরেণ্য শ্রীযুক্ত মৌলবী ওয়াজেদআলী খানপন্নি সাহেব ননকোঅপারেসন হেতু কারাগারে যাওয়াতে পুস্তক খানি সাধারণ্যে বাহির হইবার পথে বিঘ্ন ঘটিয়াছে। সমগ্র আটীয়া বাসী কেন বাঙ্গালার শিক্ষিত জনমাত্রেই এই ইতিহাস খানি দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন।

সাভারের কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র দত্ত প্রণীত ফলিত চিকিৎসাবিধানের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়াছিল, ঐ পুস্তকখানি সংশোধিত হইয়া বৃহত্তর আকারে শীঘ্রই বাহির হইতেছে।

ময়মনসিংহ টাঙ্গাইলের একজন সাহিত্যিক—ভালেপাবাদ পরগণার ইতিহাস লিখিতেছেন। এই ইতিহাস খানি খুব বৃহদায়তন হইবে ও বহু হাফটোন ছবিতে শোভিত হইবে।

মোগল-সম্রাট

বা

আকবর সাহ।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যবন্ধু ভূতপূর্ব্ব "নির্মাল্য" সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, মোগল সম্রাট আকবর সাহের জীবনী অবলম্বন করিয়া একখানা ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে রাজেন্দ্র বাবু "রাজ-মঙ্গল" "শিকার কাহিনী" "তন্দ্রা ও স্বপ্ন" লিখিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। "মোগল সম্রাট" তাঁহার পরিপক্ক জ্ঞান, এবং অলৌকিক লিপি কুশলতার নিদর্শন। বর্ত্তমান উন্নিয়মান যুগে হিন্দু মুসলমানের সম্মিলন ক্ষেত্রে রাজ নীতি, সমাজ নীতি এবং ধর্ম্ম নীতি একত্র তিনের সমাহার "মোগল-সম্রাটে" সুন্দররূপে প্রস্ফুট হইয়াছে। আশা করি "মোগল-সম্রাট" বাঙ্গালা সাহিত্য এবং রঙ্গমঞ্চে একটা অভিনব যুগান্তর আনয়ন করিবে।

সৌরভ

দশম বর্ষ। | ময়মনসিংহ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ সন। | পঞ্চম সংখ্যা।

স্নেহের দান।

(৮)

মধু বাড়ী আসিয়া যখন দেখিল, মাখন বাস্তবিকই চিঠি লিখিয়া রাখিয়াগিয়াছে তখন তাহার নিকট মাখনের মাতৃদর্শন বিবরণ একান্ত সত্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল; আর সে কথা স্মরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। সে গুড় সংযোগে চিপিটক ভক্ষণ করিতে করিতে মাতার নিকট সেই অলৌকিক কাহিনী যথাযথ বর্ণন করিল। তাহার মাও সে বর্ণনা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং উদ্দেশে সেই সতী সাধ্বীর নিকট মস্তক নত করিলেন। বলরামও শুনিলেন এবং অলক্ষিতে অশ্রু ত্যাগ করিতে করিতে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা খুলিয়া বার্ষিক শ্রাদ্ধতিথির বার-তারিখ স্থির করিলেন এবং গয়াতে যাইয়া গদাধরের শ্রীপাদপদ্মে প্রেতের পিণ্ডদানের কি ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মধু তাহার পিতাকে বিশেষ ভাবেই জানাইল যে মাখনদার এবার পরীক্ষার বৎসর, হেডমাষ্টারের নিকট থাকিয়া পড়াই তাহার এখন উচিত, সেও এই কথাই পুনঃ পুনঃ জানাইতে অনুরোধ করিয়া দিয়াছে। লজ্জা কাটিয়া গেলে সে নিজ হইতেই আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়া যাইবে। শুনিয়া রামকানাই একদিন যাইয়া মাখনকে দেখিয়া আসিবেন স্থির করিলেন।

বিকালে রামপুর হাইস্কুলের হেডমাষ্টার কিশোরীবাবু ও আর দুটী শিক্ষক বেড়াইতে আসিয়া রামকানাইর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিশোরী বাবু মাখনের কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন—"মাখনের জন্য আপনাদের কোন চিন্তা করিতে হইবেনা। সে এই ৮।১০ মাস যদি আমার নিকটে থাকিয়া পড়ে, তবে তাহাকে ১৫৲ টাকার ডিভিসনেল স্কলারসিপ যে পাওয়াইব সে সম্বন্ধেতো কোন সন্দেহই নাই জেনারেল স্কলারসিপও পাইতে পারে বা। আপনি আর যাইবেন না—আপনি গেলে সে বড়ই লজ্জিত ও বিপন্ন হইবে। ছেলে মানুষ—দীনেশের কথায় সে অত্যন্ত অপমান বোধ করিয়াছে—সেকথা ভুলিয়া গেলেই আসিবে খন্।"

এই প্রসঙ্গে দীনেশের কথা উঠিল। হেডমাষ্টার বাবু বলিলেন "দীনেশের কিছুই হইবে না; ওকে স্কুলে না যাইতে দিয়া কিছু সংস্কৃত পড়াইয়া পৈতৃক ব্যবসায়েই লিপ্ত করিয়া দিন। ছেলেটার বুদ্ধি আছে—তাহা তাহার ইচ্ছানুসারে সৎপথে পরিচালিত করিতে দিন।"

রামকানাই ঘৃণা ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—"মরুকগে সে হতভাগা।" কিশোরী বাবু পুনঃ পুনঃ রাম কানাই ভট্টাচার্য্যকে মাখনের উদ্দেশ্যে যাইতে নিষেধ করিয়া ও তাঁহার তদ্বিষয়ে স্বীকার উক্তি লইয়া চলিয়া গেলেন।

এই ব্যাপারে রামকানাইর দুশ্চিন্তার পারাপার ছিল না। এক দিকে আপন ভ্রাতুষ্পুত্র অপর দিকে মাতৃ-পিতৃ হীন নিরাশ্রয় শ্যালক পুত্র, কাহাকেও ঠেলিয়া ফেলিতে পারেন না। অথচ তিনি প্রত্যক্ষ দেখিতেছিলেন, এই দুই এর স্থান এক পরিবারে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। তিনি ইতঃপূর্ব্বে বিরোধের যে স্থল লক্ষ্য করিয়াছিলেন এই সুযোগে তাহাতে ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিবেন স্থির করিয়া রাত্রে আহারান্তে শয্যায় শুইয়া পত্নীকে বলিলেন—"বলরাম বিবাহ সম্বন্ধে কি বলিল সে দিন?" বড় বউ নিজের

পানটীর মধ্যে চূণ দিয়া সুপারি কাটিতে কাটিতে বলিলেন "ঋণশোধ না করিয়া তিনি আর বিবাহ করিবেন না স্পষ্টই বলিয়াছেন।" রামকানাই একটু চিন্তা করিয়া লইয়া বলিলেন "বিবাহ তাহার করিতেই হইবে; এখন পাত্রীর প্রয়োজন। আমার মনে হয় কুসুমের সহিত বলাইর বিবাহ হইলে, এ দুই পরিবারের মনোমালিন্য কাটিয়া যাইতে পারে, তুমি কি বল?"

বড় বউ পানটী মুখে দিয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন—"মন্দ কি; তবে তাঁহার সহিত না প্রস্তাব করিয়া যদি মাখনের সহিত কুসুমের বিবাহের প্রস্তাব চালানো যায় তবে কাহারও বোধ হয় তাহাতে কোন আপত্তির কারণ থাকে না। আর তিনি যে পণের উপর পণ করিয়া ডুবিয়া এখন আর বিবাহ করিতে স্বীকার করিবেন, বোধ হয় না।"

রামকানাই একটু উৎসাহের সহিত শয্যায় কাত ফিরিয়া বলিলেন—"বেশতো তাহাই হউক, কুসুমেরও তো বয়স হইয়াছে, এখন ঠিক হইয়া থাকুক, বলুরও একটা দেখি, তারপর একেবারে দুই বিবাহই হইয়া যাইবে।"

বড়-বউ বলুর বিবাহেরও আভাস পাইয়া পরম উৎসাহের সহিত বলিলেন—"প্রজাপতি ঠাকুরের ইচ্ছায় শুভে শুভে বিবাহ হইয়া যায়তো কত সুখের কথা।"

রামকানাই হাসিয়া বলিলেন—"বিবাহের নামে খোজ নাই, আগেই শুভে কুশলে সম্পাদন—আগে সম্মতি লও! এ বিবাহ হইলেই ঘর ঠিক থাকিবে, নতুবা যে কি হইবে নারায়ণই জানেন"! রামকানাই আর বলিতে পারিলেন না।

পরদিনই বড়-বউ তাহার মাতাঠাকুরাণীকে ও দীনেশকে একত্র করিয়া তাহাদের নিকট কুসুমের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। দীনেশ ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিল—"কিছুতেই হইতে পারে না। কুসুমের বিবাহে অনেক ভাবনা চিন্তার বিষয় আছে।"

বড়-বউ বলিলেন—"সে সকল ভাবনাচিন্তার মালীক কি কেবল তুমিই না আমাদিগকেও কিছু কিছু চিন্তা করিতে হইবে!"

দীনেশ বলিল—"তোমাদের যে সে বিষয়ে কোন চিন্তা আছে, ভাবে-স্বভাবে তো সেরূপ কিছু বুঝা যায় না।"

বড়-বউ বলিলেন—"সেটা কি, বলিলেইতো আমরা বুঝিতে পারি।"

দীনেশ—"চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন করে না, 'ফলেন পরিচিয়তে'—আগে বলুদার বিবাহ ঠিক কর, তারপর আমার মত বলিব। বলুদার বিবাহ না ঠিক হইলে তো আর মাখনার বিবাহ হইবে না?"

বড়-বউ—"তোরা মত দিলেই যে কার্য্যের উদ্দেশ্যে বাহির হইতে পারেন।"

দীনেশ বলিল—"শ্রোত্রীর ছেলে বিবাহ, কেবল বাহির হইলেই হয় না। ওজন করিয়া টাকা চাই! পিসিমা, ওজন করিয়া টাকা! তবে ওই পুঁটিকে বদল দিয়া আনিতে পার, তবে তা জানি! নতুবা ডুবী নৌকা একেবারেই যে তলাইয়া যাইবে—আমরাও সঙ্গে সঙ্গে যাইব।"

বড়-বউ দীনেশের মনের গূঢ় অভিসন্ধি বুঝিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন—"তোর বিবাহের জন্য কোন চিন্তা করিতে হইবে না। আগে রোজগার করিতে শিখ, তারপর তো বিবাহ।"

দীনেশ একটু রাগ করিয়া বলিল—"সেটা পিসিমা যার যার মতলবের কথা, সে কখনই হইবে না। আমি হাতের দা ফেলিয়া দিয়া পরে দ্বারে দ্বারে ঘুরিব, আর তোমরা তোমাদের ডুবা নৌকার অবস্থা দেখাইয়া চোখ টিপিবে—এ কিছুতেই হইবে না।"

জয়মণি এতক্ষণ কোন কথাই বলিতেছিলেন না, এইবার বলিলেন—"নদীরওতো কূল কিনারা চাই গঙ্গা, তোমাদের যে রকম ভাবগতিক দেখিতেছি, তোমাদের ধরিয়াই যে আমাদের কূল পাওয়া যাইবে তারতো কোন লক্ষণই দেখি না। তবে আর হাতের পাঁচ ছাড়িয়া ফতুর হইয়া মরি কেন? নাঃ, বুঝিলাম তুমি পিসিমা, ভাইপুতের দরদি পিসিমা আছ, তবে না হয় পিসিমার কথায়ই নদী আমার উচিত বলিতো—এ যখন স্বপ্নের কথা, তখন নিজের পথ নিজে দেখিয়া চলাই তো উচিত।"

জয়মণির মন্তব্য শুনিয়া গঙ্গা আর কোন কথা তুলিতে ইচ্ছা করিলেন না।

(৯)

প্রাতে বলরাম তাহার ঘরের দরজায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিলেন। তাহার মুখ দেখিয়া বড় বধূ বুঝিলেন, কোন বিশেষ চিন্তা তাঁহাকে পীড়া দিতেছিল। তিনি ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া ঘোমটা মুখের উপর টানিয়া ধরিয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন—"শরীরে কি কোন রকম অসুখ বোধ করিতেছেন ?"

বলরাম বলিলেন—"বৎসরান্ত শ্রাদ্ধের তিথি নিকট, একটী পয়সাও হাতে নাই; এদিকে মাখন বলিতেছে, গয়াতেও পিণ্ড বৎসরান্ত-শ্রাদ্ধের পরে সপ্তাহ মধ্যেই দিতে হইবে…"

বড়-বউ—"তা দিতেই হইবে, ছোট-বউ স্বপ্নে মাখনকে তাই বলিয়াগিয়াছে। মাখন শ্রাদ্ধ করিতে বাড়ী আসিবে তো ?" বড়-বউ বড়ই আগ্রহের সহিত এই কথাটীর প্রত্যুত্তর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

বলরাম বলিলেন—"না সে বাড়ী আসিতে একেবারেই নারাজ। সে বলে নৈহাটী গিয়া গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধ করিয়া গয়া যাইবে—একেবারে সব কার্য্য শেষ করিয়া আসিবে।"

বড়-বউ জিজ্ঞাসু হইয়া বলিলেন—"তাহাতে খরচ কম লাগিবে না বেশী লাগিবে ?"

বলরাম—"খরচ সমানই লাগিবে, কিন্তু বিদেশে হইলে টাকা সব নগদ প্রয়োজন—কাজও সুশৃঙ্খলায় হইবে না, কথায় কথায় পরের উপর নির্ভর করিতে হইবে। বাড়ীতে সে অসুবিধা নাই।"

বড়-বউ সহানুভূতির স্বরে বলিলেন—"এ বিষয়ে দেখুন পরামর্শ করিয়া—কাজ যখন অবশ্যকরণীয়, তখন যে রকমেই হউক করিতেতো হইবেই।"

বলরাম একটু হাসিয়া বলিলেন—"টাকা হইলে পরামর্শের জন্য ঠেকিবে না।"

বড় বউ বলিলেন—"পরামর্শে তাহাও মিলে।"

বলরাম উঠিয়া গেলেন। নিজের বুদ্ধি ও উপায় ঠিক না করিয়া দাদার সহিত পরামর্শ করা তিনি উচিত মনে করিলেন না।

মাখন চলিয়া যাওয়ার কিছুদিন পর একদিন রামকানাই বলরামকে বলিলেন—"ভাই আমার তো অবস্থা দেখিতেছ, স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং আমি প্রায় দারুভূতা মুরারীই হইয়া পড়িয়াছি। তুমিও আর বিবাহ করিয়া সংসার পাতিতে রাজী নহ, মাখন যে আর এদিকে দৃষ্টি করিবে, সেরূপ নমুনাও দেখা যাইতেছে না; সুতরাং আমার সঙ্গে থাকিয়া তোমার শেষ কপর্দ্দকটী পর্য্যন্ত খরচ করিয়া ফতুর হইবার দরকার দেখি না। তুমি এখন যথাসম্ভব সামান্য ব্যয়েই নিজ ভরণ পোষণ চালাইতে পার, তাহাই কর।"

বলরাম আপত্তি করিয়াছিলেন—"আপনার স্কন্ধে এতগুলি পোষ্য রাখিয়া আমি পৃথক-অন্ন হইব না; আমার মনুষ্যত্ব এখনও একেবারে লোপ পায় নাই। আপনার হাতে মানুষ হইয়াছি, সুতরাং কৃতজ্ঞতার ধারও আমাকে শেষ দিন পর্য্যন্ত হৃদয়ে স্মরণ রাখিতে হইবে। আপনি যাই বলুন এ বিষয় আমি আজ একমত হইতে পারিতেছি না। ঋণও উভয়ের, সংসারও উভয়েরই।"

রামকানাই উত্তরে বলিলেন—"সে তুমি যাই বল, আমি আমার সঙ্গে তোমাকে ডুবাইব না। তুমি আজ হ'তে পৃথক। তুমি খাইয়া পরিয়া দাদাকে সাহায্য করিতে পার—তাঁহার ঋণ দিতে পার, সে বিশেষ।

ইহার পর হইতে বলরাম পৃথক। বড়-বধূ কিন্তু তাঁহাকে পৃথক রান্না করিয়া খাইতে দেন না। বলরামও যাহা কিছু উপার্জ্জন করেন, নিজের হাতখরচের জন্য সামান্য কিছু রাখিয়া বাকী বউ-ঠাকুরাণীর হাতেই আনিয়া দেন।

মাখনের বৃত্তির টাকা পূর্ব্বে সম্পূর্ণই তিনি দাদার হাতে দিতেন; এ মাস হইতে সে দুই টাকা তাহার বার্ষিক পরীক্ষার খরচের জন্য তহবিল রাখিয়া বাকী ৩৲ টাকা বলরামকে দিয়াছিল; বলরাম তাহা আনিয়া দাদার হাতে দিয়া বলিয়াছিলেন—"মাখন যাহা দিতে পারে, তাহা আপনাকেই নিতে হইবে। আপনার আশীর্ব্বাদে তাহার মঙ্গল হইবে।" রামকানাই তাহা আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন।

এইরূপ অবস্থায় শ্রাদ্ধের খরচ সম্বন্ধীয় আর্থিক চিন্তার ভিতর বিপন্ন দাদাকে টানিয়া আনা বলরাম সঙ্গত মনে করেন নাই।

বড়-বধূর নিকট শুনিয়া রামকানাই বিকালে বলরামকে ডাকিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"শ্রাদ্ধের কি ব্যবস্থা দরকার।"

বলরাম জ্যেষ্ঠের প্রতি প্রচুর সম্ভ্রম রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"হাতে কিছুই নাই ব্যবস্থা কি

রামকানাই—"নৈহাটী গিয়া শ্রাদ্ধ করিয়া গয়ায় পিণ্ড দিয়া আসিতে নেহাৎ কম হইলেও—পঞ্চাশ টাকার কমে কিছুতেই হইবে না।"

বলরাম—"তার পঞ্চাশ পয়সারও উপায় দেখি না। বাড়ীতে করিলে ধারে কর্জ্জায় কোনমতে কাজ শেষ করা যাইত।"

রামকানাই—"সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধ গঙ্গাতে হওয়াই উচিত এবং তাহার অব্যবহিত পরেই গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ড প্রয়োজন—এ বিষয়ে মনে দ্বিধা ভাব থাকা উচিত নহে। উপায় না থাকিলে টাকা কর্জ্জ করিতে হইবে। সে আমিই করিব।"

বলরাম—সকল ঋণইতো আপনার নামে, তাহাতেই বাড়ী ঘর ব্রহ্মত্র সব রেহেন আছে; আপনাকে আর টাকা দিবে কে?"

রামকানাই—"না যদি কেহ দেয়, তবে বড় বৌর অলঙ্কার যে কয়খানা আছে, তাহাই বন্ধক রাখিয়া কার্য্য হইবে। সেজন্য শ্রাদ্ধ পতিত হইতে পারে না। বরং ৫০ টাকার স্থলে ২৫ টাকায় স্বাং স্বিংকরিয়া কার্য্য করিতে হইবে।"

বলরামের নিকট এইরূপ প্রস্তাব ভাল লাগিল না। ছোট বধুর যে কয়েকখানা রূপার মোটা ও ওজনি অলঙ্কার ছিল তাহাই বন্ধক রাখিয়া বলরাম ৫০৲ টাকা সংগ্রহ করিলেন।

বলরামের এই ব্যবস্থা রামকানাই অন্তরের সহিত অনুমোদন করিলেন না। বিদায় কালে ভাইকে বলিলেন—"আমার ব্যবস্থাটা রক্ষা করিলেই সুখের হইত। আশীর্ব্বাদ করি শুভে কুশলে কার্য্য সম্পন্ন হউক।"

ভাই বলিলেন—আপনাকে দেউলিয়া করিয়াছি, তাহা হইতে রক্ষা করিতে পারিলেই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারিলাম, মনে করিব মাথনকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।"

(১০)

পূর্ব্বে নন্দীগ্রাম হইতে পদ্মা দেখা যাইত না। ক্রমে পদ্মার প্রবল প্লাবনে এই অন্তর হ্রাস হইয়া গিয়া পদ্মা নন্দীগ্রাম ধৌত করিয়া চলিয়াছিল। এবারের বর্ষার সারাতেই—পদ্মার ভাঙ্গন আরম্ভ হইল। নন্দীগ্রাম প্রভৃতি তীরবর্ত্তী গ্রামের লোক অত্যন্ত শঙ্কিত হওয়া স্থানান্তরে আশ্রয় খুজিতে লাগিল। যাহারা পৈত্রিক ভিটার মায়া ত্যাগ করিতে না, পারিয়া তাহা আগুলিয়া রহিয়াছিল, তাহারা এসময় আর উপায় দেখিল না।

পূর্ব্ববঙ্গের বর্ষা অবিশ্রাম বর্ষা। যখন আরম্ভ হয় তখন বিরাম হীন, বিশ্রাম হীন। এবারেও অবিশ্রান্ত ধারায় বর্ষা নামিল—সে বর্ষণে ক্ষেত ডুবাইল, মাঠ ডুবাইল, ঘাট ডুবাইল, পথ ডুবাইল; বৃষ্টি মাথায় করিয়া লোক প্লাবনে ছুটা ছুটি করিতে লাগিল; নৌকা ডুবাই করিয়া মানুষ প্রাণ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য লইয়া রক্ষা পাইতে যাইয়া পদ্মার জলেই পুনরায় ভরাডুবি হইয়া মরিতে লাগিল। পাষাণ বাহিনী পদ্মার পাষাণ হৃদয়ে এ মৃত্যুলীলা চির দিন চলিয়া আসিয়াছে। শ্রীপুর, রাজনগরের বিপুল বিভব গ্রাস করিয়া যাহার বুভুক্ষু উদর তৃপ্ত হইতে পারে নাই, সে অতৃপ্ত রাক্ষসীর শান্তি কোথায়?

যে দিন সংবাদ রাষ্ট্র হইল যে লৌহজঙ্গের পাল রাজাদিগের বিশাল বন্দর পদ্মার গর্ভে ডুবিয়া তলাইয়াগিয়াছে, সে দিন লোকের আর আতঙ্কের অবধি রহিল না।

যদু গ্রামান্তর হইতে কালীপূজা করাইয়া নৌকাতে বাড়ী ফিরিয়াছিল। রামকানাই সেই নৌকা আটক রাখিয়া তাহাতে বাড়ীর সকলকে তুলিয়া দিয়া সেই শিষ্য বাড়ীতেই নৌকাখানা পাঠাইয়া দিলেন। পৈত্রিক ভিটা আগুলিয়া বসিয়া থাকিলেন কেবল তিনি একা। যদু পিতার এই ব্যবস্থায় আপত্তি করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ কিছুতেই তাহা অন্যথা হইতে দিলেন না। স্ত্রী পুত্রের চক্ষুজল অগ্রাহ্য করিয়া রামকানাই রহিলেন—বলরামের জন্য।

বলরামের পঁহুছিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। অবিশ্রাম বৃষ্টি, আসিবেই বা সে কেমন করিয়া। আর আসিলে যাইবেই বা সে কোথায়? তাই বলরাম রহিলেন।

রামকানাইর আঙ্গিনায় যদু, মধু ও দীনেশ অনেকগুলি কলার ভেলা বাঁধিয়া রাখিয়াছিল—বিপদে পদ্মাতীরবর্ত্তী লোকের ইহাই প্রাণ বাঁচাইবার একমাত্র উপায়।

রামকানাই বৃষ্টিতে ভিজিয়া গরুগুলিকে ছাড়িয়া দিলেন, এবং গরুর দড়িগুলি একত্র করিয়া ভেলার সহিত বাঁধিয়া রাখিলেন। তারপর কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া হতাশ হৃদয়ে শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

শেষরাত্রিতে মুসলমান পাড়া ও বাজারটী একেবারে তলাইয়া গেল। ভোরে গ্রামের স্কুলগৃহখানাকে আসবাবপত্র সহ পদ্মা গ্রাস করিল। অবস্থা দেখিয়া গ্রামে রামকানাইর ন্যায় যে দুই একজন লোক অবশিষ্ট ছিল তাহারাও সে শশ্মান ক্ষেত্র ত্যাগ করিল।

শেষ রাত্রিতে সংহারমূর্ত্তি ধরিয়া উন্মত্তঝড় তার তাণ্ডব নৃত্যে বিশ্বের বিরাট বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিতে উদ্যত হইল। ঝড়ের সহিত মুসলধারে বৃষ্টি পরিতে লাগিল। প্রকৃতির একটা ভীষণ উন্মত্ততা প্রত্যক্ষ করিয়া রামকানাই চক্ষের জল মুছিয়া পৈতৃকভিটার মায়া ত্যাগ করিলেন। তাঁহার ভেলা তাহাকে লইয়া প্রবল স্রোতে ভাসিয়া চলিল।

———

জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় সাহিত্য।*

দেশের এই নব-জাগরণের দিনে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছেন এবং বিদেশী গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক বিদেশী বিদ্যার বিস্তারের জন্য স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয় যে আমাদের জাতীয় শিক্ষার প্রকৃত কেন্দ্র হইতে পারে না একথা স্পষ্টবাক্যে বলিতেছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুসৃত শিক্ষাপ্রণালী জাতীয় জীবন-গঠনের পক্ষে নিষ্ফল হইয়াছে, প্রত্যুত ঘোরতর অমঙ্গল সাধন করিয়াছে, এইজন্য ইহার ও ইহার সংসৃষ্ট স্কুল-কলেজের বিলোপ সাধন অবিলম্বে কর্ত্তব্য—এরূপ অভিমতও প্রচারিত হইয়াছে। প্রথমে এই 'চরম' অভিমতটির কিঞ্চিৎ বিচার করিয়া পরে মূল কথার আলোচনা করিব।

বিদেশী শিক্ষার গুণ।

অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক কাল পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রচলনে আমাদের অন্ততঃ তিনটি উপকার হইয়াছে। প্রথমতঃ, আজ যে সমগ্র বাঙ্গালাদেশে, শুধু বাঙ্গালাদেশে কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে আমাদের মধ্যে একটা সুদৃঢ় ঐক্য-বন্ধন ও দেশাত্মবোধ জন্মিয়াছে, ইহা ইংরেজী সাহিত্য ও ইংলণ্ড, ফ্রান্স, হলাণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাজ্য, প্রভৃতি দেশের ইতিহাস-পাঠের ফল। পূর্ব্বপ্রথানুসারে নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাব্য, পুরাণ, স্মৃতি নব্যন্যায় প্রভৃতির চর্চ্চা করিলে স্বজাতীয় জ্ঞানানুশীলন অব্যাহতভাবে চলিত বটে; কিন্তু শেক্স্পীয়ার, মিল্টন, বার্ক, শেরিডান, স্কট, বায়রন, মিল, মেকলের রচনাপাঠে যে স্বাধীনতাস্পৃহা ও দেশহিতৈষণা জাগিয়াছে তাহার উদ্ভব হইত কিনা সন্দেহ। জানি, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' আমাদেরই শাস্ত্রের কথা। কিন্তু বার্ক বায়রন প্রভৃতির ওজস্বিনী বাণীই এই শাস্ত্রীয় শ্লোকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে নাই কি? বিদেশীয় শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে আমরা নিজের অনেক অমূল্য দ্রব্য হারাইয়াছি বটে (সে কথা পরে বলিব), কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেই বিদেশীয় জ্ঞানের প্রবল ধাক্কায় জাগিয়া উঠিয়া নিজের জিনিষ খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছি, নিজের অভাব-ত্রুটি, নিজের অবনতি-অবমাননা তীব্রভাবে অনুভব করিতে শিখিয়াছি, ইহা অস্বীকার করিলে ঘোরতর কৃতঘ্নতা হয়। এই বিদেশীয় শিক্ষাদীক্ষা যেমন এক দিকে মনের গোলামি (slave-mentality) আনয়ন করিয়াছে, তেমনি অপর দিকে জাতীয়ভাবোধ (national self-consciousness) উৎপাদন করিয়াছে। মনে রাখিবেন 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র এই শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট। মহাত্মা ৺রামমোহন রায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ৺রাজনারায়ণ বসু, ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্তান না হইলেও এই বিদেশীয় শিক্ষাদীক্ষার সুপক্ব ফল।

সেইজন্যই যখন গত বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎসংসৃষ্ট স্কুল-কলেজ ধ্বংশ করিবার চেষ্টা প্রকট হইয়াছিল, তখন তাহাতে সায় দিতে পারি নাই—রুটি মারা যাইবার আশঙ্কায় নহে, মনের গোলামির প্রভাবেও নহে, অন্ধ বিদেশী সাহিত্যপ্রীতির খাতিরেও নহে। যত দিন জাতীয় শিক্ষার একটা প্রণালীবদ্ধ ব্যবস্থা (scheme) খাড়া না হইতেছে এবং প্রয়োজনীয় মালমশলা সংগৃহীত ও সুসজ্জিত না হইতেছে (সে কথা পরে বলিব) তত দিন পর্য্যন্ত প্রচলিত প্রণালীর সংহার করিলে বিষম ভ্রম হইবে। তত দিন এই ইংরেজী সাহিত্যের এবং ইউরোপীয় ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিতর দিয়াই দেশাত্মবোধ উদ্‌বুদ্ধ করিতে হইবে। জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থায় ইংরেজী সাহিত্য রাজাসনচ্যুত হইলেও একেবারে বর্জ্জনীয় নহে, ইহাও মনে রাখিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, পাশ্চাত্যগণ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া, বিশেষতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে, জড়বিজ্ঞানে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে, এই শিক্ষাপ্রণালীর প্রসাদাৎ সে সমস্ত একবার বিনা-আয়াসে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্তানগণ আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন। নিজেদের প্রযত্নে এই সমস্ত তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে হইলে আমাদের কত শতাব্দী লাগিত কে জানে? এটা আমাদের কম লাভ

* ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ তারিখে মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশনে সাহিত্যশাখার সভাপতির অভিভাষণ।

নহে বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে' বুঝাইয়াছেন,—ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোক-শিক্ষায় বড় সুপটু।...ইংরেজী শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে।' (৪র্থ খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ)। ইহার ফলে আমরা যে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শুধু কৃতী ও বিচক্ষণ ডাক্তার এঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি পাইয়াছি তাহা নহে, ইউরোপীয় জ্ঞান আত্মসাৎ করিয়া সেই ভিত্তির উপর নব নব মৌলিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে ইউরোপীয় জাতিগণকেও চমৎকৃত করিয়াছেন, জগদীশ চন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় এমন বৈজ্ঞানিকও পাইয়াছি। অতএব এত বিদেশজাত বিজ্ঞান বর্জ্জনীয় নহে, সাদরে গ্রহণীয়।

তৃতীয়তঃ এই শিক্ষার ফলে ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশভাষায় একটা সমৃদ্ধ সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে ইংরেজী এবং তাহার মারফত ফরাসী জার্ম্মান ল্যাটিন গ্রীক প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যের স্বাদ পাইয়া সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত একটা অভিনব ও বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা আমাদের সাহিত্যের Renaissance অর্থাৎ নব-জীবন-লাভ বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্যগণও আদর করিয়া আমাদের এই নূতন সাহিত্য ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করিতেছেন, ইহার রস গ্রহণ করিয়া আনন্দিত ও চমৎকৃত হইতেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র ইউরোপ-জয়বার্ত্তা আর আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না। পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকরণ ও অনুসরণে এই সাহিত্যের কোনও কোনও অংশ বিকৃত হইতে পারে, কিন্তু মোটের উপর এই সাহিত্য যে পরম উপাদেয় বস্তু এবং ইহাতে যে যথেষ্ট মৌলিকত্ব ও নূতনত্ব আছে, সৌন্দর্য্য ও মহত্ব আছে, তদ্বিষয়ে অন্য মত থাকা উচিত নহে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মধুসূদন ভূদেব বঙ্কিম, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যে আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বঙ্কিম-ভূদেব-চন্দ্রনাথ-পূর্ণচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সমালোচনা, 'সামাজিক প্রবন্ধ,' 'উদ্ভ্রান্তপ্রেম,' 'কপালকুণ্ডলা,' 'নীলদর্পণ,' 'জিজ্ঞাসা' প্রভৃতি যে সকল মহামূল্য সাহিত্য, বা বিকৃত বিজাতীয় বিদেশীয় আদর্শে রচিত, এ কথা বোধ হয় কেহই বলিবেন না। দেশে জ্ঞানপ্রচারের জন্য, লোকশিক্ষার জন্য, যে সকল সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্র প্রচারিত হইয়াছে, সেগুলিও এই পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার সুফল।

এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। আমাদের দেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচারের জন্য যখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, তখন দেশীয় প্রাচীন ভাষা (সংস্কৃত, আরবী, পারসী) ও প্রচলিত মাতৃভাষা একেবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দী হইতে নির্ব্বাসিত হয় নাই। সুতরাং বিদেশীয় শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে ষোল আনা অমঙ্গল সংসাধিত হয় নাই। অল্পমাত্রায়ও দেশীয় ভাষার প্রচলন থাকাতে মেকলে যে 'a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect' বানাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে ঘটে নাই। এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা ও মাতৃভাষার কতকটা জ্ঞান লাভ করার জন্যই এরূপ একটা নূতন সাহিত্য-গঠন সহজ ও সম্ভবপর হইয়াছিল।

বিদেশী শিক্ষার দোষ।

তথাপি মুক্তকণ্ঠে বলিব, এরূপ বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় শিক্ষার কেন্দ্র হইতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম আমলে বি এ পরীক্ষায় পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য একটা শিক্ষণীয় বিষয় ছিল. কয়েক বৎসর পরেই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে স্থানচ্যুত করে। অনেক দিন হইতে সর্ব্বনিম্ন পরীক্ষায় ইংরেজী হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ ও বাঙ্গালা রচনার ব্যবস্থা ছিল, তাহাতে বাঙ্গালা ভাষার (সাহিত্যের নহে) সামান্য একটু স্থান হইয়াছিল। সাহিত্য-পরিষদের অনেক চেষ্টায় উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষায় রচনার স্থান হইয়াছিল, কিন্তু তাহার উপর পাশ-ফেল নির্ভর করিত না। তাহার পর, যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার হইল, তখন শুধু নিম্নতম পরীক্ষায় নহে, আই এ, আই এস্ সি ও বি এ পরীক্ষায়ও

ইংরেজী হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ ও বাঙ্গালায় রচনার পরীক্ষার প্রচলন হইল, ইহাতে পাশ না হইলে সমগ্র পরীক্ষায় পাশ হইবার যো নাই; নিম্নতম পরীক্ষায় ভারতবর্ষের ইতিহাস-বিষয়ক প্রশ্নপত্রের, পরীক্ষার্থিগণ ইচ্ছা করিলে, মাতৃভাষায় উত্তর লিখিতে পারিবে এইরূপ ব্যবস্থাও হইল। (পরে ভূগোল ও স্বাস্থ্যরক্ষা এই দুইটা বিষয়ে উক্ত ব্যবস্থা মঞ্জুর হইয়াছে।) মনে রাখিতে হইবে, এই সকল পরীক্ষায় বাঙ্গালায় শুধু অনুবাদ ও রচনার ব্যবস্থা হইয়াছে, বাঙ্গালা সাহিত্য পরীক্ষার বিষয় হয় নাই; এবং রাজভাষায় (এবং অন্যান্য বিষয়ে উচ্চ পরীক্ষায়) কোনও পরীক্ষায় দুইখানি, কোনও পরীক্ষায় তিনখানি প্রশ্নপত্র, আর মাতৃভাষায় শুধু একখানি। ইহাতেই বুঝা যায় মাতৃভাষার স্থান কত সঙ্কীর্ণ; আবার সকল বিষয়েই ও সকল পরীক্ষাতেই মাতৃভাষার ভিতর দিয়া শিক্ষা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা নাই, শুধু নিম্নতম পরীক্ষায় দুই একটি বিষয়ে ইচ্ছাধীন। সে দুই একটি বিষয় সকল ছাত্রের অবশ্য-গ্রহণীয়ও নহে। সম্প্রতি এম্ এ পরীক্ষায়, ইংরেজী ভাষার ন্যায় দেশভাষার সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্ব অন্যতম পরীক্ষণীয় বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এবং ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব ও সভ্যতাতত্ত্ব আর একটি পরীক্ষণীয় বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। (যদিও শেষোক্তটির বেলায় শিক্ষা ও পরীক্ষা ইংরেজী ভাষায়ই হইবে!)

কিন্তু ইহাতেই কি আমরা সন্তুষ্ট থাকিব? 'রাজভাষার সহিত বঙ্গভাষার আলোচনা'র অধিকার আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ব্যবস্থায় পাইয়াছি, 'শ্বেতদ্বীপের মাতৃভাষার পার্শ্বে আমার বঙ্গের শ্বেতশতদলবাসিনীর সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে'—ইহাই কি যথেষ্ট? চৌষট্টি রকম বিদেশী বিদ্যার ভিড়ের মধ্যে দেশ-ভাষা ও সাহিত্যের, এবং ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব ও সভ্যতাতত্ত্বের, মাথা গুঁজিবার মত একটু একটু স্থান ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে বিদায়ক্ষণে—অন্তিমকালে হরিনামের ন্যায়—মুষ্টিমেয় ছাত্রকে ভারতের বাণী শুনান হইবে, এই ব্যবস্থায় জাতীয় গৌরবে উৎফুল্ল হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই। পত্রের পশ্চাতে 'পুনশ্চ'র ন্যায়, উইলের পশ্চাতে কডিসিলের ন্যায়, বিদেশীর বিদ্যার লম্বা ফিরিস্তির পশ্চাতে দুই একটা জাতীয় তত্ত্ব গুঁজিয়া দিলেই কি বিশ্ববিদ্যালয় 'জাতীয়' হইয়া দাঁড়াইল? জানি অনেক ক্ষেত্রে 'পুনশ্চ' অংশে বা 'কডিসিল' অংশে দরকারী কথা থাকে। কিন্তু তথাপি তাহাকে মূল দলিল বলা যায় না। বিদেশী বিদ্যার চূড়ার উপর স্বদেশী বিদ্যার একটু ময়ূরপাখা চড়াইলেই মোহিত হইবার, ভক্তিরসে আপ্লুত হইবার, বিশেষ কিছুই নাই। তাই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বড় আক্ষেপেই বলিয়াছেন, 'সামান্যা দাসীর মত তোমাদের এই কারখানার মধ্যে একটি কোণায় তাহাকে একটু ঠাঁই দিয়াছ মাত্র' বাস্তবিক, ইহা মুষ্টিভিক্ষা-মাত্র, ন্যায্য প্রাপ্যের ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ। এইটুকু রফায় কৃতার্থ হইলে, ইহার জন্য কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বদান্যতায় উল্লসিত হইলে, জাতীয়তার, দেশাত্মবোধের, জননী বঙ্গভাষা ও জননী জন্মভূমির অবমাননা করা হয়।

কেহ কেহ আবার ইহা অপেক্ষাও সংক্ষিপ্ত যুক্তির অবতারণা করেন—যেহেতু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার আমাদেরই দেশীয় একজন রাজপুরুষ, এবং বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষার দপ্তর আমাদেরই দেশীয় শিক্ষাসচিবের হস্তে ন্যস্ত, অতএব এই বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রকৃতপক্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এরূপ স্তোকবাক্যে আসল কথা ভুলিলে চলিবে না।

রাজনীতিক্ষেত্রে একটা জাতি অপর একটা জাতির অধীন হইলে তাহাকে পরাধীন জাতি বলে। কিন্তু যদি একটা জাতির স্ত্রী-পুরুষে শিক্ষার নামে বিদেশীর ভাষা ও সাহিত্য, বিদেশীর ভাষাতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব, বিদেশীর অর্থনীতি ও ব্যবহার-শাস্ত্র (law), বিদেশীর রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম্মতত্ত্ব, বিদেশীর ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্র, বিদেশীর গণিত ও বিজ্ঞান, বিদেশীর ব্যায়াম ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব, বিদেশীর চিকিৎসাশাস্ত্র ও কৃষিবিজ্ঞান, বিদেশীর শিল্প ও কলা, বিদেশীর ভাষার অনুপান-সাহায্যে গলাধঃকরণ করিতে থাকে, এবং নিজেদের পূর্ব্বপুরুষদিগের সঞ্চিত জ্ঞানসম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ থাকে, তাহা হইলে জাতির শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মনটা পর্য্যন্ত পরাধীন হইয়া যায় না কি? এরূপ শিক্ষার যে বনিয়াদেই গলদ, মনের

গোলামি (slave mentality) যে এরূপ শিক্ষার অপ্রতিবিধের পরিণাম, তাহা কি আর বুঝাইতে হইবে? সেক্সপীয়ারের একখানি নাটক দ্বিতীয় রিচার্ডের রাণী শত্রুকর্তৃক ধর্ষিত স্বামীকে এই বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন,—

"What ! is my Richard both in shape and mind
Transform'd and weakened ? Hath Bolingbroke
Depos'd thine intellect ? Hath he been in thy heart ?"

আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও কি ঠিক সেই দশা নহে? এই যে উদাহরণ দিতেও বিদেশীয় সাহিত্যের দ্বারস্থ হইতে হইল, এবং মাঝে মাঝে আভাঙ্গা বিদেশীয় শব্দ প্রয়োগ করিয়া বক্তব্য পরিস্ফুট করিতে হইতেছে, ইহা অপেক্ষা slave mentalityর কুৎসিত-তর নিদর্শন আর কি আছে?

৭ম (কলিকাতা) সাহিত্য-সম্মিলনে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন, 'আমার বিশ্বাস, বাঙ্গালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি; আমাদের পূর্ব্বগৌরব আমরা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি।' এই আত্মবিস্মৃতির জন্য আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানই দায়ী। আমরা নিজের জাতির অতীত-সম্বন্ধে বিরাট্ অজ্ঞতার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ছাত্রজীবনে নবপ্রচারিত 'বঙ্গবাসী'তে আমার তখনকার শিক্ষাগুরু খ্যাতনামা শিক্ষক ও লেখক ৺ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের একটি প্রবন্ধে পড়িয়াছিলাম,— "ভারতবাসী, তুমি কাম্‌স্কট্‌কার ইতিহাস বর্ণন করিতে পার, কিন্তু কৌশাম্বী বা রাজগৃহ কোথায় ছিল তাহা তুমি বলিতে পারনা।" কথা কয়টি আজও ভুলিতে পারি নাই। আমার মত বোধ হয় আরও অনেকের জ্ঞান এইরূপ 'একপেশে'। ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাস আমাদের নখদর্পণে, কিন্তু ভারতবর্ষে কখনও 'মাৎস্যন্যায়' প্রচলিত হইয়াছিল কিনা, জিজ্ঞাসা করিলে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার শক্তি দূরে থাকুক, প্রশ্নটা বুঝিবার শক্তিও অধিকাংশ কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর নাই। এইখানেই আসল গলদ।

প্রচলিত প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিতে গিয়া আমরা নিম্নশ্রেণীতে মাতৃভাষায় বিদ্যাচর্চ্চা করিবার সময়েও বিদেশীয় সাহিত্য-পুস্তকের অনুবাদ বা অনুকরণে রচিত পাঠ্য পুস্তক পড়িতে বাধ্য হই, সেগুলি বিদেশীয় দৃষ্টান্তে ও বিলাতী ভাবে পরিপূর্ণ। চরিত্রের আদর্শ, সদ্‌গুণাবলীর নিদর্শন, সবই বিদেশীয় স্ত্রী-পুরুষের জীবন-চরিত হইতে, বিদেশের ইতিহাস হইতে, সংগৃহীত। অবশ্য, মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত স্বদেশ বিদেশ যেখানেই পাইব সেখান হইতেই সঙ্কলন করা উচিত বটে; কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায় স্বদেশের দৃষ্টান্তের সংবাদ না লইয়া বিদেশের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করা হয়। প্রভুভক্তি শিখিতে আমরা বীরবরের উপাখ্যান বা ধাত্রী পান্নার কার্য্য উপেক্ষা করিয়া কার্পেথিয়ান পর্ব্বতে দৃষ্টান্ত খুঁজিতে যাই। 'সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ' যে দেশের শাস্ত্রবাক্য, সে দেশে অতিথিসৎকারের দৃষ্টান্ত না খুঁজিয়া আফ্রিকায় ভ্রমণকালে কোন্ শ্বেতাঙ্গ পুরুষ অসভ্য বর্ব্বরদিগের নিকট সদয় ব্যবহার পাইয়াছিলেন তাহার বিবরণ সংগ্রহ করি, মাতৃস্নেহ বুঝিতে 'আগমনী' ও 'বিজয়া'র গান এবং বৈষ্ণব কবিদিগের বাৎসল্যরসের পদাবলি ফেলিয়া কুপারের কবিতার শরণ লই ইত্যাদি। ইহার ফলে আমরা স্বদেশীয় আদর্শচরিত্রের পরিচয় পাই না এবং শৈশব হইতেই বিদেশীর উপর ভক্তিশ্রদ্ধায় আমাদের হৃদয় ভরিয়া উঠে। রামায়ণ-মহাভারতের পরিবর্ত্তে গ্রীস্ ও রোমের পুরাণ-কথা (Legends of Greece and Rome) ও বাইবেলের বৃত্তান্ত আমাদিগের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হয়, পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশের পরিবর্ত্তে, অন্ততঃ তৎপাঠের পূর্ব্বে, ঈশপের কথামালা ইংরেজিতে বা বাঙ্গালায় আমাদের পরিজ্ঞাত হয়। ইহাই হইল প্রকৃত পরাধীনতা, cultural conquest, বিদেশীয় সভ্যতা-কর্তৃক দেশীয় সভ্যতার পরাভব; রাজনীতিক পরাধীনতা অপেক্ষাও ইহা বিষম।

তাহার পর একটু উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত হইয়া বিদেশীয় সাহিত্য অবলম্বন করিয়াই আমাদিগকে ভাষাতত্ব, কাব্যকলা, নাট্যকলা প্রভৃতি শিখিতে হয়। এবং বিদেশীয় ভাষার ভিতর দিয়া বিদেশীয় গণিত ইতিহাস

রাষ্ট্রনীতি অর্থশাস্ত্র দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি শিখিতে হয়। বিদেশীয় ভাষার ভিতর দিয়া শিক্ষালাভ করা যে কতদূর কঠিন ও অস্বাভাবিক ব্যাপার, তাহা আর নূতন করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন আছে কি? আশা করি, সকলেই রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার হেরফের', 'শিক্ষার বাহন' প্রভৃতি সুচিন্তিত সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ পড়িয়াছেন। এমন কি প্রকৃত শিক্ষা, প্রকৃত জ্ঞানলাভ, কঠিন বিদেশীয় ভাষার ভিতর দিয়া হয় কিনা তদ্বিষয়েও গভীর সন্দেহ আছে। অধিকাংশ স্থলেই ইহা মুখস্থ-বিভায় দাঁড়ায়। অতি অল্পসংখ্যক ছাত্র স্বাভাবিক প্রতিভা-প্রভাবে বিদেশীয় ভাষা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারে। ফলতঃ তাহারা সাধারণ-বিধির অন্তর্ভুক্ত নহে, বর্জ্জিত বিধির অন্তর্ভুক্ত।

তাহার পর, অশেষবিধ বিদেশী বিদ্যা আয়ত্ত করিতে করিতে আমাদের ধারণা জন্মিয়া যায় যে সকল বিষয়েরই উচ্চজ্ঞান বিদেশীয় একচেটিয়া, আমাদের নিজের জাতির ভাণ্ডারে এ সকল কিছুই নাই। প্রধানতঃ যাঁহার কলমের জোরে এই শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই মেকলে সাহেব দারুণ অবজ্ঞাভরে বলিয়াছেন, 'A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India & Arabia'! আমাদের বিদেশী গুরুগোষ্ঠী আমাদের কর্ণে এই মন্ত্র দিয়াছেন যে, 'উচ্চ জ্ঞানের ক্ষেত্রে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের বিশেষ কিছুই ছিল না, আর সামান্য যাহা কিছু ছিল তাহা অপর প্রাচীন জাতি-সকলের নিকট হইতে ধার করা। হিন্দুর জ্যোতিষ নাট্যকলা স্থাপত্য গ্রীক্‌দিগের নিকট হইতে গৃহীত, হিন্দুর অক্ষরলিখন ফিনিশীয়দিগের নিকট হইতে গৃহীত ইত্যাদি। হিন্দুর রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল না, গণতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না, ইত্যাদি অনেক কথাই শুনা যায়। বিদেশীয় ও (বিদেশীয় চেলা কোনও কোনও স্বদেশীয়) মুখে শুনিয়া শুনিয়া আমরা নিজের জাতির প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়াছি, আমাদের হৃদয়ে একটা সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে যে আমাদের গৌরব করিবার মত নিজস্ব সম্পত্তি কিছুই ছিল না—থাকিবার মধ্যে, ছিল রাশীকৃত আদিরসের কবিতা, পুতুলপূজার মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকাণ্ড, সমাজকে নাগপাশে বন্ধনের জন্য অশেষ-বিশেষ বিধিব্যবস্থা, নব্যন্যায়ের কচকচি আর জাতীয় জড়ত্বের আকর মায়াবাদ!! মেকলে সাহেব রায় দিয়াছেন, 'I doubt whether the Sanscrit literature be as valuable as that of our Saxon and Norman progenitors!'

অথচ, জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে ভারতবাসী শূন্য বখরাদার একথা কোল ভীল সাঁওতালদিগের সম্বন্ধে সত্য হইতে পারে, কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে ইহা কখনই সত্য নহে। ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ও বিজ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দিলেও তর্কশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রে যে আমাদের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, ইহা ত অবিসংবাদী সত্য; কিন্তু আমাদের নিজস্ব সেই জ্ঞান-সম্পৎ কি ইন্‌টারমিডিয়েট বা সাধারণ বি এ পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগকে আয়ত্ত করিবার সুযোগ দেওয়া হয়? জ্ঞানের এই বিভাগে যে ভারতবর্ষের একটা অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা আছে, একথা কি উল্লিখিত ছাত্রবর্গ কখনও জানিতে পারে? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত ('stupendous anomaly') উৎকট অব্যবস্থার কথা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিদেশীয় রাজপুরুষ, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন রেক্‌টার, লর্ড রোনাল্ডসে চোখে আঙুল দিয়া বুঝাইয়া দিলেন, তথাপি ছাত্রবর্গ 'যে তিমিরে সে তিমিরে'ই রহিয়া গেল। এ অবস্থায়ও কি বলিতে হইবে ইহাই প্রকৃত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়?

জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি আপনাদিগকে কোনও নূতন কথা শুনাইতেছি না। আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর এই গোড়ায় গলদের কথা, শুধু আমাদের দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কেন, বিদেশীয় মনস্বী স্যর জর্জ্জ বার্ডউড, স্যর জন্ উড্‌রফ্ প্রভৃতি অনেকে অনেকবার বলিয়াছেন। আমি সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করিতেছি; তবে শতাব্দীর এক-তৃতীয়াংশ কাল অনবরত বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠনা করিয়া কর্ম্মজীবনের ব্যর্থতা-অনুভবে একটা আত্মধিক্কার জন্মিয়াছে, সেই কারণে আমার বক্তব্যগুলিতে বোধ হয় একটু অতিরিক্ত মাত্রায় তীব্রতা ও তিক্ততা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা আপনারা মার্জ্জনা

করিবেন যে সময়ে এই শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সে সময়ে ইহার প্রয়োজনীয়তা ছিল, অর্থকরী বিদ্যা বলিয়াও বটে, রাজার জাতির জ্ঞানভাণ্ডারে প্রতি অতিমাত্র শ্রদ্ধার জন্যও বটে, এবং জ্ঞানতৃষ্ণানিবারণের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাবশতঃও বটে, দেশের লোকের এদিকে একটা প্রবল ঝোঁক হইয়াছিল। ইহার ফলে আমরা স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্যর রাসবিহারী ঘোষ, স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে পাইয়াছি। (যাঁহারা খাস বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগের নামের এখানে উল্লেখ করিলাম না) সুতরাং এই শিক্ষা যে একেবারে নিষ্ফল (failure) হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু, ইহারা যে জাতির বংশধর, জ্ঞানচর্চ্চা সেই জাতির মজ্জাগত ছিল বলিয়াই এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন আশ্চর্য্য সুফল ফলিয়াছে ইহা উর্ব্বর ক্ষেত্রের গুণে, বীজের গুণে নহে; মাটির গুণে, আঁটির গুণে নহে। 'চীয়তে বালিশস্যাপি সৎক্ষেত্রপতিতা কৃষিঃ। ন শালেঃ স্তম্বকারিতা বপ্তুর্গুণমপেক্ষতে॥'

যাহা হউক, এক্ষণে এই বিদেশীয় শিক্ষাদীক্ষার স্থানে দেশীয় শিক্ষাদীক্ষার প্রচলন করিতে হইবে। প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এবিষয়ে দেশময় একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। ইউরোপের প্রধান প্রধান জাতি কয়েক শতাব্দী ধরিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানের বহু উন্নতি করিয়াছে, বিস্তর নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে; সে সমস্ত এখন আর তাহাদের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে, সমস্ত জগতের সম্পত্তি। তাহা আত্মসাৎ করিবার শক্তি ও অধিকার সকল জাতির আছে। সুতরাং আমাদিগকেও সে জ্ঞান লাভ করিতে হইবে, নতুবা শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিবে। কিন্তু প্রথম হইতেই সেদিকে ঝুঁকিলে চলিবে না। আগে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের সঞ্চিত জ্ঞান আয়ত্ত করিতে হইবে, জাতীয় শিক্ষাদ্বারা আমাদের জাতীয় শক্তি উদ্বোধিত করিতে হইবে, আমরা কি ছিলাম, কি হইয়াছি, তাহা শিক্ষার্থীদিগকে জানাইতে হইবে, আমাদের অতীত গৌরবের স্মৃতি উজ্জীবিত করিতে হইবে, আমাদের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করিতে হইবে, মনীষী রামেন্দ্রসুন্দরের কথায় 'মাকে চিনিতে হইবে,' তাহার পর সেই বনিয়াদের উপর বিদেশীয় জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া শিক্ষাসৌধের উচ্চতা ও পরিসর বৃদ্ধি করিতে হইবে।

কেহ কেহ বলেন যে জ্ঞানের জাতিবিচার করিতে নাই। যে জাতির, যে দেশের কাছ হইতেই আসুক না কেন, জ্ঞানমাত্রই অর্জ্জনের, শ্রদ্ধার সহিত বরণের যোগ্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যবন অর্থাৎ গ্রীক প্রভৃতি জাতির নিকট হইতে জ্ঞান আহরণ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও দ্বিধাবোধ করেন নাই। সঙ্কীর্ণতা জ্ঞানলাভের পথে অন্তরায়। কথাটা খুব উদার, খুব সমদর্শিতাপূর্ণ, খুব শ্রুতি-সুখদ। কিন্তু উদারচেতে বিশ্বভারতী কর্ণগোচর ও হৃদ্গত করিবার প্রয়োজন। আমাদের দেশের বিশ্বনিকেতনকে পূর্ব্ব-পশ্চিমের মিলননিকেতন ক'রে তুল্‌তে হ'বে,' আমাদের বিশ্ববরেণ্য কবির এই 'অন্তরের কামনা'য় আমরাও সায় দিই। কিন্তু তাঁহারই কথায় বলি, 'পরস্পরের ক্ষেত্রে উভয়ে স্বতন্ত্র থাকলে তবেই সমন্বয় সত্য হয়। একাকার হওয়া এক হওয়া নয়।' আমরা যে নিজের জাতির বিশিষ্টতা হারাইয়া ভিন্ন জাতির শিক্ষাদীক্ষার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছি, ইহা কি অসঙ্গত, অস্বাভাবিক ও অশোভন নহে? আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু স্যর জন্ উড্‌রফের ভাষায় বলিব,—"To assimilate, one must first be a strong free personality...When the Indian Spirit has regained cultural freedom, by study and appreciation of its own inherited ancient and grand culture and by the casting away of all unassimilated foreign borrowings, it may go where it will." অথবা বিদেশীর দোহাই-ই বা দিব কেন? আমাদের চিত্তরঞ্জনও বলিয়াছেন 'পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাকে বরণ করিবার পূর্ব্বে ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতাকে তাহার স্বস্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে।... বৈদেশিক শিক্ষাদীক্ষার নিকট ভারতীয় সভ্যতার পরাজয় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে- ইহা রাজনৈতিক অধীনতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। ভারতকে ইহার প্রতিরোধ করিতেই হইবে।'

বড় আশার কথা, চিত্তরঞ্জনের এই মহতী বাণী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারের কর্ণে পশিয়াছে। এই সেদিন কনভোকেশান-উপলক্ষে বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন—"India was, and is civilised. Western civilisation, howevea valuable as a facter in the progress of mankind, should not supersede, much less be permitted to destroy, the vital elements of our civilisation." বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের (ঢাকায়) একাদশ অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখক খ্যাতনামা ভিন্‌সেন্ট স্মিথের কথা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—"Some day perhaps, the man in power will arise, who is not hide bound by the University traditions of his youth, who will perceive that an Indian University deserving of the name must devote itself to the development of Indian thought and learning, and who will care enough for true higher education to establish *a real University in India.* আমাদের দেশে এরূপ শক্তিধর পুরুষ স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভিন্ন আর কেহ নাই। তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গোড়ায় গলদ বুঝিয়াছেন, তখন কি আশা করিতে পারি না যে তিনি ইহার আমূল সংস্কার করিয়া প্রকৃত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবেন? তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা, মনে করিলে হেলায় এ কার্য্যসাধন করিতে পারেন। জানি না, কবে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে! আমরা প্রথম জীবনে বিদেশী ধাত্রীর স্তন্যপানে সম্বৰ্দ্ধিত হইয়াও প্রৌঢ়াবস্থায় প্রকৃত জননীর দর্শন পাইয়া জীবন সার্থক করিব।

দুঃখের বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের জন্য বহু অর্থ ব্যয়ে দুই দুইবার কমিশন বসিল, দ্বিতীয়বারের কমিশনে বিলাত হইতে বিশেষজ্ঞ আমদানি করিয়া তাঁহাদিগের অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতার ফল মোটা মোটা কেতাবে লিপিবদ্ধ করা হইল। কিন্তু এই গোড়ায় গলদ কিছুতেই ঘুচিল না। নানাভাবে কতক কতক পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া জাতীয় শিক্ষার কোনও কোনও অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে ও হইতেছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহাতে সন্তুষ্ট থাকা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌধ আজও পশ্চিমদ্বারীই আছে, কেবল পূর্ব্বমুখো দুই চারিটা জানালা ফুটান হইয়াছে, সদর দরজা আজও পশ্চিমমুখো। এই সদর দরজাকে জানালায় পরিণত করিয়া পূর্ব্বমুখো সদর দরজা নির্ম্মাণ করিতে হইবে তবে প্রকৃত গলদ ঘুচিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখাইতেছি, যে নবসংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে নিম্নতম পরীক্ষায় শুধু দুই একটী বিষয়ে ছাত্রবর্গ ইচ্ছা করিলে মাতৃভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে. এরূপ অনুমতি যথেষ্ট নহে; এমন কি, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও মধ্যপ্রদেশের সঙ্কল্পিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত ব্যবস্থার অনুরূপ, নিম্নতম পরীক্ষায় ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য ছাড়া আর সকল বিষয়ে শিক্ষাদান ও পরীক্ষাগ্রহণ মাতৃভাষায় হইবে; এরূপ বিধিও যথেষ্ট নহে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত উচ্চ নীচ সকল পরীক্ষায় সকল বিষয়েই (ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের বেলায়ও এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হইবার সঙ্গত কারণ দেখি না) মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ও পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা না হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা প্রকৃত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি. দেশভাষা ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার-কার্য্যের উপযোগী নহে, এই কথাটা মেকলে সাহেবের আমলে সত্য ছিল বটে; কিন্তু এই দীর্ঘকাল ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ দ্রুত উন্নতি হইয়াছে তাহাতে এ কথাটা আর এখনকার বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে বলা চলে না। আজকাল ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, অর্থনীতি, সমালোচনা, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, প্রভৃতি বিষয়ে বহু সুলিখিত গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইতেছে। ইহার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে উৎসাহ ও সহকারিতা পাইলে আরও দ্রুততর উন্নতি হইবে ইহা নিঃসন্দেহ।

যাহা হউক, যত দিন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত না হইতেছে, ততদিন জাতীয় শিক্ষায় প্রকৃত কেন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্। কেননা

আমাদের অতীত গৌরব-সম্বন্ধে নানারূপ তথ্যাবিষ্কার-কার্য্যে পরিষদ্ ব্যাপৃত, এবং এই সকল তথ্যই জাতীয় শিক্ষার প্রকৃত উপাদান। কথায় বলে, যত মত তত পথ। জাতীয় মহাসমিতি (Indian National Congress) একভাবে আমাদের জাতীয়তার ভাব উদ্বুদ্ধ করিতেছেন, দেশাত্মবোধ জাগরিত করিতেছেন, পরাধীনতাপাশবদ্ধ অবসন্ন হৃদয়ে উন্মাদনা-উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়া উজ্জীবিত করিতেছেন; সাহিত্য-পরিষদ্‌ও অন্যভাবে, আমাদের অতীত গৌরবের স্মৃতি উন্মোষিত করিয়া, এই কার্য্য করিতেছেন। জাতীয় মহাসমিতির পথ অনেক সময়ে কঠোর, বিপৎসঙ্কুল, বিঘ্নবহুল; সাহিত্য-পরিষদের পথ সুগম, সরল ও নিরাপদ। এ পথে কোন প্রবল প্রতিকূল শক্তির সহিত সংঘর্ষ হইবার অনুমাত্র আশঙ্কা নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমরা বিদেশীর মুখে ক্রমাগত শুনিয়াছি যে আমাদের গৌরব করিবার মত কিছুই নাই। সুখের বিষয়, এখন সুর কতকটা ফিরিয়াছে। বিদেশীর মুখে কিছু দিন হইতে এমন কথাও শুনা যাইতেছে যে আমাদের গৌরব করিবার মত জিনিষের অভাব নাই। ভারতের জ্ঞান, ভারতের সভ্যতা যে 'তিব্বতচীনে ব্রহ্মতাতারে,' এমন কি আরও সুদূরে, প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, ইহা আর এখন প্রাচ্যজাতিসুলভ কল্পনা-প্রসূত কবিকাহিনী নহে, Sylvain Levi প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণ এখন এ কথার সত্যতা সপ্রমাণ করিতেছে। এজন্য আমরা বিদেশী পণ্ডিতদিগের নিকট কৃতজ্ঞ।

কিন্তু এই সকল তথ্য আবিষ্কার করা আমাদেরই কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য। নতুবা আমাদের কৃতবিদ্য বলিয়া পরিচিত হইবার অধিকার নাই। এক্ষেত্রেও যদি আমরা পরমুখপেক্ষী হইয়া থাকি, তাহা হইলে বড়ই লজ্জার কথা। যতক্ষণে বিদেশী আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের কৃতিত্বের কথা আমাদিগকে দয়া করিয়া শুনাইবে, ততক্ষণে আমরা তাহা জানিব, ইহা অপেক্ষা ঘোরতর আত্মাবমাননা আর কি হইতে পারে?

সুখের বিষয়, আমাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় শিক্ষিত লোক কিছু দিন হইতে আমাদের দেশের প্রাচীন গৌরব পরিজ্ঞাত হইবার জন্য প্রত্নতত্ত্বানুশীলনে যত্নবান হইয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের এসিয়াটিক্ সোসাইটী ইহার সূত্রপাত করেন, কিন্তু উক্ত সোসাইটিতে বিদেশীর সংখ্যাই খুব বেশী ছিল, আমাদের দেশের ২। ১ জন মাত্র এই পথ লইয়াছিল। এক্ষণে অবশ্য দেশীয় লোকের সংখ্যা বাড়িয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সৃষ্টি হওয়া অবধি এই গবেষণাকার্য্যে দেশের কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা হইয়াছে। উত্তর-বঙ্গে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। অন্যান্য প্রদেশেও এই শ্রেণীর প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও গবেষণার সূত্রপাত হইয়াছে। আশা করি, অচিরেই এই ভিত্তির উপর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। অতীত গৌরবের উদ্ধার করিয়া জাতীয় ভাবের উদ্‌বোধন করিতে পারিলেই প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার আরম্ভ হয়। সাহিত্য-সম্মিলন যখন পঞ্চম বৎসরের শিশু, তখনই তৎকালীন সভাপতি, 'বাঙ্গালা বিক্রমাদিত্য,' সাহিত্য ও সর্ব্বপ্রকার দেশহিতকর কার্য্যের উৎসাহদাতা, সাহিত্য পরিষদের শ্রেষ্ঠ বান্ধব, মাননীয় মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় বলিয়াছিলেন, "সাহিত্য-সম্মিলন জাতীয় জীবন-স্ফুরণের একমাত্র উপায়। ...সম্মিলনের সদুদ্দেশ্য এই যে,...সাহিত্যের উন্নতি-সম্বন্ধে আলোচনা ও তাহার শ্রীবৃদ্ধিসাধনকল্পে উপায়নির্দ্ধারণ।" সেই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই আজ সমবেত বিজ্ঞ সাহিত্য-সেবকগণের সমক্ষে জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা-প্রণয়নের জন্য আমার এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতেছি। আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আমার এমন প্রতিপত্তি (authority) নাই যে তাহার জোরে আমার অনুরোধ রক্ষিত হইবে; তবে আপনাদেরই প্রদত্ত পদের মর্য্যাদা স্মরণ করিয়া বিনীত-ভাবে এই অনুরোধ করিতে সাহসী হইয়াছি। সঙ্গত ও উপযুক্ত বিবেচনা করিলে আপনারা অবশ্যই প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন, আমার এই ভরসা।

প্রস্তাব।

আমার প্রস্তাব এই যে, বিদেশী ও স্বদেশী পণ্ডিতবর্গের চেষ্টায় আমাদিগের প্রাচীন কালের যে সকল তথ্য

আবিষ্কৃত ও প্রকটিত হইয়াছে, সেগুলি অধিকাংশ স্থলেই কতকগুলি গবেষণাত্মক গ্রন্থে ও নানা বিদ্বৎসমিতির (Learned Society) প্রকাশিত জর্ণ্যাল প্রভৃতিতে বিক্ষিপ্ত আকারে মুদ্রিত আছে, জ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগে (যথা দর্শন, গণিত, অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি, ইতিহাস, সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতি) বিশেষজ্ঞগণ-কর্তৃক সেগুলির একটি শৃঙ্খলা-বদ্ধ সংগ্রহ (systematized compilation) প্রস্তুত হউক। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের, তথা বাঙ্গালা দেশের এসিয়াটিক সোসাইটীর দেশীয় সভ্যগণের, এবং বিশেষতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-বিভাগের বিদ্বদ্বর্গের হস্তে এই ভার ন্যস্ত হউক। সংস্কৃত, পালি, তথা আরবী পারসী, এমন কি চীনা তিব্বতীয় প্রভৃতি সাধারণের দুরধিগম্য ভাষায় যে ভারতীয় জ্ঞান সঞ্চিত আছে, সে সমস্ত একত্র সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিতে হইবে। অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ইহার সম্যক্ প্রয়োজন। তখন বিদ্যার্থিগণ প্রথমে স্বজাতির সঞ্চিত জ্ঞান আয়ত্ত করিয়া জাতীয় শিক্ষার পত্তন করিবে; তাহার পর, আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি শিক্ষা করিবে ও এইরূপে তাহাদিগের শিক্ষা সম্পূর্ণতা লাভ করিবে।

উভয় শ্রেণীর পুস্তকই দেশভাষায় লিখিত হইবে। এক্ষণে দেশভাষার যে উন্নতি হইয়াছে তাহাতে এ কার্য্য অসম্ভব বা দুরূহ নহে। এবং শিক্ষা ও পরীক্ষাও মাতৃ-ভাষায় হইবে, সে কথা পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি। সকল শিক্ষার্থীকে মাতৃভাষা ও সাহিত্য রীতিমত শিক্ষা করিতে হইবে এবং হিন্দুর পক্ষে সংস্কৃত ও পালি ভাষা ও সাহিত্য, মুসলমানের পক্ষে আরবী ও পারসী ভাষা ও সাহিত্য, শিক্ষা করা অবশ্য-কর্ত্তব্য হইবে।

স্বজাতীয় প্রাচীন গৌরবের আলোচনা করিলেই বিদ্যার্থিগণ জ্ঞানের চরম সীমায় পৌঁছিবে না। শুধু অতীত আঁকড়াইয়া থাকিলে কোনও জাতি উন্নতিলাভ করিতে পারে না, জীবন সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে না। সুতরাং পাশ্চাত্য জগতে যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভূত-পরিমাণে প্রসূত হইয়াছে, তাহা বিদ্যার্থিগণকে অর্জ্জন করিতে হইবে। আবার এই অর্জ্জিত জ্ঞানের ভিত্তির উপর নূতন নূতন তত্ত্বানুসন্ধানে তৎপর হইতে হইবে, মৌলিক গবেষণা-দ্বারা জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই উভয়বিধ জ্ঞানের ব্যবহারিক (Applied) প্রয়োগে দেশের শিল্প কলা বাণিজ্য কৃষির উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। (আশার কথা জগদীশ-চন্দ্রের বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে ইহার সূত্রপাত হইয়াছে।) তবেই আমরা জগতের মধ্যে একটা শ্রদ্ধেয় জাতি হইতে পারিব।

অবশ্য, যে সকল বিশেষজ্ঞ নূতন তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিবেন, তাঁহাদিগকে এখনও অনেকদিন নিজ নিজ আবিষ্কৃত তত্ত্ব-সকল বিদেশী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, নতুবা সেগুলি জগতের বিশেষজ্ঞগণের গোচর হইবে না, এবং তাহা না হইলে সেগুলির প্রকৃত মূল্য যাচাই করা যাইবে না। একদিন পাশ্চাত্য-জগতেও বিশেষজ্ঞগণকে এই একই কারণে ল্যাটিন ভাষায় নিজ নিজ আবিষ্কৃত তত্ত্ব প্রচারিত করিতে হইত। সকলেই জানেন, ইংরেজ বৈজ্ঞানিক নিউটন, তাঁহার 'প্রিন্‌সিপিয়া' ল্যাটিন ভাষায় লিখিয়াছিলেন, ইংরেজী ভাষায় নহে। তেমনই এখনও কিছুদিন আমাদিগের জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতিকে ইংরেজী ভাষায় তাঁহাদের আবিষ্কৃত তত্ত্ব প্রচার করিতে হইবে। ভবিষ্যতে এমন দিন আসিতে পারে, যখন আর তাহার প্রয়োজন হইবে না। যাহা হউক, যতদিন এই নিয়মে চলিতে হইবে, ততদিন সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে সে সকল তত্ত্বের স্থূলভাবে পরিচয় দিবার জন্য মাতৃভাষায় সেগুলি প্রচারও অবশ্য-কর্ত্তব্য। বাঙ্গালা দেশের, শুধু বাঙ্গালা দেশের কেন, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র তাঁহার 'অব্যক্ত' প্রভৃতি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করিয়া এই পথে অগ্রণী হইয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদে বিজ্ঞানের বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থার জন্যও তিনি ধন্যবাদভাজন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণও এ বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, সে জন্য তাঁহারাও ধন্যবাদভাজন। ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ সরল ভাষায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ব্যাখ্যান করিয়া বাঙ্গালা

সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছেন। বিশেষতঃ আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর 'জিজ্ঞাসা,' 'কর্ম্মকথা,' 'যজ্ঞকথা,' 'বিচিত্র জগৎ,' 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' প্রভৃতি উপাদেয় পুস্তকে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের যে ত্রিধারা প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহা আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রকে অপূর্ব্ব সজীবতা ও উর্ব্বরতা প্রদান করিয়াছে। মাননীয় স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত University Extension Lectures এর ধরণের ব্যবস্থা শিক্ষিত সমাজে জ্ঞান-বিতরণের উৎকৃষ্ট উপায়, এই প্রসঙ্গে এ কথাটি না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী নহেন, অথচ জ্ঞানতৃষ্ণা যাহাদিগের বলবতী, তাঁহারা এই উপায়ে প্রৌঢ়াবস্থায়ও নিজেদের যৌবনে অর্জ্জিত বিদ্যার অপূর্ণতার সংশোধন করিতে পারেন।

শুধু যে প্রত্নতত্ত্ব ও গবেষণার নীরস ক্ষেত্রে এই কার্য্য সীমাবদ্ধ তাহা নহে। যেমন গণিত ও বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তত্ত্ব কার্য্যে লাগাইয়া (Applied অর্থাৎ ব্যবহারিক রূপে) জগতের বহু উপকার সাধিত হয়, সেইরূপ গবেষণালব্ধ তত্ত্বগুলিকে খাঁটি সাহিত্যের কার্য্যে লাগাইয়া সমাজের মঙ্গল সাধন করা যায়। কেননা খাঁটি সাহিত্যই ভাবসঞ্চার ও প্রচার-দ্বারা জাতির উদ্ধারের, পুনরুত্থানের সাহায্য করে। দেশাত্ম-বোধের অনুপ্রেরণায় এক নূতন আদর্শের সাহিত্য সৃষ্ট হইবে, আবার সেই সাহিত্যের প্রভাবে জাতীয়তার ভাব নব বল পাইবে। এইরূপে উভয়ে উভয়ের সহায় হইবে। সকল দেশেই সাহিত্য জাতীয় জাগরণের মূলে আছে। আমাদের প্রাচীন ইতিহাস-ক্ষেত্রে গবেষণা দ্বারা যে সব জাতীয় গৌরবের বৃত্তান্ত লব্ধ হইবে, সেই সব বৃত্তান্তের উপাদান লইয়া নূতন আদর্শের কাব্য-নাটক রচনা করিতে হইবে, তৎপাঠে জাতীয়তার ভাব, দেশাত্মবোধ জাগিয়া উঠিবে। ইংলণ্ডের ইতিহাস-অবলম্বনে লিখিত শেক্‌স্‌পীয়ারের ঐতিহাসিক নাটকাবলী দেশভক্তির ভাবে কিরূপ অনুপ্রাণিত, তৎপাঠে ইংরেজের হৃদয়ে দেশপ্রীতি কিরূপে সঞ্চারিত হয়, তাহা ইংরেজিশিক্ষিত ভারতবাসীরা জানেন। আমাদের কাব্য-নাটকেও সেই দেশপ্রীতির ধারা প্রবাহিত করিতে হইবে। বিলাতের বিখ্যাত ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা-কার স্যর ওয়াল্টার স্কটের আদর্শ ধরিয়া বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্র তাঁহাদের সময়ে দেশের ইতিহাস যতটা পরিজ্ঞাত ছিল, সেই উপাদানের কাঠামোর উপর কল্পনার তূলিকা বুলাইয়া কয়েক খানি ইতিহাসাশ্রিত আখ্যায়িকা লিখিয়া গিয়াছেন। এখনকার নূতন অনুসন্ধানের ফলে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি সম্বন্ধে যে জ্ঞান পাওয়া গিয়াছে, হয়ত তাহার আলোকে দেখিলে বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্রের অঙ্কিত চিত্রগুলির দোষ-ত্রুটি লক্ষিত হয়, বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাসের কষ্টিপাথরে কষিলে সেগুলির কোনও কোনও অংশে খাদ ধরা পড়ে। তথাপি তাঁহারা দেশাত্মবোধ জাগরিত করিবার অমোঘ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহার জন্য তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে। শেক্‌স্‌পীয়ারের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে ও স্যর ওয়াল্টার স্কটের ঐতিহাসিক আখ্যায়িকাগুলিতেও এখনকার ঐতিহাসিক বিশেষজ্ঞগণ এইরূপ গলদ বাহির করিয়াছেন। তথাপি শেক্‌স্‌পীয়ার ও স্কট অতীতের উজ্জ্বল চিত্র সাহিত্য-মুকুরে প্রতিফলিত করিয়া অতীতের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছেন, এজন্য ইংরেজ জাতি উভয়ের নিকট কৃতজ্ঞতায় অবনত-মস্তক। দোষ-ত্রুটিসত্ত্বেও শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটক ও ইতিহাসাশ্রিত আখ্যায়িকাবলিও সেইরূপ আমাদের আদরের সামগ্রী, আমাদের সাহিত্যের উৎকৃষ্টসৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্রের ইতিহাসাশ্রিত কাব্য 'পলাশীর যুদ্ধ,' এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কয়েকখানি নাটক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্রের তিরোধানের পর আমাদের দেশের ইতিহাসের অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই আবিষ্কার-কার্য্যে আমাদের দেশের কৃতবিদ্য-সম্প্রদায়ের মধ্যেও কয়েক জন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদ্‌, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি প্রভৃতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবগঠিত গবেষণা-বিভাগের চেষ্টায় আশা করা যায় আরও নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইবে। এই সকল নূতন তথ্যের কাঁচা মালকেও বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্র প্রভৃতির প্রণালীতে ঐতিহাসিক কাব্য-

নাটকের উপাদানে পরিণত করিতে হইবে। যাঁহারা কল্পনাকুশল, তাঁহাদিগকে এই কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে। সুখের বিষয়, খ্যাতনামা ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু শুষ্ক ঐতিহাসিক তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, নবাবিষ্কৃত তথ্যের ভিত্তির উপর কি প্রণালীতে ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা রচনা করিতে হয়, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য স্বহস্তে কল্পনার তুলিকা গ্রহণ করিয়া 'শশাঙ্ক', 'ময়ূখ', 'করুণা', 'ধর্ম্মপাল' প্রভৃতি গ্রন্থরাজি রচনা করিয়া সাধারণ পাঠকদিগকে ভারতের প্রাচীন গৌরবের সহিত পরিচিত করিয়া দিতেছেন। আবার প্রত্নতত্ত্ববিশারদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার 'বেণের মেয়ে' আখ্যায়িকায় প্রাচীন বাঙ্গালার গৌরবের একটি উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। আশা করা যায়, উভয়েই আমাদিগকে আরও মুক্তহস্তে সাহিত্যরস পরিবেষণ করিবেন এবং তাঁহাদিগের আদর্শ অনুসরণ করিয়া আরও অনেকে এই শ্রেণীর আখ্যায়িকা বা নাটক রচনা করিয়া সমাজের ও সাহিত্যের উপকার করিবেন। এই শ্রেণীর কাব্য-নাটক পাঠ করিলে পাঠক-সমাজের কাব্যপাঠ-জনিত আনন্দ-লাভ হইবে, সঙ্গে সঙ্গে দেশের অতীত গৌরবসম্বন্ধে সত্যজ্ঞানলাভে প্রকৃত জাতীয় শিক্ষাও হইবে।

শুধু যে ইতিহাস-রঙ্গমঞ্চের প্রধান পুরুষগণের শৌর্য্য বীর্য্য দয়া দাক্ষিণ্য ন্যায়পরতা ক্ষমাগুণ প্রভৃতির চিত্র-প্রদর্শনের জন্যই এই শ্রেণীর কাব্য-নাটকের প্রয়োজন তাহা নহে। সাধারণ গৃহস্থ-জীবনের চিত্রও কাব্য-নাটকে অঙ্কিত হইবার প্রয়োজনীয়তা আছে, সেই শ্রেণীর চিত্রেও আদর্শচরিত্রাঙ্কনে সমাজের মঙ্গল হয়। আজকালকার আখ্যায়িকাকারগণ পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণে বা অনুসরণে, Realism, Romanticism, humanitarianism, sex-problem, criminology, medical jurisprudence প্রভৃতি বড় বড় সাহিত্যিক সামাজিক দার্শনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দোহাই দিয়া যে শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছেন, তাহাতে নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার পরিচয় থাকিলেও তাহা দ্বারা সমাজের প্রভূত অমঙ্গল সাধিত হইতেছে। তৎপরিবর্ত্তে পাশ্চাত্য সভ্যতার, পাশ্চাত্য সামাজিক প্রথার মোহাবিষ্ট বাঙ্গালীর নয়নসমক্ষে আমাদের প্রাচীন পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শ ধরিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হয়। ৺দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণে' তথা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'ধ্রুবতারা'য়, অঙ্কিত সম্পন্ন গৃহস্থঘরের আদর্শ 'কর্ত্তা' ও গৃহিণী, ৺শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর', শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'অদৃষ্টচক্র' ও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর 'স্পর্শমণি'তে অঙ্কিত পূতচরিত্র ব্রাহ্মণপণ্ডিত, ৺রমেশচন্দ্র দত্তের 'মাধবীকঙ্কণ', শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অনাথবন্ধু', ৺চন্দ্রশেখর করের 'অনাথ বালক', ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'বিশ্বনাথ', ৺শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের 'পূজার ফুল', ৺যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'ক'নেবৌ' শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'ধ্রুবতারা' ও 'অনুপমা', শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর 'তরুবালা' প্রভৃতিতে অঙ্কিত আদর্শ যুবতী ও প্রৌঢ়া বিধবা—এই সকল শ্রেণীর চিত্র সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমাজের উপর পবিত্র প্রভাব বিস্তার করে। পল্লীজীবনের সুখ দুঃখ প্রভৃতির চিত্রাঙ্কন করিয়া পল্লীপ্রীতি সঞ্চারিত করারও এখন প্রয়োজন হইয়াছে। পল্লীসংস্কার, কুটির-শিল্প-প্রচলন, কৃষক ও শিল্পীদিগের মধ্যে প্রাথমিক-শিক্ষা-বিস্তার ইত্যাদি প্রচার-কার্য্য (propaganda work) কাব্য-নাটকের মারফত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। জড়জগতের যেমন তাড়িত-শক্তি মানবের নানাকার্য্যে নিয়োজিত হইতেছে, সাহিত্যজগতেও সেইরূপ কল্পনার চপলালোক সমাজের নানা মঙ্গল-বিধানে, নানা আদর্শ-স্থাপনে, নানা প্রশ্নবিচারে, নানা সমস্যা-সমাধানে, বিনিয়োজিত হইতেছে। অতএব নাটক ও আখ্যায়িকা-রচনা করিয়া সমাজে সুন্দর আদর্শ প্রচার করা ক্ষমতাশালী লেখকদিগের একটি প্রধান কর্ত্তব্য।

ফরমায়েশে সাহিত্য গড়িয়া উঠে না, ফরমায়েশী সাহিত্যও উচ্চদরের হয় না, বিশেষতঃ কবিদিগের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রতিভাস্রোতকে হুকুমে অন্যখাতে প্রবাহিত করা যায় না, মানসসরোবরগামী হংসকে অন্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া বিড়ম্বনা-মাত্র, এ সব কথাই জানি। আমার মত নগণ্য ব্যক্তির অনুরোধের যে বিশেষ গুরুত্ব (weight)

নাই, ইহাও বুঝি। তথাপি এই শ্রেণীর গুণী লেখকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিই যে সমগ্র জাতির হৃদয়ে উদ্দীপনা আনিতে তাঁহাদিগের মত আর কে পারে? তাঁহাদিগের একটি মোহন চিত্রে, একটি অগ্নিময় ছত্রে, যাহা হয়, তাহা শত শত প্রত্নতত্ত্বাত্মক গুরুগম্ভীর গ্রন্থে হয় না। 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাই বলিতেছি, দেশমাতার দিব্য দিয়া তাঁহাদিগকে অনুনয় করিতেছি, তাঁহারা গদ্যে পদ্যে, গানে গল্পে, বক্তৃতায় প্রবন্ধে, একটা বিরাট্ সাহিত্য প্রস্তুত করুন, তাহাতে দেশভক্তির পূর্ণ উদ্দীপনা হউক। তাঁহাদিগের প্রসাদে জাতীয় মহাভাব আমাদের অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জাতে মজ্জাতে, প্রত্যেক শোণিতবিন্দুতে প্রবেশ করুক। আমরা ধন্য হই।

শুনিয়াছি, ফরাসী দেশ, আমেরিকার যুক্তরাজ্য, জাপান প্রভৃতি দেশে বিদ্যালয়ে দেশভক্তি শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাদেরও জাতীয় শিক্ষায় সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে সকল কবিতা ও কাহিনীর প্রভাবে দেশভক্তির সঞ্চার হয়, সেই সকল কবিতা চয়ন করিয়া পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়ন করিতে হইবে।

জাতীয় শিক্ষা—সম্বন্ধে আমার শেষ কথা,—যে সুর প্রথমে মধুসূদনের কণ্ঠে 'রেখো মা দাসেরে মনে' 'শ্যামা জন্মদে' এই কবিতায় ধ্বনিত হইয়াছে, রঙ্গলাল বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথ কান্তকবি কাব্যবিশারদ গোবিন্দচন্দ্র রায় ও গোবিন্দচন্দ্র দাসের মিলিত কণ্ঠে যে সুর আরও উচ্চগ্রামে উঠিয়াছে, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস, কুমুদরঞ্জন নরেন্দ্র দেব, হাবিলদার কাজি নজরুল ইসলাম প্রভৃতি নব্যদিগের কণ্ঠে যে সুর ঝঙ্কৃত হইতেছে, সেই সুর আরও পরিপুষ্টি লাভ করিয়া 'সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে' ভারতভূমির আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হউক।

* * * *

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহারাজা সূর্য্যকান্ত বাহাদুরের

সুন্দর বনে ইষ্টার স্যুটিং।

আক্কার সাহেবের একখানা জাহাজ লইয়া সুন্দর বনে শিকার করিতে যাইব,—এই সংবাদ শুনিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের তদানিন্তন চিফ্ জষ্টিস্ স্যার ফ্রান্সিস ম্যাকলীন মহোদয় আমাকে চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন, তিনিও আমাদের সঙ্গী হইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহার সঙ্গে আরও দু একবার শিকারে বাহির হইয়াছি। গল্পান্তরে তাহা বলিবার ইচ্ছা রহিল। তিনিও উৎকৃষ্ট শিকারী এবং শিকারে তাঁহার সখ্ও বিলক্ষণ ছিল। তিনি যত দিন বঙ্গদেশে ছিলেন,—প্রতি বৎসরেই তিনি, যে কোন অবসরকালে, শিকারে বাহির হইতেন। এবার ইষ্টার পর্ব্ব উপলক্ষেই আমাদের এই শিকার যাত্রা তাই ডাইরিতে—" ইষ্টার স্যুটিং " শিরনাম লিখিয়া লইলাম।

বগুড়ার নবাব সাহেব,—ইটন সাহেব, হলো সাহেব এবং দুইটি বাবু বন্ধু একত্র হইয়া,—ঠিক সন্ধ্যার সময় জাহাজে আরোহণ করিলাম,—কিয়ৎকাল মধ্যেই চিফ্ জষ্টিস্ সাহেবও দুইজন খানসামা সহ "লট্ পট" লইয়া জাহাজে উঠিলেন। যথাসময় জাহাজ ছাড়িয়া দিল,—চাঁদিনী রাত,—গঙ্গাবক্ষে বংশী নাদে নাচিয়া নাচিয়া জাহাজ চলিতে আরম্ভ করিল। ইটনের রাগিণী ছিল বেশ ভালো; আধ আধ কণ্ঠে গান ধরিল, "Oh! sweet charming night."

অনেকক্ষণ বসিয়া গল্প গুজবে, সময় কাটাইয়া যার যার কেবিন শয্যায় আশ্রয় লইলাম,—যথাসময়ে ডায়মণ্ড হারবারে আসিয়া জাহাজও নঙ্গর করিল।

সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে—খুব জোরে জাহাজ দরিয়া ছাড়িয়া—"কালা-পাণিতে" অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরের কানাচ বাহিয়া সুন্দরবন উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। সে কি মনোরম দৃশ্য! সমুদ্রে যাহারা গতিবিধি করিয়া থাকেন,—তাহারা দেখিয়াছেন,—সমুদ্র বক্ষে প্রথম বালার্ক বিকাশ,—জীবন্ত কল্পনার লীলা চাতুর্য্যের কি এক রমণীয় তন্দ্রালস-পূর্ব্বাভাস। এ দৃশ্য লইয়া দেশ বিদেশের কত কবি কত চিত্র আঁকিয়াছেন,—কত গান গাহিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই।

সমস্ত দিন,—এভাবে চলিয়া, রাত্রি আটটার পরে সুন্দর বনের মোহনায়, এক অল্প পরিসর নদীর মধ্যে জাহাজ প্রবেশ করিল। রাত্রিতে সেই সঙ্কীর্ণ পথে, জাহাজ চালান নিরাপদ নয়, তাই.—সম্মুখে একটা বাঁকের মোড়ে সেই রাত্রির মত জাহাজ নঙ্গর করিল।

আমার সঙ্গে এক কবি প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি ডেক্ ছাড়িয়া,—একেবারে ছাপ্পরে উঠিলেন। এবং সারেঙ্গের কেবিনে সমস্ত রাত্রি অমৃত রস আস্বাদন করিতে করিতে সেখানেই চলিয়া পড়িয়াছিলেন;—এদিকে ডেকে, নবাব সাহেব এবং জাষ্টিস্ সাহেব, হলো এবং ইষ্টন্ দুজনকে লেলাইয়া আমার সঙ্গে একটা, "ব্রিজের" (তাস খেলার) যুদ্ধ লাগাইয়া তামাসা দেখিতে লাগিলেন।

রাত্রি অধিক হইয়াছে, সকলে আহারে যাইব,—কবির তালাস পড়িল। বয় আসিয়া খবর দিল—"বাবু ঘুমো" "ফের পুছ—খানেকে বোলাও"—বলিয়া ফের বাবুকে আনিতে লোক পাঠাইলাম,—ইত্যবসরে এদিকে দুটি * * উঠিয়া গিয়াছে। হলো এবং ইষ্টন্ দুজনে,বাবুকে কাঁধে করিয়া আনিয়া,—কাপড় চোপড় সমেত একেবারে "ট্যাঙ্কের" মধ্যে ছাড়িয়া দিল.—বাবু ট্যাঙ্কের জলে হাবুডুবু খাইয়া,—অপ্রস্তুত অবস্থায়, বিনা বাক্যব্যয়ে নিজ কেবিনে ঢুকিয়া দরজায় খিল দিয়া কাপড় ছাড়িয়া শয়ন করিলেন। সে রাত্রিতে শত চেষ্টা করিয়াও তাহাকে অন্য কেহ কেবিনের বাহিরে আনিয়া আহার করাইতে সক্ষম হইলাম না,—এমন কি জষ্টিস্ সাহেব পর্য্যন্ত তাহাকে অনুরোধ করিলেন,—কিন্তু সে এমনি গোঁয়াড় গোবিন্দ, যে, কিছুতেই কেবিনের দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিতে রাজি হইল না। অগত্যা, আমরা আহার করিয়া নিজ নিজ কেবিনে গিয়া শয়ন করিলাম।

সকলেরই নিদ্রা হইল, কিন্তু আমার নিদ্রা হইতেছেনা, খানিক এ পাশ ও পাশ করিয়া, ডেকের উপর পায়চারী করিতে লাগিলাম, মনে কেমন একটা ভাব। বাবুটি আমার সঙ্গে আসিয়াছে, আমার বন্ধু, ভদ্র লোকের সন্তান, অনাহারে রহিল, আর আমরা আহার করিয়া নিদ্রা যাইব? আমি চুপি চুপি বাবুর কেবিনের জানালার পাশে গিয়া উকি মারিয়া দেখিলাম, বাবু তাহার ল্যাম্পের চিম্‌নিতে যেন কি একখানা ভিজা কাগজ বার বার শুকাইতেছে এবং দেখিতেছে,— আমি "খট্" করিয়া খরখরিতে একটা ঠোকা দিলাম; বাবু চমকিয়া, একদৃষ্টে বাহিরের দিক লক্ষ্য করিয়া, পুনরায় কাগজ খানা ওলট পালট করিয়া দেখিতে লাগিল। আমি আবার "খটা খট্" করিয়া দুটা টোকা মারিলাম,— দেখিলাম বাবু বন্দুক টানিয়া কাছে আনিয়া রাখিল,— আমি আবার "খটা খট্" করিয়া জানালা নাড়া দিতেই, "কোন হ্যায়!" বলিয়া বাবু দরজা খুলিয়া একবারে বন্দুক হাতে করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল,— এবং আমাকে সম্মুখে দেখিয়া "আপনি—মহারাজা!" বলিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমি তাহাকে হাত ধরিয়া আমার কেবিনে লইয়া গেলাম;— এবং যথা সম্ভব কিছু আহার করাইয়া, পুনরায় তাহাকে তাহার কেবিনে রাখিয়া আসিয়া শয্যার আশ্রয় লইলাম। নিদ্রা হইল; উঠিতেও বেলা হইল না,—ঠিক পাঁচটায়ই শয্যা ত্যাগ করিলাম। আমার এমনই অভ্যাস যে, সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হয়। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া, এক ঘণ্টা ঘুমাইয়াও ঠিক ভোরে শয্যা ত্যাগ করি,—এই আমার "বাঁধা দস্তর।"

ভোরে,— পুনরায় জাহাজ ছাড়িল।— সুন্দর বনের মধ্যে, মোড়লগঞ্জ বন্দরে মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার এক কাছাড়ী আছে; আমরা সেখানে যাইয়া মধ্যাহ্ন ভোজন করিবই "রুটিন্" ছিল। হলো সাহেবের জনৈক বন্ধু সে কাছাড়ির ম্যানেজার তিনিও ইংরেজ, নাম মিঃ ডেক্‌ব্রীম্। তাঁহারও শিকারে খুব উৎসাহ ছিল। বন্দোবস্ত ছিল, তিনিও আমাদের সঙ্গী হইবেন,—বেলা দেড় প্রহর সময় মোড়লগঞ্জের ঘাটে ষ্টিমার ভিড়িল।

ম্যানেজার সাহেব প্রকাণ্ড "ডালী" সমেত জাহাজে আসিয়া আমাদিগকে আদর আপ্যায়নে যৎপরোনাস্তি বাধিত করিলেন। এই ডালীর সঙ্গে একটী অপূর্ব্ব জিনিষ ছিল, সেটী একটী রোহিত মৎস্য। এত বড় রোহিত মৎস্য— সুন্দর বন তো দূরের কথা "মিঠা পানীতে"ও কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

সাহেব এ মাছ কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন, জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম, এই মোড়লগঞ্জে "মোড়েল সাহেবের" খনিত একটি বড় পুষ্করিণী আছে, এ সেই পুকুরেরই মাছ;— এই মাছ ২৫।৩০ বৎসরেরও অধিক দিনের রক্ষিত। বহু চেষ্টায় এ মাছটি ধরা গিয়াছে। আমার বড়শীর বাতিক খুবই আছে। শিকার কাহিনীর পূর্ব্ব খণ্ডে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাঠকগণ পাইয়াছেন। মাছ দেখিয়া সখ হইল সেই পুকুরে বর্শী ফেলিব। জাষ্টিস্ সাহেবেরও মত হইল,—নবাব সাহেবের সখ নাই; কিন্তু কি কারণে, অগত্যা সে বেলার মত রাজি হইলেন, —ম্যানেজার সাহেবকে ছিপ বড়সী ইত্যাদির জোড় জোড় একত্র করিয়া দিতে অনুরোধ করিলাম। তাঁহার নিজেরও সে সখ ছিল, সুতরাং সে হাঙ্গামা সহজেই মিটিল। স্নান আহার শেষ করিয়া,—জাষ্টিস্ সাহেব ও আমি দুপারে দুই ছিপ ফেলিয়া বসিলাম।

লাগতো-লাগ—কিছুক্ষণের মধ্যেই জাষ্টিজ সাহেবের বড়শী আট্‌কাইয়া গেল,—নড়েও না, ছাড়েও না,—যেন পাষাণ! ম্যানেজার সাহেব খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন, —"লোকে লোকারণ্য,"। সাহেব বলিলেন "বড় মাছ," সাবধানে খেলিবেন। কড় কড় করিয়া হুইলে টান পড়িল, মাছ সাড়া পুকুরময় দৌড়াইতে লাগিল;—প্রকাণ্ড কাতলা, কালো-মিহি—যেন একটা "জু জু"'র মত। প্রায় একঘণ্টা টানা খেলার পর জালে জড়াইয়া উহাকে ডাঙ্গায় তোলা হইল। —তারপর দুজনে বাঁশ বাধিয়া মাছ লইয়া চলিল। আমি পদমর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য করিয়া জাষ্টিস্ এবং নবাব সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া;—কিছু নগদ টাকা ম্যানেজারের হাতে দিয়া,—মাছটী সর্ব্বসাধারণের ভোজে যাহাতে ব্যয় হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার ভার দিয়া জাহাজে চলিলাম।

আমরা যে স্থানে যাইব সেই—নির্দ্ধারিত শিকারের স্থান মোরলগঞ্জ হইতে বেশী দূরে নয়, ৪।৫ ঘণ্টা ব্যবধান মাত্র। বলেশ্বরী নদী ধরিয়া,—কতকটা পূর্ব্ব-মুখে; সুন্দর বনের যে অংশ,—জঙ্গলাকীর্ণ, তাহাই আমাদের উদ্দিষ্ট স্থান। অপরাহ্নে মোরলগঞ্জ হইতে জাহাজ ছাড়িয়া ৮। ৮।০ টার মধ্যেই আমরা সে স্থানে আসিয়া পঁহুছিলাম। —একটা অপরিসর চড়ার সম্মুখে আমাদের জাহাজ নঙ্গর করা হইল। লস্করগণ বিশ্রামে গেল। আমরা ডেক গুল-জার করিয়া আনন্দ প্রবাহে ভাসিয়া চলিলাম।

সকলে,—বাবুকে চাপিয়া ধরিল,—বাবু রাগ করিয়াছেন।—তাঁহার রাগ ভাঙ্গিতে হইবেই। প্রথমতঃ মধুর বচন। অতঃপর মধু প্রয়োগের ব্যবস্থা হইল। বাবু সুকণ্ঠ গায়ক। হারমোনিয়ম টানিয়া গান ধরিলেন,— "যমুনে,—এই কি তুমি, সেই যমুনে," ইত্যাদি। গান থামিল,—বাবুকে আমি সেই কাগজ খণ্ডের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম।—বাবু অতি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া কহিলেন,—"মহারাজ সাহেবেরা ট্যাঙ্কে ফেলিয়া কৌতুক করিয়াছে, সে কষ্ট বড় বেশী নয়,—ছাতে বসিয়া একটি কবিতা (সনেট) লিখিয়াছিলাম,—পেন্সিলের লেখা,—নষ্ট হইয়া গেছে,—পড়া যায় না; এই কষ্ট।"

বাবুকে সে রাত্রির মত পুনরায়,—কাব্য-রাজ্যে ভ্রমণের সুযোগ দিয়া,—আমরা নিজ কক্ষে শয়নে গেলাম।

শেষ রাত্রি,— সকলে গাঢ় নিদ্রামগ্ন হঠাৎ লস্করগণ এক ভীষণ চিৎকারে আমাদের নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দিল। সকলে সাগ্রহে ব্যাপার কি জানিবার জন্য কেবিনের বাহিরে আসিলাম,— দেখিলাম, সকলেই কম্পিত কলেবর,— একান্ত আরষ্ট ভাবাপন্ন,— জাহাজে "ভূত" লাগিয়াছে। এখনই জাহাজছাড়িতে হইবে, সারেঙ্গ ও নঙ্গর টানিতে হুকুম দিল। নবাব সাহেব একটু সেকেলে ধরণের লোক ছিলেন,— তিনি উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন এবং জাহাজের চারিদিকে ঘুড়িয়া সেই মন্ত্র -সিক্ত জলের ছিট্ মারিতে লাগিলেন। পুনরায় জাহাজের ডান পাশ দিয়া তথাকথিত "ভূতের" আবির্ভাব হইল। খুব তীক্ষ্ণভাবে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম,— জলের একটা ভয়ানক উথান বিলোড়ন—আর সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের গায়ে একটা কিছুর ঘন আঘাত। জাষ্টিস্ এবং হলো বন্দুক লইয়া সম্মুখীন হইলেন;—রাত্রিও তখন প্রভাত হইয়া উঠিতেছে; কুয়াসা ভাঙ্গে নাই। কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। জাহাজ ছাড়ে ছাড়ে ঠিক এমন সময়, দুটা প্রকাণ্ড মহিষ,—শৃঙ্গে বাঁধাইয়া একটা বিরাট কুম্ভীরকে চড়ার উপর ছিট্‌কাইয়া ফেলিল। কুম্ভীরের

মুখে দাঁতে দাঁতে খিল মারা একটি ছোট্ট মহিষ-শাবক। জষ্টিস্ সাহেব এবং হলো বন্দুক লইয়া প্রস্তুতই ছিলেন,—

উভয়েই একযোগে, কুম্ভীর লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলেন।—কুম্ভীর পলট খাইয়া লম্বা হইয়া ডাঙ্গায় পড়িল,—মহিষ দুটি জলে ডুবিয়া গেল।

জালী বোট নামাইয়া কুম্ভীর দেখিতে লস্কর ছুটিল;—তাহারা চড়ায় পঁহুছিতে না পঁহুছিতে, এক পাল মহিষ আসিয়া চড়া ভূমিতে—যেখানে কুম্ভীর মহিষ শাবক মুখে করিয়া পড়িয়া আছে,—তাহা ঘিরিয়া দাঁড়াইল। এবং ঐ কুম্ভীরকে শৃঙ্গে শৃঙ্গে,—অতি আক্রোশের ভরে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল। তারপর পায় মাড়াইয়া কুম্ভীরের মুখ হইতে মরা মহিষ শাবকটী ছিনাইয়া লইয়া সেই শাবকটাকে মধ্যস্থানে কেন্দ্র করিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইল।

বোট চড়ায় যাইতে পারে না, মহিষে আক্রমণ করিতে চায়। ব্যাপার গুরুতর!—অথচ ভোরের যাত্রা, কেনই বা বৃথা যায়? এই সকল চিন্তা করিয়া,—বৃহৎ শৃঙ্গধারী পালের সেরা যেটা,—আমি সেই মহিষটাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলাম। মহিষ পড়িল; অপরাপর মহিষ দলশুদ্ধ পুনরায় জলে লাফাইয়া পড়িয়া আসিয়া পুনঃ পুনঃ জাহাজটাকে শৃঙ্গাঘাতে আক্রমণ করিতে লাগিল। সারেঙ্গ জাহাজের চাকা ঘুড়াইতে আদেশ করিল। জাহাজের চাকা ঘুরাইয়া দিল তখন মহিষের দল কোথায় যে অন্তর্হিত হইয়া গেল, তাহার আর সাড়া পাওয়া গেল না।

কুম্ভীর এবং মহিষের মুণ্ড বোটে করিয়া জাহাজে তুলিয়া আনিলাম। নবাব সাহেবের "ভূতের মন্ত্র" গুণে বোধ হয় জাহাজ নিরাপদ হইল।

শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

ঢাকার নবাবিষ্কৃত কামান।

ঢাকা সহরের গেণ্ডারিয়া নামক স্থানে কিছুদিন হইল একটী পিতলের কামান আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কামানের গাত্রে তুগ্র-আরবী অক্ষরে কামানটীর পরিচয়, নির্ম্মাণের সময় ও ওজন খোদিত আছে। ঢাকা মিউজিয়ামের কিউরেটার বাবু নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ, এই পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন। নলিনী বাবু আমাদিগকে লিখিয়াছেন "নূতন কামানটীতে নূতনত্ব কিছুই নাই, পূর্ব্বে প্রাপ্ত শের শাহের কামানেরই অবিকল প্রতিকৃতি। Inscription ও হুবহু এক। শুধু তারিখে এককে যেন ৮ আছে বলিয়া বোধ হইতেছে।" * *

নলিনী বাবুর প্রদত্ত এই বিবরণই সংবাদ পত্র সমূহেও বাহির হইয়াছে। তাহাতে কামানটী সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা নাই। সে জন্য আমরা পূর্ব্বপ্রাপ্ত শের শাহের কামানটীর বিবরণ নিম্নে প্রদান করিলাম।

পূর্ব্ব কামানটীতে পারস্য ভাষার নিম্নলিখিত বিবরণ খোদিত আছে:—

দর আহ্দে বাদসাহা আদেল শেরশাহ্
খেলেদাল্লাহ মুলকুহু ও সুলতানুহু দরতারিখে
নাহ্ছদ চেহেল নাহ্ আমল সৈয়দ আহাম্মদ রুমী।"

এই বিবরণ কামানের যেদিকে খোদিত, তাহার বিপরীত দিকে এইরূপ কতকগুলি চিহ্ন খোদিত আছে:— ৩।৪ |×|

কামানটীর নালীর নীচে পারস্য ভাষায় "বুরুৎ গাজীর" নাম লিখা। এই নামের উপরও |×| এই চিহ্নটী খোদিত আছে। কামানের চুলীর নিম্নে বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত আছে:—

'তরফ রাজা'

২।৬

ইহার বিস্তৃত আলোচনা—বারান্তরে করিব।

কাল বৈশাখী। *

(১)

আজ্‌কে সারা ভারত মাঝে, সংস্কারের ডঙ্কা বাজে,
পাঁচ হাজারী শুন্‌ছি ব্যাঙের ডাক ;
ভরসা দিত বৃষ্টি হবার, দেখ্‌ছি এখন গর্জ্জনই সার,
ময়ূর পুচ্ছ দাঁড়কাকেদের জাঁক্‌ !
আকাশে নাই মেঘের ছিটে, মর্‌ছি তৃষায় ছাতি পিটে,
পাই না খেতে—কাঁদ্‌ছি নিরাশায় ;
একটা বিরাট্‌ উপেক্ষাতে, যাচ্ছি ক্রমে অধঃপাতে
দরদ্‌ মোদের কেউ বোঝে না, হায় !
দেড় শো বছর পূর্ব্বে মোরা, ছিলাম কি ভাই বর্ণচোরা ?
হৃদয় ছিল মধুর পরিপাটি ;
পল্লীবাসে ছিলাম খাসা, আজ সহরে বাঁধছি বাসা,
জীবনটা তাই হচ্ছে ভীষণ মাটি !
ভাব্‌ছো কি ভাই,ঐ তো ঈশান—আজ্‌কে কসে বাজায় বিষাণ,
ধ্বংস মাঝে গড়ে উঠ্‌ছে জাতি ;
জাগছে গভীর দেশাত্মবোধ,আজ্‌কে তাকে কর্‌বে কে রোধ ?
পঙ্গু এখন কর্‌ছে মাতামাতি !
বিশাল পাহাড় উল্টে ফেলে, সকল বাধা বাধই ঠেলে,
যোগী ঋষির আম্‌রা সুসন্তান ;
মরিস্‌ কেন মাথা কুটে ? ভাগ্য মোদের হাতের মুঠে,
ভেঙে চুরে কর্‌না সুনির্ম্মাণ !

(২)

শুনছো কি গো মর্ম্মকথা ? দেশটা ভরা বিষণ্ণতা,
চতুর্দ্দিকে দলাদলির দল ;
নাম্‌কে ওয়াস্তে ব্যস্ত হবে, কাজের বেলা পিছ্‌-পা সবে,
নাইকো কারুর একটু ধর্ম্মবল !
দলাদলির গণ্ডগোলে, আর কতকাল মানুষ ভোলে ?
একটা ভীষণ শুনছি চেঁচামেচি !
হৃদয়হীনে দেশ ছেয়েছে, কুকুর শেয়াল বেড়ায় মেচে,
খাচ্ছে নারী সতীত্বটা বেচি' !
বাস্তভিটে বিকিয়ে দিয়ে, দিচ্ছে সবাই মেয়ের বিয়ে,
পাশ-করা বর কিন্‌তে পাওয়া যায় ;
রূপের চেয়ে রূপোর আদর, শ্রীমতীদের নাই সে কদর,
হায় কি ভীষণ হোলো কন্যাদায় !
দু চার পাতা বাঁধা বুলি, কপ্‌চাতে বেশ জানে খালি,
একটা কেমন বিকট অহঙ্কারী ;
মা বোনেদের বস্ত্র নাই, গায়ে সাবান রোজ মাখা চাই,
চাল চলনে মেয়েলী ঢং ভারী !
এরাই নাকি দেশের আশা ! জীবন পণে খেল্‌বে পাশা !
কুপ্রথা সব কর্‌বে বহিষ্কার !
হা ভগবান্‌, আবার তুমি——ধন্য করো পুণ্য ভূমি,
চাচ্ছি মানুষ, চাইনা কিছুই আর !

(৩)

ধনীর কথা বলবো কি আর ! কুঁড়ের বাদ্‌শা কি চমৎকার
প্রজার অর্থে বাবু-ফুটানি করা !
তারাই কিন্তু কাজের কাজী, কাজ ফুরালে তারাই পাজী,
এই দুনিয়ায় তারাই জ্যান্ত মরা !
প্রজার অর্থে বারমাসই, আজ্‌কে ধনী সহরবাসী,
দেশে প্রজাই মরছে ছাতি পিটে !
আধ-পেটা খায় দিনে রেতে, কেউ বা যোটেই পায় না খেতে,
ভুগছে জ্বরে আঁক্‌ড়ে বাস্তভিটে !
পাঠশালা কই ? পুকুর কোথায় ? হচ্ছে উজাড় ঘোর নিরাশায়,
কয়টি ধনী তাদের দরদ্‌ বোঝে !
বাংলাদেশের ধনী মানী, একটা বিকট অভিমানী,
যে যার প্রেমের স্বার্থটুকুই খোঁজে !
তাই তো এমন 'বল্‌—সেবী'-বাদ, আজ বিধাতার আশীর্ব্বাদ,
পেটের দায়ে মেনেই নিচ্ছে সবে ;
চলতো যারা কেঁপে কেঁপে, ক্ষুধায় তারা উঠলো ক্ষেপে,
আজকে সাড়া দিচ্ছে উচ্চরবে।
খাচ্ছো পোলাও পায়েস পিঠে, আর কতকাল লাগবে মিঠে ?
খাওয়ায় যারা তারাই খিদেয় মরে !
পায়ের নীচের মানুষ যত, যুগে যুগে সইলো কত !
এখন তারাই উঠবে মাথার'পরে।

---

* ১৩২৯ সনের ৩রা বৈশাখ মেদিনীপুরে সাহিত্য সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশনে পঠিত।

(৪)

ব্যব্সাদারের কই সে প্রীতি ? কি জঘন্য ব্যব্সা-নীতি !
এরাই দেশের করছে সর্ব্বনাশ !
জাতির গলায় ছুরি মেরে, লোক ঠকিয়ে খাচ্ছে বেড়ে !
পরদেশী সব ব্যব্সাদারের দাস !
যে যার আপন ইচ্ছামত, দাম চড়াচ্ছেন অবিরত,
কারণ সবাই দেশী কাপড় চাই !
আত্মঘাতী অপদার্থ, বোঝেন কেবল নিজের স্বার্থ,
এদের বিন্দু দেশাত্মবোধ নাই !
একটা কপট হৃদয় নিয়ে, মিষ্টি কথায় ধাপ্পা দিয়ে,
টাকা পয়সা নিচ্ছে এরাই চুষে ;
পাত্লা কাপড় গ্রামে গ্রামে, একেবারে চড়া দামে,
দেশী বলে' গছায় ঠেসে ঠুসে !
মুখে বলেন "নাও না চাচা, কেমন শাড়ী, কেমন পাছা !
এই ছাখো না জমিন্ কেমন্ বেড়ে !"
বোল্ চালে বেশ পটু সবাই, ধর্ম্মটাকে করছে জবাই,
দিন-দুপুরে খাচ্ছে সবার কেড়ে !—
সময় থাক্তে ফিরে তাকাও, চর্কা চালাও, চর্কা চালাও,
কল ও'লাদের আর কোরো না বড় !
চর্কা-সুতোয় বাড়ীর তাঁতে, মাকু ঠেলে দিনেরাতে,
নিজের হাতের তৈরি কাপড় পরো !

(৫)

কে আছে আজ দেশে এমন, চায়না খাঁটি দেশী বসন ?
মোটা বলে' তুচ্ছ করে তাকে ?
কুশ্রী বলে' বিলিয়ে দিতে, কিম্বা তাকে বদ্লে নিতে,
চাচ্ছে কে তার নিজের মেয়ের মাকে ?
থাক্লে এমন অপদার্থ, সে যে নেহাৎ কৃপাপাত্র,
বিগড়ে গেছে দু চার পাতা পড়ে' ;
এমন যদি কেউ বা থাকে, তোম্রা যেচে শেখাও তাকে,
দেশের প্রেমে উঠুক্ হৃদয় ভরে' ।
আজ প্রবাসী নিজের দেশে, চালছেড়ে দাও সর্ব্বনেশে,
দূর করো বোন্, পাউডার পমেটম্ !
পাত্লা কাপড় সেমিজ শাড়ী, পরো না আর
পুরুষ-নারী ?
স্বদেশ-প্রীতি সেই তো মনোরম !

জীবন-মরণ-সন্ধিকালে, চলো দেশী দেশের চালে,
সভ্য হ'য়ে আর যেয়ো না মারা !
আত্মনাশের দুষ্ট নেশা, ঘেঁটিয়ে খ্যাদাও সে দুরাশা,
তুচ্ছ কিগো দেশের ধর্ম্ম-ধারা ?
দেশের কুকুর 'ঠাকুর' বলে, নাও না তাকে মাথায় তুলে
এইত্তোরে তাই খাঁটি দেশপ্রীতি !
তুচ্ছ নহে, তুচ্ছ নহে, তুচ্ছ মোটেই নয়ত্তোরে ভাই !
তুচ্ছ নহে দেশের রীতি-নীতি !

(৬)

কাঁদ্বো গিয়ে কাদের পাশে ? ছোটগল্পে উপন্যাসে,
দেখ্ছি কলুষপ্রেমের বাড়াবাড়ি !
অবাধ বন্যা গোজামুজি, বাংলা ভাষা ডুবায় বুঝি,
ঝাঁপিয়ে তাতে পড়ছে পুরুষ নারী ।
সাগর পারের প্রেম-পিপাসা, সর্ব্বনাশী সব দুরাশা,
তোমরা যতই বিলাও ব্যভিচার—
মৌলিকতা পাই না খুঁজি, বস্তা পচা ভাবের পুঁজি
'রিচু' বিদ্যা চলছে চমৎকার !
কবিদের সব বাজে কথা, কোথায় ভাবের গভীরতা ?
ভাষায় কেবল 'জলতরঙ্গ' বাজে ;
সব মেয়েলী কথার ছটা, কেবল 'চুমা' চাঁদের ঘটা
নাই অনুভব্-শক্তি প্রাণের মাঝে ।
একটা বিশাল ভূমিকম্প, বাজায় শিরায় জগঝম্প,
এদের লেখায় নাই সে ভাবের ছায়া ;
হৃদয় খুলে আপন মনে ফুঁক্ছে বিষাণ দুএক জনে,—
দত্ত কবি, কাজী নজরুল্ ভায়া ।
ঢের শুনেছি প্যান্প্যানানি, এখন এসব তুচ্ছ মানি,
চর্কা-আওয়াজ এর চেয়ে ঢের খাসা ;
আজ তোমাদের হৃদয়-তারে, বাজুক ব্যথা বারে বারে,
বাজুক্ দেশের নিত্য নতুন আশা !

(৭)

একটা বিরাট হৃদয় নিয়ে, শিক্ষিত সব যাও এগিয়ে,
তাকাও একটু নিম্ন স্তরের প্রতি !
রোদ্ বৃষ্টি মাথায় করে', এরা কেবল খেটেই মরে,
নির্ব্বিবাদে সইছে সকল ক্ষতি ।
অর্দ্ধাহারে ঘোর পিপাসায়, সারাজীবন কষ্টে কাটায়,
বোবার মত কয় না কথা কভু ।

এরাই জাতির মেরুদণ্ড, হচ্ছে তবু লণ্ডভণ্ড,
উপেক্ষাটা করে' যাচ্ছি ধ্রুব!
এর প্রতিফল : ভাষা যায়, তাই বাসুকি ফণা কাঁপায়,
ওলট্ পালট্ হবেই হবে জান ;
মাঠ ময়দান করছে ধূধূ, কান পেতে আজ শুনছি শুধু,
চতুর্দ্দিকে গণতন্ত্রের বাণী।
হে রমণী, বাইরে এসে, শঙ্খ বাজাও নবীন বেশে,
তোমরা 'মানুষ' তৈরি করে' দাও!
তোমরা নতুন জাতির মাতা, বলছে যুগের সৃষ্টিদাতা,
চর্‌কা ধরে' উদ্বোধনী গাও!
হৃদয়টুকু খাঁটি রেখে, আশার কথা শোনাও ডেকে,
আমরা পুরুষ স্বার্থপরের জাত ;
প্রসব করার যন্ত্র করে,' "ক্ষিতি কাবার" করছি মরে,'
বংশ বাড়াই, পাইনা খেতে ভাত ;
মোদের চেয়ে হৃদয়-শুচি, জাগো দেশের মেথর মুচি,
জাগো কৃষক কামার কুমার তাঁতি!
সবকে বুকে আঁকড়ে ধরে,' জাগো বামুন নতুন করে,'
সবার গৃহে জ্বালাও জ্ঞানের বাতি!
পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন ঋষি, আমরা এখন কলম পেশী,
পরের জুতো চাটছি দিনেরাতে!
ত্যাগীর ছেলে ভোগী সবে, এ ব্যথা আর ঘুচ্‌বে কবে?
তাই এ জাতি যাচ্ছে অধঃপাতে!
কোলবালিসের জোড় পরে,' মাথায় মস্ত ধামা ধরে,'
অন্ধকারে করছি ছুটোছুটি ;
কই সে মোদের জাতীয়তা? যাচ্ছে বেড়ে দরিদ্রতা,
যম ভিরিশেই কামড়ে ধরে টুঁটি!
কাটবে জরুর্ আঁধার রাতি, গড়বো তোফা বিরাট্ জাতি,
ভুলবো যেদিন ব্যর্থ অভিমান ;
হৃদয় যেদিন হবে খাঁটি, করবো জীবন পরিপাটি,
মিলবো তামাম্ হিন্দু মুসলমান!
বইছে বাতাস, পাল তুলে দাও, জোর্‌সে সবাই বৈঠা চালাও,
ভাবনা কিসের? ঐ ভাষা যায় আলো!
একটু খেটেই উঠ্‌লে ঘেমে? কর্ম্ম যেন যায় না থেমে,
বুকের মাঝে বজ্র-অনল জ্বালো!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

ধনুর্ব্বেদ।

এই সুবিশাল ভারতভূমিতে প্রাচীন আর্য্যগণের প্রতিভা কত বিভিন্ন বিষয়ে কত প্রকারে বর্ণিত রহিয়াছে এবং আর্য্যগণ জ্ঞান ও উন্নতির সোপানে কতটুকু অধিরূঢ় হইয়াছিলেন একটুকু মনযোগ সহকারে তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিলেই বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহারা যেমন একদিন সুকঠোর তপশ্চারণ দ্বারা বেদান্ত প্রতিপাদ্য আধ্যাত্মবিজ্ঞান বিষয়ে পৃথিবীস্থ মানব জাতিকে নব আলোকে বিমুগ্ধ করিয়াছেন, তেমনই চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, শিল্পবিজ্ঞান, রাসায়নাদি সর্ব্ববিষয়েই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। কালের কুটিল গতিতে আমরা যে কেবলমাত্র তাঁহাদের কীর্ত্তি নিদর্শনগুলি দেখিতে পাইতেছি না এমন নহে পরন্তু সেই সকল বিষয়ের জ্ঞান ভাণ্ডার স্বরূপ তাঁহাদের সুচিন্তিত ও সুলিখিত গ্রন্থরাশিও আমাদের নিকট হইতে লুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে কতিপয় বিদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর অক্লান্ত চেষ্টায় এবং ভারতীয় মনিষিগণের প্রকৃত অধ্যবসায়ের ফলে বিবিধ শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক লুপ্তগ্রন্থ পুনরুদ্ধার হইয়াছে ও হইতেছে এবং আশা করা যায়, এই ভাবে ভারতের বিলুপ্ত ধনরাশির উদ্ধারকল্পে দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ থাকিলে অদূর ভবিষ্যতে পুনরায় ভারত অমূল্যগ্রন্থরাশি লোকসমক্ষে প্রচারিত করিয়া সসম্মানে আধুনিক সভ্যজগতের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে পারিবে। বর্ত্তমান সময়ে শুক্রনীতিসার, কামন্দকীয় নীতি, নীতিবাক্যামৃত, কোটিল্য অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি পুস্তকগুলি মুদ্রিত হওয়াতে ভারতীয় সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অর্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহাদের কতটুকু জ্ঞানোন্মেষ হইয়াছিল তাহা জানিতে পারাগিয়াছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে এ পর্য্যন্ত আর্য্যগণের যুদ্ধাস্ত্রসম্বন্ধে বৈশম্পায়নকৃত নীতি প্রকাশিকা ভিন্ন অন্য কোনও গ্রন্থই মুদ্রিত হয় নাই। ধনুর্ব্বেদ বলিতে সাধারণতঃ আর্য্যগণের সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধাস্ত্র কিংবা কেবল মাত্র ধনুক সম্বন্ধে আলোচিত গ্রন্থকেই বুঝা যায়।

প্রাচীন গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে এই ধনুর্বিদ্যা সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে ব্রহ্মা, মহাদেব, পরশুরাম, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণ জ্ঞান প্রচার করেন। ঋষি বৈশম্পায়ন কৃত নীতিপ্রকাশিকা গ্রন্থে আর্য্যগণের নানারূপ যুদ্ধাস্ত্র সম্বন্ধে

আলোচিত হইয়াছে। মহারাজ ভোজদেবকৃত একখানি ধনুর্ব্বেদ গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর, বীরচিন্তামণি, যুদ্ধজয়ার্ণব প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "নীতিপ্রকাশিকা" পুস্তকখানি গষ্টেভ্ ওপার্ট সাহেব মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত সাহেব মহোদয় শুক্রনীতিসার ও নীতিপ্রকাশিকা অবলম্বনে 'প্রাচীন হিন্দুদিগের যুদ্ধাস্ত্র, সৈন্যসজ্জা ও বারুদ ব্যবহার' প্রণালী সম্বন্ধে যে সন্দর্ভ লিখিয়াছেন তাহা অতি সুচিন্তিত ও সুখপাঠ্য।

স্বর্গীয় ডাক্তার রামদাস সেন মহোদয় যুদ্ধজয়ার্ণব, বীর চিন্তামণি প্রভৃতি যে সকল পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। মূলগ্রন্থ ব্যতিরেকেও অগ্নিপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে এবং শুক্রনীতিসারে আর্য্য-গণের যুদ্ধাস্ত্র সম্বন্ধে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কি প্রণালীতে, কিরূপভাবে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিলে প্রকৃত বীরপদবাচ্য হওয়া যায় সেই সম্বন্ধে উপদেশাবলী ধনুর্ব্বেদে সন্নিহিত আছে। এই ধনুর্ব্বিদ্যা ক্ষত্রিয়গণেরই প্রশস্ত ছিল। ব্রাহ্মণগণই অন্যান্য জাতিকে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। এবং মহর্ষি বশিষ্ঠের মতে প্রয়োজনানুসারে শিকারাদি করিবার জন্য শূদ্রও ধনুর্ব্বিদ্যা গ্রহণ করিতে পারিত।

যাহা হউক, উল্লিখিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে যেগুলি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে সেই সকল পুস্তক পাঠ করিলে আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারিব যে অন্যান্য অস্ত্র ও শস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিলেও কেবল ধনুর্ব্বিদ্যায় তাঁহারা কতটুকু অগ্রসর হইয়াছিলেন। বৈশম্পায়ণ কৃত "নীতিপ্রকাশিকা" গ্রন্থে খড়্গাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে এবং তাঁহার মতে উহাই সর্ব্বাদিম অস্ত্র। ধনু ও তৎক্ষেপ্য বাণাদি বেণুপুত্র পৃথুরাজার সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। যথা—

অসিঃ পূর্ব্বং ময়া সৃষ্টো দুষ্টানিগ্রহকারণাৎ।
ভবাদৃশ সমীপস্থো লোকান্ শিক্ষন্ চরত্যসৌ॥
ধনুরাদ্যায়ুধব্যক্তো ত্বমেবাদিঃ স্মৃতোমরা।
তস্মাৎ শস্ত্রাণি চাস্ত্রাণি দদামি তব পুত্রক॥

নীতিপ্রকাশিকায় ধনু, ইষু, ভিন্দিপাল, শক্তি, গদা, গোশীর্ষ, অসি, নলিকা শতঘ্নী প্রভৃতি প্রায় শতাধিক অস্ত্রের নাম জানিতে পারা যায় এবং সংক্ষেপতঃ উহাদের আকার প্রকার ও ব্যবহার প্রণালীও সামান্যতঃ জানা যায়। সংস্কৃত-শাস্ত্রবিশারদ ডাক্তার গষ্টেভ্ ওপার্ট মহোদয় প্রাচীনযুগে হিন্দুদিগের সৈন্যসজ্জা, যুদ্ধাস্ত্র ও বারুদাদি ব্যবহার প্রণালী সম্বন্ধে যে গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি "মরীচি পটল" নামে একটী শিল্পশাস্ত্র-গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন; উহাতে কয়েকটী যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণ সম্বন্ধেও উল্লেখ আছে। পুস্তকখানি মাদ্রাজ হইতে তামিল ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে।

বহুকাল যাবৎ এই অস্ত্রবিদ্যা আমাদের ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হওয়ায় অর্থাৎ ক্ষাত্রশক্তি বিধ্বংশ হওয়ার পর হইতেই এবং ঐ সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিদ্যার চর্চ্চা ও জ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ায় কালক্রমে তদ্বিষয়ের গ্রন্থসমূহও বিলুপ্ত হইয়াছে। এমন কি বন্দুক, কামান, ব্যোমযান প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রাদির নামোল্লেখেই আমরা বিস্মিত হইয়া পরি। হইতে পারে যে আধুনিক যুগের সমকক্ষ প্রাচীনযুগের অস্ত্রাদি ছিল না কিংবা অনেকানেক অস্ত্র বর্ত্তমানযুগে নূতন আবিষ্কৃত হইতে পারে কিন্তু সে গুলি এমন কিছু নহে যাহা দেখিয়া প্রাচীন জ্ঞানের তুলনায় আত্মভূত হইতে পারি কিংবা নিজকে হেয় জ্ঞান করিতে পারি। কামসূত্রে চতুঃষষ্ঠী অঙ্গবিদ্যা বিভাগে যন্ত্র-মাতৃকা সম্বন্ধে যে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তৎসম্বন্ধে ভাবিবার অনেক কথা আছে। এই যন্ত্রমাতৃকা সম্বন্ধে টীকাকার লিখিয়াছেন—"সজীবানাং নির্জীবানাং যন্ত্রানাং যানোদোক সংগ্রামার্থং ঘটনাশাস্ত্রং বিশ্বকর্ম্মপ্রোক্তম্।" দুঃখের বিষয় বিশ্বকর্ম্মা রচিত "বিদ্যাপ্রভাস" যাহাতে যান বাহনাদির সম্বন্ধে আলোচনা আছে সেই পুস্তকখানি এখনও লুপ্ত। ব্রহ্মা ও ভোজদেবের বিরচিত "ধনুর্ব্বেদ" প্রাপ্তির আশা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। এক্ষণে দুইটী মাত্র ধনুর্ব্বেদ পাওয়া যায়; একটি বিশ্বামিত্র বিরচিত, অপরটি মহর্ষি বশিষ্ঠ বিরচিত। বিশ্বামিত্রের ধনুর্ব্বেদ অনেক দিন হইল প্রকাশিত হইবার কথা শুনা যাইতেছে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই। মধুসূদন সরস্বতী কৃত "প্রস্থানভেদ" পাঠে অনুমিত হয় যে তিনি বিশ্বামিত্রের ধনুর্ব্বেদখানি দেখিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থের অধ্যায়ক্রমে তিনি উহার বর্ণনা করিয়াছেন। যথা:— "যজুর্ব্বেদস্যো-পবেদো ধনুর্ব্বেদঃ পাদচতুষ্টয়াত্মকো বিশ্বামিত্র প্রণীতঃ। তত্র প্রথমোদীক্ষাপাদঃ। দ্বিতীয়ঃ সংগ্রহপাদঃ। তৃতীয়ঃ সিদ্ধি-পাদঃ। চতুর্থঃ প্রয়োগপাদঃ। তত্র প্রথমপাদে ধনুর্লক্ষণং

অধিকারি নিরূপণঞ্চ কৃতম্। * * * এবং দীক্ষাভিষেক শাকুন মঙ্গলকরণাদিকঞ্চ সর্ব্বমপি প্রথমপাদে নিরূপিতম্ সর্ব্বেষামস্ত্রশস্ত্রাবিশেষাণাং আচার্য্যস্য লক্ষণপূর্ব্বকং সংগ্রহণং সংগ্রহপাদে দ্বিতীয়ে দর্শিতম্। গুরুসম্প্রদায় সিদ্ধানাং শাস্ত্র বিশেষাণাং পুনঃ পুনরভ্যাসো মন্ত্রদেবতা সিদ্ধি করণাদিক তৃতীয়পাদে। এবং দেবতাৰ্চ্চনাভ্যাসাদিভিঃ সিদ্ধানাং অস্ত্রশস্ত্রবিশেষাণাং প্রয়োগশ্চতুর্থেপাদে নিরূপিতঃ।"

এক্ষণে ধনুর্ব্বেদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আমরা আলোচনা করিব। ধনুর্ব্বেদের অস্ত্রাদি প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত যথা—মুক্ত, অমুক্ত, মুক্তামুক্ত ও যন্ত্রমুক্ত। ধনু দুই প্রকার (১) শার্ঙ্গধনু—এই ধনু সাধারণতঃ দেবতাদিগের ব্যবহার্য্য এবং মনুষ্যের দুষ্প্রাপ্য, এবং (২) বৈনব বা বংশধনু—ইহাই মনুষ্যের ব্যবহার্য্য উৎকৃষ্ট ধনু। বংশধনু কি প্রকার এবং কোন্ স্থানোৎপন্ন বংশদ্বারা উহা নির্ম্মিত হইবে, ইহার প্রমাণ, ইহার জ্যা কোন্ বস্তুদ্বারা এবং কি প্রমাণ হইবে, শর কি প্রকার হইবে এই সকল বিষয় ধনুর্ব্বেদ পাঠে জানা যায়। শিক্ষা কৌশল, বিভিন্ন আকারের ফলা প্রস্তুত করা এবং পাইনের দ্বারা অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা সাধন করার প্রণালী সম্বন্ধে ধনুর্ব্বেদ পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। অস্ত্রে পাইন দিবার পদ্ধতি বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর ও বৃহৎ সংহিতাতেও লিপিবদ্ধ আছে। যে কৌশলে বাণ নিক্ষেপ করিতে হয় তদ্বিষয়েও ধনুর্ব্বেদে আলোচনা আছে। লক্ষ্যভেদ ধনুর্বিদ্যার একটি প্রধান অঙ্গ। কোনও দ্রব্য হয়ত স্থিরভাবে রহিয়াছে, কোনটি বা দৌড়াইতেছে, কোনটি বৃহৎ, কোনটী সূক্ষ্ম, কোমল বা কঠিন ইত্যাদি নানাপ্রকারের দ্রব্যকে কিরূপ ভাবে বিভিন্ন উপায়ে ও প্রক্রিয়া দ্বারা শরবিদ্ধ করিতে হইবে কিংবা শরগতি রোধ করিবার প্রণালী—কেবলমাত্র ধনুর্ব্বেদ পাঠেই জানিতে পারা যায়। লক্ষ্যভেদ শিক্ষার রীতিনীতি এবং কি প্রকারে লক্ষ্যভেদ করিলে সিদ্ধহস্ত হওয়া যায় তাহা ধনুর্ব্বেদে উক্ত আছে। মোটকথা ধনুর্বিদ্যায় আর্য্যগণ এতবেশী পারদর্শী হইয়াছিলেন যে তাঁহারা যুদ্ধাদির জন্য এবং আত্মরক্ষার্থেও ধনুরই ব্যবহার করিতেন এবং শতঘ্নী প্রভৃতি নালিকাস্ত্রের ব্যবহার হেয় গণ্য করিতেন এবং ঐরূপ যুদ্ধ কূটযুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইত। যেমন অন্যান্য শিক্ষাবিষয়ে তেমনই ধনুর্বিদ্যা বিষয়েও পুরাকালে রাজা, রাজপুত্র কিংবা রাজাস্থ অন্যান্য যোদ্ধৃবর্গও ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া পূতচিত্তে শুভদিনে শুভ মুহূর্ত্তে গুরুগৃহে গমন করিয়া তথায় শিক্ষালাভ করিয়া ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতেন। তাঁহাদের শিক্ষাকাল সমাপ্ত হইলে সর্ব্বসমক্ষে শিক্ষাকৌশলে নিপুণতা দেখাইয়া স্বীয় কৃতিত্বের অভিনয় প্রদর্শন করিতেন। এই সকল অভিনয়স্থল "রঙ্গবাটী" নামে খ্যাত ছিল। তথায় রাজাস্থ গণ্যমান্য সকলে সমাগত হইয়া অভিনয় দর্শন করিতেন। মহাভারতে এমন অভিনয়ের বিবরণ পাওয়া যায়। সুধী পাঠকবর্গ এই সকল আলোচনা হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে এই সকল লুপ্তগ্রন্থের পুনরালোচনা কত প্রয়োজন। আমরা জাতীয় শক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়া ক্রমে ক্রমে অধঃপতিত হইতেছি। কি ধর্ম্মে, কি রাজনীতিতে সর্ব্ববিষয়েই যেন আমাদের দৈন্যতা প্রকটিত হইতেছে এবং আমরাও ম্রিয়মান হইতেছি। আমার মনে হয় প্রাচীন গ্রন্থের বিলোপজনিত আলোচনার অভাব একটি গুরুতর কারণ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভারতবাসীর প্রাচীন গৌরব গাথা যদি পুনরায় গীত হয়, যদি পুনরায় ভারতবাসী তাঁহাদের অক্ষয়ভাণ্ডারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তবে ভারতের ভবিষ্যৎ অতীতের অমৃতস্পর্শে মধুরতর হইয়া উঠিবে, ভারতবাসী আবার আত্মপ্রতিষ্ঠ জাতি হইতে পারিবে। এখনও বহু গ্রন্থ দেশবাসীর হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে; ঐ সকল গ্রন্থরাশি এখনও পুনরুদ্ধার না করিলে ভবিষ্যতে আর উদ্ধারের সম্ভাবনা থাকিবে না। এই প্রসঙ্গে পাঠকবর্গকে অতি বিনীত ভাবে জানাইতেছি যে মহর্ষি বশিষ্ঠ কৃত ধনুর্ব্বেদ একখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া আমরা উহা বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। আশা করি অতি সত্বরই উহা প্রকাশিত হইবে। সহৃদয় পাঠকবর্গের উৎসাহ পাইলে পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। এই সকল পুস্তক যত অধিক পরিমাণে নানা ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়া প্রকাশিত হইবে ততই দেশের মঙ্গল ইহা ভাবিয়াই স্বল্পশক্তি হইলেও এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

শ্রীঅরুণচন্দ্রসিংহ শর্ম্মা।
(সুসঙ্গ)

ময়মনসিংহ লিলিপ্রেসে শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত দ্বারা মুদ্রিত
ও সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সৌরভ

দশম বর্ষ। | ময়মনসিংহ, আষাঢ়, ১৩২৯ সন। | ষষ্ঠ সংখ্যা।

প্রাচীন গ্রীক জাতির শিক্ষাপ্রণালী।

(২)

আমরা ফাল্গুনের সৌরভে স্পার্টানদিগের শিক্ষাপ্রণালীর কথা লিখিয়াছিলাম, এবার প্রাচীন এথেন্সের শিক্ষাপ্রণালীর কথা বলিব।

প্রকৃত জ্ঞানলাভ করাই প্রাচীন এথেন্সবাসিগণের চরম উদ্দেশ্য ছিল। জ্ঞান অর্থে তাঁহারা কি বুঝিতেন? প্রকৃত জ্ঞানী কাহারা? যাঁহাদের কায়, মন ও আত্মার বৃত্তিগুলি যথাযথরূপে বিকশিত হইত অথচ ইহাদের মধ্যে পরস্পরের আনুপাতিক বিকাশের অভাব হেতু সামঞ্জস্যের অসদ্ভাব হইত না, প্রাচীন এথেন্সবাসিগণ তাঁহাদিগকেই প্রকৃত জ্ঞানী বলিতেন। যাহাতে এক শ্রেণীর লোক অপরাপর শ্রেণীর লোকের উপর যথেচ্ছ আধিপত্য না খাটাইয়া, পরস্পরের সহিত যথাযথ সম্বন্ধ বজায় রাখিয়া, নিজেদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারিত প্রাচীন এথেন্সবাসী পণ্ডিতগণ তৎপ্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি রাখিতেন। এইরূপে দেশে আদর্শ ব্যক্তি ও তদ্দ্বারা আদর্শ সমাজ গঠন করাই তাঁহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। নাগরিকগণের শারীরিক দৃঢ়তা অর্জ্জন, যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন, কর্ত্তব্য সাধন, জ্ঞানলাভ, বিচার ক্ষমতা ও যুক্তি-পরায়ণতা প্রভৃতিই শিক্ষার বিষয়ীভূত ছিল। পক্ষান্তরে এথেন্সবাসিগণ তাঁহাদের বিশ্রামের সময় যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিতেন এবং সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া থাকার দরুণ সামাজিক বিষয় সমূহের মীমাংসা করিয়া সমাজ সংস্কার করিতে পারিতেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ইহাদের শিক্ষা স্পার্টানদের শিক্ষাপ্রণালী হইতে অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল। আদি কবি হোমারের আমলের লোকদের মনোবৃত্তি যেমন ছিল, ইহাদের মনোবৃত্তি সমূহও প্রায় তেমনি ছিল।

এথেন্সবাসিগণের শিক্ষা-পদ্ধতির বিশিষ্টতা।

এথেন্সবাসিগণের শিক্ষাপ্রণালী ছিল প্রাইভেট বা ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত নিভৃত শিক্ষাই ইহারা পছন্দ করিতেন। আড়ম্বরের পক্ষপাতি ইহারা ছিলেন না। সুতরাং এথেন্সবাসিগণের গৃহেই প্রকৃত শিক্ষার বন্দোবস্ত হইত। অপর পক্ষে স্পার্টাবাসিগণ পারিবারিক সুখ শান্তি উপভোগ করিতে পারিতেন না। কারণ তাঁহারা ছিলেন ষ্টেটের অধিভূত যন্ত্র বিশেষ। এথেন্সবাসিগণ পরিবার ধ্বংশ না করিয়া, ব্যক্তিগত গুণ সমূহের বিকাশ দ্বারা প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি গঠন করিবার জন্য পরিবারকেই যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতেন; ইহারা মুক্তভাবে থাকিতে ভালবাসিতেন এবং বাহির হইতে শাসিত না হইয়া আত্মশাসনের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। বালকগণের প্রাথমিক শিক্ষা পিতা মাতার উপরই ন্যস্ত থাকিত। ষ্টেট যেরূপ শিক্ষাপ্রণালীর ব্যবস্থা করিতেন পিতা মাতাও তাঁহাদিগের সন্তানদিগকে ঠিক সেইরূপ ভাবে (সঙ্গীত ও কসরৎ) শিক্ষা দিতেন। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা প্রাইভেট হইলেও ষোড়শ হইতে বিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত বালকদের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে ষ্টেটের অধীনে ছিল। স্পার্টানদের ন্যায় ইহাদের শিক্ষাপ্রণালীও চারি ভাগে বিভক্ত ছিল।

(ক) পারিবারিক শিক্ষা।

কোন শিশুর জন্ম হইলে এথেন্সবাসিগণ পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করিতেন। প্রথম ছয় বৎসর

শিশুটীকে পিতা মাতার তত্ত্বাবধানেই থাকিতে হইত। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাহাকে ধাত্রীর হস্তে সমর্পণ করা হইত। ধাত্রীগুলি সাধারণতঃ ক্রীতদাস শ্রেণীর লোক। এ স্থলে স্পার্টানদের সঙ্গে এথেন্সবাসিগণের কিছু স্বাতন্ত্র্য দেখিতে পাই। তথায় মাতা শিশুকে ধাত্রীর হস্তে সমর্পণ না করিয়া নিজেই তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও পোষণের ভার গ্রহণ করিতেন এবং শারীরিক ও নৈতিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতেন। কিন্তু এথেন্সে শিশুর শরীরের প্রতিই পিতা মাতা সর্ব্বপ্রথম মনোনিবেশ করিতেন এবং ইহাকে সুস্থ ও কর্ম্মঠ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিতেন। প্রথমাবস্থায় ইহাকে দুগ্ধ ও মধু মিশ্রিত খাদ্য দেওয়া হইত এবং খেলিবার জন্য নানাপ্রকারের খেলানা দেওয়া হইত। ইহারা ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে থাকিয়া নানা-প্রকারের খেলা খেলিত। কখন বা মাটিতে গড়াগড়ি দিত। শিশুদিগকে আদব কায়দা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন নেওয়া হইত। উচ্চশ্রেণীর ধনী ব্যক্তিরা বৎসরের অধিকাংশ সময়েই নির্জ্জন আরাম কাননে বাস করিতেন। ইহাতেও ছেলেদের রুচি পরিমার্জ্জিত ও রীতিনীতি সুগঠিত হইত।

(খ) স্কুলের শিক্ষা।

সাত বৎসর বয়সে ছেলেরা স্কুল মাষ্টারের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া তাঁহারই সমভিব্যাহারে স্কুলে যাইত। শিক্ষকগণ সাধারণতঃ ক্রীতদাস শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হইলেও ছেলেরা শিক্ষকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইত। প্রত্যেক পল্লীর ছেলেরা প্রত্যহ প্রাতে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইয়া ছোট ছোট সৈনিকের মত সারি বাঁধিয়া স্কুলে যাইত। প্রচণ্ড শীত ঋতুতেও তাহাদিগকে অতি সামান্য পোষাক পড়িয়া অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় থাকিতে হইত এবং পথিমধ্যে পরস্পরের সঙ্গে ও বাহিরের লোকের সঙ্গে তাহারা সদ্ব্যবহার করিতে বাধ্য হইত। ইহাদের স্কুলের সময় বড়ই সুদীর্ঘ ছিল। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত ইহাদিগকে স্কুলে থাকিতে হইত। এই দীর্ঘ সময়ের উপযোগী সাধারণ খাদ্য ছেলেদিগকে সঙ্গে করিয়াই লইয়া আসিতে হইত। প্রাচীন এথেন্সের ইতিহাসে সাধারণতঃ দুই প্রকারের স্কুলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গীত (music) বিদ্যালয় ও কসরৎ (palætra) বিদ্যালয়। বিদ্যালয়গুলি বেসরকারী ছিল এবং ইহাদের মধ্যে কোন কোনটী নগরের বহির্ভাগে অবস্থিত ছিল। স্কুল গৃহে বিশেষ কোন আসবাব পত্র থাকিত না এবং তাহার কোন প্রাচীর ও থাকিত না। সুতরাং মুক্ত বাতাসে ছেলেরা শিক্ষালাভ করিত। ইহাতে তাহাদের শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য উভয়ই বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিত। ছেলেরা প্রায়ই মাটিতে এবং কদাচিৎ অনুন্নত আসনে বসিত। কিন্তু শিক্ষকের আসন খানা উন্নত থাকিবারই বিধান ছিল।

সঙ্গীত বিদ্যা ও ব্যায়াম সাধারণতঃ এই দুইটী বিষয়ই পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এই দুইটী বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া হইত। তাঁহারা বলিতেন-শরীরের শিক্ষার জন্য ব্যায়াম ও আত্মার বিকাশের জন্য সঙ্গীত প্রয়োজন।" এসম্বন্ধে প্লেটো বলিতেন—সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার তালমানের জ্ঞান জন্মে এবং বিভিন্ন প্রকারের রসোদয় হয়। তাহাতে আত্মার কমনীয়তা ও কোমলতা বর্দ্ধিত হয়। জীবনে সৌন্দর্য্য ও কোমলতা এই দুইটী গুণের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক।

ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ইহারা শারীরিক ও মানসিক এই উভয় প্রকার বৃত্তিগুলিকেই সমানভাবে পরিমার্জ্জিত করিতে প্রয়াস পাইতেন। ইহার পর ঐতিহাসিক যুগে ক্রমে কবিতা, নাটক, ইতিহাস, বাগ্মীতা, বিজ্ঞান প্রভৃতিও পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। কবিতা রচনা করা ও কবিতা পাঠ করা সঙ্গীতেরই অঙ্গীয় ছিল।

কিরূপে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হইত? ছেলেরা হোমার ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ কবির কবিতা মুখস্ত করিয়া রাখিত। শিক্ষক এগুলির ব্যাখ্যা করিয়া ছেলেদিগকে বুঝাইয়া দিতেন। তৎপর বীণা যন্ত্রের সংযোগে ছেলেরা ঐ কবিতা সমূহ গান করিত। খৃ পূঃ ৬০০ অব্দে লিখন ও পঠন প্রণালী তথাকার স্কুল সমূহে প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তখনও সঙ্গীত বিদ্যার উৎকর্ষ সাধনেই বালকদিগের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইত। বাদ্য যন্ত্রের মধ্যে বীণা সুপরিচিত ছিল। বংশী বা অন্য কোন প্রকার বাদ্যযন্ত্র পরিচিত ছিল না।

কবিতা ও সঙ্গীত ব্যতীত সঙ্গীত শিক্ষক কিছু কিছু লিখন, পঠন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডের সাহায্যে অল্প অল্প গণনা শিক্ষা দিতেন।

শরীরের উৎকর্ষ সাধন বিষয়ক তাবৎ ক্রিয়াকেই গ্রীকগণ ব্যায়াম বা কসরৎ বলিতেন। এক্ষেত্রেও তাঁহাদের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ক্রীড়া প্রদর্শক পালোয়ান প্রস্তুত করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। ক্ষিপ্রতা, উন্নত চালচলন, বল, বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য অর্জ্জনের জন্যই গ্রীকগণ ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। ব্যায়াম দ্বারা ধৈর্য্য, ক্ষমা, তিতিক্ষা, সাহসিকতা, রাজভক্তি, স্বদেশ প্রেমিকতা, ও পরহিতৈষণা প্রভৃতি লাভ হইত। ব্যায়াম শিক্ষার জন্য ইহারা কুস্তি বা মল্লগিরি, বর্শা ও (সুদর্শন) চক্র নিক্ষেপণ, এবং দৌড়াদৌড়ি ও লাফালাফি প্রভৃতির অনুশীলন করিতেন।

সঙ্গীত ও ব্যায়াম ব্যতীত প্রাচীন গ্রীকগণ অন্য একটী বিষয়েরও অনুশীলন করিতেন। তাহা নৃত্য। শরীরের জন্য ব্যায়াম ও মনের জন্য সঙ্গীত। নৃত্য যেন এই উভয়ের সংযোজনী রজ্জু। নৃত্যেও আত্মা এবং মন এই উভয়ের পরিচালনা ও উৎকর্ষ সম্পাদিত হয়। ধর্ম্মকার্য্য, নাগরীকতা এবং যুদ্ধাভিযান প্রভৃতি উপলক্ষেই নৃত্য শিক্ষা দেওয়া হইত।

(গ) কলেজ।

ষোড়শ বর্ষ বয়ক্রম কালে এথেন্সবাসী যুবকেরা মল্লাগারে প্রবেশ করিত। উহাই ছিল যেন তাহাদের কলেজ। ঐ মল্লাগার সম্পূর্ণরূপে ষ্টেটের অধীনছিল। বালকেরা এই বয়সে স্কুলমাষ্টারের অধীনতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। সুতরাং এখন হইতে আর তাহাদিগকে গুরুমহাশয়ের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া লিখন, পঠন ও সঙ্গীত চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিতে হইত না। প্রতি নগরের বাহিরে দুইটী মল্লাগার থাকিত। একটী খাটি এথেন্সবাসিগণের জন্য, অন্যটী বর্ণসঙ্কর বা মিশ্রবর্ণের জন্য। মল্লশিক্ষক যুবকদিগকে বিবিধ প্রকারের মল্ল ব্যায়াম শিক্ষা দিতেন, এক বিদ্যালয়ে একজন করিয়া সফ্রোনিষ্ট (Sophronist) বা নীতি শিক্ষাদাতা নিযুক্ত থাকিতেন।

যুবকেরা স্বাধীন ভাবে লাফালাফী করিয়া যাহাতে দুর্ব্বিনীত না হইয়া উঠে এই নীতি শিক্ষাদাতা শিক্ষক তাহা দেখিতেন। এই যুবকদের বেশ স্বাধীনতা ছিল; তাহারা নাট্যশালা ও অন্যান্য সর্ব্ব সাধারণের গন্তব্য স্থলে স্বাধীন ভাবে গমনাগমন করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী ছিল। কোন এথেন্সবাসী যুবক এই স্বাধীনতার অপব্যবহার করিলে তাহাকে বিচারালয়ে জবাবদিহি হইতে হইত। ঐ যুবক শাসনের বিচারালয়ের নাম ছিল এরিওপেগাসের বিচারালয়। এইরূপে নাগরিকতা সম্বন্ধীয় বিবিধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যুবকদিগকে ঢাল ও বর্শায় সুসজ্জিত হইয়া মুক্ত নাগরীকের সম্মানীত তালিকা ভুক্ত হইতে হইত।

তখন তাহারা নাগরীক। তাহারা তখন সম্পূর্ণ মাত্রায় ষ্টেটের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিত। ইহার পরও দুই বৎসর তাহাদিগকে সংযত ভাবে কঠোর নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিতে হইত। প্রথম বৎসর তাহাদিগকে এথেন্সের নিকটবর্ত্তী থাকিয়া অস্ত্র সন্ধান ও যুদ্ধকৌশল শিক্ষা করিতে হইত। কিন্তু তখনও নগরের সাধারণ উৎসব ও আমোদ প্রমোদে যোগদান করিতে তাহাদিগের নিষেধ ছিল না। বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সকলকেই সম্মিলিত জনগণের সম্মুখে সৈন্য পরিচালনা ও কসরৎ সম্বন্ধে পরীক্ষা দিতে হইত। দ্বিতীয়-বর্ষে দুর্গে থাকিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে সৈনিকের কাজ করিতে হইত। দ্বিতীয় বর্ষের অন্তে অন্য একটী পরীক্ষায় পাশ করিতে পারিলে সম্পূর্ণ নাগরিকতার অধিকার লব্ধ হইত।

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্পূর্ণ নাগরিকতার অধিকার পাইয়াও শিক্ষার সমাপ্তি ছিলনা অর্থাৎ প্রাইভেট ভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য ইহারা জীবন যাপন করিতে পারিতেন না। নগরবাসিগণের জীবনের কর্ত্তব্য সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা করিতে হইত। অর্থাৎ গ্রীকগণের বিশ্ববিদ্যালয়ও যাহা ষ্টেটও তাহা। বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে ষ্টেটকে পৃথক করিতে পারা যাইত না। আরও বিশদরূপে বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে এথেন্স-বাসী গ্রীকগণের সমস্ত জীবনই ছিল শিক্ষার এক লীলা ক্ষেত্র। তাহাদের ষ্টেট ও সামাজিক জীবন উভয়ই ছিল শিক্ষাগার—The greek university was the state, and the state was the university

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

স্মৃতির আরতি।

সাহিত্য চর্চ্চার স্পৃহা ছোটবেলা হইতেই জন্মিয়াছিল, আমরা শৈশবেই কবি হইয়া উঠিয়াছিলাম। আমাদের সেকালে "সাহিত্যিক" বলিয়া কোন কথা ছিল না। যিনি দুই একটা বাজে কথা বানাইয়া লিখিতে পারিতেন তাঁহাকেই সেকালে কবি বলা হইত। তাহার কারণ যাঁহারা 'কবি' বলিতেন, তাঁহারা ছিলেন আরো সেকালের; সেই আরো সেকালে কবিতা ছাড়া গদ্য লেখার কোন রেওয়াজই ছিল না।

আমাদের কবি হইবার সুযোগ ছিল বিস্তর। প্রথম সুযোগ ছিল—আমরা বাল্যকালে যে স্কুলে পড়িতাম, তাহার প্রধান শিক্ষক ছিলেন তখনকার একজন প্রসিদ্ধ কবি, ৺দীনেশচরণ বসু এবং হেডপণ্ডিত ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ পুস্তক লেখক—বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরী। এই মাইনর স্কুলটী যখন কায়া পরিবর্ত্তন করিয়া এণ্ট্রেন্স স্কুলে পরিবর্ত্তিত হইল, কালের চক্রে ঘুরিয়া আমরাও আসিয়া কৈশোর জীবনে পুনরায় সেই তীর্থে সম্মিলিত হইলাম। তখন সেখানে চাঁদেরহাটের ন্যায় কবিরহাট। সে স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন কবি, সেকেণ্ড মাষ্টার কবি—তিনি শুধু বাঙ্গালায় নহে, চসমা চখে দিয়া ইংরাজীতেও কবিতা লিখিতেন। তবে তাঁহারা খুব বড় কবি ছিলেন না। কিন্তু আমাদের তৃতীয় শিক্ষক ছিলেন—সেই দীনেশচরণ বসু মহাশয়। দীনেশবাবুর তখন খুব নাম ডাক—"কবিকাহিনীর" কবি বলিয়া বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশে তাহার সম্মানিত স্থান। আমাদের হেড্ পণ্ডিত ছিলেন পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন; তাঁহার রচিত 'ব্যাকরণ মঞ্জুষা, তখন মাত্র বাহির হইয়াছে—তাহার পরিশিষ্টভাগে ছিল—অলঙ্কার প্রকরণ; সুতরাং আমরা মনে করিতাম, তিনিও ছিলেন কবি; তারপর দ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন—কাব্যর গোবিন্দচন্দ্র দাস।

এইরূপ কবি যোগ পাইয়া আমরা দলে দলে কবি হইয়া পড়িয়াছিলাম। উপরের শ্রেণীর যুবকেরা দীনেশবাবুর ছন্দ অনুকরণ করিয়া কবিতা লিখিতেন, নিম্ন শ্রেণীর কিশোরেরা গোবিন্দদাসের ছন্দ অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিত। প্রতি শনিবার স্কুলের ঘণ্টার পরে ক্লাশে ক্লাশে জ্ঞানপ্রদায়িনী সভা হইত, আর কবিতা পাঠের ছড়াছড়ি পড়িয়া যাইত। যাহারা নিজে চেষ্টা করিয়া সফলকাম হইত না, তাহারও পরকে দিয়া লিখাইয়া আনিইয়া সভায় দাঁড়াইয়া তাহা পাঠ করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিত না। বাতিক এমনই আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছিল।

হেডমাষ্টার মহাশয় মাঝে মাঝে অবসর ক্রমে হটাৎ এক এক শ্রেণীতে যাইয়া উপনীত হইতেন এবং মাষ্টার ও ছাত্রদিগের অবস্থা পরীক্ষা করিতেন। তিনিও তাঁহার ছাত্রদিগের কাব্যপিপাসার খবর কিছু কিছু রাখিতেন; এক দিন ভূগোল পড়ার সময় আসিয়া কবিতাতে ভূগোল মনে রাখিবার পদ্ধতি দেখাইয়া গেলেন।

> উত্তরেতে হিমালয়—জয় ভারতের জয়।
> পশ্চিমেতে সুলেমান—দেশহিতে দাও প্রাণ।
> রাজস্থানে আরাবলি—শিক্ষাকর আত্মবলি!
> পূবে পাহাড় মণিপুর—অলসতা কর দূর!
> *　*　*　*　*　*
> গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র বঙ্গে—পরমেশ ডাক রঙ্গে।
>
> ইত্যাদি

নিরীহ স্বভাব—জেকেট্ আস্তিন পরা চটিজুতা ধারী পণ্ডিত মহাশয়দিগকে যে কঠোর স্বভাব ভ্রুকুটি-কুটীল-চাহনী কোট-বুটধারী মাষ্টার মহাশয়দিগের ন্যায় তেমন ভয় করিয়া চলিতে হয় না বালকদিগকে একথা কাহারও শিখাইয়া দিতে হয় না, আমাদের সে জ্ঞান বাল্যকাল হইতেই ছিল। আমাদের পণ্ডিত মহাশয়দিগকেও আমরা তেমন ভয় করিতাম না। বরং তৎ পরিবর্ত্তে আব্দার করিতাম তাঁহাদের নিকট বড় বেশী। হেডমাষ্টার কবিতায় ভূগোল পড়াইয়া গেলে সকলেরই বেশ স্ফুর্ত্তি বোধ হইতে লাগিল। কোন কোন ছাত্র আরও দুই একটা নামের মিল জুটাইয়া কৃতিত্ব প্রকাশের চেষ্টা করিল। পরের ঘণ্টায় গোবিন্দদাস মহাশয় আসিলে আমরা বলিলাম—"পণ্ডিত মহাশয় কবিতাতে পড়াইতে হইবে।"

পণ্ডিত মহাশয় একদিন কবিতাতেই পড়াইলেন। ভারত ইতিহাসের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঘটনাগুলির উল্লেখে একটী সুন্দর কবিতা রচনা করিয়া আনিয়া তাহা দুটী ছাত্রকে দিয়া প্রশ্নোত্তর ছলে পাঠ করাইলেন।

প্রশ্ন—দুঃখিনী ভারতী তাই আছে কি স্মরণ?
উত্তর—নিত্য করি যার তরে অশ্রু বিসর্জ্জন।
প্রশ্ন—আছে মনে সত্যসন্ধরাম রঘুবীর?
উত্তর—ভুলিনি সে পিতৃভক্ত প্রিয় জননীর।

* * *

নীল নদীর প্লাবন-স্পর্শ লাভ করিয়া যেমন সাহারার উত্তপ্ত মরু হৃদয় স্বর্ণ-শীর্ষ শ্যামল ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে আমাদের কাব্য ভাবহীন নিরস হৃদয়ও সেইরূপ এই সকল মহাজনের সঙ্গ-সংস্পর্শে উথলিয়া উঠিয়াছিল। আমরা দল বাঁধিয়া কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।

ফলে আমাদের ১ম শ্রেণীর ছাত্র পরেশ ঘোষ দীনেশ বাবুকে দেখাইয়া একখানা উপন্যাস ছাপাইয়া ফেলিলেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র বাবু গোলকচন্দ্র দত্ত মহাশয় "কবিতাকুসুম" নামে একখানা কবিতা পুস্তক বাহির করিলেন। তাহা দেখিয়া আমাদের সতীর্থ উপেন্দ্র রায় মহাশয় "ভারতমাতার খেদ" নামক দীর্ঘ কবিতা লিখিয়া কালীনারায়ণ সন্যাল মহাশয়ের ছাপাখানায় ঘন ঘন যাতায়াত করিতে লাগিলেন

এই সময় আমাদের স্কুল ছাড়া বাহিরে যে কবি-সাহিত্যিকের অসদ্ভাব ছিল, তাহা নহে। বলিতে গেলে এই সময় সাহিত্যালোচনা বিষয়ে ময়মনসিংহে Elizabethan Period. ভারতমিহির কার্য্যালয়ে বাবু কালিনারায়ণ সান্যালকে ঘেরিয়া লইয়া তখন বাবু অনাথবন্ধু গুহ, ৺অমরচন্দ্র দত্ত, বাবু শ্রীনাথ চন্দ, কবি আনন্দচন্দ্র মিত্র, দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য, যাদবচন্দ্র লাহিড়ী প্রভৃতি সাহিত্যের আরতি করিতেছিলেন।

এই সকল রথী ও মহারথীগণের আদর্শ পাইয়া যে কেবল কিশোর ও যুবকেরাই বাতিকগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহা নহে; দীনেশ বাবুর "কাব্যকাহিনী" ও আনন্দ মিত্রের "মিত্র কাব্য" দেখিয়া আমাদের হেড পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ও "কবিতা কৌমুদী" নামে এক খানা "কাব্যগ্রন্থ" বাহির করিয়া ফেলিলেন।

পণ্ডিত মহাশয়কে সকলেই শাঁকরণ মঞ্জুষার পণ্ডিত বলিয়া সম্মান করিত। মঞ্জুষার ঘনান্ধকার গহ্বর হইতে যে কাব্যের কৌমুদী-প্রভা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে, তাহা কেহই ভাবে নাই। আমরা বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সে পুস্তকখানা দেখিলাম এবং তাহার দুই একটা মজার কবিতা হাতে তালি দিয়া পাঠ করিতে অভ্যাস করিলাম। তাহার একটী কবিতা আজও স্মৃতির পরদায় অঙ্কিত রহিয়াছে—

"যদি পশু হইতাম, লেজ নাড়িতাম, মসা তাড়িতাম;
তৃণ দল ঘনশ্যাম, খাইতাম অবিরাম।
কে চায় মসারী, কে চায় বাসর?"

* * * * *

তখন জাতীয় মহাসভার জন্ম হয় নাই, দেশের রাজনৈতিক হাওয়া খুব নিস্তেজ; এই নিস্তেজ জল বায়ুতেও সেকালের কবিরা স্বাধীনতা ও পরাধীনতার কবিতাই বেশী লিখিতেন, ভাষার ভিতর দিয়া তুবড়ী ছুটাইয়া যাইতেন। পণ্ডিত মহাশয়ের এই কবিতাটীও বোধ হয় মানবের পরাধীনতার বিষয় লইয়া লিখিত হইয়াছিল। আমরা কিন্তু কবিতাটির বিষয় বিভব সম্বন্ধে ততদূর না তলাইয়া কেবল—"যদি পশু হইতাম, লেজ নাড়িতাম, মসা তাড়িতাম" এইটুকু লইয়াই আনন্দে মাতিয়া গেলাম। এক এক জনে এক এক পদ উচ্চারণ করিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে শুনাইয়া পাঠ করিতাম; পণ্ডিত মহাশয় না জানি তাহাতে কত আনন্দ উপভোগ করিতেন!

(২)

আমরা স্বর্গীয় দীনেশচরণ বসু ও গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়কে অতি নিকটে পাইয়াছিলাম বটে কিন্তু তাঁহাদিগকে খুব বড় কবি বলিয়া তখন জানিতাম না। উপেন্দ্র রায় আমাদের ক্লাসের মধ্যে প্রবীন ছাত্র ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভিতর প্রকৃতই কবিত্ব ছিল। আমরা তাহাকে অন্ধভাবে অনুকরণ করিয়া চলিতাম; তিনি যাহা বলিতেন বেদবাক্য জ্ঞান করিতাম। তিনি একদিন দীনেশবাবুর একটী কবিতার চরণ আওরাইয়া আমাদিগকে বলিলেন—দীনেশ বাবু বাঙ্গালার তৃতীয় কবি। প্রথম হেমবাবু, দ্বিতীয় নবীন বাবু, তৃতীয় আমাদের তৃতীয় শিক্ষক বাবু দীনেশচরণ বসু।

শুনিয়া আমরা অবাক হইয়া গেলাম। এত বড় কবি আমাদের দীনেশ বাবু! কেমন করিয়া?

উপেন্দ্র গম্ভীরভাবে আমাদিগের নিকট সে ইতিহাস উদ্ঘাটন করিয়া বলিলেন—১৮৭৭ সনে প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের আগমনে যে সকল কবি কবিতা লিখিয়াছিলেন তাঁহাদের পরীক্ষা হইয়াছিল। সে পরীক্ষায় হেম বাবুর কবিতা—"ভারত ভিক্ষা" হইয়াছিল প্রথম, নবীন বাবুর "ভারতউচ্ছ্বাস" দ্বিতীয়, দীনেশ বাবুর "উদ্বোধন" তৃতীয় ও রাজকৃষ্ণ রায়ের "ভারতে যুবরাজ" চতুর্থ স্থান লাভ করিয়াছিল।

দীনেশ বাবুর সেই উদ্বোধন কবিতাটী ছাপা হইয়াছিল। উপেন তাহার সযত্ন রক্ষিত খাতা বাহির করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়াছিলেন; আমরা তাহা নকল করিয়া লইয়া মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলাম। কবিতার প্রথম কয়েকটী লাইন এখনও আমাদিগের স্মরণ আছে। দীনেশ বাবু বর্তমান যুগের তরুণ পাঠকগণের নিকট অপরিচিত, তাই তাঁহার কাব্য প্রতিভার পরিচয় প্রদান জন্য যে কয়েক ছত্র আমাদের স্মরণ আছে, নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"জাগো মা আমার! গোধূলী আইল,
পশ্চিমে দীনেশ গড়ায়ে পড়িল।
এ কাল নিদ্রায় কতকাল আর
রবে অচেতন; জাগো মা আমার!
জাগো মা! কাতরে ডাকিছে তনয়।
কতদিন হ'ল ঘুমাইলে বল?
কত যুগ কাল সাগরে ডুবিল?
এ কেমন ঘুম ঘুমাইছ মাগো
শুন কথা মাগো একবার জাগো!

* * * *

এ কিগো তোমার নিদ্রার সময়?
আজি শুভ নিশি, জাগো মা আমার!
তোমাকে দেখিতে দেখ রাজকুমার
হাঙ্গর কুম্ভীর, মগ্ন গিরিময়
সাত সমুদ্রের নাহি করি ভয়
শ্বেত দ্বীপ হতে এলেন আপনি!"

কবিতার শেষ চারণটী ছিল এইরূপ:—

"আশীর্বাদ করি ভারত ভ্রমিয়া
নিরাপদে যাও স্বদেশে ফিরিয়া;
কহিও মায়েরে—"ভারত দুঃখিনী
অশ্রুজলে ভাসি কহিল—জননী
ভারতের আশা করো না নির্ব্বাণ।"

প্রকৃত প্রস্তাবে কবিদিগের তেমন কোন পরীক্ষা হইয়াছিল কিনা, আজ পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারি নাই। নবীন বাবুর "আমার জীবন" পাঠ করিয়া ইহার আংশিক বিবরণ অন্যরূপ জানিয়াছি। যাহা হউক, তখন উপেন্দ্রের কথা শুনিয়া ও "জাগো মা আমার" কবিতা পাঠ করিয়া দীনেশচরণের চরণে আমাদের মস্তক শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে এত অবনত হইয়া পড়িয়াছিল যে উপেন্দ্রের সঙ্গে যাইয়া এক দিন দীনেশ বাবুকে তাঁহার বাসায় দেখিয়া আসিয়াছিলাম।

দীনেশ বাবু থাকিতেন বাবু অনাথবন্ধু গুহের প্রাচীন বাসায়—এখন যে স্থানে ঠাকুর ষ্টেটের কাছারী। খুব মনে আছে—প্রাতঃকালে গিয়াছিলাম। আমরা গিয়া দেখিলাম, দীনেশ বাবু তাঁহার বিছানার সম্মুখে কুসুমস্তবকে সজ্জিত টেবিলের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া মুদ্রিত নয়নে উপাসনা করিতেছিলেন। আমরা বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। উপাসনা অন্তে তিনি একতারা বাজাইয়া গাইলেন—

"শেষের সে দিন মন কররে স্মরণ, ভবধাম যবে ছাড়িবে।"

উপেন্দ্র বলিয়াছিলেন—এই সঙ্গীতটী দীনেশ বাবুর নিজের রচিত। * *

তখন ইংরেজী জানা অধিকাংশ লোকেই চক্ষু বুজিয়া উপাসনা করিতেন। আমরা ৺আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের স্কুলে আসিয়া ছাত্র অবস্থাতেই চক্ষু বুজিয়া উপাসনা করিতে শিক্ষা করিয়াছিলাম। তাহাতে যে মনে সান্ত্বনা পাইতাম, সে কথা বলাই বাহুল্য।

এই সময়ই আমাদের স্কুলে বার্ষিক উৎসবের [Aniversarya] সূত্রপাত হয়। শুনিয়াছি ইহার পূর্ব্বে জেলা স্কুলে Aneversary হইয়াছিল। জেলা স্কুলের শিক্ষক ৺কবি আনন্দচন্দ্র মিত্র জেলা স্কুলের সঙ্গীত রচনা করিয়া দিতেন। এই বৎসর আমাদের স্কুলে উৎসবের ধুম পড়িলে ছাত্র শিক্ষক সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের সেই ভূগোলের কবিতা ও কবি গোবিন্দদাসের ইতিহাসের কবিতা নূতন আকারে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া উৎসবে অভিনিত হইল। তিনটী বালক প্রশ্নোত্তরছলে রাগিণী সহকারে তাহা অভিনয় করিয়াছিল। এই উপলক্ষে দীনেশ বাবু 'আর্য্যনাম' নামে একটী নূতন কবিতা রচনা করিয়া দিয়াছিলেন; একজন নবীন কিশোর কবি তাহা বীররসের সহিত অভিনয় করিয়া দীনেশ বাবুর নিকট প্রচুর ধন্যবাদ ও আদর লাভ করিয়াছিল। পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সেই কবিতাটী অবশ্যই কাহারও পাঠের বিষয় হইয়াছিল না, হইলে বোধ হয় অভিনয় মন্দ হইত না। তাঁহার রচিত একটী সংস্কৃত নান্দী একটী শিশু অতি সুন্দর রূপে আবৃত্তি করিয়াছিল। উপেন্দ্র রায় তাঁহার যে "ভারতমাতার খেদ" লইয়া ভারতমিহির প্রেসে যাতায়াত করিয়াছিলেন, তাহা এখানে পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়া আমাদিগের নিকট হইতে প্রচুর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন।

এই উৎসবের সঙ্গীত গুলি রচনা করিয়াছিলেন দীনেশ বাবু ও গোবিন্দদাস। দীনেশ বাবুর সঙ্গীতটী ভুলিয়া গিয়াছি; গোবিন্দ দাসের একটী সঙ্গীত এই নষ্ট স্মৃতির কোণে আজও স্পষ্ট ধ্বনিত হইতেছে। তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম।

"বহুদিন হতে রে ভাই শ্রীহীনা অমরাপুরী।
আগের নাহি সে কিছু ঐশ্বর্য্য রূপ মাধুরী।
* * * *
সহেনা পরাণে আর, এ যাতনা অনিবার
এস ভাই একবার সবে প্রাণপণ করি।
ভাগ্যসিন্ধু দেবতার বহু রত্ন গর্ভে তার
উদ্দাম মন্দরে মথি আপার বাসুকী ধরি।
উঠিবে সে ঐরাবত, ধন রত্ন শত শত
লইয়া অমৃত কুম্ভ উঠিবে সে ধন্বন্তরী।
যদি উঠে হলাহল করিব কণ্ঠের তল
বলনা কি ভয় তাহে? প্রতিজ্ঞা বাঁচি কি মরি।"

কবিতাটী স্কুলের কোন সভায় গীত হইবার উপযোগী বলিয়া মনে না হইলেও এ কথা সত্য যে সেই অন্ধকার সেকেলে যুগে "দেশমাতৃকার পূজা" প্রভৃতির ন্যায় মুখভরা বড় বড় কথা গুলির সৃষ্টি না হইলেও সেই অন্ধ যুগের কূপমণ্ডুক কবিরা স্বদেশ ও ভারতমাতা সম্বন্ধে এত জাগ্রত ছিলেন যে শয়নে উপবেশনে, আমোদে আহ্লাদে, বিদায়ে মিলনে সর্ব্বত্র সকল অনুষ্ঠানেই ভারতমাতার দুঃখের অবস্থা কীর্ত্তন ব্যতীত তাঁহাদের যেন অন্য বিষয় লিখিবার বড় বেশী কিছু ছিল না। অন্ততঃ গোবিন্দদাসের সম্বন্ধে তো একথা খুবই বলা যাইতে পারে।

বৎসর ফিরিয়া আসিলে পুনরায় জেলা স্কুলে উৎসবের আয়োজন হইল। তখন জেলা স্কুলের শিক্ষক কবি আনন্দচন্দ্র মিত্র বিলাতে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন; তাহাদের সঙ্গীত লিখিবে কে? তখন সকলেরই দৃষ্টি পড়িল, উদীয়মান কবি গোবিন্দ দাসের উপর। গোবিন্দদাস জেলা স্কুলের জন্য যে সঙ্গীতটী রচনা করিয়াছিলেন তাহাও ঐ ভাবেরই হইয়াছিল। জেলার জজ সভার সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। আমরা সে সঙ্গীতটীরও যতদূর স্মরণ আছে, নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিয়া আজিকার মত বিদায় হইলাম।

"ভারত সৈরিন্ধ্রী বেশে আছে বিরাটের ঘরে,
দুর্ভাগ্য পাণ্ডব পঞ্চ তাহার দাসত্ব করে।
নাহি মান অপমান, নাহি সে কর্ত্তব্য জ্ঞান,
নাহি সে পাণ্ডব তেন, আছে দাস চিরতরে।
মনুষ্যত্ব নাহি আর, ক্লীবত্ব করেছে সার,
দাসত্বের বোঝা বয়ে * * *

শ্রীঃ—

ছোট-বড়।

সতীর হাতের সোণার কাঁকন
কহিছে তাঁহারে কেঁদে—
লোহার সনেতে কেন গো আমায়
রাখিয়াছ তুমি বেঁধে?
নোঙ্‌রা লোকের সঙ্গ করা সে
বড্ডই অপমান!
খুলে ফেলে দাও হাতের নোয়াটা,
বাড়ুক আমার মান।

চম্‌কি উঠিয়া কহিলেন সতী—
শত্রুর, মুখে ছাই!
দোহাই আমার সাথের সাথী যে;
তোরে আমি নাহি চাই!

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।

স্নেহেরদান।

(১১)

তখন নৈহাটী ষ্টেশনে over bridge হয় নাই। সমস্ত গাড়ীই সম্মুখের প্লেটফরমে আসিয়া লাগিত। সেখান হইতে যাত্রীদিগকে ষ্টেশন গৃহের ভিতর দিয়া যাইয়া রাস্তায় বাহির হইতে হইত।

মাখন ও তাহার পিতা ষ্টেশন গৃহ হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় পড়িতেই একটী ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। যুবকটীর পায়ে চটী জুতা, গায়ে পরিধান বস্ত্রের অঞ্চল ডান হাতের নীচ দিয়া ঘুরাইয়া বাম স্কন্ধে স্থাপিত। স্কন্ধের উপর দিয়া তাহার বর্ণ-পরিচয় প্রকাশ পাইতেছিল। যুবক প্রাতঃ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল।

তাঁহাদের পিতা পুত্রের অঙ্গেও সামান্য উত্তরীয় ব্যতীত বাহুল্য বস্ত্র-পোষাক ছিল না। সেই সামান্য উত্তরীয়ের ভিতর দিয়াই তাহাদেরও ব্রাহ্মণ্য চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছিল।

মাখনের চেহারাতে যে মাধুর্য্য ছিল, তাহার আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া ছেলেটী নিজ হইতে আসিয়া মাখনকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কোথায় যাইতে চান?"

মাখন তাহাকে সমবয়স্ক দেখিয়া বলিল—"গঙ্গার তীরে কেবলরাম চক্রবর্ত্তীর বাসায় যাইব—সে কোন দিকে?"

যুবক সাগ্রহে বলিল—"আপনি গঙ্গাস্নান করিবেন বোধ হয়, তাই কেবল চক্রবর্ত্তীর খোঁজ করিতেছেন; না?"

মাখন—"হাঁ; আপনি চিনেন কি তাঁর বাসা?"

যুবক হাসিয়া বলিল—"চলুন আপনাকে সে দিকে লইয়া যাই।"

যুবক আগে আগে চলিল; পিতা পুত্র তাহার পশ্চাতে চলিলেন। মাখনের হাতে কম্বল জড়ানো কেনভাসের একটা বেগ তাহার পিতার হস্তে একটী গলায় দড়ি লাগানো ঘটী অপর হস্তে বাঁশের লাঠি।

দুচার পা চলিয়াই যুবকটী মাখনকে তাহার বাড়ী ঘরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। মাখনও জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিয়া প্রতিপ্রশ্ন করিল। এরূপে চলিতে চলিতে উভয়ের মধ্যে অনেক আলাপ হইল এবং উভয়ই জানিল যে তাহারা উভয়ে একই শ্রেণীতে পড়ে।

যুবকটী যখন জানিল যে মাখনও এণ্ট্রেন্স ক্লাশেই পড়ে, তখন তাহার সহানুভূতি পূর্ণভাবে প্রকাশ করিয়া সে বলিল "দেখুন, কেবল চক্রবর্ত্তীর সহিত আপনাদের জানাশুনা আছে কি? না, নাম শুনিয়া যাইতেছেন?"

মাখন পিতারদিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিল।

বলরাম উত্তর করিলেন—"তিনি আমাদের দেশের লোক, এখানে আসিয়া আমাদের অঞ্চলের সকলি তথায় আশ্রয় লইয়া থাকেন; সেই পরিচয়ে আমরাও সেইখানে থাকিব বলিয়া স্থির করিয়াছি। অন্য পরিচয় নাই।"

বলরামের দিকে চাহিয়া যুবকটী বলিল—"তবে আপনাদের সেখানে না যাওয়াই ভাল। আমাদের বাড়ীতে চলুন, আমরা পুরোহিত ডাকিয়া আপনার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করাইয়া দিব। শ্রাদ্ধ যখন কাল, তখন অনর্থক একটা দিন হোটেল খানার বিশ্রী আড্ডায় কাটাইবেন কেন?"

বলরামের মনে বিপদের আশঙ্কা ধীরে ধীরে উঁকি মারিতেছিল। কি জানি কোন্ অজানা লোকের বাড়ীধরা ছেলে শেষটায় ভুলাইয়া নিয়া কোন শকটে ফেলে। তিনি বলিলেন—"না বাবা, তুমি আমাদিগকে চক্রবর্ত্তীর বাড়ীই দেখাইয়া দাও; সেখানেই সেরূপে হয় সুবিধা করিয়া লওয়া যাইবে।"

মাখন একটু মোলায়েম করিয়া বলিল—"চলুন আপনি আমাদিগকে কেবল রামের বাড়ী দেখাইয়া দিবেন, তারপর আমি আপনার সঙ্গে আপনাদের বাড়ীতে যাইব।"

অতি অনিচ্ছার সহিত যুবক তাহাদের কথায় সম্মতি দিয়া চলিল। তাহারা বড় রাস্তায় সোজা গঙ্গার দিকে আসিয়া তারপর বামদিগের ছোট গলিতে ঢুকিয়া চক্রবর্ত্তীর বাসায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

কেবলরাম ছেলেটীকে দেখিয়া খুব শ্রদ্ধার সহিত বলিলেন—"সন্তুবাবু যে— যাত্রী নিয়ে উপস্থিত..."

যুবকটীর প্রতি কেবলরামের শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখিয়া পিতাপুত্র উভয়ই সন্তুবাবুর প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল হইয়া পড়িলেন।

সন্তুবাবু মাখনের হাতের ব্যাগটী নিজের হাতে লইয়া তাহা একটা কেরাসিনের বাক্সের উপর রাখিয়া চক্রবর্ত্তীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ইনি আমার বন্ধু ব্যক্তি চক্রবর্ত্তী মহাশয়, আমাদের বাড়ী যাইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, এখানেই থাকিবেন।"

কেবল চক্রবর্ত্তী হুকা টানিতেছিলেন, হুকাটা বলরামের দিকে হাত বাড়াইয়া ধরিয়া "বলিলেন—আসুন— বসুন—তামাক খান— বেশ সুখের কথা; ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণ গতি..."

(১২)

সন্তুবাবুর চেষ্টায় ও উদ্যোগে অতি সামান্য ব্যয়ে মাখন বৎসরান্ত শ্রাদ্ধ সমাপন করিল। সন্তুর খুড়া মহাশয় নিজে উপস্থিত থাকিয়া শ্রাদ্ধ কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিলেন।

চক্রবর্ত্তীর কুঞ্জ যে আড্ডা বিশেষ—পিতাপুত্র একত্র বাসের অযোগ্য, তাহা বুঝিয়া মাখন পিতার সম্মতি লইয়া সন্তুবাবুদের বাড়ীতেই রাত্রি যাপন করিল।

যাত্রার দিন সন্তুবাবু তাহাদিগকে একেবারে গয়ার টিকিট করিয়া গাড়ীতে রওয়ানা করিয়া দিয়া গেল। গয়ায় পঁহুছিয়া চিঠি লিখিতে এবং গয়া হইতে ফিরিবার পথে নৈহাটী নামিয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে সন্তুবাবু তাহাদিগকে অনুরোধ করিয়া দিল। সন্তুর খুড়া মহাশয় তাঁহার এক গয়াপ্রবাসী বন্ধুর নিকট একখানা পরিচয় পত্রও দিয়াছিলেন।

সেই চিঠির সাহায্যে গয়ার কার্য্যও তাহাদের নিরাপদেই শেষ হইল। অতি সামান্য দক্ষিণার সুফল বা সফল লাভ করিয়া হাতে কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত হওয়ায় বলরামের বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা দর্শনের সাধ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

সুতরাং ত্রিরাত্রি গয়াধামে বাস করিয়া পিতাপুত্র ৺কাশীধামে চলিয়া গেলেন।

মণিকর্ণিকার ঘাটে ভক্তি ভরে স্নান করিয়া পিতাপুত্র বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা দর্শন করিলেন। অন্নপূর্ণার বাড়ে ভীষণ জনতার মধ্যে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া বলরাম আকুল স্বরে চীৎকার করিয়া তাঁহার একমাত্র পুত্র—মাতৃহারা মাখনের জন্য অন্ন প্রার্থনা করিলেন। শত যাত্রীর পদ নিষ্পেষণ তাহার স্পন্দন হীন পৃষ্ঠের উপর দিয়া চলিয়া গেল। মাখন পিতাকে উদ্ধার করিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

ভক্তের আকুল ক্রন্দনের নিকট বিপদ অতি তুচ্ছ। সরল প্রাণের অনাবিল নিবেদন আত্মহারা হইয়া অন্নপূর্ণার চরণে জ্ঞাপন করিয়া বলরাম উঠিয়া আসিলেন।

আজ আর তাঁহার মনে কোন অশান্তি নাই, কোন দৈন্য নাই, কোন শূন্য নাই। তাহার মন আজ মায়ের পায়ে একমাত্র পুত্রের ভবিষ্যৎ অন্ন ভিক্ষা চাহিবার সুযোগ পাইয়া সেই প্রাপ্তির আনন্দে বিভোর।

মায়ের নামে বিশ্বাস-শীল ভক্তের মন এমনই অটল, এমনই উচ্চ, এমনই শান্তির আনন্দে নিমগ্ন হইয়া থাকে।

বাসায় আসিয়া বলরাম মাখনকে বলিলেন—"তুমি যাহা খুসি খাও, আমি আজ আহার করিব না।"

পিতার আদেশে মাখন আহার করিল। তারপর পিতার কম্বলের পার্শ্বে স্থান করিয়া গত রজনীর অনিদ্রার প্রতিশোধ লইল।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে মাখন নিদ্রা হইতে উঠিয়া পিতার আহারের কথা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল। বলরাম বলিলেন—"আমি খাইব না, কয়েক বার দাস্ত হইয়াছে, বমিও হইয়াছে…"

মাখন পিতার অবস্থা ভাবিয়া ভয় পাইয়া গেল। বলরাম তাহার মনের ভাব বুঝিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"বাবা বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা দর্শন হইয়াছে। আর জীবনে কোন সাধ নাই—তুমি আমার জন্য চিন্তিত হইও না; মা অন্নপূর্ণা তোমার প্রতি চিরদিন দৃষ্টি রাখিবেন। পিতৃবাক্য অবিশ্বাস করিও না। মার প্রতি চিরদিন ভক্তি রাখিও। পিতামাতা লইয়া কেহ চিরকাল থাকিতে পারে না—আজ যদি বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্মে শরণ লইতে পারি চির মুক্ত হইব। বাবা, আমাকে শেষ অবস্থায় কোন ঔষধ খাওয়াইয়া আমার অধোগতি করিও না। ৺কাশীধামে গঙ্গোদক ও বিশ্বেশ্বরের চরণামৃত ব্যতীত যেন আর কোন কিছু আমার উদরে স্থান না পায়। আমার কাশী প্রাপ্তি হইলে—ইহা অপেক্ষা অধিক

সৌভাগ্য আর কিছুই নাই। তুমি কাঁদিয়া কাটিয়া নিজকে এলাইয়া ফেলিও না। আমার কথাগুলি মনে রাখিও— বাবা বিশ্বেশ্বর তোমাকে নিরাপদে রক্ষা-করিবেন, মা অন্নপূর্ণা তোমার অন্ন-বস্ত্র যোগাইবেন। তাঁহাদের প্রতি যেন চিরদিন ভক্তি থাকে।"

মাখন পিতার কথা শুনিয়া কান্না রাখিতে পারিল না। যাত্রীর অবস্থা অনতিবিলম্বেই পাণ্ডা ঠাকুরের কর্ণে গিয়াছিল। তিনি আসিয়া অবস্থা দেখিলেন। সে সময় যাত্রীর ভিড় খুব কম ছিল, তাই মাখনের নিঃসহায় করুণ অশ্রুপূর্ণ মুখ খানির দিকে চাহিয়া পাণ্ডা ঠাকুর রোগীকে হাস-পাতালে না পাঠাইয়া নির্ব্বিঘ্নে বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্ম লাভের সুযোগ প্রদান করিলেন। বলরামের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতেছিল কিন্তু তাঁহার উপদেশ বাণীতে মাখনের দুর্ব্বল হৃদয় অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের মহিমায় শক্তিশালী হইতেছিল। সে প্রাণপণে পিতার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল।

বাবা বিশ্বেশ্বরের ও অন্নপূর্ণার চরণ চিন্তা করিতে করিতে সেই রাত্রিতেই বলরামের মহাপ্রাণ অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বরের শ্রীপাদ পদ্মে লীন হইয়া গেল। মাখন পিতৃ উপদেশ স্মরণ রাখিয়া দৃঢ় চিত্তে পিতৃ শোক সহ্য করিল। তাহার সহৃদয় পাণ্ডা ঠাকুরের কৃপায় পিতার দেহ দশাশ্বমেধের মহাশ্মশানে দগ্ধ করিয়া আসিয়া সতুবাবুর নিকট একখানা টেলিগ্রাম করিল। তারপর অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশ্যে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম করিয়া ও পাণ্ডা ঠাকুরের স্নেহাশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া নৈহাটী যাত্রা করিল।

(১৩)

সতুবাবু ষ্টেসনে অপেক্ষা করিতেছিল। মাখনের চক্ষু তাঁহার উপর পড়িতেই সতুর চক্ষুও মাখনের উপর পড়িল। মাখন পিতার জন্য এ পর্য্যন্ত প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে পারে নাই। অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বরের চরণে লুটাইয়া পিতার জন্য তাহার একবার কাঁদিবার ইচ্ছা ছিল; পিতৃদশা প্রস্ত হইয়া সে আর মন্দিরে যাইতে পারে নাই; তাই তার সে প্রাণের ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। দুঃখ দরদ বুঝিবার মানুষ না পাইলে মানুষের প্রাণের বেদনা হৃদয়ের অন্তস্থলে আলোড়ন করিয়া উঠে না। নির্জ্জনেও মানুষ মর্ম্মের আকুল বেদনা নীরবতার ভিতর প্রতিধ্বনীত করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে। তেমন সুযোগও মাখনের এপর্য্যন্ত ঘটে নাই। সুতরাং প্রাণের তুফান বাহির করিয়া দিবার অবসর সে এপর্য্যন্ত পায় নাই।

সতুকে দেখিয়া মাখনের প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সতু যখন নীরবে গাড়ীতে উঠিয়া তাহার কম্বল জড়িত বেগটা নিজ হাতে তুলিয়া লইল, তখন তেমন আত্মীয়তার নিকট মাখন আর তাহার মনকে দৃঢ়তার ভিতর স্থির রাখিতে পারিল না। মাখন আবেগপূর্ণ ক্রন্দনোচ্ছ্বাসে হৃদয়ের কাতর ভাব প্রকাশ করিয়া দিয়া সতুর গলা জড়াইয়া ধরিল।

তখন যাত্রীর নামিবার ভিড়। মাখনের গলায় কাছা দেখিয়া যাত্রীরা তাহার নামিবার পথ ছাড়িয়া দিল। সতুরও চক্ষে জল ছল ছল করিতেছিল, কণ্ঠের আওয়াজ বাঝিয়া উঠিতেছিল। সে মাখনকে হাতে ধরিয়া বাহির করিয়া লইয়া নিঃশব্দে অগ্রসর হইল।

সতুর খুড়া মহাশয় মাখনের নিকট তাহার সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া সতুর মার সহিত পরামর্শ করিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গে তখন ভীষণ বর্ষা নামিয়াছে। পদ্মায় ভাঙ্গন ধরিয়াছে। সংবাদ পত্রের স্তম্ভে নিত্য নূতন ভাবে সে সকল কথা বাহির হইতেছিল। মাখন পরদিনই বাড়ী যাইবে বলায় সতুর খুড়া মহাশয় আপত্তি করিলেন। তিনি বলিলেন—"পূর্ব্ববঙ্গে ভয়ানক বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে। রেল লাইন পদ্মার প্লাবনে স্থানে স্থানে ডুবিয়া গিয়াছে। গোয়ালন্দ ষ্টেসন একেবারে পদ্মার গর্ভে স্থান পাইয়াছে; অনেক ষ্টিমার ষ্টেসনও ডুবিয়া গিয়াছে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় তোমার যাওয়া কোনমতেই হইতে পারে না। তুমি তোমার জেঠা মহাশয়কে চিঠি লিখিয়া অবস্থা জানাও, তাঁহার সম্মতি লইয়া এই স্থানে গঙ্গা পাড়ে শ্রাদ্ধ করিয়া শুদ্ধ হইয়া বাড়ী যাও। সেদিকে দিনের দুর্য্যোগও কাটিয়া যাক্।"

মাখন অগত্যা তাহাই করিল। সেই দিনই সে তাহার জেঠা মহাশয়কে ও কিশোরী বাবু হেড মাষ্টারকে তাহার এই বিপদ বার্ত্তা জানাইয়া চিঠি লিখিল। চিঠিতে সতুর বন্ধুত্ব ও তাহার অভিভাবকদিগের সদোপদেশ, সহানুভূতি এবং সহৃদয়তার কথার উল্লেখ করিয়া দিল।

একাদশ দিবসে শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত কাহারও কোন উত্তর না পাইয়া মাখনের বিপন্ন হৃদয় উপায়-হীন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। সতু তাহার অবস্থা বুঝিয়া তাহাকে যথেষ্ট সান্ত্বনা ও সাহস দিয়া বুঝাইল। এবং পরদিন নিজব্যয়ে তাহার পিতৃশ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করাইয়া দিল। শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করিয়া উঠিয়া মাখন তাহার অনাবিল পূত অশ্রুধারায় সেই পরিবারের নিকট তাহার হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে লাগিল।

সতু প্রতিদিনই ষ্টেসনে যাইয়া পূর্ব্ববঙ্গ রেল লাইনের অবস্থা অবগত হইয়া আসিতেছিল। শ্রাদ্ধের পরদিন মাখন ও সতু উভয়ে যাইয়া আরো বিশেষ ভাবে তাহা অবগত হইল।

রেল রাজবাড়ী ষ্টেসন পর্য্যন্ত যাইয়া থাকে। গোয়ালন্দ ষ্টেসন এখনও পদ্মার গর্ভে। খেয়া নৌকার সাহায্যে রাজবাড়ী হইতে যাইয়া ষ্টিমারে উঠিতে হয়। পদ্মার তীরে কোন ষ্টিমার ষ্টেসনই পূর্ব্ব স্থানে নাই। যাত্রী-দিগকে নৌকার সাহায্যে অতি কষ্টে তীরে নামাইয়া দেওয়া হয়। ষ্টিমার পূর্ব্বে যে স্থানে তিন ঘণ্টায় যাইত এখন সেস্থানে যাইতে ছয় ঘণ্টা লাগিয়া থাকে।

এই সকল বিবরণ তাহারা রেল গামী যাত্রীদিগের নিকট সংগ্রহ করিয়া লইল।

দেশের এইরূপ শোচনীয় অবস্থার কথা শুনিয়া এবং তাহার নিষয় ভাবিয়া মাখনের মন আর বিদেশে বসিয়া থাকিতে চাহিলনা। সে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সতুর মা ও খুড়া মহাশয়ের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল। তাঁহারা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া সতুর সহিত একত্র থাকিয়া পড়া শোনা করিতে বলিয়া দিলেন।

সতু অনিচ্ছা সত্বেও তাহার সমস্ত হৃদয়ের আবেগ অভিসিঞ্চিত ভালবাসার সহিত তাহাকে বিদায় দিল। কত প্রীতি ভালবাসার বিনিময়ে, কত অমিয় মধুর আলাপনে তাহাদের এই দিনগুলি কাটিয়াছে, কত উদার যে সে ভাব, কত গভীর যে সে ভাব—তাহা একমাত্র নির্ম্মল হৃদয় প্রণয়ী যুবকেরাই বুঝিতে পারে।

(১৪)

রাজবাড়ী ষ্টেসনে আসিয়াই যাত্রীদিগকে গাড়ী ত্যাগ করিতে হইল। ইহার পর আর রেল গাড়ী যায় না যাইবার উপায় নাই। সম্মুখের অপার উশৃঙ্খল তরঙ্গরাশি কলের গাড়ীকে বিকল করিয়া রাখিয়াছে।

তখনও ভোরের আলো পদ্মার দিগন্ত ব্যাপী জল রাশি ভেদ করিয়া পূর্ব্বাসায় ফুটিয়া উঠে নাই—পদ্মার তরঙ্গভঙ্গে শুকতারার উজ্জল আলো আছাড় খাইয়া নাচিতেছিল মাত্র। ষ্টেসনের উজ্জল গ্যাসালোকে যাত্রীকুল 'ত্রাহি মধুসূদন' বলিয়া নামিয়া পড়িলেন বটে, কিন্তু একি বিভিষিকা!

ষ্টিমার কূল হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত। সে অর্দ্ধ মাইল স্থানে প্লাবনের জল তরঙ্গভঙ্গে খেলিতেছিল। কয়েক খানা নৌকায় যাত্রীদিগকে উঠাইয়া লইয়া ষ্টিমারে তুলিয়া দিবার বন্দোবস্ত আছে।

শেষ রাত্রির অন্ধকারে দুর্গম জল পথ হাটিয়া যাইয়া নৌকায় উঠার বিপত্তি, সকলেরই অগ্রে যাইবার আকুল আগ্রহ, স্ত্রী-পুত্র ও সহযাত্রীকে লইয়া এক নৌকায় একত্র উঠার চেষ্টা, কুলির মাথার মালপত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রভৃতি ব্যাপারে লোকের যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল মাখন কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহা দেখিল।

আবাল-বৃদ্ধ বণিতার এই দুর্গতি দেখিয়া সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। নিজ বিপদের চিন্তা তাহার মন হইতে পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। তাহার আর চিন্তা কি? কাঁদিবার লোকটীও তাহার নাই। জ্যেঠা মহাশয় জেঠি মা প্রভৃতি এই অবস্থায় যে জীবিত আছেন, সে আশা সে তাঁহাদের কোন পত্রোত্তর না পাইয়াই হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিয়াছিল; তবে আত্মচিন্তার আর তাহার এমন কি অধিক প্রয়োজন? দাঁড়াইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকের তামাসা দেখা কি মনুষ্যত্বর কাজ?

মাখন তাহার যথাসর্ব্বস্ব সেই কম্বল জড়িত ব্যাগটী ও তাহার সহিত আবদ্ধ ঘটিটী এবং পিতৃ পরিত্যক্ত বংশের লাঠিটি একধারে রাখিয়া বালক বালিকা সহিত স্ত্রীলোকদিগকে তুলিয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইল।

বড় বড় নৌকাগুলি অন্ধকারে হাঁটু জল আসিয়া ঠেকিয়াছিল, স্ত্রীলোকেরা অপরের সাহায্য ভিন্ন কিছুতেই উঠিতে পারিতেছিল না। যাহার কোলে শিশু তিনি বিপন্ন হইয়া চীৎকার করিতেছিলেন। যাত্রীর ধাক্কায় একটী স্ত্রীলোক ক্রোড়ে শিশু লইয়া জলে পড়িয়া গেলেন।

মাখন দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকেই প্রথম তুলিল। তিনি পড়িয়া গিয়াও শিশুকে হাত ছাড়া করেন নাই; ধন্য মাতৃস্নেহ! মাখন লজ্জা সরম ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে দুই হাতে জাঁকড়াইয়া ধরিয়া একেবারে নৌকায় তুলিয়া দিল। তারপর সে আর একটী শিশুকে তাহার মার কোল হইতে নিজ কোলে লইয়া তাহার জননীকে তুলিয়া দিতে সাহায্য করিল। শিশুর পিতা তাহার অন্য একটী তদপেক্ষা অল্প বড় পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি মাখনকে অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিলেন-"আপনি দেবতা! মহাশয় দেবতা!" মাখন বলিল—দিন আপনার কোলের শিশু, আপনিও উঠিয়া পড়ুন।" ভদ্রলোকটী তাঁহার কোলের ছেলেটীকে মাখনের কোলে দিয়া নৌকায় উঠিয়া স্ত্রী পুত্রের সহিত একত্র হইলেন। তারপর মাখনের কোল হইতে শিশুটীকে লইয়া বিনীতভাবে বলিলেন "মহাশয় বেডিংটা কুলির মাথায়-কোথায় গেল একবার আমার দেখে আসা উচিত নয় কি?" মাখন বলিল—মোট হারাণ যাইবে না। সে বিষয়ে আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। আর তবুটা ক্ষতি হইলেও আপনার আর ...। আপনার কুলির নম্বর কত? আমি সকলের শেষে উঠিব, আমি অনুসন্ধান করিয়া দেখিব।" ভদ্রলোকটী নম্বর বলিতে পারিলেন না। মাখন অন্যদিকে চলিয়া গেল। সে দিকে একটী বৃদ্ধা নৌকায় উঠিতে চেষ্টা করিতেছিল। সে বৃদ্ধাকে তুলিয়া দিল। একটী ভদ্রলোক তাঁহার স্ত্রীকে হারাইয়া জলের মধ্যে পাগলের মত এত ব্যস্ততার সহিত দৌড়িতেছিলেন যে হাতের জুতা ও ছাতি সহ জলে আছাড় খাইয়া পড়িয়া জুতা জুড়াটী হারাইয়া ফেলিলেন। মাখন তাহাকে তুলিতে গেলে তিনি পাগলের মত হইয়া বলিলেন—"ভাই আমি মেয়েদের হারিয়ে ফেলেছি। আমার চাপরাসীটাই বা গেল কোথায়? স্ত্রীর কোলে শিশু ছিল।" মাখন বলিল আপনি ধীরে সুস্থে দেখুন, ষ্টীমার ভোর বেলায় ছাড়িবে; ততক্ষণ আপনিও অনুসন্ধান করুন, আমিও দেখি।"

কয়েকটী স্ত্রীলোক দেখিয়া মাখন তথায় যাইয়া তাঁহাদিগকে তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিল। স্ত্রীলোকদের সঙ্গে লোক বেশীছিল সুতরাং মাখন অপর লোকের সাহায্য করিতে লাগিল।

আটখানা নৌকা বোঝাই হইয়া রওয়ানা হইয়া গেল। কত হাহাকার যে ঘাটে উঠিল, তাহার বর্ণনা করা লেখনীর অসাধ্য। কেহ স্ত্রীপুত্র ছাড়া হইয়া উন্মাদের মত ছুটা ছুটী করিতে লাগিল, কেহ মোট হারা হইয়া চীৎকার করিয়া গলা ভাঙ্গিতে লাগিল। কেহ সঙ্গী হারা হইয়া হা হুতাশ করিতে লাগিল। সেই উচ্চ কোলাহল নদীকূলের দৃশ্য ভীষণ হইতে ভীষণতর করিয়া তুলিল।

মাখনের জীবনে এই প্রথম জন-সেবা। আজ বিপন্নের সাহায্য করিয়া সে মনে মনে যে সুখ অনুভব করিল, তেমন সুখ সে জীবনে আর কোন কার্য্যে এ পর্য্যন্ত পায় নাই। সে বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার উদ্দেশে মাথা নত করিয়া প্রার্থনা করিল—"ভগবান আমাকে এইরূপে খাটাইয়াই সুখ দাও।"

মাখনের পরিধান বস্ত্র ও উত্তরিয় একেবারে ভিজিয়া গিয়াছিল; তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপও নাই। হবিষ্যের দশ দিন তো সে আর্দ্রবস্ত্র পরিয়াই কাটাইয়াছে।

সে এইবার সেই বিপন্ন পত্নীহারা ভদ্রলোকটীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

তখন উষার জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে; শুকতারা নিষ্প্রভ; আকাশের অন্যান্য তারকারাজী অন্তর্হত হইয়াছে। মাখন দেখিল একটী বিধবা ভদ্র মহিলা তাহারই মত একটী ঘটী ও ব্যাগ হস্তে দাঁড়াইয়া আকুল ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন। রোগে তাঁহার শরীরের লাবণ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে বটে কিন্তু তিনি যে সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিধবা তাহার মুখ শ্রী তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছিল।

মাখন তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যাইবে মা?"

বিধবাটী তাহার করুণ দৃষ্টিতে মাতৃহীন মাখনের সমস্তখানি হৃদয় অধিকার করিয়া লইয়া কম্পিত স্বরে বলিল—"নারায়ণগঞ্জ নামিব বাবা. নায়েতো উঠিতে পারিলাম না।"

মাখন বলিল—"আপনি আসিয়া এইখানে দাঁড়ান, নৌকাগুলি পুনরায় আসিবে, আমি আপনাকে তুলিয়া দিব।"

মাখন সেই বিধবা মহিলাটীকে তাহার নিজ লোটা কম্বলের নিকট লইয়া গিয়া দেখিল—হরি, হরি! তাহার

সেই ক্ষুদ্র সম্পত্তিটীও যে দুষ্ট লোকের লুব্ধ-দৃষ্টি এড়াইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই! পিতার শেষ স্মৃতি জাগ্রত রাখিবার জন্য রহিয়াছে তথায় কেবল বলরামের সেই বাঁশের লাঠিটী মাত্র।

মহিলাটীকে সেখানে লইয়া গিয়া মাখন বলিল—"বাঃ আমার ব্যাগ ও ঘটিটী যে কে লইয়া গিয়াছে। যাক্ ভগবানের দান তিনিই গ্রহণ করিয়াছেন। আপনি এই স্থানে অপেক্ষা করুন; আমার লাঠিটীই রহিল। আমি আপনাকে নিশ্চয় তুলিয়া নিব। না তুলিতে পারি, আপনার জন্য আমি রহিব। ষ্টিমার ছাড়িবে ভোরে, লোক রহিয়াছে, মাল রহিয়াছে, সরকারী ডাক রহিয়াছে। নৌকাগুলি আরো দু একবার আসিবে।"

মাখন বিধবাকে নিশ্চিন্ত করিয়া সেই বিপন্ন ভদ্রলোকের উদ্দেশে গেল।

সেই পত্নীহারা ভদ্রলোকটী তখনও হতাশ ভাবে ইতস্ততঃ স্ত্রী খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম রনদা। তিনি শিশু-কোলে স্ত্রীলোক দেখিলেই "রনদা" বলিয়া ডাকিতেছিলেন; আর নিরাশ হইয়া ফিরিতেছিলেন। তাঁহার এরূপ বিচিত্র অভিনয়ে মাখনের হাসি পাইতেছিল; দুঃখও বোধ হইতেছিল।

মাখনের বয়স অপেক্ষা তাঁহার বয়স প্রায় দ্বিগুণ হইবে সুতরাং সে সান্ত্বনা সূচক কোন কথা না বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার স্ত্রীকে পাইলেন কি?"

তিনি তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন "দেখ্‌চি।"

মাখন—"বলুনতো আমি সবটা ঘুরিয়া খুঁজিয়া দেখিয়া আসিতে পারি।"

ভদ্রলোকটী বিরক্তির সহিত বলিলেন—"সে কথা কি ব'লে দিতে হয়, না জিজ্ঞেস্ কত্তে হয়?"

"তবে কি পরিচয়ে খুঁজিব? আপনি কি কাজ করেন?"

ভদ্রলোকটী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"স্ত্রীর শরীরেও তার কিছু চিহ্ন থাক্‌বে নাকি?"

মাখন—"একটী ছেলে কোলে অবশ্য।"

"ঢের ছেলে!" বলিয়া লোকটী বিরক্তির সহিত "হরে! হরে, হরনাথ—চাপরাসী।" ডাকিতে ডাকিতে যাত্রীর ভিড়ে প্রবেশ করিলেন।

মাখন সে সম্বোধনে রাগ করিল না। তাহার মনে হইল, স্ত্রীহারা হইয়া ভদ্রলোকটীর মেজাজ বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছে।

"মাখন যেখানেই স্ত্রীলোক দেখিল, সেখানেই গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনাদের কেহ কি সঙ্গীয় লোক হারাইয়াছেন?"

সে সঙ্গী-হারা দুটী স্ত্রীলোক পাইল কিন্তু স্বামী হারা কোন স্ত্রীলোক পাইল না। মোট হারাইয়াছে, এমন লোকের অভাব নাই। কুলির সঙ্গে মোট রহিয়াছে, যাত্রী ষ্টিমারে চলিয়া গিয়াছে এমন অবস্থারও অভাবই নাই।

মাখন অনুসন্ধান শেষ করিয়া পুনরায় গিয়া সেই ভদ্রলোকটীকে ধরিল। তখন তিনি নিরাশ হইয়া আসিয়া বালুচড়ে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন।

নিরাশ হৃদয়ে আশার কথা বড়ই মিষ্ট। অতিবড় কর্কশ ভাষীকেও আশারবাণী শুনাইলে মধুর কথা বলে। মাখন যাইয়া সেই ভদ্রলোকটীকে বলিল—"আপনার স্ত্রী নিশ্চয় ষ্টিমারে চলিয়া গিয়াছেন; আমি কয়েকটী স্ত্রীলোককেই শিশু সন্তান সহ নৌকায় তুলিয়া দিয়াছি।"

লোকটী কথার প্রারম্ভে বিরক্তি বোধ করিয়াছিলেন। শেষ কথা কয়টী শুনিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—"আপনি নিজে তুলে দিয়েচেন? শিশুকোলে? সঙ্গে কেউ নেই—?"

"হাঁ আমি নিজেই তুলিয়া দিয়াছি; বোধ হয় সঙ্গে কেহ নাই; তাঁহার সঙ্গে লোক থাকিলে অবশ্য তাঁহাকে সাহায্য করিত। একটী স্ত্রীলোক কোলের শিশু সহ জলে পড়িয়া গিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে শিশুসহ নৌকায় তুলিয়া দিয়াছি—এরূপ অনেক স্ত্রীলোকও—

তাহার কথা শেষ না হইতেই ভদ্রলোকটী মাখনের হাত টানিয়া ধরিয়া বলিলেন—"Thank god—আপনিতো ঠিক বল্‌চেন? আমার চাপরাসীটা...?"

"সে খবর আমি জানিনা, আমি লক্ষ্যও করিনাই। মোট কথা আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে ষ্টেশন হইতে এপর্য্যন্ত আনিয়াছেন বলিয়া জানেন এবং এখন এখানে নাই বলিয়া অনুসন্ধানে নিশ্চয় জানিয়া থাকেন, তবে আমার কথা বিশ্বাস করিয়া আপনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। আপনি স্ত্রীকে শিশুকে ছাড়িয়া পাছে পড়িলেন কেন?"

বাবুটী বলিলেন—"আমি জুতা মোজা খুলচি ও আবাব্দ তাঁকে নিয়ে চলে গেল। আমার বিলম্ব হ'লো, তারপর আমার একটু ভুলও হ'লো; আর একটী শিশু

ক্রোড়ে মহিলার পিছন ধরে আমি ভুলকরে ফেললুম”… বলিয়া তিনি সেই দুঃখেও একটু হাসিলেন।

মাখন বলিল—“আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের এরূপ ক্ষেত্রে ঘুমটা না দিয়া চলায় তত ক্ষতি হয় না, যতটা বেশী ক্ষতি ঐ পরদার জন্য সময় সময় এরূপ ক্ষেত্রে হইয়া থাকে।”

ভদ্রলোকটী বলিলেন—“ঠিক বলেচ ভাই!”

নৌকা কখানা যাত্রী তুলিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল।

এখন আর রাত্রির অন্ধকার নাই। অন্ধকার পাণ্ডুর বর্ণ হইয়া আসিয়াছে এবং পূর্ব্বদিগন্তে পদ্মার তরঙ্গের উপর অরুণ ছটা হেলিয়া দুলিয়া খেলা করিতেছে।

এবার সকলেই সুবিধা মত ধীরে সুস্থে নৌকায় উঠিলেন। মাখন সেই রুগ্না মহিলাটীকে ধরিয়া নৌকায় তুলিয়া ও নিজে উঠিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্রমশঃ—

বাঙ্গলার ছাত্র-মহলে নৈতিকতার অভাব।

অতি প্রাচীন কালে পারস্যদেশে বাহরামগোর নামে এক নরপতি বাস করিতেন। তাঁহার সমাধির উপর এই মূল্যবান্ বচনটী খোদিতছিল:—“আত্মার বল বাহুবলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।” আরবী ও পারসী সাহিত্যে অনেক স্থলেই এই কথাটী উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়।

কোনও পণ্ডিত বলিয়াছেন, সৃষ্টিকর্ত্তার সর্ব্বপ্রকারের সৃষ্টির মধ্যে মানবের মত শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। আবার মানবের ইন্দ্রিয় নিচয়ের মধ্যে মনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই এবং মনের মধ্যে বিচার শক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। মন আত্মার উপরই স্থাপিত। আত্মার বল বাহুবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একথা সর্ব্বযুগের, সর্ব্বদেশের, সর্ব্বজাতির সুধী ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিয়াছেন এবং জগতের ইতিহাস ইহার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে পরে এবং বর্ত্তমানে দেখাইয়াছে ও দেখাইতেছে।

দারিদ্র্যের কষ্ট আত্মারবলই মধুর করিয়া তুলে। অত্যাচারীর কঠোর উৎপীড়ন আত্মার বলই কোমল কুসুমে পরিণত করে। কঠোর কর্ত্তব্য সাধন করিতে আত্মার বলই মানবের প্রধান সহায়। জগতের শীর্ষ-স্থানীয় ব্যক্তিগণ আত্মার বলের পরম অধিকারী। এ সকল কথা এত পুরাতণ শুনায় যে আমরা এ বিষয় মনোযোগ দেওয়া নেহায়েৎ অর্ব্বাচীনের কার্য্য বলিয়া মনে করি।

আত্মার বল নৈতিক চরিত্রের উপর স্থাপিত। সত্যের প্রতি অনুরাগ, জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা, কর্ত্তব্য সাধনে দৃঢ়তা—এসকল নীতিপরায়ণতার ভিত্তি বাল্যে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে পরিণত বয়সে আত্মার বল সাধনায় সহজেই কৃতকার্য্য হওয়া যায়।

দেহের সর্ব্বপ্রকার পরিপুষ্টির ন্যায় আত্মার বলের পরিপুষ্টি (development) চর্চ্চা সাপেক্ষ। আমাদের বিদ্যালয় সমূহে সেইবলের পরিপুষ্টির কোন কথা উঠেনা, তাহার কারণ নৈতিক উপদেশ ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট, বাধ্যতা মূলক পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত নহে।

বর্ত্তমানে আমাদের বিদ্যালয় সমূহে কি কি দুর্নীতি পরায়ণতা পরিদৃষ্ট হয়, তাহার একটী ছোট খাট তালিকা সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করা প্রয়োজন মনে করিতেছি:—

১। শিক্ষক ও পরীক্ষক সম্প্রদায়কে প্রতারণা করিয়া কোনও না কোন রকমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করা।

২। শিক্ষকের প্রতি অবজ্ঞা তাচ্ছল্য ও উপহাস প্রদর্শন করিতে পারিলে আনন্দ বোধ করা। *

* আজকাল এই দোষটী বড়ই ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে। অনেক প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হইতে তিনটী দৃষ্টান্ত দিতেছি:—

(ক) কোনও বড় সহরের এক নামজাদা বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ মানে কোনও নূতন শিক্ষক প্রবেশ করিবা মাত্র একটী ছাত্র বলিয়া উঠে “স্যার, আপনারা সব নিকর্ম্মা শিক্ষক।” শ্রেণীর অন্যান্য ছাত্র তখন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে।

(খ) শিক্ষা বিভাগের কোনও উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্ম্মচারী কোনও সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া স্কুল আঙ্গিনায় প্রথম পদার্পণ করিবা মাত্র একটী ছাত্র তাঁহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিয়া ফেলে, “দেখ দেখ ‘চাচামিঞা’ আসিতেছে।” নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানকে হিন্দুগণ ঠাট্টা করিয়া (অংশ্য কতকটা তুচ্ছভাবে) “চাচামিঞা” বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন।

(গ) কোনও বিখ্যাত কলেজে ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ এক কোমল প্রকৃতির অধ্যাপক প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়াইতেছিলেন। একটী ছাত্র দাড়াইয়া হঠাৎ অধ্যাপকের মুখের উপরই বলিয়াফেলে, “আপনি কিছুই পড়াইতে জানেন না।” ক্লাশে হাসির রোল পড়িয়া যায়। কেহ কেহ এই কথায় উপর বলেন; “অক্সফোর্ডে ও কেম্ব্রিজে এরূপ ঢের হইয়া থাকে।” এক স্থলের অন্যায় ব্যবহার দ্বারা অন্য স্থলের অন্যায় ব্যবহার কেমন করিয়া অনুমোদন করা যায়, তাহা আমরা বুঝিতে পারিনা।

৩। বয়ো জ্যেষ্ঠ ও সম্মানযোগ্য ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করা।

৪। বিদ্যালয় হইতে বা সংগঠি হইতে কাগজ, দোয়াত, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি চুরি করা।

৫। বয়স্ক বালকগণের অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ছাত্রদিগকে অশ্লীল ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া ও কুমন্ত্রণা দ্বারা কুপথে আনয়ন করা।

অনেকে একদমে বলিয়া ফেলেন এসকল দুর্নীত পরায়ণতার কারণ এই যে আমাদের দেশের শিক্ষা বৈদেশিক ছাঁচে গঠিত এবং আমাদের দেশের শিক্ষা পরিচালন ভার বিদেশীর হাতে ন্যস্ত। তেমন ধারণা অভ্রান্ত নহে। পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের দেশের নৈতিক আদর্শের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে—একথা স্বীকার্য্য। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমাদিগকে সত্যের পরিবর্ত্তে মিথ্যার আশ্রয় নিতেও শিক্ষা দিতেছে, ইহা কিছুতেই অনুমোদন যোগ্য নহে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমাদিগকে চুরি করিতে শিখাদিয়াছে বা শিক্ষককে উপহাস করিতে শিখাদিয়াছে একথা বলিলেও নিশ্চয়ই সত্যকথা বলা হইবেনা।

ছাত্রের বিদ্যারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাহার চরিত্রের উপর প্রথমতঃ তাহাদের পিতামাতার চরিত্রের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া থাকে, তৎপর শিক্ষকের, তৎপর পাঠ্য পুস্তক লিখিত বিষয়ের এবং তৎপর চতুষ্পার্শ্বের (environ ment)। পাঠ্য পুস্তক এবং তন্মধ্যে লিখিত বিষয় সমূহের জন্য শিক্ষাবিভাগ পরিচালনকারিগণ দায়ী। আমরা কথায় কথায় বলিয়া থাকি বর্ত্তমান শিক্ষা নৈতিক-চরিত্র গঠনের বিরোধী অথচ পাঠ্যপুস্তকে 'চুরি করা বড় দোষ' একথা ছাড়া "চুরিকরা বড়গুণ" একথা কোথায়ও লিখিত নাই কিম্বা "পিতামাতা ও শিক্ষককে ভক্তিকর" একথা ছাড়া "পিতামাতা ও শিক্ষককে উপহাস কর" একথা লিখিত নাই। সুতরাং এ দুর্নীতি পরায়ণতার কারণ অন্যত্র খুঁজিতে হইবে।

আমরা বলি ছাত্রগণের এদুর্নীতি পরায়ণতার প্রথম কারণ অত্যাধিক স্নেহপরায়ণ বাঙ্গালীর পুত্র পূজা। সৌরভের মাঘ সংখ্যায় "বাঙ্গালীর পুত্র-পূজা" প্রবন্ধে আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি।

পুত্ররূপী দেবতার ক্রোধ সহসা দমিত হইতে দেখা যায় না। দেবতার ক্রোধের চরমপরিণতি অনেক সময় ভয়াবহও হইয়া পড়ে, দেবতা ক্রোধ ভরে কোন সময় বা মাতার অলঙ্কারের বাক্স গভীর জলে নিক্ষেপ করেন; কোন সময় বা বাটীর অপর ছোট মেয়ের নাসিকার অগ্রভাগ দাঁতে কাটিয়াদেন, কোন সময় বা কর্ত্তার মূল্যবান টেকঘড়ী দ্বারা কুকুরকে ঢিল ছোঁড়েন। তাহাছাড়া মিষ্টান্নের হাড়ী ভাঙ্গিয়াফেলা, দুধের বাটী গরম বলিয়া ঝির মাথায় ঢালিয়া দেওয়া তো অতি সাধারণ ব্যাপার।

কোন এক বালক প্রতিবেশীর ফলের বাগান হইতে একটী ফল না বলিয়া লইয়া আসিল। পিতা তাহা লক্ষ্য করিলেন কিন্তু বাঙ্গালী পিতা স্বভাবের চিরন্তন অবহেলা রোগের বশেই হউক কিম্বা পুত্রদেবতার মান ভঙ্গের ভয়েই হউক তাহার প্রতিকার চিন্তা বা চেষ্টা কোনটাই করিলেন না। এই বীজ রোপীত হইল।

এই স্থলে পিতার প্রথম স্থির করা উচিৎছিল যে পুত্রের এই অপহরণ প্রবৃত্তি কি সঙ্গদোষেই উৎপন্ন হইয়াছে না রসনা তৃপ্তির লোভেই উৎপন্ন হইয়াছে। এই দুই ভিন্ন অবস্থায় দুই ভিন্ন ব্যবস্থার দরকার; হঠাৎ কড়া শাসন দ্বারা বারণ করিতে গেলেও ভয় আছে—অতঃপর সে এরূপ কার্য্য পিতামাতা বা অভিভাবকের চক্ষুর অন্তরালে করিতে আরম্ভ করিবে।

এসকল কথা যে কেহ জানেন না, আমরাই ইহা জগতে নূতন আবিষ্কার করিতেছি তাহা নহে। তবে আমরা এই বলিতে চাই যে যেমন মধ্যম শ্রেণীর গুণ বিশিষ্ট লোক দ্বারাই জগৎ পূর্ণ সেইরূপ মধ্য শ্রেণীর মস্তিষ্ক শক্তি বিশিষ্ট বালকের সংখ্যাও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আমরা কেবল প্রতিভাবান দুই চারিটীর দিকেই সকল প্রকার মনোযোগ প্রদান করিয়া থাকি। ফলে আমাদের দেশের মধ্যে সাধারণ লোকের জীবন হইয়া যায় এক ঘেঁয়ে।

ছাত্রগণের দুর্নীতি পরায়ণতার দ্বিতীয় কারণ—ছাত্রদের নৈতিক চরিত্রের জন্য শিক্ষক সম্প্রদায়ের আপনাদিগকে দায়ী মনে না করা। দায়ী মনে না করিবার কারণও অনেক আছে। সমাজে দরিদ্র শিক্ষকের সম্মান নাই। সুতরাং শিক্ষকের ও নিজ ব্যবসায়ের জন্য অধিক মাত্রায় দায়িত্ব বোধ বা অনুরাগ নাই। অধিকাংশ শিক্ষক মনে করেন, খাটিতেছি পেটের দায়। মাসের শেষ বেতন পাইলেই হইল।

ছাত্রের নৈতিক চরিত্রের প্রতি শিক্ষকের উদাসীনতার অন্য এক কারণ 'ভীতি'। ছাত্রদ্বারা শিক্ষক বা

অধ্যাপকের রাস্তা ঘাটে অপমানিত হওয়ার ন্যায় ঘটনা এখন আর বিরল নহে। কেবল রাস্তা ঘাটে কেন স্কুলে কলেজে এমন কি শ্রেণীর ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে আজকাল তাদৃশ ব্যাপার অভূতপূর্ব্ব নহে।

একেতো শিক্ষকগণ সমাজে নগণ্য; তারপর অন্নচিন্তায় জরজর, তাহার উপর যদি তাহাদের কষ্টে সৃষ্টে রক্ষিত তথাকথিত "মান" টুকুও যায়-যায় হয়, তখন তাহাদের অবস্থা বাস্তবিকই কি শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায় না? অথচ চাকুরী টুকুও বজায় না রাখিলে নয়। সুতরাং শিক্ষক ছাত্রের ঔদ্ধত্য, নষ্টামী ও অন্যায় দেখিয়াও যে এড়াইয়া যান, তাহা তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক।

ইহা ছাড়া আমাদের বাঙ্গালী চরিত্রের শৈথিল্য পরতন্ত্রতা তো একটা কারণ আছেই। ছোট হউক, বড় হউক; পারিশ্রমিক অল্প হউক, বেশী হউক কিম্বা বিন পারিশ্রমিকেই হউক, যে কাজের ভার নিয়াছি সে কার্য্য সাধ্য মত সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতে হইবে, এধারণা আমাদের মধ্যে প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং যখন কোন সুকুমার মতি ছাত্রকে অন্য কোন বখেটে ছেলে নষ্ট করিতেছে বলিয়া টের পাওয়া যায় তখন হয় তো একথাও মনে হয় 'মরুকগে ছাই।' ইহার প্রতিকার কি?

প্রতিকার নিশ্চয়ই আছে। মানুষকে কর্ম্ম নিরত রাখিবার নিমিত্তই ভগবান সময় সময় জগতে অনর্থ প্রেরণ করিয়া থাকেন। প্রতিকারের প্রথম উপায় পুত্রপূজা বন্ধ। পূর্ব্বোল্লিখিত বাঙ্গালীর পুত্রপূজা শীর্ষক প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি,—

"পূজা বিধাতার চরণে—স্বয় দোষ ত্রুটীর পূর্ণ উপলব্ধির সহিত আত্ম নিবেদন না হইলে সে পূজার স্বার্থকতা নাই। যে মমতা পুত্রের মানুষ হইবার পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়, সে মমতার স্বার্থকতা নাই। সে মমতা একটা নিজের স্বাভাবিক স্নেহবৃত্তির নিরর্থক চরিতার্থ করণ মাত্র। প্রকৃত পূজার অনুষ্ঠান করিতে পারিলে নিজের জীবনের শান্তি সাধনের সহিত জগতেরও কোন না কোন উপকার সাধিত হয়; আর পুত্রের ভাবযুক্ত চিন্তা করিয়া মমতা করিতে পারিলে নিজ পরিবারের, দশের ও দেশের উপকার সাধিত হয়।"

জন্মের পর হইতেই—শিশুর আহার, পরিচ্ছদ, অভিরুচি প্রভৃতি সকল বিষয়েই সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শিশু বয়োপ্রাপ্ত হইয়া বালকে পরিণত হইলেই নানাবিধ দোষ তাহার স্বভাবে বদ্ধমূল হইতে থাকে। সুতরাং শিশুকাল হইতেই তাহাকে বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি সম্মান, ধর্ম্মের প্রতি ভক্তি ইত্যাদি শিক্ষাদিয়া তুলিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষককে ভীতি, নৈরাশ্য, ঔদাসীনতা ত্যাগ করিতে হইবে। জাতি গঠনের দায়িত্ব কেবল রাজনৈতিকের নহে। শিল্পী, ব্যবসায়ী সকলের উপরই এ দায়িত্ব ভার কিছু না কিছু আছে। শিক্ষকের স্কন্ধেই বেশীর ভাগ। সুতরাং ছাত্রের উৎপীড়ন, সমাজের অবজ্ঞা ইত্যাদি সত্বেও তাহাদিগকে ছাত্রের নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য খাটিতে হইবে। যে স্থলে কঠোর শাসন আবশ্যক সেই স্থলে ভয়, লাজ, দ্বিধা, সঙ্কোচ দূরে ফেলিয়া অম্লান বদনে শাসন ব্যবস্থা করিতে হইবে। ছাত্রের মঙ্গলের জন্য নিজের ব্যক্তিগত অভিমান বা ক্রোধকে সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিতে হইবে। ভালবাসায়ও শিক্ষক পশ্চাদপদ হইবেন না। সৎগুণ থাকিলে এবং চক্ষুর সম্মুখে কোন বিশেষ প্রশংসার বা সৎসাহসের কার্য্য করিলে, হিন্দু-মুসলমান, নমশূদ্র ও চামার সকল প্রকারের বৈষম্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ছাত্রকে বক্ষে টানিয়া লইতে হইবে। রাজ-আলিঙ্গনের ন্যায় শিক্ষকের আলিঙ্গনেরও মোহিনী শক্তি আছে।

তৃতীয়তঃ প্রত্যেক ছাত্রের অভিভাবকের সহিত প্রত্যেক শিক্ষকের পরিচিত হইতে হইবে। অভিভাবকের অবজ্ঞা তাচ্ছিল্য মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। মাঝে মাঝে এবং বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে অভিভাবকের সঙ্গে ছাত্রের মঙ্গল বিষয়ে আলোচনা করিতে হইবে।

মনে রাখিতে হইবে ছাত্রের চরিত্র সংশোধনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় শাসন বা ভৎসনা বা উপদেশ নহে; সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় শিক্ষক ও অভিভাবকের নির্ম্মল, দেবোপম চরিত্র। যাঁহার চরিত্র আদর্শ স্থানীয় তাঁহার চক্ষুর অসন্তুষ্টি জ্ঞাপক চাহনির যে শক্তি আছে, ভ্রষ্ট চরিত্র অভিভাবক বা শিক্ষকের কঠোর শাসনের সে শক্তি নাই।

মোটের উপর যেমন "নাজাগিলে কভু ভারতললনা" এজাতির প্রকৃত জাগরণ হইবেনা সেইরূপ অভিভাবক ও শিক্ষক শ্রেণী না জাগিলে এজাতির উদ্ধারের পথ মুক্ত হইবেনা। ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনের উপর জাতীয় চরিত্র গঠন নির্ভর করে। যে জাতির চরিত্রের স্থায়িত্ব নাই, সে জাতির অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য নাই।

মোহাম্মদ আবদুর রসিদ বি,এ, বি,টি।

স্নেহের জয়।

আট বৎসরের খুকী রাধারাণী সংসারের বাদ বিসংবাদ কিছুই জানেনা। বাবা ও কাকার মধ্যে বহুকালবর্দ্ধিত বিদ্বেষ ভাব যে ভীষণ বৈরিতার বীজে জলসেচন করিতেছিল, উহা বালিকার ক্ষুদ্রহৃদয়ে স্থান পায় নাই। সে প্রত্যহ দুপুর বেলা কাকার সঙ্গে এক আসনে বসিয়া খাওয়া দাওয়া করে এবং ভোজনান্তে কাকার ঘরে কাকার কোলে মাথা রাখিয়াই ঘুমাইয়া থাকে। নিঃসন্তান নীলমণি সরকারের সমস্ত পিতৃব্য-স্নেহ এই ভ্রাতুষ্পুত্রীর উপর ঘনীভূত হইয়া উহাকে কন্যার চাইতেও প্রিয়তর করিয়া তুলিয়াছিল। ঠিক আট বৎসর আগে নীলমণি সরকারেরও এমনি একটী মেয়ে হইয়াছিল; কিন্তু বিধাতা বিরূপ; শিশু আতুর ঘরেই প্রাণত্যাগ করে। তারপর এই সুদীর্ঘ আট বৎসরে তাহার আর কোন সন্তানই হয় নাই। কাকা ও কাকীমার বুকভরা ভালবাসা লাভ করিয়া রাধারাণী তাহার অপরাপর সহোদর সহোদরার ঈর্ষ্যার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। উহা অবশ্য বালক বালিকার ঈর্ষা বই আর কিছুই নয়।

নীলমণি সরকার খাইতে বসিয়াছে। আজ তাহার আহারীয় দ্রব্য গলাধঃকৃত হয় না; হাতে উঠেতো মুখে উঠে না, মুখে উঠেতো উদরসাৎ হইতে চায়না। সরকারের সন্তর্পিত দৃষ্টি যেন কাহাকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। তাহার সমস্ত অঙ্গ শিথিলের মত বোধ হইতেছিল। স্বামীর এই উদাসব্যঞ্জক ভাব পত্নীর সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। আড়ালে উনি সকলই লক্ষ্য করিতেছিলেন; কিন্তু মনের আবেগ যে মুখেও প্রকাশ করা যায় না, প্রাণেও সহ্য করা যায় না। পত্নী নিকটে আসিয়া অতি কাতরকণ্ঠেই নিবেদন করিল—"রাধারাণী না আসলে যে তোমার খাওয়াই হবেনা তা আমি জানি, কিন্তু কি করবে বল? তারা আজ রাধারাণীকে মানা ক'রে দিয়েছে। ও আর আমাদের ঘরে আস্‌বেনা।— আর পুকুরটার দামই বা কত? ওটা নিয়ে ভায়ে ভায়ে বিবাদ। কেন পুকুরের মায়াটাকি ছাড়লে হয় না? ওদের ভাগে দুইটা পুকুর থাকবে, আর তোমার ভাগে দুইটী বাগিচা; লোকসান কি তাতে?"

পত্নীর বাক্যে কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করার কারণ নীলু সরকারের ছিল না। তার যত দুঃখ ও যত ক্ষোভ—সব সেই ছোট বালিকাটীর উপর। কেন সেই কচি শিশু-কোমল কানন লতা—তাহার শুষ্ক হৃদয়টাকে এতখানি পাইয়া বসিয়াছিল? কেনই বা সে বাপমার ভালবাসা অবহেলা করিয়া কাকার চিরসঞ্চিত স্নেহরাশি নিংড়াইয়া নিবার জন্য মমতার এমন দৃঢ় ফাঁদ পাতিয়াছিল? বড় আদরের রাধারাণী তার, আজ কিনা একটী বারও আসিয়া—সেই কত না পাখীর কথা, কত না রাজপুত্রের কথা, কত না কি—কিছুই শোধাইল না, কিছুই বলিল না! ক্ষুদ্র দুইটী বাহুলতায় পিছনের দিক হইতে কাঁধ জড়াইয়া ধরিয়া কাকার স্নেহচুম্বনের ভাগী হইল না! এই সমস্ত বিসদৃশ চিন্তায় সরকারের চিত্ত বড় চঞ্চল—বড় অস্থির। ইহার মূলে যে অগ্রজ মহাশয়েরই কূটজাল বিজড়িত, কনিষ্ঠের তাহা বুঝিতে বাকী নাই। নীলু সরকারের প্রাণের দারুণ জ্বালা বাহ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গে স্পষ্টতঃ প্রকাশ না পাইলেও অন্তরে তাহা গভীর মালিন্যরেখা অঙ্কিত করিল।

প্রকাশ্য উচ্চ গর্জ্জন অপেক্ষা নীরবে পোষিত বৈরিভাব বিষময় ফল ধারণ করে। সরকারের সাদা মনটাতে প্রবল রোষবহ্নি জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে। আগ্নেয়-গিরি কখন যে অগ্নি উদ্গিরণ করিবে তাহা কাহারও জানা নাই।

(২)

ইহার পর, কয়েক দিন চলিয়া গিয়াছে; দুই ভাইয়ের বিবাদ কালবৈশাখীর ঘন মেঘের ন্যায় ক্রমে ক্রমে পুঞ্জীভূত হইয়া বর্ষণোন্মুখ হইয়া আছে। বাড়ীর কুকুরটির পর্য্যন্ত একবাড়ী হইতে অপর বাড়ীতে যাইবার জো নাই। বড় ভাই বাড়ীর চারিধার পাকা পর্দ্দায় ঘেরাও করিয়াছেন। মাঝে মাঝে বড় বধূর তর্জ্জন গর্জ্জন দেয়ালের আড়াল হইতে ছোট তরফের আঙ্গিনায় গিয়া মিষ্টি মধুর বিষ বর্ষণ করে। নীলু সরকার পদে পদে অবমানিত, উত্যক্ত ও লাঞ্ছিত। ছোট তরফের একটা পোষা বিড়াল একদিন বড় তরফের আঙ্গিনা হইতে মর্ম্মবিদারী প্রাণান্তক চীৎকার করিতেই দু'খানি ভাঙ্গা পা লইয়া নীলুর পদতলে আসিয়া লুঠাইয়া পড়িল। সরকারের আরক্ত চক্ষু হইতে কয়েক বিন্দু তপ্ত অশ্রু টস্ টস্ করিয়া বক্ষে পড়িয়া তাহার তীব্র মানসিক ব্যথা ব্যক্ত করিয়া দিল।

মাঝখানে একদিন রাধারাণী অতি সঙ্গোপনে আসিয়া কাকার পিঠে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু নীলু সরকারের পাষাণীকৃত হৃদয় সেই সরল স্নেহের প্রতিদানে হতাদর হইয়া পড়িয়াছিল। সেইদিন তাহার মুখ হইতে একটীও স্নেহের বাণী বাহির হয় নাই, বরং সে ইচ্ছা করিয়াই রাধারাণীর হাত দুইটী গলা হইতে সরাইয়া দিল। অভিমানিনী বালিকা শোক-ক্ষতহৃদয়ে নিঃশব্দে অতি ধীরে ধীরে—অতি ম্লানমুখে কাকাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। হায় দুর্ভাগ্য!

রাধারাণী বাড়ী ফিরিবার কালে সহসা পিতার চক্ষুর সম্মুখে পড়িয়া গেল। পিতা তারাপদ সরকার ভ্রুকুটি কুটিল নেত্রে দাওয়া হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া হাতের হুকাটি নীচে রাখিয়া এবং ভিতর বাড়ীর খিড়কী দরজা খুলিয়া ছোট তরফের উপর অজস্র গালি বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। গিন্নী আসিয়া বহ্নিতে ইন্ধন যোগাইবার নিমিত্ত স্বামীর সাহায্যার্থ কোমড় বাঁধিয়া লাগিয়া গেলেন। সেই সমস্ত গালাগালির ভাষা ও ভঙ্গী, উভয়ই অবর্ণনীয়! বড় বধূ মনোরমা মুখভঙ্গী, গ্রীবাভঙ্গী ও হাতনাড়ার সহিত বলিতেছিলেন "অহো আমার আহ্লাদ যে, আহ্লাদ আর গায় ধরে না, একে নিয়ে আহ্লাদ, ওকে নিয়ে আহ্লাদ। বলি পরের মেয়েকে নিয়ে এত গা-ঢলানো কেন গা? ভারি ত আমার ভালবাসা? তেমন ভালবাসার মুখে ছাই। ছেলেপুলে গুলিকে কখন বিষ খাইয়ে মেরে ফেল্‌বে দেখ্‌ছি। নিজেদের ছেলে-পুলে না-হচ্ছেত না-ই আছে, বয়েই গেল! আটকুঁড়ে মিন্সে কোথাকার।" ছোট তরফ হইতে ও যে উত্তর প্রত্যুত্তর হয় নাই, তেমন নহে। এক হাতে কোন দিনও বাজিতে শুনা যায় না।

(৩)

গ্রাম ভরিয়া তুমুল আন্দোলন। গোটা কামারহাটী জুড়িয়া শুধুই সরকার বাড়ীর কথা। প্রচণ্ড তোলপাড়! "হুঁ যেমন কর্ম্ম তেমন ফল হয়েছে বটে। যেম্নি পাপ তেম্নি সাজা! আচ্ছা রকমের বিচার হ'য়ে গেছে! নীলু সরকারের মাথাটা যে এখন ও কাঁধে আছে, ইহাই আশ্চর্য্য! আঃ—হাঃ, অতখানি কচি মেয়ে, কি মারটাই না তাকে মেরেছে! পশুর মত নির্দ্দয় প্রহার! মেয়েটার যে আত্মা উড়ে যায়নি, ইহা কেবল ভগবানের অনুগ্রহ! আর—বাঁচবে ব'লেও মনে হয়না। আজ নাকি তার ১০৫ ডিগ্রী জ্বর। হা ভগবান্!"

ব্যাপারটী এই। একদিন চৈত্রমাসের দুপুরবেলা রাধারাণী ও তাহার বড় দুই ভাই বড়্‌শী দিয়া নিজেদের পুকুরে মাছ ধরিতে যায়। বাড়ী হইতে পুকুর তত দূরে নয়। সুদীর্ঘ ধৈর্য্য ধারণের পর বড় ভাই দুইটী প্রত্যেকেই দুটী একটী করিয়া মাছ পাইয়াছে। কিন্তু হায় রাধারাণীর কপাল মন্দ। সে একটীও মাছ পাইলনা। কি? সে ছোট বলিয়া মাছগুলি পর্য্যন্ত তাহাকে ভালবাস্‌লো না? বালিকার ধৈর্য্যের সীমা ভাঙিল। সে এদিক্ ওদিক্ স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াও যখন মৎস্যকুলের অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হইল, তখন ভ্রাতৃদ্বয়ের অলক্ষিতে সংলগ্ন অপর একটী পুকুরে ছিপ্ ফেলিয়া বড় বড় মাছের অপেক্ষা করিতে লাগিল। ওদিকে নীলু সরকারের কানে কে একটা সংবাদ রটাইল যে "তারাপদ সরকারের ছেলে মেয়েরা তোমার পুকুরের মাছগুলি ধরে সর্ব্বনাশ কর্‌লে, দেখ গে যাও।" রুদ্রমূর্ত্তি নীলু সরকার ক্রোধোদ্দীপ্ত কলেবরে একটী লম্ফে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পুকুর পারে উপস্থিত।

তারপর যে মর্ম্মান্তক দৃশ্যের অভিনয় হইল,—উঃ—তাহা বর্ণনা করা যে লেখনীর অনায়ত্ত! নীলুর নবীভূত রোষবহ্নি বালিকার কোমল অঙ্গে নৃশংস অত্যাচার করিয়া গেল। ননীর গড়া স্নেহের পুতুলী লৌহবজ্রের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে মুস্‌ড়িয়া গেল—যেন মাটিতে মিশিয়া গেল! আহা! এই খুকীই না একদিন তাহার মরুহৃদয়ে বিরাট স্নেহ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল? হা ভগবান্! স্নেহ দয়া মমতা মায়া—এ সমস্তও তবে তাসের ঘর! বড় ভাই দুটী তো দূর হইতে ভগিনীর দুরবস্থা দেখিয়া প্রাণভয়ে দৌড়!

ইতি মধ্যেই তারাপদ সরকারের কর্ণগোচর হইয়াছে যে তাহার ছেলে ও মেয়ে সব খুন—মুহূর্ত্তমধ্যে তারাপদ আসিয়া তাহার নব নিযুক্ত লাঠিয়াল চতুষ্টয় সহ নীলু সরকারকে আক্রমণ করিল। একা নীলু সরকার পাঁচ জনের সঙ্গে লড়িয়া, নিজের সাহায্য পক্ষ আসিবার পূর্ব্বেই—রক্তাক্ত-কলেবরে ভূতল শায়ী হইয়াছে। মাথায় প্রচণ্ড আঘাতে তাহার দেহ সংজ্ঞাহীন।

(৪)

দুই তরফে দুইজন শয্যাগত। একের অবস্থা শোচনীয় অপরের অবস্থা কিঞ্চিৎ আশাপ্রদ। আতঙ্কেই হউক, আশঙ্কায়ই হউক, অথবা অন্য কোন অপ্রকাশ্য কারণেই হউক রাধারাণীর সেই যে সে-দিন জ্বর হইয়াছে তাহার আর বিরাম নাই। ডাক্তারের রিপোর্টে প্রকাশ নীলু সরকারের অবস্থা প্রথম কয়েকদিনের অপেক্ষা এখন নাকি অনেকটা ভাল। গোটা কামারহাটিতে একটী মাত্র ডাক্তার। ইনিই দুই বাড়ীতে চিকিৎসায় নিযুক্ত। তারাপদ সরকার বিচক্ষণ লোক; পূর্ব্ব হইতেই সে ডাক্তারকে হস্তগত রাখিবার ফন্দী আটিতেছে। এই রূপ আরও দুই একটী সাক্ষী পাইলেই কার্য্যোদ্ধার হয়।

জেলার সদর মহকুমায় ফৌজদারী রুজু হইয়াছে। উভয় পক্ষই বাদী, অথচ উভয় পক্ষই প্রতিবাদী। বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক সে মোকদ্দমা। কে হারে, কে জিতে; দোদুল্যমান অবস্থা। পাড়াগাঁয়ে জালিয়াৎ, জুয়াচোর, মিথ্যাবাদী, চক্রী, নারকীর অভাব নাই। সরকার ভাইদের যাহা কিছু নগদ টাকা—অন্ততঃ লোকের মুখে মুখে প্রকাশ—সেই টাকাগুলির সদ্ব্যবহার না হইলে পেটের ক্ষুধাই মিটিবে না। তেমনতর অর্থগৃধ্নু নরপিশাচ সহরেও কম নহে, গ্রামেও কম নহে। দুইপক্ষ হইতে প্রবল তদ্বির চলিতে লাগিল। মোকদ্দমা কিছুতেই আপোষে মিটমাট হইবার নহে। গত দুই দিনের বিচারে নীলু সরকারের পক্ষেই আইনের জোর প্রবল দেখা যাইতেছে।

(৫)

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন। শয্যা শায়িতা রাধারাণী যন্ত্রণায় বিষম চট্‌ফট্ করিতেছে। একে প্রবল জ্বর, তার উপর প্রখর সূর্য্যোত্তাপ; দীর্ঘকাল যাবৎ বৃষ্টি নাই। জ্বরের টেম্পারেচার ১০৬ ডিগ্রী। মেয়ের পার্শ্বে তাহার গর্ভধারিণী, ও বাড়ীর ঝি। ভাই দুইটী বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। মাতার নয়ন দ্বয় জলভারাক্রান্ত। মাতা ও কন্যা উভয়েই কঙ্কালসার। ক্ষণে ক্ষণে বালিকা প্রলাপ বকিতেছে—"ও কাকাগো, মেরোনা—মেরোনা—তোমার পায়ে পড়ি।" তারপর অট্টহাস "হোঃ হোঃ আজ আমি কাকার সঙ্গে খাব।" ইত্যাদি

রাধারাণীর এই শোচনীয় অবস্থা তাহার স্নেহময়ী কাকীমার অবিদিত ছিল না। গতহ'প্তা একদিন ইনিও একটী কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। করুণা ও মমতার প্রতিমূর্ত্তি সরলা পত্নী স্বামীর পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়া রাধারাণীর অন্তকার অবস্থা যাহা পাড়াপড়শির মুখে শুনিয়া ছিল, তাহা স্বামীকে জানাইল। নীলু সরকার শুনিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল উপায় কি?

(৬)

সন্ধ্যা হয় হয়। প্রভাকরের প্রখর কিরণ ধারা ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। সহসা একি এ! মাথায় ব্যাণ্ডেজ, পায়ে ব্যাণ্ডেজ, গায়ে গরম কাপড় জড়ানো—ও কে রুগ্না বালিকার গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল? নীলু সরকার না?

নীলু সরকার কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। বিজন বনের মাঝে সহসা ভীষণ শার্দ্দূল দর্শনে হরিণীর যেরূপ অবস্থা হয় তারাপদ সরকারের পত্নী তদবস্থ হইয়া ত্রাসে কাঁপিতে লাগিলেন। নীলু সরকার বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে ডাকিল—"মা রাধারাণী—"

নীলু সরকার রাধারাণীর রোগজীর্ণ দেহ খানির সহিত নিজের বুক জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"এই যে আমি এসেছি-মা" স্নেহমত্ত। নীলু সরকারের সমস্ত অঙ্গ তখন স্নেহরসের প্রবল বন্যায় যেন উছলিয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, সহস্র-চুম্বনের বিশাল অমৃত সাগরে মেয়েটীকে ডুবাইয়া ফেলিয়া উহাকেও অমৃত করিয়া তোলে। কিন্তু বালিকা যে প্রায় সংজ্ঞাহীন! রাধারাণীর অবস্থা দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি গৃহ কোণ হইতে তিন চারি ঘটি ঠাণ্ডা জল আনিয়া তাহা দ্বারা রাধারাণীর মাথাটা ভালরকমে ধোয়াইয়া দিল। বালিকা চোক্ মেলিয়া চাহিয়া দেখে তাহারই প্রিয় কাকা তাহাকে বুকে জড়াইয়া রাখিয়া স্নেহ সম্ভাষণ করিতেছেন। শুষ্ক তরুতে ক্ষীণ হাসির ফুল ফুটিয়া উঠিল। সে এক দৃষ্টে যেন অবাক হইয়া কাকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ঠিক এইসময় কনিষ্ঠের বিরুদ্ধে মোকদ্দমার জটিল জাল বিস্তার করিয়া তারাপদ সরকার সদর মহকুমা হইতে বাড়ী ফিরিয়াছে—নীলু সরকার দাদার ধূলিধূসরিত পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়া আর্দ্র ও কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"দাদা সব ছেড়ে দিচ্চি—ক্ষমা কর, আমার রাধারাণী যে যায়…।"

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

শ্রাবণে।

আকাশ খানা ষোল আনা
দখল ক'রে ল'য়েছে ;
মেঘের ডাকে ভেকের রাজ্য
অবসান আজ হ'য়েছে।

অভিষেকের শান্তি ধারা
বর্ষিতেছে নিশি দিন ;
বা'রে ক্রিয়ার স্বভাব যাদের
ঘটছে তাদের অন্তরীণ।

সাহিত্যিকদের নৃত্য কৃত্যের
এই বেধেছে গণ্ডগোল
পড়তে গেলে পড়া বাঁধে
যাদের কিছু পাকছে চুল।

চসমা খানা ঘষে মেজে
খুব করে নোয়ায়ে ঘাড়
আজ আর তাদের হচ্ছে নাক
পাদ টীকার পাঠোদ্ধার।

পথে ঘাটে ছাতা ধরে যাচ্ছে
যাদের যাওয়ার কাজ—
পা দুটি খুব টিপে টিপে
কোঁচাটীরে করে ভাঁজ।

সেত্ সেতে সে পিছল পথে
কেউ হতেছে কুপোকাৎ,
কেউ করছে ঘরে বসে
মুড়ী চিড়ের মুণ্ডপাৎ !

তাস পাশার আড্ডাতে এসে
দলে দলে ঢুকছে লোক
অকাজে দিন কাটিয়ে দিয়ে
পাচ্ছে তারা মহা সুখ।

পথের ধারে গরু বাঁধা,
গোঠে এখন খেলছে ঢেউ ;
আর সকালে ধেনু ল'য়ে
মাঠের পানে যায় না কেউ।

চাষারা আজ জান লুটা'য়ে
খেতের কাজে মেতেছে ?
বাজে কথার রাজ্যে এসে
কেবল চারটা খে'তেছে।

পাখীগুলি পালিয়ে আছে
ঝোপে ঝাড়ে জঙ্গলে—
ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা হ'তে
থাকবে ব'লে মঙ্গলে।

ঘরের কোণে আটক পড়ে
শিশুর নাই সেই স্ফুর্ত্তিটুক।
গুরু গুরু শব্দ শুনে
দুরু দুরু কাঁপছে বুক।

কার যেন ম্লান মুখের ছায়ায়
জগৎখানা ভেকেছে—
দিন দুপুরে সন্ধ্যা যেন
ঘোরাল ক'রে রয়েছে।

গভীর জলের তলে গেছে
নদীর যত শুষ্ক চর
বাঁকে বাঁকে পাল তুলিয়ে
ছুটছে যত নৌ-বহর।

কেউ চলেছে বিদেশ পানে
কেউ চলেছে ভবনে,
বর্ষা ঋতুর বিজয় কেতু
উড়ছে যেন পবনে !

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ।
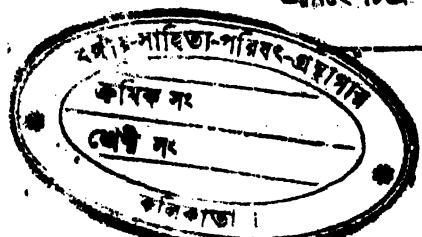
রামায়ণে জ্যোতিষ।

রামায়ণের জ্যোতিষ আলোচনা করিতে প্রথমেই একটা বিষয়ে বিশেষরূপে সন্দেহ হয় যে রামায়ণীযুগে বারের ব্যবহার ছিল কিনা? কারণ রামায়ণে বারের উল্লেখ পাওয়া যায় না। রামের জন্ম, বিবাহ, ভরতাদির জন্ম, যাত্রা প্রভৃতির বর্ণনায় তিনি নক্ষত্রেরই উল্লেখ আছে, বারের উল্লেখ নাই। আদি কাণ্ডের ১৮শ সর্গে রামের জন্ম সময়ের নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা আছে:—

"ততো যজ্ঞে সমাপ্তেতু ঋতুনাং ষট্ সমত্যয়ুঃ।
ততশ্চ দ্বাদশে মাসে চৈত্রে নাবমিকে তিথৌ॥ ৮
নক্ষত্রেঽদিতি দৈবত্যে স্বোচ্চ-সংস্থেষু পঞ্চসু
গ্রহেষু কর্কটে লগ্নে বাকপতা বিন্দুনা সহ॥ ৯

চৈত্র মাসের নবমী তিথিতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পাঁচটী গ্রহ তুঙ্গী ছিল,

শ্রীরামচন্দ্রের জন্মকুণ্ডলী।
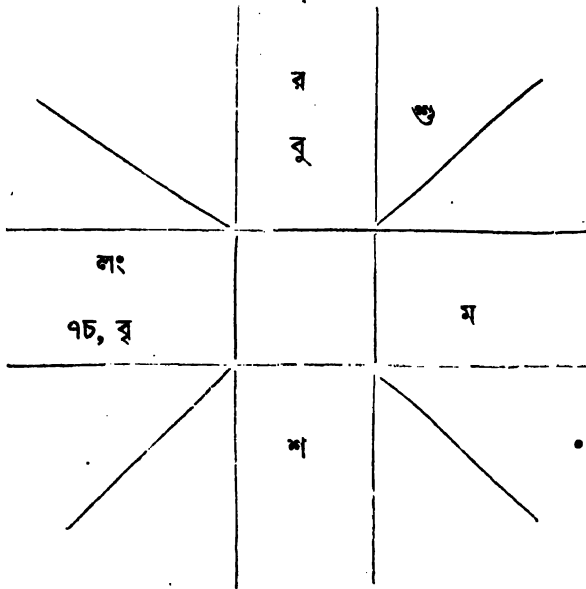
বৃহস্পতি ও চন্দ্রযুক্ত কর্কট লগ্নে তাহার জন্ম হয়। এস্থলে বারের কোনও উল্লেখ নাই। ভরতাদির জন্ম বর্ণনায়ও বারের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ভরত মীনলগ্নে পুষ্যা নক্ষত্রে; সৌমিত্রিদ্বয় অশ্লেষা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেন। রামচন্দ্র পুনর্ব্বসুতে, ভরত পুষ্যায় এবং লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন অশ্লেষায় জন্মগ্রহণ করেন, ইহাতে মনে হয়, তাঁহারা এক মাসেই ক্রমান্বয়ে তিন দিনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিম্নলিখিত শ্লোকে কর্কট রাশিতে রবির উল্লেখ থাকায় ভরতের ও সৌমিত্রি দ্বয়ের জন্ম শ্রাবণ মাসে হইয়াছিল বুঝা যায়, যথা—

পুষ্যে জাতস্তু ভরতো মীনলগ্নে প্রসন্নধীঃ।
সর্পে জাতৌতু সৌমিত্রী কুলীরেঽভ্যুদিতেরবৌ॥

অর্থাৎ—কর্কট রাশিতে রবির অবস্থান সময়ে মীনলগ্নে পুষ্যা নক্ষত্রে ভরত ও অশ্লেষা নক্ষত্রে সৌমিত্রি দ্বয় জন্মগ্রহণ করেন।

বিবাহ দিন প্রসঙ্গেও শুধু নক্ষত্রের উল্লেখ আছে, বারের কোনও উল্লেখ নাই, যথা—

"মঘা হ্যদ্য মহাবাহো তৃতীয়-দিবসে প্রভো।
ফল্গুন্যামুত্তরে রাজং তস্মিন্ বৈবাহিকং কুরু॥ ২৪

আদিকাণ্ড। ৭১ সর্গ।

রামায়ণের এই সমস্ত বচনে আরও একটী বিষয় লক্ষ্য করা যায়। যেখানেই কোনও শুভ দিনের উল্লেখ করা হইয়াছে—সেখানেই নক্ষত্রের প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। অনেক স্থলে আর কিছু উল্লেখ না করিয়া শুধু নক্ষত্র দ্বারা নির্দ্দিষ্ট দিন সূচিত হইয়াছে। লঙ্কাকাণ্ডে সুগ্রীবকে লক্ষ্য করিয়া রামচন্দ্র যে যাত্রার দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাহাতেও বারের উল্লেখ নাই, কেবল নক্ষত্র নির্দ্দেশ। যথা।—

উত্তরা ফল্গুনী হ্যদ্য শ্বস্তু হস্তেন যোক্ষ্যতে।
অভিপ্রযাম সুগ্রীব সর্ব্বানীক সমাবৃতাঃ॥ ৫

লঙ্কাকাণ্ড। ৪র্থ সর্গ।

এখানেও বারের উল্লেখ নাই শুধু নক্ষত্র দ্বারা দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে অন্য একটী কথা লক্ষ্যের বিষয়। বর্ত্তমান সময়ে যে রীতিতে দিন নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাতেও নক্ষত্রের শুভাশুভ আলোচ্য বটে, কিন্তু বার তিথি-নক্ষত্র যোগাদি বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। কিন্তু রামায়ণের সর্ব্বত্রই নক্ষত্রের প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানের সহিত এই শ্লোকে একটু সাদৃশ্য এই—বর্ত্তমান সময়ে যেরূপে তারা-শুদ্ধি দেখা হয়, রামায়ণীযুগেও সেইরূপে তারা শুদ্ধির বিচার হইত; এই শ্লোকে ইহার প্রমাণ আছে। এই শ্লোকে

রাম বলিয়াছেন—"হে সুগ্রীব, আজ উত্তরাফল্গুনী নক্ষত্র আগামী কল্য হস্তা, সুতরাং সৈন্যাদি পরিবৃত হইয়া আজই যাত্রা করিব।" হস্তা নক্ষত্রে যাত্রা না করিবার হেতু রামের জন্ম নক্ষত্র পুনর্ব্বসু। পুনর্ব্বসু হইতে গণনায় হস্তা তারা-শুদ্ধির নিয়মে নিধন তারা বলিয়া উক্তি হয়। সুতরাং তাহাতে যাত্রা নিষেধ; এই নিয়মে উত্তরাফল্গুনী নক্ষত্র সাধক তারা বটে; সুতরাং এই নক্ষত্রে যাত্রা শুভ।

বারের একমাত্র প্রমাণ স্বরূপে রামায়ণ হইতে যে বচন উল্লেখ করা যাইতে পারে, তাহা এই:—

অদ্য বার্হস্পতঃ শ্রীমান্ যুক্তঃ পুষ্যেণ রাঘব।
প্রোচ্যতে ব্রাহ্মণৈঃ প্রাজ্ঞৈঃ কেন ত্বমসি দুর্ম্মনাঃ॥
অযোধ্যাকাণ্ড। ২৬ সর্গ। ৯ শ্লোক

এই শ্লোকে বার্হস্পতঃ এই শব্দ দ্বারা কেহ কেহ বৃহস্পতিবার সমর্থন করেন, কিন্তু বৃহস্পতি শব্দ ষ্ণ প্রত্যয় করার কোনও হেতু নির্দ্দেশ তাঁহারা করেন না। কেহ কেহ বৃহস্পতি দেবতা, কেহ আবার বৃহস্পতি গ্রহযুক্ত পুষ্যা নক্ষত্র—বলিয়া অর্থ করিয়াছেন। আমরা রামায়ণের অন্য কোথাও বারের উল্লেখ দেখি নাই, এ ক্ষেত্রে বৃহস্পতিবার অর্থ করিতে স্বার্থে প্রত্যয় করিতে হয়, কিন্তু তাহা কষ্ট কল্পনা। অন্যান্য অনেক স্থলে শুভগ্রহযুক্ত নক্ষত্রের উল্লেখ করিয়া দিনের শুভত্ব সূচিত হইয়াছে, সুতরাং এ স্থলেও শুভগ্রহ বৃহস্পতিযুক্ত পুষ্যা নক্ষত্র দ্বারাই শুভদিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং তাহাই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

শুধু নক্ষত্র দ্বারা দিন নির্দ্দেশ অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না! বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে সৌরমানে যেরূপ মাসের তারিখ নির্দ্দেশ করিয়া আমরা দিন উল্লেখ করি, কাশী প্রভৃতি পশ্চিম দেশে সেরূপ নিয়ম নাই। তথায় এখনও চান্দ্রমানে তিথি দ্বারা দিন উল্লেখ করা হয়, তারিখের উল্লেখ করা হয় না। তদ্দেশীয়েরা বলেন "আজ কৃষ্ণা-চতুর্থী" "আমি শুক্লা এ দশীতে গিয়াছিলাম ইত্যাদি।" কিন্তু তাঁহারা বারেরও উল্লেখ করেন। রামায়ণে যেরূপ দিন বিষয়ে নক্ষত্রের প্রাধান্য দেখা যায় তাহাতে এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয় যে তখন নাক্ষত্রমানেরই ব্যবহার ছিল। যেমন রাম বলিতেছেন আজ উত্তরাফাল্গুনী, কাল হস্তা ইত্যাদি। অবশ্য তিথির উল্লেখ রামায়ণে আছে; সুতরাং চান্দ্রমান ব্যবহার তখন থাকা অসম্ভব নয়।

পূর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্রের যে জন্মকুণ্ডলী উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে রবি মেষ রাশিতে অবস্থিত, তাহা বৈশাখ মাসের সূচক কিন্তু চৈত্র মাসে তাঁহার জন্ম, ইহা আপাততঃ অসঙ্গত মনে হইলেও চান্দ্রমান ধরিলে অসঙ্গত বোধ হয় না। কারণ সৌরবৈশাখে অনেক সময় চান্দ্র চৈত্র হইতে পারে। শ্রীরামচন্দ্রের রাশিচক্রে দৃষ্টিপাত মাত্রই বোধ হয় যে ইহা একখানা অসাধারণ কুণ্ডলী, পাঁচটী গ্রহ তুঙ্গী, এবং পরাশর মতে দেবলোক বর্গস্থ। পরাশরে আছে—"মৎস্যাদি কল্কিপর্য্যন্তাঃ সপ্তবর্গোত্তমামতাঃ" ইহাই অবতারযোগ। "চন্দ্রপ্রভা," "ক্ষেত্রসিংহাসন," "চতুঃসাগর" প্রভৃতি যোগ হইয়াছে। সপ্তম স্থানে মঙ্গল থাকায় পত্নী স্থানের ফল সম্পূর্ণ মিলিয়াছে। দশমে পিতৃ স্থানে পাপরবি, পাপযুক্ত বুধ—অবস্থিতি করায় এবং শনি ও মঙ্গলের পূর্ণ দৃষ্টিতে দশমস্থান ক্রূরাক্রান্ত হওয়ায় জাতক পিতৃক্লেশের কারণ হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রের অন্যান্য স্থানের ফল কোষ্ঠীর সহিত ঐক্য হয়।

রামায়ণী যুগেও দৈবের উপর বিশ্বাস কত প্রবল ছিল তাহা নিম্নোদ্ধৃত সীতার উক্তিতে পাওয়া যায়:—

অথাপি চ মহাপ্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণানাং ময়াশ্রুতং।
পুরা পিতৃ গৃহে সত্যং বস্তব্যং কিলমে বনে॥৮
লাক্ষণেভ্যো দ্বিজাতিভ্যঃ শ্রুত্বাহং বচনং গৃহে।
বনবাস কৃতোৎসাহা নিত্যমেব মহাবল॥৯
অযোধ্যাকাণ্ড। ৩০ সর্গ।

অর্থ:—হে মহাপ্রাজ্ঞ আমি পিতৃ গৃহে বাসকালে ব্রাহ্মণগণের মুখে শুনিয়াছি যে আমাকে বনে বাস করিতে হইবে। আমি লক্ষণবিদ্ ব্রাহ্মণগণের মুখে আমার বনবাস অবধারিত জানিয়া নিত্যই বনগমনে উৎসুক হইয়া আছি।

বর্ত্তমান সময়েও অনেক ভিক্ষোপজীবিনী স্ত্রীলোককে অনেক গৃহস্থের অন্তঃপুরে গণনা করিতে দেখা যায়। রামায়ণেও এরূপ ঘটনার প্রমাণ আছে, সীতা বলিতেছেন:—

কন্যাচ পিতুর্গেহে বনবাসঃ শ্রুতোময়া।
ভিক্ষিণ্যাঃ শমবৃত্তায়া মম মাতুরিহাগতা॥১৬
অযোধ্যাকাণ্ড।৩০ সর্গ।

তাৎপর্য্যার্থ:— আমি কন্যাকালে পিতৃগৃহে বাস সময়ে আমার মাতৃ সমীপে আগতা ভিক্ষুণীর নিকট আমার বনবাসের বিষয় অবগত হইয়াছি।

স্ত্রীলোক সাধারণতঃ গণনাদিতে বেশী বিশ্বাসী। তাই কোনও বিশ্বস্ত শ্রুত গণনার অন্যথা হইলে তাহারা বেশী ব্যথিত হয়। তখন নিজের উপস্থিত বিপদ্ হইতেও সেই গণনাকারীর বাক্য জন্য বেশী সন্তপ্ত হয়। সীতার নিম্নোদ্ধৃত বিলাপে তাহা অতি স্পষ্ট হইয়াছে। ইন্দ্রজিৎ শরে রাম লক্ষ্মণ সংজ্ঞাহীন হইলে রাবণ সংবাদ পাইয়া তাঁহাদিগকে মৃত স্থির করিয়া সীতাকে পুষ্পকারোহণে যুদ্ধস্থল দেখিতে পাঠান। সীতা স্বামীকে মৃতপ্রায় পতিত দেখিয়া শোকাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলেন—"জ্যোতিষশাস্ত্রবিদেরাও শ্রীলক্ষ্মণবিদ্ পণ্ডিতেরা আমার শারীরিক লক্ষণ দেখিয়া আমার সম্বন্ধে যে যে শুভকর কথা বলিয়াছিলেন স্বামীর মৃত্যুতে তৎসমস্তই মিথ্যা হইয়া গেল।" (লঙ্কাকাণ্ড। ৪৮ সর্গ।)

জ্যোতির্গণনার ক্ষীণ আশাসূত্র ধরিয়া কিপ্রকারে মানুষ জীবন ধারণ করে, কতবড় অনন্ত বিশ্বাস ভরে ভবিষ্যদ্বাণীগুলি বেদবাণী বলিয়া মানিয়া লয়, এবং কোনও সময়ে সেই ফলব্যতিক্রম দেখিলে কেমন মর্ম্মন্তুদ্ যাতনায় অস্থির হয়, উল্লিখিত সীতার বিলাপই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বাল্যকালে শ্রুত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সীতার মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা ছিল, তাই—ফলব্যতিক্রম দর্শন মাত্র সেই গণনাকারীর কথা স্মরণপথে উদিত হইল। সীতা আবার বলিতেছেন—

উচুর্লাক্ষণিকা যে মাং পুত্রিণ্য-বিধবেতি চ।

তেঽদ্য সর্ব্বে হতে রামে জ্ঞানিনোঽনৃতবাদিনঃ॥৬

"যে লক্ষণবিদ্ পণ্ডিতেরা বলিয়াছিলেন, আমি পুত্রবতী হইব এবং বিধবা হইব না, আজ রামের মৃত্যুতে সেই জ্ঞানিগণ মিথ্যাবাদী হইলেন।"

ইমানি খলু পদ্মানি পাদয়োর্বৈঃ কুলস্ত্রিয়ঃ;

আধিরাজ্যেঽভিষিচ্যন্তে নরেন্দ্রৈঃ পতিভিঃসহ।

তান্যদ্য নিহতে রামে বিতথানি ভবন্তি মে॥৮

"যে চিহ্ন ধারণ করিলে স্ত্রীলোক নরেন্দ্র স্বামীর সহিত অধিরাজ্যে অভিষিক্ত হয় আমার পদদ্বয়ে সেই পদ্মচিহ্ন রহিয়াছে। আজ রাম নিহত হওয়ায় সে সমস্তই মিথ্যা হইল॥"

উল্লিখিত উক্তি হইতে তৎকালে সামুদ্রিক শাস্ত্রের বহুল চর্চ্চা ছিল, ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং রামায়ণ রচনার সময় গণিত, ফলিত ও সামুদ্রিক জ্যোতিষ বিশেষভাবে আলোচিত হইত, ইহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে।

বাল্মীকি জ্যোতিষে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং সেই জ্ঞান প্রকাশ করিতে তিনি সর্ব্বত্র সচেষ্ট ছিলেন, তাহারও প্রমাণ তাঁহার অনেক শ্লোকের উপমা পদে পাওয়া যায়। উপমার অনেক স্থলে তিনি গ্রহ নক্ষত্রাদির উল্লেখ করিয়াছেন। যথা "রোহিণী যেমন চন্দ্রের অনুগমন করে," চন্দ্র যেমন নক্ষত্রগণকে শাসন করেন," "রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায়" 'তারাগণ মধ্যে উদিত মঙ্গল গ্রহের ন্যায়,' "রাহু যেমন চন্দ্র প্রভাকে হরণ করে," "গগণে যেমন বুধ ও শুক্রের যুদ্ধ "চন্দ্র যেমন প্রতি নক্ষত্র সংক্রমন করিয়া থাকেন" ইত্যাদি

দৈব ও পুরুষকারের প্রাধান্য বিষয়ে রাম লক্ষ্মণের মুখ দিয়া ঋষি যে বাক্য প্রয়োগ করাইয়াছেন তাহাতে রাম ও লক্ষ্মণের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অতি সুন্দর ফুটিয়াছে। এই উক্তি পাঠমাত্র রামের কোমল ও সহজ অবসন্ন ভাবযুক্ত সৌম্যমূর্ত্তি এবং লক্ষ্মণের স্বাভাবিক তেজস্কর মূর্ত্তি নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হয়।

"রাম বলিলেন দৈবই আমার বনবাসের কারণ। বৎস! কর্ম্মফল ব্যতীত যাহার জ্ঞেয় আর কিছুই নাই, সেই দৈবের সহিত কোন ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সাহসী হইবে? লক্ষ্মণ কহিলেন "যে ব্যক্তি নিস্তেজ নিবীর্য্য, সেই দৈবের অনুসরণ করে। কিন্তু যাহারা বীর, লোকে যাহাদিগের বল বিক্রমের শ্লাঘা করে, তাঁহারা কদাচ দৈবের মুখাপেক্ষা করেন না। তিনি স্বীয় পুরুষের দ্বারা দৈবকে নিরস্ত করিতে পারেন; দৈববলে তাহার স্বার্থ হানি হইলেও তিনি অবসন্ন হন না।" (অযোধ্যাকাণ্ড। ২৩ সর্গ)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত।

নীহারিকা।

নবদম্পতী ;

আড় নয়নে দিনে দেখা,
মনে প্রাণে কেউ না একা ;
জড়িয়ে শুয়ে এক বিছানায়,
রাতটা কেবল গল্পে কাটায় ;
প্রেমের একটা রঙীন আলো,
দুনিয়াটাকে দেখায় ভালো !
একটা ভালবাসা-বাসি,
ডুবায় সকল দুঃখরাশি !

পল্লীকিশোরী ;

স্বর্ণ জিনি বর্ণ অতুল,
কোকিল-কালো চকচকে চুল ;
পাত্‌লা সরু ওষ্ঠ অধর,
নয় সে কচি, নয় সে নধর ;
হাঁটুতে দোলে হাল্‌কা কোমর,
হরিণ চোখে নাইসে গোঁমর ;
মুখখানি ঠিক পাকা ডালিম,
যৌবন দেছে দিচ্ছে তালিম।

প্রবাসী কেরাণী ;

তারের খবর—"শীগ্‌গির আসুন !
ছুটি না পান চাকৃরি ছাড়ুন !"
দুদিন পরে দেখেন গিয়ে,
পুত্র গেছেন ফাঁকি দিয়ে !
হায় কলেরা ! সোণার ছেলে !—
এলেন পুনঃ সব্‌কে ফেলে !
চাকৃরি বজায় রাখ্‌বে গরীব,
সব কেরাণীর এই তো নসীব !

রূপসী-বেশ্যা ;

একটা যেন ঝোড়ো হাওয়া,
একটা জীবন হারিয়ে যাওয়া ;
একটা জমাট অন্ধকার,
একটা অবুঝ অহঙ্কার ;
একটা ভীষণ জলোচ্ছ্বাস,
একটা গভীর সর্ব্বনাশ ;
একটা মহা আত্মঘাত,
একটা বিকট আর্ত্তনাদ !

পল্লীর পোষ্টমাষ্টার ;

চল্‌ছে কেবল 'টক্কা টরে,'
বাসার ভিতর খোকা মরে !
"বাবু, একটু যান ভিতরে,
বৌমা কেঁদে আছ্‌ড়ে মরে।"
আহা তোম্‌রা কাঁদ্‌ছো কেন ?
পাগল হব সত্যি যেন !
'রানার্‌' ডাকে, "ডাক এনেছি !"
রাখ্‌রে বাবা চেঁচা মেচি !

নতুন বৌ।

সঁপে দিলেন কাদের হাতে !
কাঁদ্‌ছি সদাই মর্ম্মাঘাতে !
কথায় কথায় বাপ মা তুলে,
গালি পাড়েন হৃদয় খুলে !
বাপ বিকালেন বাস্তুভিটে !
করেন এঁরা সয়তানিটে !
দেয় না যেতে বাপের বাড়ী !
হায়রে কেন হলাম নারী !

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

ময়মনসিংহ লিলিপ্রেসে শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত দ্বারা মুদ্রিত ও
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত।

১০ম বর্ষ। } ময়মনসিংহ, শ্রাবণ, ১৩২৯ সন। { ৭ম সংখ্যা।

শক্তির জাগরণ।

বিদেশীর জীয়ন কাঠির স্পর্শেই হোক্, আর তার আঘাতের প্রতিঘাতেই হোক্, ইংরেজী আমলে এদেশের বহুদিনকার নিদ্রিতসত্তা নানা দিক্‌দিয়ে—নানা ভাবের স্পন্দনের মধ্য দিয়ে আপ্‌নাকে জাগরিত করতে চেয়েছে। পশ্চিম হতে একটা নবাগত জীবন স্পন্দন তড়িৎ প্রবাহের মত তার তনুর প্রতি অনুতে অনুতে সঞ্চারিত হয়ে তাকে মুহুর্মুহুঃ সজাগ করে তুলেছে—সে তার প্রাণের তারে তারে একটা জীবনের সাড়া পেয়ে, আপনাকে স্ফুরিত করে তুলেছে—কখনো দারুণ বিদ্রোহের উন্মাদ নর্ত্তনে তার হৃদয়তন্ত্রী রুদ্র ঝঙ্কারে কেঁপে উঠেছে—কভু বা সুখের গোলাপী নেশায়, মদির আবেশে তার বহুদিবসের জড়প্রায় মস্তিষ্ক-কেন্দ্র অধীর আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ তার পুরাতন ঘুমঘোর-অবসাদ্‌ভার—পাষাণের মত তাকে আর চেপে নেই—সে সুখে দুঃখে সুদিনে দুর্দ্দিনে, জীবনের রঙ্গময় পথে হাসি কান্নার অভিনয় কর্‌বার জন্য ছুটে চলেছে।

কিন্তু আজ এক শতাব্দীর এই তার নব-জাগরণের পরেও দেখ্‌ছি, মাঝে মাঝে তার প্রাণের অবাধ গতি কেমন একটা আড়ষ্টতায় স্তব্ধ হয়ে যায়, তার জীবনের তার শিথিল হয়ে আর সেই তীব্র ঝঙ্কার অনুরণিত করে না। তার জীবনের গাঙ দুই কূল প্লাবিত করে ভাদরের ভরা বান আনে না—ভাটায় শুধু তলাকার শুষ্ক কর্দ্দমরাশি জেগে ওঠে। একটা সনাতন জড়িমা মূর্ত্তি ধরে তার নবযৌবনোদ্ভিন্ন তরুণ অঙ্গে অঙ্গে অকাল বার্দ্ধক্যের চিহ্ন এঁকে দেয়—একটা মহামৃত্যুর ছায়া তার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যের সবখানি জুড়ে তাকে চিন্তাভারক্লিষ্ট অবসাদজীর্ণ করে ফেলে।

সাময়িক সে নৈরাশ্য, সে জড়তা, সময়ের স্রোতে ভেসে যায়, যৌবনের অসহ তেজ ও প্রতাপ, তারুণ্যের উদ্দাম শক্তি আবার ফুটে ওঠে সত্য কথা, কিন্তু এই জরাভূতকে তো কিছুতেই বিদূরিত করতে পারা গেল না। অনন্ত যৌবনের সহচররূপেই যেন তার আঁচল ধরে চলেছে অনন্তমরণ তার বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তিতে।

এই জরাকে এই অবসাদকে দূর কর্‌বার কত মনীষি-কত প্রতিকারের ব্যবস্থা করে দিলেন। কেহ বা বিষ-বড়ির প্রয়োগে বিষনাশে সচেষ্ট, কেহ বা বাহ্য কোনও রসায়ন প্রয়োগে তার জীর্ণ তনুতে তরুণ অমৃত বিকাশিত কর্ত্তে ব্যাকুল, কিন্তু দেশের মূল হতে সমস্ত অক্ষমতার, অবসাদের বীজ পর্য্যন্ত কেউ নিরসনে সমর্থ হ'ল না। ভিতরকার গলদ আবৃত হল, কিন্তু আধারটি প্রকৃত শক্তিতে শক্তিমান্ হয়ে জরা-মরণের পরপারের দিকে কোনো প্রেরণা লাভ কর্‌ল না। তাই সময়ের আবর্ত্তনে দেখা দিল সেই চিরন্তন মালিন্য, অপূর্ণতা ও ক্লীবতা।

আমরা যদি একটু সমাহিত হই, তা হলে স্পষ্ট ও পরিষ্কার দৃষ্টিতে দেখতে পাব, যে জগতের সব দেশে, সমাজে ও জাতিতে এই একই জীবন মৃত্যুর, যৌবন-জরার, আলোক-ছায়ার যুগল-লীলা নেচে নেচে চলেছে। দুঃখ সুখের উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ অমৃত ও হলাহল বয়ে চলেছে বিশ্বের প্রতি আধারে আধারে। কোথাও সর্ব্বেন্দ্রিয় রসায়ণ আনন্দঘন অমৃতরূপে অন্তহীন মহিমা ফুটে ওঠেনি।

শক্তির ছড়াছড়ি ও বৃথাক্ষয়ই সর্ব্বত্র পরিস্ফুট হয়ে ওঠে—কোথাও শক্তির অফুরন্ত বিকাশ বাধাহীন বিস্তার স্পষ্ট ও অস্পষ্ট আকারে বিরাজ করছে না। যে অবসাদ আমাদের জাতীয় জীবনে অন্ধকার মূর্ত্তি প্রেতাত্মার করাল ছায়া বিস্তার করেছে, তার রেখা নবযৌবন গর্ব্বিত ইয়ুরোপ আমেরিকা, জাপান সবারই বদনে, নয়নে চিহ্নিত।

যারা আপনাদিগকে জাগ্রত, উন্নত বলে পরিচয় দিয়েছে তাদের মাঝেও দুর্ব্বলতার ছবি সুস্পষ্ট। নেপোলিয়ানের ফ্রান্স আজ কোথায়? মৃত্যুর একটা প্রলয়াত্মক বিভীষিকায় সে আজ সমাচ্ছন্ন, সে আজ মৃতপ্রায়—তার জীবনের স্ফূর্ত্তি আজ অবসন্ন প্রায়। সেদিনকার জার্ম্মেণী—যে সমগ্র পৃথিবীকে একটী গ্রাসে আত্মসাৎ কর্ত্তে চেয়েছিল—সেই বিসমার্ক-কাইজার হিণ্ডেনবার্গের বীরমহিমায় জাগ্রত সমুন্নত জার্ম্মেণী আজ শ্মশানের দৃশ্য স্মরণ করিয়ে দেয়। এখনও যারা আস্ফালন করছে তাদের জীবনযাত্রা ক্রমেই অবসাদের অচলায়তনে গতিহীন হবার উন্মুখী। সুতরাং আমরা দেখ্‌ছি সব দেশেই উন্নতি ও জাগরণ সবই অপূর্ণ ও ক্ষণিক বলে প্রমাণিত করে দিচ্ছে।

তাই আমরা জগতের এই অকাল বিধ্বংসী স্পন্দননিচয় প্রকৃত জাগরণের পরিচয় বল্‌তে পারি না, একে বল্‌তে পারি—দুঃস্বপ্নের একটা বিকার মাত্র। প্রকৃত শক্তির সাড়া এখনও আসে নাই, তাই ক্ষণিক চঞ্চলতায় সব দেশ মাত্‌ছে ও নৃত্য কর্‌ছে—তাই এর সামর্থ্য নাই—এর ধৃতি অতি ক্ষীণ—এর নাই এমন কোনও অমোঘ বীর্য্য যা দ্বারা জগত চিরন্তন সাফল্যে মণ্ডিত হয়ে উঠ্‌তে পারে।

তাই বিশ্বজীবনে অমৃত শক্তির সঞ্চারের জন্য আজ অত্যন্ত প্রয়োজন হচ্ছে নীরবতা। সবার যে শক্তি, তাতে যদি নীরবতার অনন্ত গাম্ভীর্য্য আপন সামর্থ্যে না ফুটে ওঠে তবে তা নিস্ফল—তবে তা বিকাশের মুখেই টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাবে। আজ তাই জগদ্বাসীকে "কালী বলে, হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে" ডুব দিতে হবে। এই বিশ্বের মর্ম্মমূলে রয়েছে অতল স্পর্শ, যে অমৃত রসায়ণ, তারই কূলহারা সাগরে ঝাঁপ না দিলে আজ জগত পাবে না প্রকৃত জীবনের সন্ধান, পাবে না সেই চিরযৌবন, পাবে না অনন্ত রত্নের পরিচয় যার অচপলদ্যুতি বিরাজ কর্‌ছে—সব অন্ধকারের পরপারে—সব জরামরণের অন্তরালে।

মানুষের আপনারই অন্তস্তলে যে আত্মাশক্তি রয়েছে—সকলের আদিতে—সেখানে পৌছতে যতদিন না পার্‌বে ততদিনই দুর্ব্বলতার অন্ত নাই—তাই আজ শুধু ব্যক্তি বিশেষকে নয় বিশ্ববাসীকে অন্তর্ম্মুখী হতে হবে—শক্তি সাধক হয়ে মহাশক্তির বরাভয় লাভ কর্ত্তে হবে।

মানুষের আপনারি চরমকেন্দ্রে সহস্রার শতদল হতে যে সঞ্জীবনীসুধা সহস্র ধারায় গলে পড়্‌ছে সেই অমৃত পান কর্লে মানুষ নীলকণ্ঠের মত হলাহলকে আত্মসাৎ করে ফেল্‌তে পার্ব্বে। মৃত্যুকে সে আপনার কিঙ্করে পরিণত কর্ব্বে।

মানুষের কর্ম্মকে আজ তাই মোড় ফিরিয়ে অন্তরের দিকে যাত্রা কর্‌তে হবে। তাকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আপনাকে অতিক্রম করে, নরধামকে পার হয়ে দিব্যধামের অধিকারী হতে হবে—তখনই মানুষের রচিত সৃষ্টি ধরাতে স্বর্গের সনাতন গরিমায় বিকশিত হয়ে উঠ্‌বে। তখন মানব হবে মূর্ত্তদেব বিগ্রহ—সে পাবে এমন পদ, যা অমর বাঞ্ছিত—তার কর্ম্মে তখন স্বয়ং শ্রীভগবান অবতাররূপে জন্মগ্রহণ কর্‌বেন।

শ্রী—

স্নেহের দান।

(১৫)

নিরাপদে ষ্টীমারে উঠিয়া মহিলাটীর একটা সুবিধামত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াই মাখন সেই বৃদ্ধের ও পত্নীহারা ভদ্রলোকটীর খোঁজে যাইতেছিল। মহিলাটী তাহাকে বলিলেন—"তোমার ভিজা কাপড়টা ছাড় বাবা।"

এই বলিয়া তিনি তাঁহার ব্যাগ হইতে একখানা নূতন কাপড় বাহির করিয়া মাখনের সম্মুখে ধরিলেন।

মাখন বলিল—"এই যে আমার কোমরে চাদর বাঁধা আছে; চাদর রৌদ্রে শুখাইলে পরে কাপড় শুখাইব।"

মহিলাটী কিছুতেই মাখনের কথা শুনিলেন না; তিনি মাখনকে কাপড় বদলাইতে বাধ্য করিলেন। মাখন কাপড় খানা হাতে লইয়া বলিল—"আপনার যে দুখানাই নূতন কাপড়; কম্বলখানা, ব্যাগটী, ঘটিটীও নূতন।"

মহিলাটী বলিলেন—"সে অনেক কথার কথা বাবা, তুমি আগে কাপড় বদলাও, তারপর হবে তাহা।"

মাখন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার তো দেখিতেছি দুখানা কাপড়ই সম্বল, আপনি স্নান করিয়া উপায় করিবেন কি?"

মহিলাটী বলিলেন—"তোমার কাপড়খানা ধুইয়া দাও; আমি অসুস্থ শরীরে আজ স্নান করিব না, জাহাজে আহ্নিকও করিব না।"

নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত মাখন মহিলার নূতন বস্ত্রখানা পরিধান করিয়া চাদর ও কাপড় ধুইয়া রৌদ্রে শুখাইতে দিল। তারপর সেই আঘাত প্রাপ্ত বৃদ্ধের খোজ করিতে চলিল। কিন্তু এতলোকের মধ্য হইতে সে কিছুতেই বৃদ্ধকে খোজ করিয়া উঠিতে পারিল না।

পত্নীহারা ভদ্রলোকটী মুন্সেফ। তিনি পূর্ব্ববঙ্গে বদলি হইয়া যাইতেছিলেন। তিনি ষ্টীমারে আসিয়া স্ত্রীকে ও শিশুকে এবং চাপরাসিকে পাইয়া প্রথমেই স্ত্রীর ধমক খাইয়া থতমত খাইলেন তারপর স্ত্রীপুত্রকে কেবিনে পুরিয়া চাপরাসির উপর রাগ ঝাড়িলেন।

সেকেণ্ড ক্লাশের মেইল কেবিনটা দুটা সাহেব লোকে অধিকার করিয়া লইয়াছিল। বাহিরের চারিপায়াগুলিও অধিকৃত হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং মুন্সেফ বাবু ইণ্টার ক্লাশের ডেকের উপরই শয্যা বিস্তার করিয়া বসিয়া বেশী পয়সা দিয়াও কম পয়সার ফল লাভজনিত মনের খুতখুতিতে অনেকক্ষণ বিষণ্ণ মনে বসিয়া রহিলেন। তারপর চাপরাসি চা আনিয়া দিলে পুনরায় চাপরাসির উপর সেই পুরাতন বুলি নূতন করিয়া আওড়াইয়া আওড়াইয়া চা পান করিতেছিলেন।

মাখনকে দেখিয়া চায়ের পেয়ালায় চামচ ঘুরাইতে ঘুরাইতে মুন্সেফ বাবু বলিলেন—"কি হে ছোকরা?......"

মাখন থার্ড ক্লাশের সীমানায় তার টপকাইতেছিল দেখিয়া তিনি ব্যস্তভাবে বলিলেন—"এ সেকেণ্ড ক্লাশ।"

মাখন বলিল—"ইণ্টার ক্লাশের স্থানও এই হাতার ভিতরই।"

বাবুটী মুখ বিকৃত করিলেন, আর কোন কথা বলিলেন না।

মাখন তাঁহাদের খোজ নিতে আসিয়াছিল, তাঁহার নিশ্চিন্ত অবস্থানের ও চা পানের কায়দা দেখিয়াই বুঝিয়াছিল, তিনি স্ত্রীপুত্রকে ষ্টীমারে আসিয়া পাইয়াছেন। তথাপি সে জিজ্ঞাসা করিল—"তাঁরা আগের নৌকায়ই আসিয়াছিলেন তো?"

বাবুটী আর মাখনের কথা কাণে তুলিলেন না। মাখনও তাহার সম্মানে আঘাত দেওয়া সঙ্গত মনে করিল না।

চারপায়ার উপর হইতে একটী ভদ্রলোক মাখনকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া উচ্চ কায়দায় অভিবাদন-সম্ভাষণ করিল। বয়োজ্যেষ্ঠ লোকের এরূপ ব্যবহারে সে বড়ই লজ্জিত হইয়া পড়িল। মাখন তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার নিকট আসিল। ইঁহারই স্ত্রী ও শিশুটীকে মাখন নৌকায় তুলিয়া দিতে সাহায্য করিয়াছিল।

ভদ্রলোকটী ঢাকায় ওকালতি করেন। মাখন তাঁহার পরিচয় পাইয়া ঢাকা যাত্রী সেই বিধবা মহিলাটীর কথা বলিল এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে তাঁহার গন্তব্য স্থানে যাইতে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিল। মাখন বলিল—আমার বাড়ীর অবস্থা ষ্টীমার হইতেই দেখা যাইবে। যদি অবস্থা নিরাপদ দেখি, আমি নিজেই তাঁহাকে লইয়া যাইয়া রাখিয়া আসিব। যদি না পারি, এই কার্য্যটী আপনাকে নিতান্তই করিতে হইবে।"

ভদ্রলোকটী আনন্দের সহিত স্বীকৃত হইলেন।

মাখন ঘুরিয়া আসিয়া সেই রুগ্না মহিলাটীর কাছেই বসিয়া রহিল।

মহিলাটী মাখনের ব্যবহারে ও মিষ্ট কথায় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। এইবার তাহাকে তিনি তাঁহার রোগক্লিষ্ট করুণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সংসারে তোমার আরকে আছে বাবা?"

এ করুণ-স্নেহবাণী মাখনের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিল, সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল—"সকলি ছিল মাসীমা, আমার সকলি ছিল।"

মাখনের "মাসীমা" সম্ভোধনে মহিলাটীর চক্ষে স্নেহের অশ্রু দেখা দিল। তিনি সস্নেহে মাখনের মুণ্ডিত মস্তকে হাত বুলাইয়া বলিলেন—"মহাগুরু-দশা বুঝি বাবা?"

মাখন চক্ষের জল মুছিয়া বলিল—"মায়ের শ্রাদ্ধ করিতে বাহির হইয়াছিলাম, পিতারও শ্রাদ্ধ শেষ করিয়া গৃহে যাইতেছি। গৃহও যে আছে মাসীমা তারও কোন সম্ভাবনা নাই। আর চারদণ্ড পরেই তাহাও চক্ষের সম্মুখেই দেখিতে পাইব।"

মাখনের সঙ্গে সঙ্গে মাসীমারও চক্ষু অশ্রুতে সিক্ত হইয়া পড়িল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই পদ্মার পাড়েই বাড়ী বুঝি?"

মাখন—"হাঁ, মাসিমা, একেবারে পাড়ে; যাওয়ার কালে দেখিয়া গিয়াছি, আজ আর দেখিব, ভরসা হইতেছে না।"

মাসি—"তোমার বাড়ীতে আর কে ছিল বাবা?"

মাখন দুই হাতের তালুতে চক্ষু টিপিয়া ধরিয়া জোড়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"ছিল সকলি মাসীমা, জেঠা মহাশয় ছিলেন, জেঠীমা ছিলেন, ভাই ছিল, ভগিনী ছিল ...... মাখন আর বলিতে পারিল না, তাহার চক্ষের জল, হাতের বাধা অতিক্রম করিয়া ধারা বহিয়া ছুটিল।

মাসিমা নিজ অঞ্চল দ্বারা মাখনের চক্ষু মুছিয়া দিয়া বলিলেন—"বাবা জগবন্ধু তোমার মত ছেলেকে অসহায় করিবেন না। আমিও ব্রাহ্মণের মেয়ে আমার বাক্য অন্যথা হইবে না; জগন্নাথ তোমার মঙ্গল করিবেন।"

মাসীমা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নাম কি বাবা? তোমার মার পেটের ভাইবোন্ আর কয়টী?"

মাখন বলিল—"আমার নাম মাখনলাল ভট্টাচার্য্য, আমিই পিতা মাতার একমাত্র সন্তান।"

মাসিমা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"বাবা মাখন, নিঃসহায়ের লক্ষ্য ভগবান জগবন্ধু।"

মাখন মনে বল সঞ্চয় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া ষ্টিমারের রেইলিং ধরিয়া পদ্মা তীরের অবস্থা দেখিতে লাগিল।

এদিকের অবস্থায় তত নিরাশ হইবার কারণ নাই, দেখিয়া মাখন পুনরায় মহিলাটীর নিকট বসিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিল—"ঢাকা আপনার কে আছে মাসিমা?" মাসীমা বলিলেন—"আমার এক ভাইপো আছে সেখানে।"

মহিলাটী ব্রাহ্মণ কন্যা, বয়স অনুমান ৩০।৩২। পরমা সুন্দরী, অথচ পথ চলিতেছেন একাএকা। মাখনের কৌতূহলী হৃদয় তাঁহার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সে এক দৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইল না, অনেক কথা ভাবিয়া প্রবৃত্তিও হইতেছিল না।

মহিলাটী মাখনের মনের ভাব অনুমান করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"বাবা আমার ও তোমার মত সবই ছিল, স্বামী ছিল পুত্র ছিল, ভাই ছিল, রাজার সংসার—লোক জন, পাইক বরকন্দাজ, দাস দাসী, হাতী ঘোড়া......

তিনি আর বলিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষু হইতে তীব্রবেগে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল।

মাখনের কৌতূহলাক্রান্ত দমিত প্রবৃত্তি এখন আকুল আগ্রহে মাসীমার কাহিনী শুনিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ষ্টীমারের বিরক্তিকর সুদীর্ঘ সময় সে মাসিমার রাজ সংসারের অতীত কাহিনী শুনিয়া কাটাইয়া দিবে ভাবিয়া খুব সহানুভূতির সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি একা একা আজ কোথা হইতে আসিলেন?"

মাসীমা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিলাম বাবা। "সেও এক বিরাট পর্ব্ব—মহাভারত, মাসীমা চুপ করিয়া রহিলেন।

মাখন জিজ্ঞাসা করিল—"একা গিয়াছিলেন?"

মাসী—"ভাসুরের সঙ্গে গিয়াছিলাম। লোক জন ছিল, সে প্রায় দুই মাসের কথা—যেখানে ভেদ বমি হয়; ভাসুর প্রথম নিজের বাসায়ই রাখিয়াছিলেন; অবস্থা খারাপ হইয়া দাঁড়াইলে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেন। সেখানে গিয়া আমার অবস্থা আরো খারাপ হয়। ডাক্তার ঔষধ বন্ধ করিয়া নাকি জবাব দিয়াছিলেন। তখন পুরীতে খুব মারিভয় আরম্ভ হইয়াছিল—ভাসুর আমাকে ফেলিয়াই চলিয়া আইসেন। জগবন্ধু আমাকে লইলেন না বাবা, ফিরাইয়া আনিয়াছেন।..."

মাখন বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"ভাসুর—আপনার আপন ভাসুর?"

মাখনের অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হইয়াছিল।

মাসীমা বলিলেন—"আপন ভাশুর বাবা, বিপদে কে কার আপন হয়?"

মাখন বলিল—"বিপদই মাসীমা আপন পর পরীক্ষার সময়। তার পর আপনার কি হইল?"

মাখন প্রশ্ন করিয়া পরম আগ্রহের সহিত তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তিনি বলিতে লাগিলেন—"ব্যারামের অবস্থায় কিরূপ ছিলাম বাবা, তাহা জানিনা; শুনিয়াছি আমার ভাশুর আমার মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া আমার সৎকারের জন্য কিছু টাকা হাসপাতালে পাঠাইয়া দিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। আমি আরোগ্য হইলে তাহা দ্বারাই তাঁহারা আমার লোটা কম্বল কাপড় কিনিয়া আমাকে রেলে তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন।"

মাখন—"আপনি পাণ্ডার বাড়ীতে গেলেন না কেন? তীর্থের পাণ্ডা, অসময়ে বেশ সাহায্য করে; আমি নিজে তাহার পরিচয় পাইয়াছি।"

মাসীমা বলিলেন—"আমি মরিয়াছি জানিয়া যখন ভাশুর চলিয়া গিয়াছেন, তখন আমাকে পাণ্ডা কেন বিশ্বাস করিবে। তারপর ভাশুরের মনেই বা কোন্ ইচ্ছা বাবা—আমার আর কাহাকেও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না, তাই একা একাই যাত্রা করিলাম। বাবা জগবন্ধু আমার আছেন, তিনিই কূল ধরাইবেন।"

মাখন চিন্তিত হইয়া বলিল—তবে মাসীমা আপনার বিপদ এখনও কাটে নাই। আপনি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী যাইতেছেন, আমি তাহা ভাল বুঝিতেছি না; আপনার ভাশুর যদি আপনাকে অস্বীকার করেন—তাঁহার পক্ষে অস্বীকার করাই স্বাভাবিক, কেননা বড় লোক……আর তাঁরা আপনার শ্রাদ্ধ শান্তিও করিয়া ফেলিয়াছেন……।

এই সময় তীরের দিকে চাহিতেই পদ্মার ধ্বংশ লীলার চিত্র মাখনের চক্ষে পড়িয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

মাখন দেখিতে লাগিল—কত গৃহ, দালান, কোঠা, ঘাট, মাঠ, বৃক্ষ পদ্মার গর্ভে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহা তাহার আপনার দেশ, পরিচিত স্থান। ইহার কোন্ গাছটী কোথায় ছিল, কোন্ ঘর খানা সে যাইবার সময় দেখিয়া গিয়াছে, আজ দেখিতেছেনা—একটী একটী করিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল। সে দেখিল আজ তাহার নিকট সবই যেন অপরিচিত। এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া সে তাহাদের নন্দীগ্রাম সম্বন্ধে আর কিছুতেই ভরসা রাখিতে পারিল না।

ভদ্র মহিলাটীও তারের ফাঁক দিয়া কীর্ত্তিনাশার ভাঙ্গা গড়ার অবস্থা দেখিতেছিলেন। মাখন একটী একটী করিয়া তাহার পরিচিত স্থান গুলি তাঁহাকে দেখাইতেছিল এবং তাহাদের যাইবার সময় সেই সকল স্থান হইতে কীর্ত্তিনাশা কতদূরে ছিল, তাহা অনুমানে বুঝাইতেছিল।

এইবার তাহার চক্ষে পড়িল রায়পুরের দৃশ্য। এই না রায়পুরের স্কুলগৃহ! হায়, হায়, তবে আর নন্দীগ্রাম কোথায় থাকিবে? রায়পুর ছিল পদ্মার দুই মাইল দূরে অবস্থিত, তাহার স্থান হইয়াছে এখন একেবারে পদ্মার কূলে। ঐ সেই স্কুলের মাঠের উচ্চ বৃক্ষটী—যাহার নীচে বসিয়া মধুর সহিত সে একদিন কত কথাই বলিয়াছিল। সে গাছটা তো এতদূর হইতে কখনই দেখা যাইত না! হায়, হায়, কি হইল!

এইবার মাখন দেখিল নন্দীগ্রামের অবস্থা। নন্দীগ্রাম পদ্মার গর্ভে কোথায় তলাইয়া গিয়াছে এখন সে তাহার অনুমানই করিতে পারিতেছে না, অনুমানের কোন চিহ্নও নাই—সে দিকের মাইলের পর মাইল ভূমির উপর দিয়া কূল ভাগিনী পদ্মা তাহার দিগন্ত বিস্তারী চঞ্চল অঞ্চল উড়াইয়া দিয়া অভিসার করিয়াছে।

মাখন এ দৃশ্য দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না। চীৎকার করিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার চক্ষু হইতে বর্ষার প্লাবন ছুটিয়া চলিল। মহিলাটী তাহাকে নানা কথায় প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন; কিছুতেই তাহার মনে সান্ত্বনা আসিল না। সে চিৎ হইয়া অনেকক্ষণ শুইয়া থাকিয়া চিন্তা করিল। তাহার দুই চক্ষের জল ধারায় বিধবার কম্বল ভিজিয়া গেল।

মাখন চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বলিল—"মাসীমা এইবার আমাকে বিদায় হইতে হইবে? এখন আপনার উপায়?"

মাখন তাহার কাপড়খানা বদলাইয়া লইল।

মাসীমা বলিলেন—"আমার আর উপায় অনুপায় কি বাবা? জগবন্ধুই আমার উপায়। তিনি যখন দেশের মাটিতে আনিয়াছেন তখন গতিও করিবেন।"

মাখন বলিল—"খুব সহজে যে গতি হইবে তাহা আমার মনে হইতেছে না। আপনার ভাশুর জমিদার,

আপনার সম্পত্তির লালসা যদি তাঁহার প্রবল হইয়া থাকে তবে আপনার বিপদেরও লাঞ্ছনার অবধি নাই……"

মহিলাটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—ভগবান কুলে-কপালে যাহা রাখিয়াছেন বাবা, তাহা ভোগ করিতে হইবেই……"

মাখন বলিল—"রবি বাবুর একটী গল্পে যেরূপ পড়িয়াছি, আর জাল প্রতাপচাঁদের সম্বন্ধে যেরূপ শুনিয়াছি—সেরূপ হইলে উপায় নাই।"

এই সময় ষ্টীমারের বংশীধ্বনী হইল।

মাখন বলিল—"আসুন আমার সঙ্গে মাসীমা, আমি আপনার ঢাকার বাসায় যাইবার পর্য্যন্ত আশ্রয় করিয়া রাখিয়া যাই। তিনি ঢাকার একজন উকীল, তাঁহার পরিবার সঙ্গে, তিনি আপনাকে আপনার ভাইপোর বাসায় পঁহুছাইয়া দিবেন। আমার জেঠা মহাশয়দিগের অবস্থা চিন্তা করিয়া আমি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি, নতুবা আমি নিজেই আপনাকে আপনার বাসায় রাখিয়া আসিতাম।"

মহিলাটী তেমন সকল কথাই চিন্তা করিতেছিলেন। মাখনের কথা শুনিয়া তিনি আশ্বস্তির শ্বাস ফেলিয়া কম্বল গোটাইয়া লইলেন। মাখন তাঁহার হস্ত হইতে কম্বল ও ব্যাগটী লইয়া অগ্রসর হইল। তিনি তাহার পাছে পাছে সেই তারের বেড়া দেওয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় আসিলেন।

মাখন সেই উকীল ভদ্রলোকটীকে পুনরায় বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়া বিধবার ভার তাহার উপর রাখিয়া অতি বিনীত ভাবে উভয়ের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

মহিলাটী মাখনের মাথায় ও মুখে হাত বুলাইয়া দিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। উকীলবাবু সম্মানের সহিত তাঁহাকে মেয়েদের কামড়ায় লইয়া গিয়া তাহার স্ত্রীর হেফাজতে দিলেন।

পৈত্রিক বস্তাখানা হাতে লইয়া মাখন দৌড়িয়া গিয়া নীচে নামিল। মহিলা সেই কেবিনের জানালা দিয়া নির্নিমেষ নেত্রে মাখনের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সেই নিরাশ্রয় বিধবার করুণ দৃষ্টি যেন নিরাশ্রয় বালকের উপর শান্তিপূর্ণ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছিল।

* * * *

[illegible] আসিয়া মাখন নৌকায় আশ্রয় লইল। নৌকা ব্যতীত এখন আর এ অঞ্চলে অন্য সুবিধা নাই। রায়পুরের ঘাটে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া মাখন একেবারে কিশোরী বাবুর বাসায় পঁহুছিল।

কিশোরী বাবু তাহাকে স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাইয়া বলিলেন "তোমার বিপদের কথা তোমার চিঠিতে জানিয়াছি; কিন্তু বড়ই বিপদ গিয়াছিল সে সময় আমাদের উপর দিয়া আমার বাড়ী খানাও পদ্মার গর্ভে স্থান পাইয়াছে—তাহা অবশ্যই দেখিয়া আসিয়াছ; আমিও সেই বিপদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিলাম। তা, শ্রাদ্ধাদিতো অবশ্যই কোন এক রকমে সম্পন্ন হইয়াছে?"

কিশোরী বাবুর দীর্ঘ মুখবন্ধের দিকে মাখনের লক্ষ্য ছিল না বরং তাহা তাহার নিকট বিরক্তিজনক হইয়া উঠিতেছিল। সে তাঁহার কথার কোন উত্তর না দিয়া উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল "জেটামহাশয় কোথায়?" এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া মাখন কাঁদিয়া অস্থির হইল।

কিশোরী বাবু বলিলেন—"কোন চিন্তা নাই, তোমার জেঠা মহাশয় সপরিবারে প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছেন। মধু একদিন তোমার সংবাদ লইতে আসিয়াছিল; তাহার সহিত আলাপে বুঝিলাম, তোমার পিতার মৃত্যু সংবাদ তাহারা পায় নাই। মধুর সহিত তোমার চিঠি খানা আমি তোমার জেঠা মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছি।"

এইবার মাখন নিশ্চিন্ত হইয়া কিশোরীবাবুর পূর্ব্ব প্রশ্নের সবিস্তার উত্তর প্রদান করিল।

ত্রিধারা।

(বঙ্গ সাহিত্যের উৎপত্তি বিবরণ)

ত্রিবেণীর ধারার ন্যায় ভাষা-জগতেও পদ্য গদ্য ও গীত এই ত্রিধারা বহিতেছে। স্মরণাতীত কালের ঋক, যজুঃ ও সাম পদ্য গদ্য ও গীত দ্বারা যথাক্রমে উদ্বোধিত। সুতরাং এ কথা সাহস সহকারে বলা যায় যে কি ধর্ম্মোপদেশ, কি মনস্তত্ব, পদ্য গদ্য ও গীতের সাহায্যেই অভিব্যক্তি লাভ করিয়া আসিতেছে। বেদ অপৌরুষেয়, এ হিসাবে এই ত্রিধারাকে ত্রিস্রোতারই বাচিক সংস্করণ বলা যাইতে পারে। অন্ততঃ আর্য্য হিন্দুর মনে এমনই একটী অপার্থিব ভাবের

স্ফুরণ স্বাভাবিকই বটে। যাহা হউক আমরা দেখিতেছি যে বৈদিক যুগে যাহার আরম্ভ অধুনা বঙ্গভারতীর মঙ্গলারতির দিনেও তাহার বিরাম বিচ্ছেদ ঘটিতেছে না। মুখ্যতঃ ঐ ত্রিধারাকেই আশ্রয় করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের সৃষ্টি, পুষ্টি সংসাধিত হইতেছে।

উপরে গদ্য পদ্য ও গীত এইরূপে পাঠ থাকিলেও বঙ্গ সাহিত্যে প্রথমেই কিন্তু প্রভাতের বিহগ কাকলির স্থায় বৈষ্ণব কবিগণের কলকণ্ঠ শ্রুত হওয়া যাইতেছে। তাঁহারা রাই-কানুর প্রেমালেখ্যকে লক্ষ্য স্থলে রাখিয়া সুমধুর সঙ্গীত ধারায় বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়া গিয়াছেন। এই কৃতীত্ব সাধনায় বিখ্যাত গীতগোবিন্দের কবি জয়দেবকেই অগ্রনী বলা যাইত যদি তিনি সংস্কৃত ভারতীর অযত্নসংবদ্ধ স্নেহাঞ্চল অর্থাৎ সামান্ত কয়টী অনুঃস্বার বিসর্গের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। তা না পারাতেই সেই কৃতীত্বের পূর্ণ যশোভাক হইলেন চণ্ডীদাস আর বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসেরই সমসাময়িক। তিনি বাঙ্গালী নহেন, তবু তাঁহার দান বঙ্গীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদরূপে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। নিরাভরণা মাতার আদি আভরণই চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির অমিয়সিক্ত পদাবলী। ইঁহারা ভক্ত ও সাধক কবি। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্ত ইঁহাদের মধুময় পদ আস্বাদন করিয়া ভাবসমাধি প্রাপ্ত হইতেন। এমন কি তিনি অনেক সময় ঐ সকল পদ আবৃত্তি করিয়া 'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবে শিক্ষ' দিতে চেষ্টা পাইতেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্ম প্রচারে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদশক্তিশালী সহায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অদ্যাপি বড় বড় কীর্ত্তনীয়ার দলে ঐ সমস্ত পদ-কীর্ত্তন হয়। সহস্র সহস্র লোক আত্মহারা হইয়া পুলকাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। বাঙ্গালীর আদি কবি, বঙ্গবাণীর প্রথম পূজারী চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি আমাদের যে কিরূপ গৌরবের সামগ্রী ইহাতেই অনুমেয়। বাঙ্গালীর নিজ জন চণ্ডীদাস সম্বন্ধে একজন লিখিয়াছেন "প্রেম আলেখ্যের সুনিপুন শিল্পী, প্রেম অঙ্গের বিচক্ষণ ব্যবচ্ছেদক, মহাকবি চণ্ডীদাস বঙ্গ সাহিত্যে যত্তই চির কীর্ত্তিমান। প্রেম নিরয়ের পরতে পরতে, ভাব অভাবের স্ফুরণে কুঞ্চনে, প্রেমিক প্রেমিকার আঁখিতে, শিরায় শিরায় শ্বাসে প্রশ্বাসে, পলকে পলকে যে চিত্র ফুটিয়া উঠে চণ্ডীদাস স্বকীয় বর্ণ বৈচিত্র্যময়ী তুলিকায় তাহা কি সুন্দর আঁকিয়াছেন। মধুর মদিরা রসে ভিজাইয়া সুচিক্কণ ভাব সাজাইয়া তিনি যে আস্বাদন মধুর পদাবলী গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহা ভক্তের নির্ম্মাল্য, যোগীর জপমালা, সংযোগীর মন্দারমালা, বিয়োগীর চন্দন লেপ।" ইহা শুধু লেখকের নয়, প্রত্যেক কাব্যরস পিপাসুর মর্ম্মবাণী।

মহাত্মা চণ্ডীদাস তাঁর এক একটী সঙ্গীতে নিগূঢ় প্রেম বৈচিত্র্যের এমনই একটী সহজ সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে স্নাতপরা নায়িকার সহিত অবাধে তাহার উপমা স্থাপন করা যাইতে পারে। অন্তঃস্থলে কিছুই যেন লুকাইয়া নাই, অথচ শীলতার আবরণে সকলই যেন ঢাকা আছে। স্বভাবকবি চণ্ডীদাস অবিকল প্রাণের ভাষায় তাঁহার গীত-গুলি গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বরাগের নায়িকা একান্তে করুণকণ্ঠে সখীদিগকে কহিতেছেন :—

সখিরে, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম ?
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ
জানি না কতবা মধু শ্যাম নামে আছে গো।
বদন ছাড়িতে নাহি পারে,
জপিতে জপিতে নাম অবশ তনুয়া গো
কেমনে পাইব সই, তারে ?

বর্ষীয়সী নায়িকা দেখুন কেমন কচি খুকীটির মত আধ আধ কথায় প্রাণের আকুলতা প্রকাশ করিতেছেন। এই যে একটুও শব্দাড়ম্বর নাই—ইহাতেই কিন্তু সম্ভোগ তৃষ্ণাটী চমৎকার ফুটিয়াছে। শব্দের ঘন ঘটায় আচ্ছন্ন করিলে নায়িকার প্রেমানুরাগ-রঞ্জিত হৃদয়খানি এরূপ বিশুভ্র আকাশের মত দেখা যাইত কি ? তাই বলি চণ্ডীদাস কেবল গীতই সৃষ্টি করেন নাই গীতে প্রাণ প্রতিষ্ঠাও করিয়া গিয়াছেন। এই জন্ত চারিশত বৎসরেরও উপরে তাঁর গীত গুলি কাব্যজগতে তিষ্ঠিয়া আছে।

বিদ্যাপতি মৈথিল কবি। তাঁহার ভাষাটীকে ব্রজ-বুলী বলে। বাঙ্গালা ও হিন্দী মিশ্রিত সে এক অভিনব ওজস্বল ভাষা। তাহাতে চির নবীনতা বিরাজিত। হিন্দী শব্দ যাহা গৃহীত হইয়াছে তাহা বাঙ্গালীর অন্তরে বিদ্যুতের

মত ক্রিয়া করে। বুঝিবা এই দৈবলব্ধ ভাষার সজাততা গুণেই তিনি সুধা মধুর ব্রজরস উদ্গিরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিদ্যাপতি উপমার গুরু ঠাকুর। তাঁহার বয়ঃসন্ধি, রসোদ্গার, প্রবাস ও মান পাঠ করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। এই চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই আরো কত বৈষ্ণব কবি তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত সঙ্গীত ধারাটীকে হৃষ্টপুষ্ট করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাসের গণনায় চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির অভ্যুদয়কাল ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দ। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, যদুনন্দন দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ আবির্ভূত হইয়া একশত বৎসর পরে বঙ্গসাহিত্যে পদ্যের স্রোত প্রবাহিত করিলেন। তারপর চৈতন্য লীলা অবলম্বনে বৃন্দাবনদাস, লোচন দাস, কৃষ্ণদাস, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য মঙ্গল, চৈতন্যচরিতামৃত নামে বাঙ্গালার মহাকাব্যের সৃষ্টি করিলেন; এই কাব্যস্রোতে ভক্তিজগৎ নিমজ্জিত হইল। কিন্তু বহির্জ্জগতের প্রাণ উহাতে ভিজিল না; অবশেষে ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে মহামতি কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণ মহাকাব্যের সৃষ্টি করিয়া সেই অভাবও পূর্ণ করিয়া লইলেন। পাছে পাছে মুকুন্দরাম, অযোধ্যারাম, কাশীরাম প্রভৃতি কত কত প্রতিভাবন্ত কবিই আবির্ভূত হইয়া ঐ ধারাটীকে বিপুল বেগসম্পন্ন করিয়া তুলিলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী গত হইতে লাগিল তথনও বঙ্গসাহিত্যে ত্রিধারার সংযোগ সাধিত হইল না, বঙ্গবাণীর ত্রিতন্ত্রীতে তথনও গদ্যাস্মরিত গাথা বাদিত হইতে ছিল না। অনন্তর ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজীব লোচন, চণ্ডীচরণ, রামমোহন প্রমুখ মনীষিবর্গ উদ্যোগী হইয়া শ্রীত যমুনা, পন্ত গোদাবরীর পার্শ্বে গদ্য গণ্ডকীর ধারাটীকেও সংযোজিত করিয়া দিলেন। ইহাই হইল বঙ্গসাহিত্যের উৎপত্তি ও গতি বিস্তৃতির আদি বিবরণ। পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সঙ্গীত ধারার দিক দিয়া বঙ্গসাহিত্যের আত্ম প্রকাশ, ষোড়শ ও ঊনবিংশ খ্রীষ্টাব্দে গদ্য ও পদ্য সংযোগে ত্রিধারার পরিণতি, ঐটী একটা প্রকৃষ্ট স্মরণীয় বিষয়।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কবিভূষণ।

আঁধার মাণিক।

হঠাৎ জেগে দুপুর রেতে সখ হ'লো যে ভারী,
একটুখানি তামাক খাব—অম্‌নি তাড়াতাড়ি—
পাশেই শুয়েছিলেন গিন্নি—বল্লেম ডেকে তাঁয়—
"ওঠো প্রিয়ে! পতি সেবার সময় বয়ে যায়।"

অনেক ডাকাডাকির পরে নিদ্রোত্থিতা যদা—
বল্লেন প্রিয়া যে সব কথা, মোটেই নয় তা পদ্য;
"এমন বেজায় সখ্‌টা হ'লে রাখ্‌তে হয় ভৃত্যাদি—
পোড়া কপাল এমন আমার—" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

নির্ব্বিকারে হজম করে প্রিয়ার মধু-বাণী,
চুপটী করে রইনু পড়ে—কারণ আমি জানি—
প্রিয়া আমার লাটের সভার সভ্যগণের মত,
প্রতিবাদ যা করেন মুখে—নন্‌তো কাজে তত।

"কল্লে সবুর মেওয়া ফলে"—শাস্ত্র বাক্য এটা,
ভাগ্যে আমার তৎক্ষণাৎই ফ'লে গেল সেটা;
আপন মনে কিছুক্ষণ গজর গজর করে,
খাটের উপর উঠে গিন্নি বসলেন আঁধার ঘরে।

করে হুঁকো দেশালাইটী আর তামাক টীকে,
গুরুক্ খোরের যা কিছু চাই—ছিলই পাশের দিকে;
খরচ করে একটী মোটে, দেশালাইয়ের কাঠি—
আঁধার ঘরেই তামাক গিন্নি সাজ্‌লেন পরিপাটী।

সেজে তামাক কল্‌কেটীরে দিয়ে হুঁকোর মাথে,
জ্বালিয়ে দিতে টীকেগুলি দিলেন যে "ফুঁ" তাতে।
জ্বলছে টীকে, পড়ছে আলো, প্রিয়ার মুখের পরে,
সে মুখখানির সে শোভাটী বুঝাই কেমন করে?

জমাট আঁধার মাঝে প্রিয়ার মুখটী ঝলমলে,
রক্ত কমল ফুটলো যেন দীঘির কালজলে।
আঁধার মাণিক কি যে তোমরা দেখ্‌তে যদি চাও
গিন্নী নিয়ে ঘর কর যে—আজই তামাক খাও।

শ্রীপ্রমথনাথ সান্যাল।

রামায়ণী যুগের স্থাপত্য শিল্প।

উন্নত শিল্প, উন্নত সভ্যতার পরিচায়ক। শিল্পের উন্নতি বিষয়ে রামায়ণী যুগে ভারতবর্ষের অবস্থা কেমন ছিল তাহার আলোচনা করিলে শিল্প বিজ্ঞানের এই উন্নততম যুগেও সেই সহস্র সহস্র বৎসরের প্রাচীন শিল্প-কলার কথা ভাবিয়া হর্ষে ও আনন্দে হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠে, শ্রদ্ধায় শির সেই প্রাচীনের নিকট অবনত হইয়া পড়ে।

মহাকবি বাল্মীকি তদীয় মহাকাব্য রামায়ণে তদানিন্তন কালের শিল্প নৈপুণ্যের যে সকল চিত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া ইয়ুরোপীয় শিল্প কলায় পরম শ্রদ্ধাবান পাঠকেরা তাহা হয়ত হুইলারী অনুকরণে অবিশ্বাস করিতে পারেন, কল্পনা প্রিয়তার বাহুল্য বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু ঐ সকল পাঠক সেইরূপ অবহেলার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিবার পূর্ব্বে সুবিখ্যাত ফরাসী সমালোচক সাঁবুফের কথাটী মনে করিয়া যদি একবার দেশের প্রতি একটু শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করেন তবে দেশের উপকার, তথা জাতির উপকার কিছু হউক না হউক নিজ অন্তরের অভ্যন্তরে তাহারা যথেষ্ট শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিবেন।

ফরাসী সমালোচক সাঁবুফ বলিয়াছেন—সাহিত্য কেবলি কল্পনার লীলা খেলা নহে, তাহা জাতীয় জীবনের সুন্দর প্রতিবিম্ব।

ঐতিহাসিক হুইলার সাহেবের মত সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে (১) বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। ইনি রামায়ণী যুগে ভারতবর্ষের লোক ইষ্টকের ব্যবহার জানিত বলিয়া সন্দেহ করেন এবং সেই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া রামায়ণ রচয়িতা মহাকবির বর্ণনাকে "Brahmanical Exaggerations of anceent glory" শ্লেষাত্মক ইঙ্গিতে বিশেষিত করিয়াছেন এবং অযোধ্যার চতুর্দ্দিকে যে প্রাচীর বেষ্টিত ছিল তাহা ইষ্টক বা পাথরের প্রাচীর ছিল না, সম্ভবত খুব মজবুত বাঁশের বেড়া ছিল বলিয়া অনুমান করেন। তিনি লিখিয়াছেন, "In all probability the palace was surrounded by a hedge"

(১) সাহিত্য ১৩১৬, আর্য্যাবর্ত্ত ১৩১৮

প্রাচীন ভারতের স্থপতি শিল্প সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য কতদূর সমীচীন তাহা প্রদর্শন জন্য আমরা রামায়ণী যুগের পূর্ব্বে বৈদিক যুগে, এতৎ সম্বন্ধে ভারতবাসীর কোন জ্ঞান ছিল কি না—দুই একটী কথায় তাহার উল্লেখ মাত্র করিয়া আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করিব।

ঋক বেদের প্রাচীনতা স্বদেশী-বিদেশী সকল ঐতিহাসিক এবং পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণই স্বীকার করিয়াছেন। ঋক বেদের নানা স্থানেই প্রাচীন আর্য্যদিগের স্তম্ভ বিশিষ্ট প্রাসাদ (১) পাষাণ নির্ম্মিত নগরী, (২) পাষাণ নির্ম্মিত সৌধমালা, (৩) লৌহ নির্ম্মিত নগরী (৪) এমন কি ত্রিধাতু নির্ম্মিত গৃহাদিরও (৫) উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

সুতরাং স্থপতি বিজ্ঞান যে রামায়ণীযুগের বহু পূর্ব্বেও ভারতবাসীর নিকট অপরিচিত ছিল তাহা অনুমান করিবার অবকাশ দেখা যাইতেছে না।

এইবার প্রকৃত প্রস্তাবের অবতারণা করা যাউক। রামায়ণের পঞ্চম সর্গে অযোধ্যাপুরীর বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। এই বর্ণনার বাহুল্য অংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল শিল্প সৌন্দর্য্যের হিসাবে দেখিতে গেলে দেখা যায়, অযোধ্যাপুরী ছিল—বহু তোরণ-কপাট-সমন্বিত, যন্ত্র ও শত শত শতঘ্নী অস্ত্র সমন্বিত উন্নত প্রাকারে ও পরিখায় বেষ্টিত দিব্য নগরী; তাহার স্থানে স্থানে ছিল, বধূ নাট্যশালা, বৈদেশিক রাজগণের ও বৈদেশিক বণিক সম্প্রদায়ের বাস ভবন, কোথাও বিহারার্থে গুপ্ত গৃহ। দ্বিতল ত্রিতল ও আকাশস্পর্শী বিমান গৃহাদিও পুরীর স্থানে স্থানে অবস্থিত ছিল।

কাব্যের এই বর্ণনা ইতিহাসের কষ্টি পাথরে যাচাই করিলে কত দূর উত্তীর্ণ হইতে পারে, এইবার আমরা তাহারই পরীক্ষা করিব।

মহার্ষির এই বর্ণনা কতদূর স্বাভাবিক ইহাই এ স্থলে আলোচনার বিষয়।

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে সেই যুগে ইষ্টকের প্রচলন ছিল কি না? ইষ্টকের প্রচলন থাকিলে ইষ্টক গৃহের

* (১) ২ মণ্ডল, ৪১ সূক্ত, ৫ ঋক ও ৫.৬২।৬
(২) ৪।৩০।২০
(৩) ৪।৩০।২০
(৪) ৭।১৫।১৪
(৫) ৬।৪৬।৯

অবস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যাইতে পারে, এবং এরূপ স্থলে দ্বিতল, ত্রিতল বা বিমান গৃহ শোভিত ও দুর্গ প্রাকার পরিবেষ্টিত রাজপুরীর কল্পনা কখনও অস্বাভাবিক নহে।

রামায়ণের বালকাণ্ডেই ইষ্টকের উল্লেখ আছে। এবং ঐ স্থানেই ইষ্টকালয় নির্ম্মাণেরও কথা আছে। মহারাজ দশরথ অশ্বমেদ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্টকে বিভিন্ন দেশীয় নিমন্ত্রিত রাজগণের অবস্থান উপযোগী গৃহাদি নির্ম্মাণের ভার অর্পণ করিলে মন্ত্রী স্থানীয় বশিষ্ট কর্ম্মকুশল স্থপতীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"ইষ্টকা বহু সাহস্রী শীঘ্রমানীয়তামিতি।
উপকার্য্যাঃ ক্রিয়ন্তাংচ রাজ্ঞাংবহুগুণান্বিতাঃ ॥ ৯
ব্রাহ্মণা বসথাশ্চৈব কর্ত্তব্যাঃ শতশঃশুভাঃ।
ভক্ষ্যান্ন পানৈর্ব্বহুভিঃ সমুপেতাঃ সুনিষ্ঠিতাঃ ॥ ১০
পৌরজানপদস্যাপি কর্ত্তব্যাশ্চ সুবিস্তরাঃ।
আগতানাং সুদূরাচ্চ পার্থিবানাং পৃথক পৃথক ॥ ১১
বাজিবারণ শালাশ্চ তথা শয্যাগৃহানিচ।
ভটানাং মহদাবাসা বৈদেশিক নিবাসিনাম্ ॥ ১২
আবাসা বহুবক্ষ্যাবৈ সর্ব্বকামৈরূপস্থিতাঃ।
তথা পৌরজনস্যাপি জনস্য বহুশোভনম্ ॥ ১৩
(১৩ সর্গ বালকাণ্ড।)

অর্থাৎ তোমরা বহু সংখ্যক ইষ্টক আনয়ন করিয়া নানাগুণসমন্বিত রাজযোগ্য বহুল গৃহ, ব্রাহ্মণদিগের বাসযোগ্য বহুবিধ ভক্ষ্য এবং পানযুক্ত শত শত সুদৃঢ় উত্তম গৃহ, পৌরগণের বাসযোগ্য অনেক আবাস, বহুদূর প্রদেশ হইতে সমাগত নরপতিগণের পৃথক পৃথক শয্যা-গৃহ এবং অশ্ব ও হস্তীশালা, স্বদেশী ও বিদেশী ভট্টদিগের জন্য বৃহৎ বৃহৎ বহু আবাস গৃহ এবং ইতর পৌরজনগণের বাস নিমিত্ত সমস্ত কাম্য বস্তু সমন্বিত বিবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য পূর্ণ সুশোভন অনেক গৃহ নির্ম্মাণ কর।

এই ইষ্টকের উল্লেখ আমাদিগকে স্পষ্টই বলিয়া দিতেছে যে মহর্ষি বাল্মীকি যে সময়ে এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তখন তাহার প্রচলন ও ব্যবহার ছিল। সুতরাং অযোধ্যার প্রাসাদ-প্রাচীরের অবস্থান অস্বাভাবিক নহে।

এই সমারোহ ও নিমন্ত্রণ ব্যাপারের উদ্যোগ আয়োজনের বর্ণনা আমাদিগকে আমাদের বৃটিশ রাজধানী দিল্লীর অভিষেক ব্যাপারের আয়োজন অনুষ্টানের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

ইষ্টক যে সে কালে বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে নির্দ্দিষ্ট আকারে প্রস্তুত করা হইত এবং তাহা সাময়িক অস্থায়ী কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইত তাহারও দৃষ্টান্ত রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

ইষ্টকাশ্চ যথান্যায়ং কারিতাশ্চ প্রমাণতঃ।
চিতোহগ্নি ব্রাহ্মনৈস্তত্র কুশলৈঃ শিল্প কর্ম্মণি ॥ ২৮
(১৪ সর্গ বালকাণ্ড)

অর্থাৎ তখন শিল্পকার্য্য কুশল ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রীয় পরিমাণানুসারে নির্ম্মিত ইষ্টক দ্বারা যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ড নির্ম্মান করিলেন।

ইষ্টকের ব্যবহার কোন কোন স্থলে যে শাস্ত্রানুমোদিত ছিল, এবং যজ্ঞকুণ্ড প্রভৃতি গ্রথিত করিতে ব্রাহ্মণকেও যে স্থপিত শিল্পে বিলক্ষণ দক্ষ হইতে হইত, রামায়ণের এই শ্লোকে তাহার প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

কোন কবি যাহা কখনও দর্শন করেন নাই অথবা শ্রবণও করেন নাই, এমন কোন বিষয়ের বর্ণনা তিনি কখন ও স্বাভাবিকতা রক্ষা করিয়া করিতে পারেন না। স্বর্গ ও নরকের বর্ণনা অনেক কবিই করিয়াছেন, আকাশে উদ্যান কল্পনাও আমাদের মস্তিষ্ককে সময় সময়, ভারগ্রস্ত করিয়া উঠায়। স্বপ্নেও আমরা অনেক বিচিত্র দৃশ্য দর্শন করিতে পারি। যে যে বস্তুর সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা, কল্পনা ও স্বপ্ন মূর্ত্ত্য হইয়া উঠে বিচার করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের জ্ঞানের অগোচর একটী সামান্য পদার্থেরও সেই সেই ক্ষেত্রে স্থান নাই।

অযোধ্যার বর্ণনায় "Brahmanical exaggeration of ancient glory" নাই, একথা আমরা বলিতে ছিনা, এবং বলিতে পারিওনা কিন্তু কবি তাঁহার জ্ঞান ধারণার বহির্ভূত বিষয় তাঁহার বর্ণনা-শক্তির প্রভাবে মূর্ত্ত্য করিয়া তুলিয়াছেন, একথা কেহ বলিতে পারিবেন না। কেননা এরূপ কল্পনা অস্বাভাবিক এবং অবৈজ্ঞানিক।

সুতরাং আমরা রামায়ণের বর্ণনা অনুসরণ করিয়া স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি—সরযূ তীরে নিবিষ্ট কোশল রাজধানী অযোধ্যা নগরী ছিল—কপাট তোরণান্বিতা, যন্ত্র সমন্বিতা সর্ব্বায়ুধবতী দুর্গ পরিখা বেষ্টিতা গগন স্পর্শী প্রাসাদ শিখর সমন্বিতা.. দিব্যা পুরী। (১)

ইহা রাজধানী অযোধ্যার শিল্প সৌন্দর্য্যের মোটামুটী পরিচয়। এইবার আমরা রাজ প্রাসাদাবলীর পৃথক পৃথক বর্ণনা হইতে তৎকালীন স্থপতি শিল্পের পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

মহারাজ দশরথের রাজপ্রাসাদাবলী বহুকক্ষে সুবিভক্ত ছিল। যথা কৌশল্যার কক্ষ, কৈকেয়ীর কক্ষ, শুদ্ধান্তপুর ইত্যাদি।

রাজা দশরথের মৃত্যু রাজগৃহের অষ্টম কক্ষায় হইয়া ছিল। এই অন্তঃপুরে সুমন্ত্র রামকে বনে রাখিয়া আসিয়া দশরথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। "স প্রবিশ্যাষ্টমীং কক্ষাং রাজানং দীনমাতুরম্"। ২৪
(অযোধ্যা ৫৭ সর্গ।)

রাজ ভবনে দ্বিতল ও ত্রিতল গৃহ ছিল। কৈকেয়ী ভবনের এক ছাদে থাকিয়াই তদীয়া দাসী কুব্জা কৌশল্যার ধাত্রীর নিকট রামের রাজ্যাভিষেকের সংবাদ জানিতে পারিয়াছিল। উভয় ধাত্রীই দুই পৃথক ছাদে বসিয়া রামাভিষেক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিল। (অযোধ্যা ৭ সর্গ।)

মহাকবি কৈকেয়ীর অন্তঃপুরের যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, সে বর্ণনা হইতে সেই আঙ্গিনার গৃহ সজ্জা ও শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় অবগত হওয়া যায়। সেই অন্তঃপুর অভ্যন্তরে ছিল—

লতাগৃহৈশ্চিত্রগৃহৈশ্চম্পকাশোক শোভিতৈঃ।
দান্ত রাজত সৌবর্ণ বেদিকাভিঃ সমাযুতম্॥ ১৩
নিত্যপুষ্প ফলৈর্বৃক্ষৈর্বাপীভিরুপশোভিতম্।
দান্তরাজতসৌবর্ণৈঃ সংবৃতং পরমাসনৈঃ॥ ১৪
অযোধ্যা—১০ সর্গ।

অনেক লতা নির্ম্মিত গৃহ, অনেক চিত্র শোভিত গৃহ অশোক ও চম্পক বৃক্ষ শোভিত গৃহ ছিল। অনেক সুবর্ণ ও গজদন্ত খচিত বেদিকা ছিল এবং স্থানে স্থানে গজদন্ত ও সুবর্ণের আসন সমূহ বিন্যস্ত ছিল।

ইহা একটী অতি উচ্চ শ্রেণীর সুরম্য উদ্যান বাটিকার চিত্র। ইহার রচনা রুচি ও শিল্প সৌন্দর্য্য আধুনিক বিলাশ পর তন্ত্র যুগের যে কোন বিলাশ পরায়ণ নৃপতির অন্তঃপুরবর্ত্তী উদ্যানের সহিত তুলিত হইতে পারে।

রাজ কুমারদিগের গৃহ স্বতন্ত্র ছিল এবং সে গুলি রাজপুরী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক—দূরে অবস্থিত ছিল। কুমারদিগের বাস ভবনের মধ্যে কেবল রাম ভবনের বর্ণনাই রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়। সে ভবনের আদর্শ কৈকেয়ী ভবন অপেক্ষা উন্নত ও সম্পদশালী। মহর্ষি তাহার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা এইরূপ—

সুমন্ত্র রামকে রাজাদশরথের নিকট আনয়ন করিতে রাম ভবনে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি যতই ভবনের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন ততই দেখিতে লাগিলেন—

মহাকপাট পিহিতং বিতর্দ্দিশত শোভিতম্।
কাঞ্চন প্রতিমৈকাগ্রং মণিবিদ্রোমতোরণম্॥ ৩১
শারদাভ্র ঘনপ্রখ্যং দীপ্তং মেরুগুহা সমম্।
মণিভর্ব্বিমাল্যানাং সুমহদ্ভিরলঙ্কৃতম্॥ ৩২
মুক্তামণিভিরাকীর্ণং চন্দনাগুরু ভূষিতম্।
গন্ধান্মনোজ্ঞান্ বিসৃজদ্দার্দ্দুরং শিখরং যথা॥ ৩৩
সারসৈশ্চ ময়ূরৈশ্চ বিনর্দ্দদ্ভি বিরাজিতম্।
সুকৃতেহামৃগাকীর্ণং সুৎকীর্ণ ভক্তিভিস্তথা॥ ৩৪
অযোধ্যা—১৫ সর্গ

সুমন্ত্র দেখিলেন—বৃহৎ কপাট যুক্ত অভ্র খণ্ডের ন্যায় দ্যুতি সমন্বিত ইন্দ্রালয় তুল্য রাম ভবন, তাহার চারিদিক প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। ঐ প্রাচীরের উপরিভাগে বিতর্দ্দি বা বেদিকা সমূহে শোভিত; সেই বেদিকা সমূহে সুবর্ণ নির্ম্মিত মূর্ত্তি সমূহ স্থাপিত। তোরণের বহির্দ্বার মণি ও বিদ্রুমে খচিত, উহা মধ্য-মণি শোভিত, স্বর্ণপুষ্পের মালায় সুসজ্জিত ও সূক্ষ্ম শিল্প কার্য্যে চিত্রিত, উহার স্থানে স্থানে সুবর্ণ নির্ম্মিত পশু মূর্ত্তি সমূহ উৎকীর্ণ আছে।

যাঁহারা মোগল রাজধানী দিল্লী ও আগ্রার দুর্গাভ্যন্তর স্থিত মোগল ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; নীল, পীত, লোহিত প্রস্তরের কারুকার্য্য খচিত মতি মসজিদ দেখিয়াছেন; আগ্রার তাজমহলের গাত্রে ইন্দ্রনীল ও আয়স্কান্ত মণি বিদ্রুম খচিত বিচিত্র চিত্রাবলী অবলোকন করিয়া-

(১) বালকাণ্ড ৫ম সর্গ ৫—১১ শ্লোক।

ছেন—রাম ভবনের এ বর্ণনা তাহাদের নিকট অপরিচিত বোধ হইবে না। তাহারা বুঝিতে পারিবেন, মহাকবি তেমন কোন মহা ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াই এই রূপ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এহেন রাম ভবনে প্রবেশ করিয়া সুমন্ত্র কি দেখিয়াছিলেন?

দদর্শ সুভঃপর্য্যঙ্কেসৌবর্ণেসোত্তরচ্ছেদে—উত্তম আস্তরণে আচ্ছাদিত সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে রাম সমাসিন রহিয়াছেন।

রাজধানী অযোধ্যার রাজ প্রাসাদ ও কক্ষাবলির যে সামান্য পরিচয় উপরে উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাতেই সেকালের উন্নত স্থাপত্য শিল্পের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ গুলিই যে কেবল দ্বিতল ত্রিতল ছিল, তাহা নহে; রাজধানীর অনেক গৃহই ঐরূপ ছিল। রাম পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যখন পদব্রজে যাইতেছিলেন, তখন শ্রীসম্পন্ন নাগরিকগণ স্ব স্ব উচ্চ প্রাসাদের ছাদে ও বিমান গৃহাদির চূড়ে থাকিয়া রামকে অবলোকন করিয়াছিলেন।

"ততঃ প্রাসাদ হর্ম্ম্যাণি বিমান শিখরাণিচ।
অভিরুহ্য জনঃ শ্রীমানুদাসীনো ব্যলোকয়ৎ॥" ৩
(অযোধ্যা—৩৩ সর্গ)

বিমান গৃহকে রামায়ণের টীকাকারগণ সপ্তভৌমিক গৃহ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং সেকালে সপ্ততল গৃহও ছিল বলা যাইতে পারে।

অযোধ্যার সিংহদ্বার বা প্রবেশ দ্বার খুব উচ্চ ছিল। সেই দ্বারের ভিতরদিয়া অশ্বযুক্ত রথ ও আরোহীসহ হস্তী যাতায়াত করিত। সে দ্বারের বর্ণনা পাঠ করিলে মোগল সম্রাট আকবরের দ্বিতীয় রাজধানী ফতেপুর শিখরীর আকাশ স্পর্শী প্রবেশ দ্বারের কথা আমাদের মনে পড়ে।

অযোধ্যার এক অংশে শিল্পিগণ বাস করিত। উত্তম স্থপতির উল্লেখ রামায়ণের নানা স্থানেই আছে। রামায়ণের নানা স্থানে কূপ খনন ও জল গমনাগমনের জন্য রাস্তার উপর সেতু প্রস্তুতেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু ঐ সকল কার্য্যে স্থপতির প্রয়োজন হইত কি না, তাহার কোন উল্লেখ নাই।

যাহা হউক রামায়ণীযুগে যে আর্য্য ভারতে স্থপতি শিল্পের চরম উন্নতি হইয়াছিল, আধুনিক অত্যুন্নত হর্ম্ম্য-শিল্পের সহিত আমরা তাহা তুলনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিলাম।

এইবার আমরা অনার্য্য পুরী লঙ্কার কথা আলোচনা করিব।

স্বর্ণসৌধকিরিটিনী লঙ্কার সৌন্দর্য্য ও সম্পদের নিকট স্বর্গ-বৈভব-কল্পনা পরাজিত, অযোধ্যার শিল্প-সৌন্দর্য্য তুচ্ছ, মোগল বাদসাহদিগের বিলাশ কক্ষ ও মহলনিচয় লাঞ্ছিত, এমন কি আধুনিক ইয়োরোপের নন্দন কানন, চতুর্দ্দশ লুইর বিলাস নিকেতন ভার্সেলি'র বিচিত্র রংমহাল লজ্জায় মলিন হইয়া যাইবে।

লঙ্কার রাজপ্রাসাদ ছিল, হীরক ও বৈদূর্য্য খচিত, তাহাতে গজ দন্ত, সুবর্ণ, স্ফটিক, ও রজতের রমনীয় স্তম্ভ সকল শোভিত ছিল; গৃহের গবাক্ষ সকল ছিল—গজ দন্ত ময় ও স্বর্ণ জালে জড়িত। (আরণ্য ৫৫) প্রাসাদারোহনের স্ফটিকময় সোপান পথ ছিল দুন্দুভিনাদী। (সুন্দর ৩ ও ৯) লঙ্কার দ্বারের কপাট সমূহ সমস্তই ছিল স্বর্ণ-মণি-স্ফটিক-বৈদূর্য্য-মুক্তা সমন্বিত। রাবণের গৃহ ছিল পর্ব্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত, পরিখা বেষ্টিত, বহু উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। ঐ সুরম্য নিকেতনের কোথাও বিচিত্র চিত্র গৃহ, কোথাও ক্রীড়া গৃহ, কোথাও রতি গৃহ এবং কোথাও বা দিবা বিহার গৃহ ছিল। এক স্থানে ছিল চিত্র শালা (Art Gallery), অন্যত্র দারু নির্ম্মিত ক্রীড়া পর্ব্বত (Artificial Mountain) * *

রাবণের শয়ন গৃহে ছিল স্ফটিক নির্ম্মিত বেদী। ঐ বেদী রত্ন খচিত * * * বেদীর উপর নীলকান্ত খচিত পর্য্যঙ্ক। পর্য্যঙ্কের পদ সমূহ হস্তী দন্ত রচিত ও (স্থানে স্থানে) স্বর্ণ মণ্ডিত * * শয্যা পার্শ্বে বাল ব্যজন হস্ত সর্ব্বদা ব্যজন রত। (সু—১০) * * * রাবনের রাজ সভার কুট্টিম প্রদেশ স্বর্ণ ও রৌপ্যে গ্রথিত। মধ্যস্থলে স্ফটিকও স্বর্ণ জড়িত উত্তম ছাদ। * * (লঙ্কা ১১)।

এ সম্পদের তুলনা নাই। রাবণের রত্নভূষিত সভা-গৃহের ক্ষুদ্রাদর্শ মোগল সম্রাটদিগের বিশ্ববিখ্যাত সভাগৃহ

দেওয়ান ই খাসে অনুকৃত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। এই স্তম্ভোপরি শোভিত বৃহৎ দরবার গৃহের সিংহাসনের উপর যে স্বর্ণ ও রৌপ্যমণ্ডিত ছাদ ছিল, সে ছাদ দেখিবার সুযোগ এখন আর নাই; তাহা দেখিলে এ সম্পদের কতক আভাস পাঠক পাইতে পারিতেন। জাঠেরা দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া এ স্বর্ণ চন্দ্রাতপ হইতে যে স্বর্ণ লুণ্ঠন করিয়াছিল, বৈদেশিক ভ্রমণকারীরা লিখিয়াছেন, সে গলিত স্বর্ণের ওজন হইয়াছিল এক টন। (২৮ মণ) ইহার পরও যে স্বর্ণ রহিয়াছিল তাহাও এখন আর নাই। ইহা এ কালের কথা। এখন ভাবুন সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের সেই স্বর্ণ যুগের কথা—বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত স্বর্ণলঙ্কার কথা।

এইরূপ শত শত ধ্বজপতাকা শোভিত অট্টালিকায় লঙ্কাপুরী সুশোভিত ছিল। এ সম্পদ-সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা স্থপতি শিল্পেরই আলোচনা করিতেছি, প্রসঙ্গ ক্রমে যে অন্যান্য শিল্প-সৌন্দর্য্যের উল্লেখ করা হইল, তাহা কেবল বর্ণনার পূর্ণতার জন্য মাত্র।

এই লঙ্কা পুরীর নির্ম্মাতা শিল্পীবর বিশ্বকর্ম্মা।

পালিতাং রাক্ষসেন্দ্রেণ নির্ম্মিতাং বিশ্বকর্ম্মণা।

সুন্দর—২ সর্গ ২০ শ্লোক।

এই বিশ্বকর্ম্মা কে? রামায়ণে ইহার যে সামান্য পরিচয় আছে, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে লঙ্কা, কিষ্কিন্ধ্যা, পুষ্পক বিমান প্রভৃতি ইহারই সৃষ্টি। (সুন্দরা ৮)

বিশ্বকর্ম্মার নাম প্রবাদ বাক্যের মত বর্ত্তমান সময়ও লোক মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। ইনি যে বাস্তবিক স্থাপত্য শিল্পের একজন অদ্বিতীয় শিল্পী পুরুষ ছিলেন এবং বাস্তু-শিল্প সম্বন্ধে বহু অমূল্য উপদেশ রাখিয়া গিয়াছিলেন, প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের গবেষণায় সম্প্রতি তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। "বিশ্বকর্ম্মা প্রকাশঃ" নামে সম্প্রতি যে গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে (১)। সেই গ্রন্থে বাস্তু শাস্ত্রের বহুরীতি প্রদর্শিত হইয়াছে। "ময়মত" নামক শিল্প গ্রন্থ ও বিশ্বকর্ম্মার শিল্পরীতি সম্বন্ধীয় আর একখানা গ্রন্থ। এই উভয় গ্রন্থই বিশ্বকর্ম্মার বলিয়া পরিচিত কিন্তু এই দুই গ্রন্থ এক বিশ্বকর্ম্মার নহে।

ঐতিহাসিক অক্ষয় মৈত্রের মহাশয় বহ্নি পুরাণের (গণভেদ নামক অধ্যায়) যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় সেকালে দুই ব্যক্তির বিশ্বকর্ম্মা—উপাধি ছিল; এক জনের নাম ময়, দ্বিতীয় ত্বষ্টা। যথা—

"যৌ প্রোক্তৌ বিশ্বকর্ম্মাণৌ ময়স্তষ্টাচ যোগবিৎ।
যৌ ধাতাচ বিধাতাচ পৌরাণৌ জগতঃ পতী॥"

ময় দানব কুল সম্ভূত, ত্বষ্টা ঋষিকুলোৎপন্ন। ময় প্রণীত শিল্প শাস্ত্র'ময়মত'এখনও দক্ষিণ ভারতে সম্মানিত। দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন বাস্তু রচনা-রীতিও নাকি অনেকটা ময়মত শাস্ত্রের অনুসারী। অপর পক্ষে উত্তর ভারতের ভুবনেশ্বরের মন্দির প্রভৃতি প্রাচীন সৌধ-অট্টালিকার স্থাপত্যরীতি দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার বলিয়া পরিচিত। এই উভয় বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চিন্তা করিলে মনে হয় দানব শিল্পাচার্য্য ময়-বিশ্বকর্ম্মাই দানবপুরী লঙ্কা ও দাক্ষিণাত্যের কিষ্কিন্ধার গুহা-শিল্পের শিল্পী। (২)

কিন্তু দুঃখের বিষয় রামায়ণী যুগের কোন শিল্প নিদর্শন এখন রক্ষিত নাই, যাহার সহিত উত্তরভারতের ও দক্ষিণ-ভারতের অনুসৃত বিভিন্ন বিশ্বকর্ম্মা প্রদর্শিত রচনা রীতির আলোচন করা যাইতে পারে। মহর্ষিও তাহার রচনায় এমন কোন আভাস প্রদান করেন নাই যাহাতে

১। বিশ্বকর্ম্মা প্রকাশের দুইটী সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। একটী ক্ষেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক বোম্বাই নগরে শ্রীবেঙ্কটেশ্বর মুদ্রণালয়ে, আর একটী কিষণ লাল দ্বারকা প্রসাদ কর্ত্তৃক মথুরা নগরে প্রকাশিত। গ্রন্থ খানা নাকি সম্পূর্ণ আবিষ্কৃত হয় নাই। এই গ্রন্থে ত্রয়োদশ অধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বাস্তু শিল্পের আলোচনা অধিক নাই; বাস্তু যাগাদির কথাই বেশী আলোচিত হইয়াছে। এই জন্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের মহাশয় অনুমান করেন—এই গ্রন্থ বিশ্বকর্ম্মার রচিত সম্পূর্ণ গ্রন্থ নহে। (সম্মিলন ১৩১৮ বৈশাখ।)

(২) পরবর্ত্তী যুগে যে ময় দানব যুধিষ্ঠিরের রাজ সূয় যজ্ঞসভা নির্ম্মাণ করিয়াছিল সে ময়-দানব এই ময় বিশ্বকর্ম্মা হইতে অভিন্ন কি না তাহার আলোচনা পরে করিতে চেষ্টা করিব।

মানসার নামক শিল্প গ্রন্থের আলোচনায় পণ্ডিত রামরাজ দেখাইয়াছেন,—বিশ্বকর্ম্মার চারি পুত্র ছিল; ১ম বিশ্বকর্ম্মা, ২য় ত্বষ্টা, ৩য় ময়, ৪র্থ মনু। সুতরাং নাম ধরিয়া বিচার সর্ব্বত্র নিরাপদ নহে।

তৎকালীন স্থাপত্য রীতি অনুসরণ করিয়া তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে। সুতরাং আমরাও বাধ্য হইয়া কেবল মহাকবির বর্ণনা হইতে স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শনগুলির উল্লেখ মাত্র করিয়াই সেকালের শিল্পসম্পদের পরিচয় প্রদান করিতেছি।

রামায়ণীযুগে অযোধ্যায় বিশ্বকর্ম্মার বাস্তু রচনা রীতি প্রবর্ত্তিত হয় নাই। সেখানে স্থানীয় মানব শিল্পীরাই তাহাদের নিজ নিজ শিক্ষার উৎকর্ষ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

লঙ্কার এই সকল প্রাসাদ-প্রাচীর ব্যতীত স্থপতি শিল্পের নিদর্শন স্বরূপ আর কি কি ছিল নিয়ে সংক্ষেপে তাহার পরিচয় প্রদান করা গেল।

চৈত্য প্রাসাদ (Monument) ইহা লঙ্কার রক্ষকুল দেবতার মন্দির। এই মন্দির গোলাকার এবং সহস্র স্তম্ভের উপর স্থাপিত। ইহার সোপান শ্রেণী প্রবাল গ্রথিত, বেদিকা সমূহ বিশুদ্ধ কাঞ্চন নির্ম্মিত। ইহার অভ্রচূড় আকাশ স্পর্শি। (সু—১৫)

চৈত্যপ্রাসাদ মুচ্ছ্রিতম্॥ ১৫
মধ্যে স্তম্ভ সহস্রেণ * * *।
প্রবালকৃত সোপানং তপ্তকাঞ্চন বেদিকম্॥ ১৬

পান ভূমি (Restaurant House) হনুমান লঙ্কায় গিয়া প্রথমেই এই সাধারণের পান ভোজন গৃহে বিচরণ ও বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। (সুন্দর—১১)

যাহারা আধুনিক সভ্যতার লীলা নিকেতন প্যারীর বা লণ্ডনের পান ভোজনাগারগুলির বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছেন, তাহারা সুন্দর কাণ্ডের ১১শ সর্গে বর্ণিত এই পান ভোজন গৃহটীর বর্ণনা পাঠ করিয়া উভয় বর্ণনা মিলাইয়া দেখিবেন। দেখিতে পাইবেন, বর্ত্তমান সভ্যতার (?) এই নগ্ন অনুষ্ঠানটী রাক্ষসী সভ্যতার একটী ধার করা অনুষ্ঠান ব্যতীত নুতন কিছু নহে।

স্বস্তিকাকার গৃহ (Ovel Sized) ও পদ্মাকার গৃহের উল্লেখ মাত্র আছে। কোন বর্ণনা নাই। (১)

পদ্ম স্বস্তিক সংস্থিতৈ।
বর্দ্ধমান গৃহৈশ্চাপি সর্ব্বতঃ সুবিভূষিতৈঃ। ৭

বজ্রাকার ও অঙ্কুশাকার গৃহ।

ভূমধ্যস্থ গৃহ (Subterranian Hall)।

অশ্বক্ষুরাকার গৃহ—সম্রাটের আগমনে যে Pavilion প্রস্তুত করা হইয়াছিল, বোধ হয় তাহাই ছিল অশ্বক্ষুরাকার গৃহের অনুকরণে।

সপ্ততল ও অষ্টতল গৃহ—অযোধ্যায় বিমান গৃহ ছিল এখানে (লঙ্কায়) সপ্ততল অষ্টতল গৃহের বর্ণনাও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সপ্তভৌমাষ্টভৌমৈশ্চ সদদর্শ মহাপুরীম্। ৪৯ (সু—২)

এতদ্ব্যতীত পান গৃহ, কেলি গৃহ, পুষ্প গৃহ (সু—১২)-প্রভৃতি বহু গৃহের কথা লঙ্কার বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়।

অযোধ্যা এবং লঙ্কা উভয় স্থানের বর্ণনাতেই দুর্গের উল্লেখ আছে। বর্ত্তমান সময়ের দুর্গ প্রাচীরের অবস্থান ও নির্ম্মাণ রীতি যাহারা দেখিয়াছেন বা অবগত আছেন তাহারা এই বর্ত্তমান রীতির সহিত ঋষি বর্ণিত প্রাচীন রীতি ও অবস্থার তুলনা করিয়া দেখিবেন। আমরা সংক্ষেপে লঙ্কার দুর্গ প্রাচীরের অবস্থানের বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

লঙ্কার চতুর্দ্দিকে চারিটী সুদৃঢ় দ্বার। দ্বার গুলি দৃঢ় বদ্ধ অর্গল যুক্ত। ঐ দ্বার সকলের অভ্যন্তরে শত্রু নিবারণের জন্য ইযুপল যন্ত্র সমূহ স্থাপিত আছে। উহারা সমাগত শত্রু সৈন্য বহির্দ্দেশ হইতেই নিবারিত হয়। এ দ্বার সমূহে শত শত লৌহনির্ম্মিত শতঘ্নী সমূহ স্থাপিত আছে। দুর্গ প্রকার অগাধ জলপূর্ণ পরিখা বেষ্টিত। পরিখার উপর চারি দ্বার পথে চারিটী যন্ত্র গৃহ ও যন্ত্র চালিত সেতু বর্ত্তমান। শত্রু সৈন্য সেতু পথে উপস্থিত হইলে সেই নক্র কুম্ভীর সমাকুল পরিখার জলে তাহাদিগকে সেতু সহ যন্ত্র সাহায্যে ডুবাইয়া দেওয়া হয়।

* * * * * * *

লঙ্কাপুরীতে নাদেয়, পার্ব্বতীয়, বন্য ও কৃত্রিম এই চারি প্রকার দুর্গ থাকায় এবং ঐ দুর্গ গুলি পর্ব্বতোপরি থাকায় লঙ্কা পুরী দুর্জ্জয়। (লঙ্কা সর্গ—২১—২২)

---

(১) রামায়ণের কোন কোন টীকাকার পূর্ব্ব দ্বার রহিত ঘর কে স্বস্তিকাকার ও দক্ষিণ দ্বার রহিত ঘর কে পদ্মাকার গৃহ বলেন।

অঞ্জলি।

পুনর্যৌবন।

হিন্দুদিগের অথর্ব্ববেদ, তন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদে স্থিরযৌবন ও পুনর্যৌবন লাভের নানাপ্রকার প্রণালী দৃষ্ট হয় কিন্তু অধুনা তাহার প্রয়োগ ও সাফল্য একরূপ নাই বলিলেই হয়। কিছুদিন হইতে প্রতীচীর কোনও অস্ত্রচিকিৎসা বিশারদ, বৃদ্ধকে তরুণ যুবকে পরিণত করিবার জন্ম যে গবেষণা করিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা অতীব আশ্চর্য্য জনক। এই সম্বন্ধে আজ দুই বৎসর যাবৎ নানা দেশের পত্রিকায় আলোচনা হইতেছে। সম্প্রতি বিলাতের "ডেইলি মেইল" নামক পত্রিকায় নিম্নলিখিত বিবরণ বাহির হইয়াছে।

"কিছুদিন হইল আমেরিকার বিখ্যাত ডাক্তার ষ্টিনাক (Steenack) উদ্ভাবিত পুনর্যৌবন সম্পাদক অস্ত্রোপচার কয়েকটী বৃদ্ধলোকের উপর প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে পুনর্যৌবন দান করিয়াছেন, ইহাতে আমেরিকায় হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে।

ডাক্তার ষ্টিনাক বহু বৎসর পর্য্যন্ত অতীব শ্রমসাধ্য গবেষণা করিয়া ১৯১৭ সালে তাহার এই আবিষ্কারের বিষয় জগতে স্বয়ং ঘোষণা করেন। সেই সময় হইতে জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়ার অনেক বিখ্যাত সার্জ্জন এই প্রক্রিয়া নানাক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া সর্ব্বত্র সমান ভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছেন। যুদ্ধের বহুপূর্ব্বে ডাক্তার ষ্টিনাক প্রথমতঃ পুং জাতীয় ইন্দুরের উপর ইহার পরীক্ষা করেন। পুং ইন্দুর সাধারণতঃ ২৭ মাস হইতে ৩০ মাস পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। ১৮ মাসের পরেই জরা আরম্ভ হয়। ইন্দুরের বার্দ্ধক্যের অবস্থা অতি সহজে ধরা পড়ে, তখন লোম পড়িয়া যায়, উদ্যম হীন হয়, ওজন কমে, স্ত্রী ইন্দুরের প্রতি কোনও আকর্ষণ থাকেনা ইত্যাদি। ডাক্তার ষ্টিনাক জরার মূল কারণ অবগত হইয়া ইন্দুরের যৌবন গ্রন্থি (Puberal gland) যুক্ত শুক্রনালী (sperm-duct) অস্ত্রোপচার করিয়া বাঁধিয়া দিলেন। উক্ত প্রক্রিয়ার একমাসের মধ্যে ইন্দুরটী সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল। নূতন লোমোদ্গম হইল। সতেজ ও নূতন জীবনীশক্তি সম্পন্ন হইয়া অন্যান্য ইন্দুরের সহিত মারামারি করিতে লাগিল এবং স্ত্রী ইন্দুরের প্রতি সমধিক ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিতে লাগিল। এই ভাবে ঐ ইন্দুরটী ৩৫ মাস জীবিত ছিল। সুতরাং ইহা ষোড়শ ভাগ জীবন বৃদ্ধি বলা যাইতে পারে। মানুষের পক্ষে ইহাপ্রায় ১০ দশ বৎসর বৃদ্ধি ধরা যাইতে পারে।

উক্ত প্রক্রিয়া আরও শত শত ক্ষেত্রে পরীক্ষিত হইল, এবং সর্ব্বত্র একরূপ সাফল্য প্রদান করিয়াছিল। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনার বিখ্যাত সার্জ্জন লিচ্‌টেনষ্টার্ণ (Lisch tenstern) উক্ত প্রক্রিয়া মনুষ্য দেহে পরীক্ষা করিয়া আশ্চর্য্য সাফল্য লাভ করেন। সেই হইতে তিনি ৬০ জনের উপর উক্ত প্রক্রিয়া পরীক্ষা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন একস্থলেও অকৃতকার্য্য হয়েন নাই।

ডাক্তার পিটার সিমিড্ (Peter Schmidt), ডাক্তার লিভিলেঙ (Levy leng) ডাক্তার মুহাসম্ (Muhsam) প্রভৃতি বিখ্যাত সার্জ্জনরা জার্ম্মেনীর অনেক স্থলে এই প্রক্রিয়া দ্বারা অনেককে পুনর্যৌবন দান করিয়াছেন। তাহাদের কৃতকার্য্যতার বিবরণ জার্ম্মেনী ও অষ্ট্রিয়ার অনেক বিখ্যাত মেডিকেল জার্ণালে বাহির হইয়াছে।

এই প্রক্রিয়াটী অতীব সাধারণ ব্যাপার দরকার হইলে ১৫ মিনিটের মধ্যে নড়া দাত উঠাইতে যেরূপ অসুবিধা তাহা অপেক্ষা বেশী অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। ইহার মধ্যে কোনও অতি প্রাকৃত বা গুহ্য ব্যাপার কিছুই নাই। আমাদের স্বাস্থ্য শুক্রাধার শূন্য নালীর উপর কতখানি নির্ভর করে সেবিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের ক্রমশঃই বেশী জ্ঞানলাভ হইতেছে। বোধ হয় গলগ্রন্থি (Thyroid) এবিষয়ে পূর্ব্বে তাহাদের নিকট বেশী পরিচিত ছিল।

যাহার গলগ্রন্থি নষ্ট হয় সেই হতভাগ্য উদ্ভিদের ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। যদি শৈষ্মিকগ্রন্থি (Pitnitery gland) অকর্ম্মণ্য হয় তবে মানুষ বামন অথবা দৈত্যাকারে পরিণত হইতে পারে।

যখন Pubaral glandএর কার্য্য ক্ষমতা কমিয়া যায় তখন হইতেই জরা উপস্থিত হয়। শুক্রগ্রন্থি (sherm duct) বাঁধিয়া দিলে Pubaral glandএর কার্য্য ক্ষমতা

সতেজে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সঙ্গে ২ যৌবন ফিরিয়া আসে। যৌবনের স্বাস্থ্য কার্য্যক্ষমতা, উৎসাহ প্রভৃতি আবার নবীকৃত হয়।”

উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে আমাদের দেশে ষাড় ও ছাগ প্রভৃতিকে যেভাবে খাসী করা হয় তাহার সহিত ইহার কিছু সাদৃশ্য আছে বলিয়া সন্দেহ হয়। কেননা শুক্রগ্রন্থি ছিন্ন করিয়াই খাসী করা হয়। এক্ষেত্রে ষাড়ের নিকট শুক্রগ্রন্থি সংযুক্ত নালীটী বাধিয়া দেওয়া হয়। অস্ত্রের স্থান-বিভিন্নতা ভিন্ন মূলনীতি বোধ হয় এক হইবে। এবিষয়ে ভারতে কোনও পরীক্ষা হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই; ইহা পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই।

শুক্রাধার নালীর উপর জরা নির্ভর করে, ইহাই যদি বৈজ্ঞানিকেরা জরার মূলনীতি ধরিয়া থাকেন তবে আমাদের ঋষি কথিত ব্রহ্মচর্য্য আবার ডাক্তারী বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া নূতন আকারে দেখা দিবে বলিয়া আশা করা যায়। সম্রাট্ যযাতি অনেক খোসামোদ করিয়া পুত্রের যৌবন লইয়া বিষয় উপভোগ করিয়াছিলেন। এখন অতি অনায়াসে অনেক বৃদ্ধ পুনর্ব্বার যৌবনের সাধ মিটাইতে সক্ষম হইবেন। বৃদ্ধ বয়সের অভিজ্ঞতা, পরিপক্ক জ্ঞান ও গাম্ভীর্য্যের সহিত যৌবনের সতেজ ইন্দ্রিয় কার্য্যক্ষমতা ও উৎসাহ মিলিত হইলে যে এক অপূর্ব্ব বিষয়ের সৃষ্টি হইবে তাহা ভাবিতেও আনন্দ আছে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত।

তিমি।

লণ্ডনের জুলজিকেল সোসাইটীর এনাটমিষ্ট ডাক্তার সি, এফ, সান্টাগ (Dr C. F. Sonntag) তথায় জলজাত প্রাণী সম্বন্ধে যে এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন তাহা হইতে নিম্নলিখিত তথ্য সংগ্রহ করা হইল।

তিনি বলেন এক জাতীয় তিমি মৎস্যের শারীরিক উত্তাপ ১০১ ডিগ্রি; কিন্তু তাহাদের নবজাত শিশু অনায়াসে তুষার শীতল জলে বিচরণ করিয়া থাকে, তাহাতে তাহাদের কোনরূপ অনিষ্ট হয় না। ইহাদের মত কোন প্রাণীকেই এত অল্প বয়সে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে দেখা যায় না। ব্যাঘ্র প্রভৃতির শাবকগণের শারীরিক উত্তাপ রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের মাতা শিশুগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে। কিন্তু এই তিমির ভিতরে এরূপ যন্ত্র আছে যাহাতে তাহাদের শারীরিক উত্তাপ নিয়মিত হইতে পারে। এই শিশুগণ কিরূপে আহার সংগ্রহ করে তাহা বুঝা যায় না। কিন্তু ইহারা যখন ডুব দিয়া নীচে গভীর জলে চলিয়া যায় তখন ইহাদের ফুস্ফুসে যাহাতে জল প্রবেশ করিতে না পারে সেজন্য একটী যন্ত্র আছে।

একটী প্রচলিত প্রবাদ আছে যে তিমি মৎস্যের বদ হজম হইলে ইহাদের পাকস্থলীতে এক প্রকার কস্তুরী জন্মিয়া থাকে। তিমি মৎস্য কাটল (Cuttle) নামক একরূপ কাটাযুক্ত মৎস্য ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহাদের কণ্টকময় মুখ হজম করিতে পারে না। ইহার উত্তেজনার ফলে ঐরূপ মূল্যবান কস্তুরী প্রস্তুত হয়। এই কস্তুরীর মূল্য ১½ তোলা ৭৫৲ টাকা হইতে ১৫০৲ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

এই তিমির ভিতরে এরূপ একটী যন্ত্র আছে যাহা দ্বারা তাহারা সমুদ্রগর্ভে বহুদূরের শব্দ শুনিতে পারে। যুদ্ধের সময়ে হাইড্রফন (Hydrophon) যন্ত্রদ্বারা যেরূপ বহুদূরে গত ডুবুরি জাহাজের শব্দ পাওয়া যায়; ইহাদের এই যন্ত্রেও সেই কার্য্য করিয়া থাকে।

কোন তিমি বহুদূরে থাকিয়াও কোনরূপ বিপদে পড়িলে এই যন্ত্রের সাহায্যে বিপদ সংবাদ জ্ঞাত হইয়া অপর তিমি উহার সহায়তা করিতে অগ্রসর হয়।

শ্বাস প্রশ্বাসের সময়ে তিমি মৎস্যের ফুসফুসে ১০ হইতে ১৫ গেলন রক্ত প্রতিবারে প্রবেশ করিয়া থাকে।

তিমির হৃদ্‌পিণ্ডের দ্বারা বড় রকমের একটী টব্ বোঝাই হইয়া থাকে।

তিমি আহারে কোন স্বাদ পায় না।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

নারীর সহিষ্ণুতা।

(বৈদেশিক চিত্র।)

প্রায়ই শুনা যায় যে রমণীর দৃঢ়তা পুরুষের অপেক্ষা অনেক বেশী। এমন কি, যে দৈহিক যাতনা পুরুষের কঠোর শক্তিকেও পরাভূত করে, নারিগণ তাহা অকাতরে সহ্য করিতে পারেন। নিম্নোক্ত কাহিনী আমার অন্তরে সেই ধারণা আরও বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে এবং তজ্জন্যই ঘটনাটী আমার দিন-লিপিতে স্থান লাভ করিয়াছে।

আমি কয়েক মাস পর্য্যন্ত সদাসর্ব্বদাই একটী সম্পত্তিশালী সম্ভ্রান্ত পরিবারের জনৈক মহিলার চিকিৎসা ও পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলাম। রোগিণী স্ত্রীজাতি সুলভ মারাত্মক কর্কট রোগগ্রস্ত (Cancer ক্যান্‌সার) হইয়াছিলেন। ইনি যেরূপ দৈহিক সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী ছিলেন, প্রকৃতিটীও ইঁহার তেমনি অসাধারণ মাধুর্য্য মণ্ডিত ছিল। এই দারুণ যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধির উৎপীড়ন তিনি অনন্য সাধারণ সাহস ও ধীরতার সহিত সহ্য করিতেন এবং চিকিৎসকগণ যে তাঁহার রোগযাতনা লাঘবের জন্য যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন তজ্জন্য আবেগপূর্ণ ভাষায় অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। আমি ইঁহার গুণে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে ইঁহার দুঃখে সমমর্ম্মী হইয়া পড়িয়াছিলাম। বস্তুতঃ যতদিন আমি এই মহীয়সী মহিলার সাহচর্য্য করিয়াছি তন্মধ্যে একদিনের জন্যও কোন কারণেই ইঁহাকে অসন্তুষ্টি বা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতে দেখি নাই।

একদিন প্রাতে দেখিলাম, তিনি বৈঠকখানায় একখানি সোফায় শায়িত রহিয়াছেন ; মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ, ভ্রূ কুঞ্চিত; বুঝিলাম, তিনি অতিশয় যাতনা ভোগ করিতেছেন। গত রাত্রিতে শরীরের অবস্থা কিরূপ ছিল জিজ্ঞাসা করিলাম; তিনি রোগ কম্পিত-স্বরে অথচ অশেষ ধৈর্য্য সহকারে কহিলেন—"ডাক্তার, কা'ল কি ভয়ঙ্কর রাত্রিই গিয়াছে! ভাগ্যে আমার স্বামী এখানে ছিলেন না ; থাকলে তাঁর কতই কষ্ট হইত!"—সেই সময়ে রোগিণীর একমাত্র শিশু পুত্রটী মস্তকের কুঞ্চিত কেশরাশি দোলাইয়া, নীল চক্ষে আনন্দের জ্যোতি ফুটাইয়া ছুটিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। জননীকে পাছে বিরক্ত করে এই আশঙ্কায় আমি তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া ঘড়ীটি খুলিয়া খেলিতে দিলাম। রোগিণী কিয়ৎক্ষণ নয়নানন্দ-নন্দনের মুখ পানে অসীম স্নেহ করুণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সহসা শীর্ণ তুষার শুভ্র হস্তে চক্ষু আবৃত করিলেন ; দেখিলাম, অঙ্গুলী বাহিয়া অশ্রুধারা নিপতিত হইতেছে—কিন্তু মুখে বাক্য নাই। হায় অভাগিনী জননী!—সম্মুখে স্নেহের দুলাল, পাছে তাহার কুসুম-কোমল প্রাণে ব্যথা লাগে, তাই প্রকাশ্যে কাঁদিতেও পারিলে না! ধন্য সহিষ্ণুতা।

ক্রমেই রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—অস্ত্রোপচার অনিবার্য্য হইয়া পড়িল। আমার সহিত যে বিখ্যাত অস্ত্র চিকিৎসক রোগিণীর চিকিৎসায় নিযুক্ত ছিলেন তিনি যথোচিত করুণ কোমল ভাষায় রোগিণীকে সেই বিষয় জ্ঞাপন করিলেন এবং তাঁহার অস্ত্রোপচার সহ্য করিবার সাহস আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। রমণী সস্মিত মুখে আমাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন,—তিনি ইহা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছেন এবং আত্মসমর্পণে স্থিরসংকল্প হইয়াছেন—কিন্তু দুইটী সর্ত্তে। প্রথমতঃ—তাঁহার সমুদ্রগত স্বামীকে এ সংবাদ পূর্ব্বে দেওয়া হইবে না ; দ্বিতীয়তঃ—অস্ত্রোপচার কালে তাঁহার চক্ষু বা হস্ত পদাদি আবদ্ধ করা হইবে না। তাঁহার দৃঢ়তাপূর্ণ অচঞ্চল ভাব লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম, কোন যুক্তি আপত্তি অনর্থক। অস্ত্র চিকিৎসক স্যর—আমার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইলেন। রোগিণী তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"স্যর,—আপনি যাহা চিন্তা করিতেছেন তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আশা করি আমি এমন সাহস দেখাইতে পারিব যাহা আপনি নারী-জাতির পক্ষে সম্ভাবনীয় বলিয়া এখন বিশ্বাসও করিতে পারিবেন না।" এই কথায় স্যর—এর সন্দেহ দূর হইল। অস্ত্রোপচারের জন্য পরবর্ত্তী বুধবার নির্দ্দিষ্ট হইল। বুধবার আসিল—আমি কম্পিত বক্ষে স্যর—এবং তাঁহার প্রধান ছাত্র মিঃ—র সহিত গাড়ীতে উঠিলাম। স্যর—এর ভৃত্য অস্ত্রের ব্যাগটী গাড়ীতে রাখিয়া গেল। পাঠক, হয়তো আপনি আমাকে অব্যবসায়ী মনে করিবেন, তা করুন,—আমার কিন্তু অস্ত্রের ব্যাগটী দেখিয়া শরীর শিহরিয়া উঠিল। রোগিণী সহরের বাহিরে কয়েক মাইল দূরে বাস করিতেন। আমরা বেলা দুইটার সময় তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত

হইলাম। পশ্চাতের একটী বসিবার ঘর অস্ত্রোপচারের জন্ত মনোনীত হইয়াছিল; আমরা অবিলম্বে তথায় নীত হইলাম। কক্ষের বাহিরেই সুরম্য উদ্যান—বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির অনুপম সুষমা রাশি বিতরণ করিতেছে—কিন্তু আমাদের সে সৌন্দর্য্য উপভোগের অবসর কোথায়? আমরা অস্ত্রোপচারের সাজসজ্জা করিতে নিযুক্ত হইলাম। একে একে অস্ত্রাদি সজ্জিত হইল। পটি, স্পঞ্জ, গরমজল প্রভৃতি আসিল। সব প্রস্তুত। রোগিণীকে সংবাদ দেওয়া হইল।

আমার চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া স্যর—একটী সময়োপযোগী বিদ্রূপাত্মক কাহিনীর অবতারণায় উদ্যত হইয়াছিলেন এমন সময়ে রোগিণী তাঁহার দুইজন পরিচারিকার সহিত প্রফুল্ল বদনে স্থির পদক্ষেপে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সৌন্দর্য্যের উপর এই প্রাণনাশী ভীষণ রোগের একটা আতবিদ্বেষ আছে, প্রবীণ চিকিৎসা শাস্ত্র প্রণেতা পণ্ডিতগণ ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। রোগিণীর বয়স তখন ২৬। ২৭ বৎসর। দারুণ রোগও তদানুষঙ্গিক উপসর্গাদি বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও তিনি অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন। এই সৌন্দর্য্যই তাঁহার এই দুর্দ্দশা আহ্বান করিয়াছিল। এই লাবণ্যের খনি কুসুম-কোমল দেহে অস্ত্র প্রয়োগ এবং তাহার ফলে অশেষ যাতনাও অবশ্যম্ভাবী সৌন্দর্য্য হানির বিষয় চিন্তা করিতেও আমার হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক ব্যথা অনুভূত হইতেছিল। গবাক্ষের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্রায়তন টেবিলের উপরে সুদৃশ্য কাচাধারে পোর্ট মদ্য ও পান-পাত্র ছিল, রোগিনী তৎপ্রতি ইঙ্গিত করিয়া কি যেন বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—আমি স্খলিতস্বরে বলিলাম, "অনুমতি করেন তো আপনাকে একটু পোর্ট দেই।" মহিলা মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—"যদি তাহাতে উপকার হয় তবে দিন্‌। এই বলিয়া তিনি মদ্য পূর্ণ পাত্রটী ওষ্ঠে স্পর্শ করিয়া রাখিয়া দিলেন এবং অন্য এক পাত্র সুরা হস্তে লইয়া মৃদু হাস্তে বলিলেন—"আসুন ডাক্তার, আপনারও আমারই মতন বলকারক ঔষধের প্রয়োজন, আপনিও একটু পান করুন।"—এই বলিয়া সুরাপাত্র আমার হস্তে দিলেন। পানান্তে গ্লাসটী টেবিলে রাখিতেই রোগিণী কহিলেন—'ডাক্তার! নারীর স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা মার্জ্জনা করিবেন—গত কল্য আমার স্বামীর একখানা পত্র পাইয়াছি, অস্ত্রোপচার-কালে আপনি যদি দয়া করিয়া সেই পত্রখানা আমার চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া রাখেন তবে তাঁর হস্তাক্ষরে আমি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া অক্লেশে সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিব। দেখিবেন, আর কেউ যেন তাহা দেখিতে না পায়।"

"ক্ষমা করিবেন—উহাতে আপনি বরং অধিক বিচলিত হইবেন। আমার অনুরোধ——"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই তিনি দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিলেন— ভুল বুঝিলেন ডাক্তার, উহাতেই বরং ধৈর্য্য ও শান্তি লাভ করবো।—আর যদি আমার—" "মৃত্যু হয়" বোধ হয় বলিতে যাইতেছিলেন—আবেগে কণ্ঠ হইতে বাক্য নির্গত হইল না। তিনি তুহীন-শীতল-হস্তে পত্রখানি আমার নিকট সমর্পণ করিলেন—কিন্তু হস্ত কম্পিত হইল না। আমি এই সুযোগে বলিলাম—"প্রতিদানে আপনি—অস্ত্র প্রয়োগকালে—আমাকে আপনার হস্ত ধারণের অনুমতি প্রদান করুন।"

তিনি মৃদুহাস্তে বলিলেন—"কি! আপনি ভয় পাইতেছেন ডাক্তার?"—কিন্তু আমার অনুরোধে অসম্মত হইলেন না।

এই সময়ে স্যর—প্রফুল্লচিত্তে আসিয়া রোগিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনাদের গল্প শেষ হইল? আমি এই সামান্য কাজটী শেষ করিয়া আপনাকে স্থায়ী সোয়াস্তি দিতে চাই।"

"আমি প্রস্তুত স্যর;—পরিচালকগণ স্থানান্তরে গিয়াছে তো?" প্রত্যুত্তরে জনৈক অশ্রুমুখী পরিচারিকা মস্তক সঞ্চালনে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিল। পুনর্ব্বার তিনি অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার হ্যারি?" "খেলা করছে।"—"এখন আমি প্রস্তুত"—বলিয়া তিনি একখানি কেদারায় উপবেশন করিলেন। পরিচারিকা গাত্র হইতে শালখানা তুলিয়া লইল। রুগ্ন স্থান হইতে আচ্ছাদন আবরণগুলি মোচন করিতে নিজেই অবিচলিত ভাবে সাহায্য করিতে লাগিলেন। তৎপর স্যর—র অভিপ্রায়ানুসারে তিনি আসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বীয় দক্ষিণ হস্তখানি আমার হস্তে অর্পণ করিলেন এবং আমার প্রতি ধৈর্য্য ও

সাহসিকতাব্যঞ্জক কটাক্ষপাত করিয়া মৃদুহাস্য করিলেন। সেই সুনীল চক্ষে এমনই একটা অনির্ব্বচনীয় মর্ম্মস্পর্শী রুদ্ধ আবেগ পরিলক্ষিত হইতেছিল যে তাহা দেখিয়া আমার হৃদয়ের তন্ত্রী যেন ছিন্ন হইয়া গেল! আমি তাঁহার স্বামীর সান্ত্বনাপূর্ণ পত্রখানি তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ধরিলাম, তিনি অর্দ্ধ নিমিলিত নির্ণিমেষনেত্রে শেষ পর্য্যন্ত গভীর আগ্রহে তৎপ্রতি তাকাইয়া রহিলেন। এই দারুণ সন্ধিক্ষণে আমার একমাত্র ভরসা ও সান্ত্বনা স্তর—র প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা ও অসাধারণ নৈপুণ্য।

প্রথম ছুরিকাঘাতে রমণীর সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ হইয়া গেল—অস্ত্রক্রিয়ার দুর্ব্বিসহ যাতনার লাঘবতার জন্য আমি অন্তরের সহিত রোগিণীর মূর্চ্ছার কামনা করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহা হইল না। সেই দীর্ঘকাল ব্যাপী ভীষণ যন্ত্রণাপ্রদ অস্ত্রক্রিয়াকালে তিনি একবার নড়িলেন না—একটী কাতরোক্তিও উচ্চারণ করিলে না; কেবল অনিমেষ নয়নে তাঁহার প্রেমময় স্বামীর প্রীতিপদ হস্তলিপি একাগ্রচিত্তে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। সমস্ত কার্য্য শেষ হইয়া গেলে অস্ফুট স্বরে কেবল কহিলেন—"ডাক্তার! সব হইল তো?"

আমি বলিলাম—"হাঁ"—আমরা এখনই আপনাকে শয্যায় লইয়া যাইব।"

তিনি কহিলেন—"না—না—আমি বোধ হয় হাঁটিতে পারিব; চেষ্টা করিয়া দেখি—"

এই বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিতে চেষ্টা করিতেই স্তর্ বাধা দিয়া বলিলেন—ইহাতে সাংঘাতিক বিপদ ঘটিতে পারে। রোগিনী শান্ত নিবৃত্ত হইলেন। আমরা তাঁহাকে বহন করিয়া শয্যায় লইয়া গেলাম। শয্যায় শায়িত হইবা মাত্র প্রবল প্রতিক্রিয়ার ফলে তিনি সম্পূর্ণ অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। স্তর—অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন; কিন্তু নিদ্রাকারক ঔষধের ক্রিয়ায় কয়েক ঘণ্টা সুনিদ্রার ফলে রোগিণী পুনঃ সংজ্ঞা লাভ করিলেন।

রোগিণী সুস্থতা লাভ করিলেন,—কিন্তু দীর্ঘকালে। বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য সমুদ্রোপকূলে যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি বিশেষ যত্ন ও আগ্রহ সহকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতাম। এমন কি দিনে দুই তিন বারও তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম। শেষ দিনের স্মৃতিটুকু আজও আমার স্মরণ-পথে জাগরূক রহিয়াছে, বোধ হয় কখনও বিস্মৃত হইব না। কথা প্রসঙ্গে রোগিণী তাঁহার অস্ত্রোপচারজনিত সৌন্দর্য্যহীনতার উল্লেখ করিলে আমি সেই ক্ষেত্রোপযোগী সান্ত্বনাসূচক প্রবোধবাক্য বলিতেছিলাম—সহসা তাঁহার বদন মণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল, তিনি স্খলিত বচনে কহিলেন—"কিন্তু ডাক্তার! আমার স্বামী বোধহয় আমাকে এখনও ভাল বাসিবেন।"

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

অর্থনীতির প্রথম পাঠ।
রাজকর।

আমরা সকলেই কোনও না কোনও প্রকার রাজকর দিয়া থাকি। যাঁহারা প্রত্যক্ষ ভাবে কোনও প্রকার কর না দেন, অপ্রত্যক্ষ ভাবে কোন প্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয় কালীন সেই সেই বস্তুর মূল্যের সঙ্গে সংমিশ্রিত গবর্ণমেণ্ট নির্দ্ধারিত শুল্ক তাঁহাদেরও একেবারে কম যায় না। এই সকল নানাপ্রকারের রাজকর আমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অনুকূল কি প্রতিকূল তাহা অনেকেই অনুধাবন করিতে পারে না। এই প্রবন্ধে আমরা তৎ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। করদাতাগণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠি লইয়া বিভিন্ন রাজকরের ঔচিত্যানুচিত্য বিচার করিতে হইলে আমাদের প্রধানতঃ একটী মূলনীতি সম্বন্ধে কিছু বুঝিতে হইবে। সেটীকে ইংরেজী অর্থনীতি বেত্তাগণ "Doctrine of maximum satisfaction" নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই শব্দটীর বাঙ্গালা পরিভাষা এখনও গঠিত হয় নাই। সুতরাং ইহার মোটামুটি ভাবটী প্রথমে বুঝাইতে চেষ্টা করা গেল।

প্রত্যেক দেশেই অথবা প্রত্যেক সমাজেই ধনী ও দরিদ্র উভয় শ্রেণীর লোক বাস করে; এবং তাহার মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যাই অধিক। দরিদ্রের হাতে অর্থ থাকে ধনীর চেয়ে অনেক কম সুতরাং দরিদ্রের জীবন রক্ষণোপযোগী কিংবা জীবনের উন্নতি বিধায়ক ব্যয় সঙ্কুলন হইয়া তাহার হাতে টাকা অতিরিক্ত থাকে না। অথবা থাকিলেও

তাহার পরিমাণ ধনীর তুলনায় অনেক কম, সেইজন্য দরিদ্রের অর্থের মূল্য ধনীর অপেক্ষা অনেক বেশী। কোন কোন স্থলে দরিদ্রের এক টাকা ধনীর একশত টাকার সমান হইতে পারে; অবশ্য তাহা আপেক্ষিক ধনবত্তা কিংবা দারিদ্র্যের উপর নির্ভর করে। অতএব কোনও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে আমরা যতই বেশী টাকা ধনীর নিকট হইতে আদায় করিয়া সাধারণের সৌকার্য্যার্থে ব্যয় করিতে পারিব ততই অপেক্ষাকৃত বহুল দরিদ্রলোকের সুখ বাড়িবে; এবং এইরূপ যাহার টাকার মূল্য কম, তাহার নিকট হইতে টাকা সরাইয়া যাহার টাকার মূল্য বেশী তাহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইলে সমাজের মোট সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী হয়। ইহাই মোটামুটি "Doctrine of maximum satisfaction."

তাই গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিত যে কর যতই এই নীতি দ্বারা সমর্থিত, ততই সেই কর নৈতিক হিসাবে আমাদের গ্রাহ্য।

রাজকর মোটামুটি দুই প্রকারের। একটা প্রত্যক্ষ—যাহা প্রত্যক্ষভাবে আমরা সরকারকে দেই; যথা—আয়কর, ভূমিকর ইত্যাদি। আর একপ্রকার "অপ্রত্যক্ষ" যাহা আমরা অপ্রত্যক্ষ ভাবে আবশ্যক বস্তু ক্রয় করার সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিত শুল্ক ভাবে দেই। "অপ্রত্যক্ষ" করের সম্বন্ধে আলোচনা আমরা পরে করিতেছি, প্রথমতঃ প্রত্যক্ষ করের সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাউক। এইস্থলে এই কথা বলা আবশ্যক যে, অপ্রত্যক্ষ কর আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত নীতি অনুসারে অপেক্ষাকৃত দোষাক্ত; কারণ অপ্রত্যক্ষ করের বোঝা দরিদ্র সাধারণের উপরই বেশী চাপে। যে দেশের গবর্ণমেণ্ট সাধারণতঃ প্রজা-সাধারণের সন্তুষ্টি এবং দেশপ্রাণতা হইতে পৃথক ভাবে অবস্থান করে সেই গবর্ণমেণ্টই সাধারণতঃ "প্রত্যক্ষ" অপেক্ষা "অপ্রত্যক্ষ" আয়ের জন্য চেষ্টিত হয়; আর যে গবর্ণমেণ্ট সম্মিলিত প্রজাশক্তির প্রতিবিম্ব এবং প্রজা-সাধারণের স্বার্থের অনুকূল সেই গবর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষভাবে কর স্থাপন করিতে কখনও ভীত বা পরাঙ্মুখ হয় না।

প্রত্যক্ষ কর কি ভাবে ধার্য্য হইলে আমাদের পূর্ব্বোক্ত নীতির অনুমোদিত হইতে পারে এ স্থলে তাহাও আমাদিগকে দেখিতে হইবে। করের ধার্য্য প্রণালী আমরা আপাততঃ এই কয় প্রকার দেখিতে পাই যথা—(১) সম পারিমাণিক (Proportional) (২) ক্রম হ্রাসমান (Regressive) এবং (৩) ক্রমবিবর্দ্ধমান (Progressive & Degressive)। প্রথম প্রণালী অনুসারে আর্থিক ক্ষমতার গুণানুসারে অবিকল সম পরিমাণে কর বাড়িতে থাকে। যথা—বার্ষিক আয় এক হাজার টাকা এমন একজনের যদি কর হয় ১০৲ দশ টাকা, সেইস্থলে আর একজন ঠিক তাহার দ্বিগুণ আয় সম্পন্ন হইয়া কর দেয় ঠিক ২০৲ কুড়ি টাকা। করের এই অনুপাত রীতি মূল আলোচ্য নীতি দ্বারা সমর্থিত হইতে পারে না। কারণ দ্বিগুণ আয় সম্পন্ন ব্যক্তির অর্থের মূল্য প্রথমোক্ত অপেক্ষাকৃত, কম আয় সম্পন্ন ব্যক্তি অপেক্ষা কম। অতএব হয় দুই হাজার টাকা আয়ের উপর কর আরও বেশী হওয়া উচিত ছিল কিংবা অল্প ব্যক্তির (হাজার টাকা আয়ের) কর আরও কম হওয়া উচিত ছিল। দরিদ্র এবং ধনীর সমান কর কখনও ন্যায় সঙ্গত হইতে পারে না। আর দ্বিতীয় প্রকারের কর ধার্য্য প্রণালী (ক্রম হ্রাসমান Regressive অর্থাৎ ধনবত্তার সঙ্গে সঙ্গে করেরও হ্রাস হওয়া) কোনও গবর্ণমেণ্ট তাহার ন্যায়ের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়া অনুসরণ করিতে পারে না। ধরুণ—এক হাজার টাকা আয়ের উপর দশ টাকা কর হইলে দুই হাজার টাকা আয়ের উপর ৮৲ টাকা কখনও ন্যায়ানুমোদিত হইতে পারে না। তবে, অপ্রত্যক্ষ কর যাহা প্রয়োজনীয় বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দিতে হয় তাহা প্রায় এই প্রকারেরই হয়, কারণ অপেক্ষাকৃত আয় সম্পন্ন ব্যক্তির উপরই এই করের চাপ অপেক্ষাকৃত বেশী পড়ে। আর তৃতীয় প্রকারের ধার্য্য প্রণালীই (Progressive) সাধারণ হিসাবে ন্যায় সঙ্গত। তবে ইহার মধ্যে আবার দুই প্রকারের প্রণালী বিবেচ্য। এক প্রণালী (Progrssive) অর্থাৎ যাহা বর্দ্ধিত আয়ের সঙ্গে বর্দ্ধিত পরিমাণে ধার্য্য করা হয়, যেমন, এক হাজার টাকা যাহার আয় সেই ব্যক্তির কর যদি হয় দশ টাকা, দুই হাজার টাকা আয়ের ব্যক্তির কর হইবে ২৫৲ টাকা, ৪ হাজার টাকা আয়ের ব্যক্তির কর হইবে ৫৫৲ টাকা ইত্যাদি। আর এক প্রকার কর

'Degressive' যাহার বর্দ্ধিত আয়ের সঙ্গে বাড়ে কিন্তু কম পরিমাণে, যেমন এক হাজারীর কর যদি হয় দশ টাকা, দুই হাজারীর হইবে আঠার টাকা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য শেষোক্ত প্রকারের কর কিছুতেই নীতি অনুমোদিত হইতে পারে না। প্রথম প্রকারের ক্রমবিবর্দ্ধমান করই (Progessive) আমাদের আলোচ্য নীতির অনুযায়ী হইয়াছে। এবং প্রত্যেক সভ্য দেশের প্রায় সমস্ত প্রত্যক্ষ করই এই নিয়মানুসারে ধার্য করা হয়। অবশ্য পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে হিসাব করিয়া আয়ের পরিমাণ ধরিয়া কর ধার্য্য করা হয় না, কারণ ইহা এক প্রকার অসম্ভব; তবে যতদূর সম্ভব এইদিকে আধুনিক সভ্য শাসন কর্ত্তৃপক্ষগণের বিশেষ দৃষ্টি আছে।

এখন আমরা অপ্রত্যক্ষ কর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। অপ্রত্যক্ষ কর সাধারণতঃ দুই প্রকারে ধার্য্য করা হয়। এক প্রকার হয়—জিনিসের মূল্যানুসারে (Ad valorem) আর এক প্রকার—জিনিসের সংখ্যা কিংবা ওজনানুসারে (Ad Specific)। বলা বাহুল্য মূল্যানুসারে যে কর ধার্য্য হয় ইহাই যুক্তি সঙ্গত; কারণ যে জিনিসের মূল্য বেশী তাহাই বেশী কর বহন করিয়া বাজার দরের সঙ্গে জন সাধারণের আর্থিক ক্ষমতার একটা সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারে। কিন্তু মূল্য সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিয়া যদি জিনিসের কর ধার্য্য করা হয় তাহা হইলে হয়ত এমন হইতে পারে যে একটা জিনিসের মূল্য বেশী অথচ ওজন ইত্যাদি কম হওয়ায় অল্প কর দিয়া অব্যাহতি পাইল, পক্ষান্তরে একটা জিনিসের মূল্য কম অথচ ওজনাদি অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী হওয়ার দরুণ বেশী পরিমাণে কর দিয়া জন সাধারণের আর্থিক ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যেমন, স্বর্ণ ও কয়লা। এক মণ স্বর্ণের মূল্য, আর এক মণ কয়লার মূল্য যে কতটুকু তফাৎ হইবে ইহা সহজেই অনুমেয়। তবে উভয়ের কর যদি ওজন সাপেক্ষ হয় তাহা হইলে সাধারণের কিপ্রকার অহিতকর হয়, তাহা বোধ হয় বিশদভাবে বলার কোনও প্রয়োজন নাই। তবেই আমরা দেখিতে পাই যে সমাজে মোট সুখের মাত্রা (Maximum Satisfaction) বেশী হইতে হইলে মূল্যানুযায়ী করই যুক্তি সঙ্গত।

পণ্যদ্রব্যের কর সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার সময় আর একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। আমরা যত উৎপাদিত পণ্য দেখিতে পাই, তাহার সকলগুলিই এক নিয়মে উৎপাদিত হয় না। কতগুলি দ্রব্য যতই বেশী উৎপাদন করা যায়, ততই তাহার খরচ কম লাগে এবং সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের পড়তা কম পড়ে (Increasing return) আধুনিক শিল্প দ্রব্যগুলি প্রায় অধিকাংশই এই প্রকারের; দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে—একটা মিলে যত বেশী বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে ততই মিলের পক্ষে লাভ, কারণ একই যন্ত্রে, একই শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের সাহায্যে এবং অন্যান্য সব একই ভাবে থাকিয়া এই সমস্ত প্রস্তুত হইতেছে। অবশ্য মিলের যন্ত্রাদির ক্ষমতাতিরিক্ত হইলে ভিন্ন যন্ত্রাদি স্থাপন করিতে হইবে, ইহাতে খরচও বেশী লাগিবে কিন্তু তৎপর আবার সেই পূর্ব্ব নিয়মেই চলিতে থাকিবে। তারপর এই সমস্ত কারখানাতে যতই বেশী জিনিস তৈয়ার হইতে আরম্ভ হইবে ততই চারিদিকে এই সমস্ত কারখানার উপযোগী দ্রব্যাদি যোগাইবারও সুবিধা ক্রমশঃ বাড়িবে। ইহাতেও খরচের লাঘব অনেকটা হইবে। এই প্রকার পণ্যদ্রব্য যাহাতে উৎপাদনাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে খরচের পড়তা কম পড়ে, তাহার উপর কর নির্দ্ধারিত করিলে সেই সমস্ত জিনিসের অন্ততঃ পক্ষে করানুযায়ী মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় দরুণ চাহিদা কম হইবে; কম চাহিদা হইলেই উৎপাদনও কম হইবে এবং খরচের যে সুবিধাটুকু হইত তাহারও সুবিধা নষ্ট হইবে। অবশ্য যে সমস্ত দ্রব্য নিতান্ত আবশ্যক, তাহা কষ্টকর হইলেও লোকে ক্রয় করিতে বাধ্য হইবে। সুতরাং এই সমস্ত জিনিসের উপর যে কর হইবে তাহাতে কর দ্বারা যে লাভ গবর্ণমেণ্ট করিতে পারেন তার চেয়ে বেশী ক্ষতি হয় জন সাধারণের যাহারা বেশী উৎপাদিত হইলে কম মূল্যে ক্রয় করিতে পাইত এবং এই সুবিধায় তাহাদের মোটামুটি সুখের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে পারিত। কিন্তু এই সমস্ত দ্রব্যের উপর যে কর সেই করকে কেহ যেন ইহাদের উৎপাদনকারীদের লাভের উপর যে প্রত্যক্ষ কর ধার্য্য হয়, তাহার সহিত এক না ভাবেন।

পক্ষান্তরে, অনেক পণ্যদ্রব্যের উপর্যুক্ত সুবিধাগুলি

নাই। অনেক পণ্য—উৎপাদন যত বেশী হয় ততই তাহাদের খরচ বেশী কম এবং সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের পড়তাও বেশী পড়ে। এই সমস্ত জিনিস সাধারণতঃ ভূমির অপেক্ষা রাখে; যথা—ধান্য, তুলা, গম ইত্যাদি যত প্রকার কৃষিজ পণ্য। ইহার প্রধান কারণ এই যে ভূমিজ পদার্থের পরিমাণ বাড়াইতে গেলেই ভূমির প্রসারতা বাড়াইতে হইবে। কিন্তু ভূমির প্রসারতা বাড়ান মনুষ্যের সাধ্যাতীত; ভূমি সীমাবদ্ধ। অতএব ভূমিজ পদার্থের পরিমাণ বাড়াইতে গেলে হয় এক ভূমিই বেশী কর্ষণ করিয়া তাহার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করিতে হয় কিংবা অন্য পতিত ভূমির আশ্রয় লইতে হয়। যেরূপেই হউক, ইহাতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন যতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ততই খরচের পড়তা বাড়িবে। তাহাতে যতই বেশী অর্থ ও শ্রম নিয়োগ করি না কেন, ফল তদনুযায়ী কম হইবে; অপরদিকে কর্ষণ বাহুল্যে ভূমির উর্ব্বরতা দিন দিন কমিয়া যাইবে। অতএব এই সমস্ত কৃষিজ পণ্যের উপর কর বসাইলে মূল্য বৃদ্ধি দরুণ যে চাহিদা কম হইবে তাহা আবার কম উৎপাদনের কম খরচের পড়্‌তা দ্বারা একরকম পোষাইয়াও যাইবে। ফলতঃ এই সমস্ত পণ্যের করে গবর্ণমেন্ট যদ্দূর লাভবান্ হইতে পারে সাধারণের ধারানুযায়ী মূল্য বৃদ্ধি দরুণ ক্ষতি তার চেয়ে অনেক কম। তবে, এই সমস্ত পণ্যের কর নির্দ্ধারণ কালে আর একটি বিষয় বিবেচ্য। যে কারণে উপর্য্যুক্ত নিয়ম এই সমস্ত পণ্য দ্রব্যকে কর নির্দ্ধারণের উপযোগী করিয়া তোলে তাহা মানুষের অন্যান্য প্রয়োজনের সঙ্গে যেমন ভাবে খাপ খায় তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে। যেমন পাটের উপর কোনও কর ধার্য্য করিলে আমাদের তেমন বেশী কিছু আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না, যদি ভূমিজ পদার্থের উপর্য্যুক্ত প্রকৃতি আমাদের অপরিহার্য্য প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খায়। কর নির্দ্ধারণ হেতু পাটের মূল্য বাড়িলে ইহার উৎপাদন কমিবে আর সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের জন্য যে খরচ হয় তাহার পড়তাও কম হইবে; অথচ পাট আমাদের তেমন নিত্য ব্যবহার্য্য কিংবা নৈমিত্তিক জীবনে অপরিহার্য্য বস্তু নয়। পরন্তু ধান্যের উপর কর বসাইলে আমাদের নৈমিত্তিক জীবনের বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তুর উপর আঘাত পড়ে, এবং দরিদ্র সাধারণের বিশেষ ক্ষতির কারণ হয়। সুতরাং ইহা কিছুতেই সামাজিক সুখের প্রসারক নহে।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, মানবসুখের প্রসারতাই রাজকরের উদ্দেশ্য। ধনীর অতিরিক্ত ধন আহরণ করিয়া সমাজের কল্যান সাধন দ্বারা দরিদ্রের দুঃখভার লঘু করিয়া দরিদ্রকে ধনীর সঙ্গে প্রতিযোগিতার এক মঞ্চে দাঁড়করানই রাজকর গ্রহণের এক মাত্র উদ্দেশ্য থাকা উচিত। কোনও বিশিষ্ট রাজকর ন্যায় কি অন্যায়, তাহা আমরা এই মাপ কাঠি (Doctrine of maximum satisfaction) দ্বারা মাপিয়া লইতে পারি।

শ্রীকুমুদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

স্মৃতির আরতি।

(৩)

কবিবর অন্নদচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে আমরা দীনেশ বাবু ও গোবিন্দ দাসের মত তেমন ভাবে জানিতাম না। তিনি যখন জেলা স্কুলে মাষ্টারী করিতেন, তখন আমরা শিশু। সুতরাং তাঁহার কথা বলিতে গেলে স্মৃতির কথা হইবে না, শ্রুতির কথা হইয়া দাঁড়াইবে। কবির সহিত যখন পরিচিত হইবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল তখন তিনি-এক খানা নুতন কাব্যের insperation নিয়া ব্যস্ত—কলিকাতা কর্পোরেসনের কর্ম্মচারী।

এই ময়মনসিংহই তাঁহার কাব্য প্রতিভার জন্মস্থান, এই স্থানে বসিয়া তিনি তাঁহার "ফেলেনাকাব্য", "মিত্র কাব্য" লিখিয়া জন সমাজে প্রচার করেন; এই স্থানে তিনি তাঁহার উপন্যাস গ্রন্থ "রাজকুমারী" লিখিয়াছিলেন; এই স্থানের সাহিত্যিক আবহাওয়া তাঁহার সাহিত্য চর্চ্চার ফলে পরবর্ত্তী সাহিত্যচর্চ্চাকারীগণের জন্য উৎসাহ-উপাদান সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং ময়মনসিংহের সাহিত্য-যথে তাঁহার স্মৃতি পুণ্যস্মৃতি।

মিত্র কবির প্রথম লেখা আমাদিগের চক্ষে পড়ে ময়মনসিংহের সেকালের মাসিক পত্র 'বাঙ্গালী'তে। ১২৮১ সালের আশ্বিন হইতে পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের সম্পাদকতায় ময়মনসিংহ হইতে বাঙ্গালী বাহির হইত। তখনকার লেখকেরা বোধ হয় আধুনিক লেখকদিগের ন্যায় তেমন নামের কাঙ্গাল ছিলেন না, তাই তাঁহাদিগের লিখিত প্রবন্ধের নীচে দীর্ঘ উপাধি দূরে থাকুক নামটিও থাকিত না। বাঙ্গালীতেও লেখকদিগের নাম থাকিত না। নাম না বাহির হইলেও স্থানীয় লোকের নিকট লেখকের নাম

অগোচর থাকিত না।

আশ্বিন মাসের বাঙ্গালীতে মিত্র কবির শরৎ বর্ণনা বাহির হইয়াছিল। পরে এই কবিতা আমরা অন্যত্র পড়িয়াছিলাম। কবিতাটীর কয়েক লাইন নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

আইল শরৎ,　　　পরিল জগৎ,
মরকত হার গলে
গগনে তারকা,　　　বনে সেফালিকা
কুমুদ ফুটিল জলে।
পূর্ণিমার চাঁদ,　　　এমনি সুছাঁদ,
কসিত কনক থালা
ক্ষরিতেছে সুধা,　　　হরিতেছে ক্ষুধা,
ধরার ঘুচিল জ্বালা। ইত্যাদি।

১৮৮২ সালের আশ্বিন মাসে স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু বিলাত হইতে ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে প্রথম র‍্যাঙ্গলার হইয়া ময়মনসিংহে আসিলে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যে সভা হয় সেই অভ্যর্থনাসভায় মিত্র কবি আনন্দমোহনকে সম্বোধন করিয়া—"আনন্দমোহনের প্রতি ময়মনসিংহের উক্তি" একটী কবিতা পাঠ করেন। কবিতাটী আমাদের মুখস্থ ছিল, এখনও স্মৃতিপটে যাহা খোদিত রহিয়াছে তাহা হইতে কতক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—এই কবিতায় ময়মনসিংহের পক্ষে যে একটী গর্ব্বের উক্তি ছিল তাহা আজও ভুলিতে পারি নাই।

"কত যে পাদরি পেতে আছে ফাঁদ,
হাতে দেয় পেড়ে আকাশের চাঁদ;
কোন মন্ত্র বলে,　　　কিম্বা কি কৌশলে
আমার কপালে ঘটায় প্রমাদ।
*　　　*　　　*
অসভ্য বলিয়া কভু গুণমণি,
অতঃপর যদি কেউ ডাকে শুনি,
উচ্চ করি মাথা,　　　কব এই কথা,
জান নাকি আমি কাহার জননী?

এই ঘটনার পর হইতে বোধ হয় কবির হৃদয়েও বিলাতে যাইয়া ব্যারিষ্টার হইবার উচ্চ আশা জাগিয়া উঠে। এই সময়ের লিখিত তাঁহার একটী সঙ্গীতেও তাঁহার মনের ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়ে; তিনি লিখেন—

"মনরে অবোধ বিলাত যাবি।
তুই কি বিলাত যেয়ে সাহেব হবি?
দুটী পয়সা নাইরে হাতে, ইচ্ছা করিস বিলাত যেতে,
যদি সাহসের জামিন দিয়ে প্রাণ বাঁধা দিস টাকা পাবি।
*　　　*　　　*
ওরে তত্ত্ব জ্ঞানটী সাধন হলে ব্যারিষ্টারের পদটী পাবি"

তাঁহার অনেক গানেই তাঁহার গুপ্তঅভিলাস ব্যক্ত হইয়াছিল।

বিলাতযাইবার খরচ সংগ্রহ করিবার জন্য তিনমাস সময়ের মধ্যে তিনি "হেলেনা কাব্য" লিখিয়াছিলেন। হেলেনা কাব্য তাঁহার প্রথম গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রথম ভাগ ১২৮৩ সালে স্থানীয় ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত ও পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দের প্রসংশা-পত্ররূপী ভূমিকা গর্ভে লইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। এইরূপ প্রসংশা পত্র লইয়া গ্রন্থের জন্ম গ্রহণ আজ কাল অভিনব ব্যাপার না হইলেও সেকালে নাকি এই ব্যাপারটা নিতান্তই একটা অভিনব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাই বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের গ্রন্থ সমালোচনায়—শুকদেব দাড়ি গোঁফ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন—এইরূপ ভাবের টীপ্পনী কাটিয়াছিলেন।

সেকালে দেশীয় লোকের নিকট কবি সাহিত্যিকদের তেমন আদর না থাকিলেও পাশ্চাত্যদিগের নিকট গুণবানের যথেষ্ট আদর ছিল। এখানে তখন মিঃ প্র্যাট নামে একজন জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ছিলেন; তিনি শেষটায় হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন। মিত্র কবিকে তিনি সুকবি বলিয়া আদর করিতেন। মিত্র কবি তাঁহার নিকট নাকি নিজ মানসিক গোপন অভিলাস ব্যক্ত করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, মিঃ প্র্যাটের চেষ্টায় গৌরীপুরের স্বর্গীয়া বিশ্বেশ্বরী দেবী চৌধুরাণী কবির বিলাত গমন ও অবস্থানের সম্পূর্ণ ব্যয় ভার বহন করিতে স্বীকৃতা হন, তদনুসারে মিত্র মহাশয়ও জেলাস্কুলের শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করেন।

অদৃষ্টে না থাকিলে তীর্থ ভ্রমণ হয় না; বোধহয় অদৃষ্ট বৈগুণ্যেই তাঁহার আর বিলাত যাওয়া হয় নাই; তিনি কলিকাতা গিয়া কলিকাতা কর্পোরেসনে চাকুরী লইয়া বসেন।

মিত্র কবির "ভারত শ্মশান মাঝে আমরে বিধবা বালা," "গাওরে আনন্দে সবে জয় ব্রহ্ম জয়" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গান তখন আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলের মুখেই শুনা যাইত।

এমন কি তাহার কতকগুলি গান একতারা ও খঞ্জনী বাজাইয়া ভিখারী বৈষ্ণব বৈষ্ণবীরাও গাইত। সে সকল গানের ভিতর হইতে একটী অতি প্রাচীন অথচ সুপরিচিত গান এখানে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। মিত্র কবি আধুনিক পাঠক দিগের নিকট অপরিচিত, তাই এই পরিচিত গানটী উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার স্মৃতির তর্পণ করিতেছি এবং গানটীর রচয়িতাকে নবীন পাঠকগণের নিকট পরিচিত করিয়াদিতেছি।

"দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোণা।
তারে ধরি ধরি মনে করি ধরতে গেলাম আর পেলেম না
বহুদিন ভাব তরঙ্গে, ভেসেছি কতই রঙ্গে,
সুজনের সঙ্গে হবে দেখা শুনা।
তারে অম্বার আমার মনে করি আমার হয়ে আর হলোনা॥
সে মানুষ চেয়ে চেয়ে, ফি'রতেছি পাগল হয়ে,
মরমে জলছে আগুন আর নিভে না
আমায় বলে বলুক লোকে মদন বিরহে তাঁর প্রাণ বাঁচে না॥

মিত্র কবির বাড়ী ছিল বিক্রমপুর-বজ্রযোগিনী। তিনি তাঁহার 'রাজকুমারী' উপন্যাসে বজ্রযোগিনীর নাম উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী কাহিনী লিপি বদ্ধ করিয়াছিলেন।

শ্রী—

প্রিয়তমার প্রতি।

(১)

ওগো জীবন-সঙ্গিনী!
তোমায় কিগো জান্তাম আগে তুমিই রস-রঙ্গিনী!
পরম সুখী পেয়ে তোমায়, স্নান করেছি প্রেম-যমুনায়,
দিন যামিনী আওয়াজ শুনি বাজে কেমন শিঞ্জিনী!
ওগো জীবন-সঙ্গিনী!

(২)

তুমিই চির-বন্দিতা!
কেমন করে' ভুলবো তোমায় ওগো জীবন-নন্দিতা!
চলা বলা চাউনী তোমায়, তরুণ প্রাণে আনলো জোয়ার,
মনের ব্যথা ভেসে গেছে পেয়ে মধুর মন্দিতা!
তুমিই চির-বন্দিতা!

(৩)

ওগো দিবা অঙ্গনা!
রাত্রিদিনে সঙ্গোপনে হচ্ছে তোমায় বন্দনা!
মুখখানি তোর দেখার আশে, ছলকরে' যাই আশে-পাশে,
আড়াল থেকে একটু দেখেই ভাবি জগৎ স্বপ্ন না!
ওগো দিবা অঙ্গনা!

(৪)

ওগো আমার মঙ্গলা!
ধন্য তুমি হাজার দুখে হওনা কভু চঞ্চলা!
ভালবাসি কেমন তোমায়, কারু কি পারে সেই তুলনায়
নিজেই তুমি বুঝতে পার, মন যে তোমার টলটলা!
ওগো আমার মঙ্গলা!

(৫)

লো রূপসী সুন্দরী!
থাক্‌তে আমি পারবো না সই তোমায় ক্ষণেক বিস্মরি!
সাধ মেটেনা দেখে দেখে, বুক জুড়'লো বুকে রেখে,
তোমায় পেয়ে যাচ্ছি সুখে দুখের সাগর সন্তরি'!
লো রূপসী সুন্দরী!

(৬)

ও কিশোরী অপ্সরা!
চুম্বনে তোর দুঃখ ভুলি, গভীর সুখে বুকভরা!
সারা জীবন এমনি সুখে, প্রেমটি তোর বইবো বুকে,
স্বর্গ আমার পর্ণকুটীর, চাইনা প্রাসাদ রং-করা!
ও কিশোরী অপ্সরা!

(৭)

ওগো হৃদয়-সম্রাজ্ঞী!
সত্যি তুমি 'জাদু' জানো, খুব শিখেছ কারসাজি!
হাসলে হেসে আকুল হই, কাঁদলে কেঁদে চেয়ে রই,
করতে তিলেক চোখের আড়াল মনটা ভীষণ গররাজি!
ওগো হৃদয়-সম্রাজ্ঞী!

(৮)

ওগো আমার প্রাণ্-প্রিয়া!
জীবন আমার ধন্য হোলো তোমায় শুধু বন্দিয়া!
তোমার বিমল সঙ্গ-সুখে, তুফান ওঠে সারা বুকে,
সুখের ব্যথায় শরীর কাঁপে, মনকে চাপি মন দিয়া!
ওগো আমার প্রাণ্-প্রিয়া!

(৯)

ওগো আমার আপ্‌নারি!
একটু তুমি হ'লে ব্যাজার চাই না হ'তে সংসারী!
বিষাদ-ভরা মনটা নিয়ে, একা-একাই বেড়াই গিয়ে,
মন বসেনা কোন কাজেই, হায়রে একি ঝকমারি!
ওগো আমার আপ্‌নারি!

(১০)

ওগো প্রেমের পুত্তলি!
নাওগো আমায় মধুর করে,' উর্দ্ধে উঠাও উত্তোলি'!
মোতির মানিক চাইনা কিছু, চলবো তোমার পিছু পিছু,
গঞ্জনা মোর ভূষণ হবে, বিঘ্ন যাব পায় দলি'!
ওগো প্রেমের পুত্তলি!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

ময়মনসিংহ লোকপ্রেসে শ্রীশ্যামচন্দ্র অনন্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সৌরভ

দশম বর্ষ। } ময়মনসিংহ, ভাদ্র, ১৩২৯। { ৮ম সংখ্যা।

সূর্য্য কি নিবিয়া যাইবে?

সূর্য্য পৃথিবী হইতে প্রায় ৯ কোটি ৩১ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। নয় কোটি ৩১ লক্ষ মাইল যে কতদূর তাহার ধারণা করা ও অসাধ্য। এই দূরত্বের ক্ষীণ আভাস প্রদানের জন্য সাধারণতঃ একটী কাল্পনিক দৃষ্টান্তের আশ্রয় লওয়া হইয়া থাকে। যদি পৃথিবী হইতে সূর্য্যমণ্ডলে গমনের একটী রেলপথ থাকিত, আর একটী ট্রেণ ঘণ্টায় ৬০ মাইল গতিতে পৃথিবী হইতে সূর্য্যমণ্ডলে গমনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিত তবে দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত চলিয়াও সেই ট্রেন্ খানি ১৮০ বৎসরের কমে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে পারিত না। মানুষের পরমায়ু ১৮০ বৎসর হয় না। সুতরাং এই সময় মধ্যে যাত্রীদিগকে তিনবার মরিয়া পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হইত! থাক সে কথা। এতদূরে থাকিয়াও সূর্য্য পৃথিবীতে যে তাপ বিকিরণ করিতেছে তাহা অনেক সময়ই আমাদের পক্ষে অসহনীয় হইয়া থাকে। সময় মত বৃষ্টি না হইলে পৃথিবী যেন দগ্ধ হইয়া যায় অতএব সূর্য্য যে অতি ভয়ানক উত্তপ্ত পদার্থ তাহাতে আর সন্দেহ মাত্রও নাই। পণ্ডিতেরা বলেন সূর্য্য দশ কোটি বৎসরের অধিককাল যাবত এইরূপ তাপ বিতরণ করিতেছে। এই যে সূর্য্যের এত তাপ ক্ষয় হইতেছে তাহাতে কি সূর্য্য দিন দিন তাপহীন হইয়া পড়িতেছে? যাহার ব্যয় আছে তাহার ব্যয় পূরণের ব্যবস্থা না থাকিলে অতিশয় ধনী ব্যক্তি হইলেও সে ক্রমশঃ নিঃস্ব হইয়া পড়িবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

যদি সূর্য্য নিবিয়াই যায় তবে আমরা আলোক পাইব না। পৃথিবী দিবারাত্র সমান অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিবে। এই যে সুবিমল চন্দ্র নীলনভোমণ্ডলে উদিত হইয়া পৃথিবীকে শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত করে, সেই চন্দ্রের কিরণও আর থাকিবে না। কেন না চন্দ্রের নিজের আলোক নাই। চন্দ্র সূর্য্যালোকে প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। শুধু কি তাই? সূর্য্যোত্তাপ ব্যতীত ষড় ঋতুর পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। সূর্য্যের উত্তাপে জল বাষ্প হইয়া আকাশে উঠে; সেই বাষ্প-রাশি আবার বৃষ্টি রূপে পৃথিবীতে পতিত হয়। সূর্য্যের উত্তাপ না থাকিলে আর বৃষ্টিপাত হইবে না। বৃষ্টি না হইলে মৃত্তিকা শুষ্ক হইয়া পাথরের মত শক্ত হইয়া যাইবে। ভূপৃষ্ঠে কোন শস্যই উৎপন্ন হইবে না। শ্যামল বৃক্ষলতাদি শুকাইয়া বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। পৃথিবী ভীষণ মরুভূমিতে পরিণত হইবে। জনপ্রাণী খাদ্যাভাবে প্রাণ ত্যাগ করিবে। যখন সূর্য্যোত্তাপ বিলুপ্ত হইবে তখন পৃথিবীর জীবজন্তু এবং উদ্ভিজ্জাদি ও ধ্বংস মুখে পতিত হইবে। যদি তাহাই হয় তবে সূর্য্যের মূলধন সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়া দেখা অসঙ্গত হইবে না।

সূর্য্যের যে কিরূপ প্রচণ্ড উত্তাপ তৎসম্বন্ধে কিছু না বলিলেও চলিবে। এইরূপ উত্তাপ সূর্য্য অনন্ত আকাশে বিকীর্ণ করিতেছে। সূর্য্য-বিকীর্ণ উত্তাপের অতি সামান্য অংশ মাত্র পৃথিবীর উপর পতিত হয়। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ অনুমান করেন সূর্য্য বিকীর্ণ উত্তাপের কোটি ভাগের এক ভাগ ও পৃথিবীতে আসিয়া পঁহুছে না। ইহাতেই আমরা গ্রীষ্মকালে গরমে অস্থির হইয়া উঠি। প্রত্যহ সূর্য্য অনন্ত আকাশে কত তাপ বিকীরণ করিতেছে তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। আর কত কাল সূর্য্য এইরূপ তাপ বিতরণ করিতে পারিবে? তাপ ক্ষয়ে সূর্য্য দিন দিন

ক্ষীণ জ্যোতিঃ হইয়া পড়িতেছে না কি? এ সম্বন্ধে জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ বহু গবেষণা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে তাহার আভাস মাত্র প্রদান করিব।

গ্রহগুলির নিজের আলোক নাই। উহারা সূর্য্যের আলোকে প্রদীপ্ত হয়। সূর্য্য প্রখর জ্যোতিষ্মান্। সূর্য্যের ন্যায় আকাশের কোটি কোটি নক্ষত্রও তেজোময়। উহাদের নিজের আলোক আছে। বাস্তবিক সূর্য্যেও নক্ষত্রে কোন প্রভেদ নাই। সূর্য্য আকাশের অগণিত নক্ষত্ররাজির একটী নক্ষত্র মাত্র। নক্ষত্র সকল অচিন্তনীয় দূরে অবস্থিত বলিয়া সামান্য দীপ শিখার ন্যায় দৃষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে উহারা ও সূর্য্যের ন্যায় বৃহৎ এবং তাদৃশ প্রখর তেজোময়। অনেক নক্ষত্র সূর্য্যাপেক্ষাও বৃহত্তর। সূর্য্যকে নিকটতম নক্ষত্রটীর স্থানে রাখিয়া আসিলে উহাকেও ক্ষুদ্র আলোক বিন্দুর ন্যায় প্রতীয়মান হইবে।

সৌর জগৎকে একটী বৃহৎ জ্যোতিষ্ক পরিবার বলা যাইতে পারে। সূর্য্য কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। উহার আকর্ষণের অধীন হইয়া গ্রহ সকল সূর্য্যের চারিদিকে পদক্ষিণ করিতেছে। গ্রহের চারিদিকে আবার উপগ্রহ সকল ঘুরিতেছে। এই সকল জ্যোতিষ্ক সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হইয়া থাকে। আকাশের কোটি কোটি নক্ষত্র ও এইরূপ গহ পরিবেষ্টিত হইয়া এক একটী সৌর পরিবারের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছে কিনা তাহা এখন পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই। অনন্ত কেবল আকাশে এক সূর্য্যের চারিদিকেই গ্রহ গুলি পরিভ্রমণ করিতেছে আর কোটি কোটি নক্ষত্রের কোনটীরই গ্রহ নাই একথা বলা যায় না। হয়ত নক্ষত্র সকল ও পৃথিবীর ন্যায় গ্রহে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে এবং ঐ সকল গ্রহে মানুষের ন্যায় কিম্বা তাহা অপেক্ষাও উন্নততর জীব বাস করিতেছে।

লাপলাস্ প্রমুখ পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন এককালে সূর্য্য এবং শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহও উপগ্রহ সকল একটী বিরাট জলন্ত বাষ্প পিণ্ডাকারে আকাশে অবস্থিত ছিল। সেই জলন্ত বাষ্প পিণ্ড নেপচুন গ্রহের কক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উহা নিশ্চল ছিলনা অবিশ্রান্ত ঘুরিতেছিল। সেই ঘূর্ণায়মান অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত জলন্ত পিণ্ড হইতে কেন্দ্রাপসারিণী গতি প্রভাবে কতক অংশ উৎক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে সেই অংশ নেপচুন গ্রহে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে ক্রমে অন্যান্য গ্রহের উৎপত্তি হইয়াছে। এই প্রণালীতে সৌর-জগতের গ্রহ সকল হইতে উপগ্রহ সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। ও উপগ্রহের উৎত্তির পর যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহাই সূর্য্যরূপে অবস্থিত আছে। ইহাই অতি সংক্ষেপে নীহারিকা বাদ। নীহারিকা অর্থ জলন্ত বাষ্প। যে প্রণালীতে নীহারিকা বা জলন্ত বাষ্প হইতে সূর্য্য ও গ্রহাদির উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া লাপলাস্ ও তৎমতাবলম্বী ব্যক্তিগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন তাহা আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদগণ স্বীকার করেন না বটে কিন্তু সূর্য্য এবং গ্রহ ও উপগ্রহ সকল এক কালে একত্র জলন্ত বাষ্পাবস্থায় বিরাজিত ছিল সে সম্বন্ধে কাহার ও মতদ্বৈত নাই। সূর্য্য রশ্মি বর্ণবীক্ষণ যন্ত্র spectorseope সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় সূর্য্য মণ্ডলে স্বর্ণ, রোপ্য লৌহ প্রভৃতি নানাপ্রকার ধাতু ও অন্যান্য মৌলিক পদার্থ বাষ্পাকারে অবস্থিত আছে। পৃথিবীতে যে সকল পদার্থ পাওয়া যায় সূর্য্য মণ্ডলে ও সেই সকল পদার্থেরই অস্তিত্ব প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। নূতন কিছুই পাওয়া যায় নাই। ইহা হইতে পণ্ডিতেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে পৃথিবী যে সকল উপাদানে গঠিত সূর্য্য ও সেই সকল উপাদানেই গঠিত। পৃথিবীর উপাদান কঠিন অবস্থায় আছে, সূর্য্যের উপাদান বায়বীয় অবস্থায় আছে এই প্রভেদ।

বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, প্রভৃতি গ্রহ ও এক সময়ে সূর্য্যের ন্যায় জলন্ত বাষ্পাবস্থায় ছিল। তখন ঐ সকল গ্রহের নিজের জ্যোতিঃ ছিল। আকাশে উহারাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূর্য্যরূপে বিরাজিত থাকিয়া আলোক বিকীর্ণ করিত। কালক্রমে ঐ সকল জ্যোতিষ্ক শীতল হইয়া একবারে নিবিয়া গিয়াছে। প্রশ্ন হইতেছে গ্রহগুলি যদি একদিন সূর্য্যের মতই নিজের আলোকে, তেজোময় ছিল তবে উহারা এখন নিষ্প্রভ হইল কেন? ইহার উত্তর কঠিন নয়। আমরা যদি এক সময়ে একটী কলসী, একটী ঘটি, একটী বাটি ও একটী চামচ্ ফুটন্ত জল দিয়া পূর্ণ করি, তবে কিছুক্ষণ পরেই দেখিতে পাইব চামচের জল সর্ব্বাগ্রে শীতল হইয়া গিয়াছে কিন্তু তখনও বাটি, ঘটি ও কলসীর জল প্রায় পূর্ব্ববৎ উষ্ণ রহিয়াছে। তার পর বাটির জল শীতল হইবে, তার পর ঘটির সর্ব্ব শেষে কলসীর জল শীতল হইবে। উত্তপ্ত পদার্থ যত বৃহৎ হয় তাহা শীতল হইতে তত বেশী সময় লাগে। এই তত্ত্বই জ্যোতিষ্ক জীবনের মূল-সূত্র নীহারিকা

বাদই (Nebular theory) ঠিক হউক, আর উল্কাবাদই (Meteorictheory) ঠিক হউক ইহাতে কিছু আইসে যায় না। সৌর জগতের সমগ্র জ্যোতিষ্ক একই উপাদান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং উহারা সকলই এক কালে জ্বলন্ত বাষ্পাকারে আকাশে বিরাজমান ছিল সে সম্বন্ধে মত ভেদ নাই। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে সর্ব্ব ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কটী সর্ব্বাগ্রে শীতল হইয়া নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে। সৌরজগতের 'উপগ্রহ' অর্থাৎ পৃথিবী মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন এই সকল গ্রহের 'চন্দ্র' সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক। এই সকল জ্যোতিষ্ক সর্ব্বাগ্রে শীতল হইয়া নিবিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর চন্দ্রে দূরবীক্ষণ দ্বারা বহু সংখ্যক সুবৃহৎ আগ্নেয় গিরি দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু ঐ আগ্নেয় গিরি সকল হইতে আর অগ্ন্যুৎপাত হয় না। চন্দ্রের আভ্যন্তরীন তাপ চিরলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। চন্দ্র মণ্ডলের স্থানে স্থানে বহু সংখ্যক সুবিস্তৃত সমুদ্র গর্ভ দূরবীক্ষণে দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু ঐ সকল সমুদ্র জল শূন্য। চন্দ্র লোক হইতে জল বিলুপ্ত হইয়াছে। চন্দ্রে বায়ু পর্য্যন্ত নাই। সুতরাং চন্দ্র এখন তাহার সকল গৌরব হারাইয়া মৃত অবস্থায় আকাশে অবস্থিত আছে। আমরা এখন যাহা দেখি তাহা ভুবন-মন-মোহন শশাঙ্কর কঙ্কাল মাত্র। চন্দ্রের আয়তন পৃথিবীর আয়তনের পঞ্চাশ ভাগের একভাগ সুতরাং চন্দ্র পৃথিবীর বহু পূর্ব্বেই নির্ব্বাপিত হইয়াছে। বুধ, পৃথিবীর $\frac{1}{20}$ ভাগ শুক্র $\frac{4}{5}$ ভাগ, মঙ্গল $\frac{1}{8}$ ভাগ, এই গ্রহগুলি সকলই পৃথিবীর পূর্ব্বে অল্পাধিক শীতল হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর নৈসর্গিক অবস্থা আমাদের অনেকটা জানা আছে। পৃথিবীর অবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই আমরা অন্যান্য গ্রহের অবস্থা অবগত হইতে পারি। বর্ত্তমানে পৃথিবীর পৃষ্ঠ দেশ শীতল হইয়া প্রাণিগণের বাসের উপযোগী হইয়াছে বটে কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ এখন ও ভয়ানক উত্তপ্ত রহিয়াছে। উষ্ণ প্রস্রবন ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ইহার প্রমাণ। আয়তনে সূর্য্যের পরই বৃহস্পতির স্থান বৃহস্পতি পৃথিবী হইতে প্রায় সাড়ে তেরশত গুণ বড়। বৃহস্পতির নৈসর্গিক অবস্থা জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতেরা যাহা জানিতে পারিয়াছেন তাহাতে সুস্পষ্ট ধারণা হইবে যে বৃহস্পতি এখন ও অত্যুষ্ণ বাষ্প অবস্থায় বিদ্যমান আছে। উহার চারিদিকে নিয়ত বাষ্পীয় আবরণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। দূরবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে বৃহস্পতির পৃষ্ঠ হইতে অনবরত বাষ্পরাশি আকাশে উঠিতেছে এবং সেই বাষ্প পুনরায় বৃষ্টি রূপে বৃহস্পতির পৃষ্ঠে পতিত হইয়াছে। বৃহস্পতির পৃষ্ঠ এখন ও এত উত্তপ্ত যে জল উহার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিবা মাত্র পুনরায় বাষ্প হইয়া উর্দ্ধে উত্থিত হয়। বৃহস্পতির এই উত্তাপ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে উহার উপাদান সকল এখন ও অনেটা উষ্ণ বাষ্পাবস্থায় রহিয়াছে। বৃহস্পতি আয়তনে পৃথিবীর চেয়ে ১৩৯০ গুণ বড় কিন্তু বৃহস্পতির ওজন পৃথিবী হইতে মাত্র তিনশত গুণ অধিক। ইহা হইতে বুঝা যায় যে বৃহস্পতির উপাদান সকল অতিশয় হালকা। বর্ত্তমানে বৃহস্পতির জ্যোতিঃ নির্ব্বাপিত হইয়াছে বটে কিন্তু উহা এখন ও অত্যুষ্ণ বাষ্পাবস্থায় রহিয়াছে। কালে উহা শীতল হইয়া পৃথিবীর ন্যায় কঠিন হইবে। তেরশত নব্বইটী পৃথিবী একত্র করিলে বৃহস্পতির সমান হয় কিন্তু তেরলক্ষ পৃথিবী দ্বারা একটী গোলক প্রস্তুত করিলে সূর্য্যের সমান হইবে। এই জন্য বিরাট দেহ সূর্য্য আজ পর্য্যন্ত ক্ষীণ রশ্মি না হইয়া প্রজ্জলিত অনল কুণ্ডের ন্যায় আকাশে বিরাজিত হইয়াছে।

সূর্য্য অন্যূন ১০ কোটি বৎসর যাবত তাপ বিকীরণ করিতেছে। কিন্তু এই তাপ বিতরণে সূর্য্যত্তাপ হ্রাস হইয়াছে কিনা তাহা কেহ নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে সূর্য্যোত্তাপ হ্রাস হইবারই কথা। যাহার আয় পরিমিত তাহার ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা না থাকিলে দিন দিন তাহার মূলধন কমিতে থাকিবে ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত সত্য।

আমরা যেমন সূর্য্য হইতে আলোক ও উত্তাপ পাই সূর্য্যের ও তেমনি অন্য জ্যোতিষ্ক হইতে আলোক ও উত্তাপ পাওয়া কি অসম্ভব? ঋণ করিয়া দান করা ও অনেক উদার লোকের স্বভাব। চন্দ্র, সূর্য্যরশ্মি ধার করিয়া জ্যোৎস্না বিতরণ করে। আকাশের কোটি কোটি নক্ষত্র সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশীল। সুতরাং ঐ সকল নক্ষত্র হইতে সূর্য্য উত্তাপ পাইয়া নিজ ক্ষতিপূরণ করিতেছে কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখা যাউক। দূরবর্ত্তী নক্ষত্র সকল হইতে পৃথিবী যত দূরে, সূর্য্য ও প্রায় সেই পরিমাণ দূরে অবস্থিত। পৃথিবী হইতে নিকটতম নক্ষত্রের দূরত্ব ২৫০০০০০০০০০০০ পঁচিশ লক্ষ কোটি মাইলের ন্যূন হইবে না। আর পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব

মাত্র নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্বটা নক্ষত্রের দূরত্ব হইতে বাদ দিলে ২৪৯৯৯৯৭০০০০০০ চব্বিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয় শত নব্বই কোটি মাইল হয়। ইহাই সূর্য্য ও নক্ষত্রের ব্যবধান। সুতরাং পৃথিবী রাত্রিকালে নক্ষত্র সকল হইতে যে পরিমাণ তাপ ও আলোক পায় সূর্য্য ইহার চেয়ে বেশী তাপ ও আলোক প্রাপ্ত হইতে পারে না। সূর্য্যের আয়তন পৃথিবীর আয়তন অপেক্ষা বৃহৎ বটে তবুও নক্ষত্র সকলের যে তাপ সূর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহা দ্বারা উহার বিকীরিত উত্তাপের কোটি অংশের এক অংশের ও ক্ষতি পূরণ হইতে পারে না। তাহা হইলে নক্ষত্র হইতে প্রাপ্ত তাপ দ্বারা সূর্য্যের বিকীরিত তাপের ক্ষতিপূরণ হয় না।

কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন আকাশ হইতে সূর্য্য ম লে অবিশ্রান্ত অসংখ্য উল্কা বর্ষণ হইতেছে, তাহাতে সূর্য্যোত্তাপের সমতা রক্ষিত হইতেছে। আমাদের পৃথিবীতে সর্ব্বদাই উল্কাপাত হইতেছে। দিনের বেলায় ও উল্কাপত হয় কিন্তু সূ্য্যের প্রখর আলোকে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। একজন পণ্ডিত হিসাব করিয়া বলিয়াছেন প্রতিদিন ছোট বড় প্রায় ৩০।৪০ কোটি উল্কা পৃথিবীতে আসিয়া পড়িতেছে। সূর্য্যের আয়তন পৃথিবীর আয়তন হইতে ১৩ লক্ষ গুণ বৃহৎ সুতরাং সূর্য্যমণ্ডলে তদনুসারে অধিকতর উল্কাপাত হইবার সম্ভাবনা। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে উল্কাপিণ্ড সকলের সংঘর্ষণে উহা জ্বলিয়া উঠে এবং তাহাতে তাপ ও আলোকের উৎপত্তি হয়। সূর্য্যের আকর্ষণ পৃথিবীর আকর্ষণ অপেক্ষা অনেক অধিক সুতরাং সূর্য্যের বায়ুমণ্ডলে উল্কা পিণ্ড সকলের গতি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় প্রখরতর তাপ ও আলোকের উৎপত্তি হইয়া থাকে। রান্না করিবার সময় উনামের জ্বাল কমিয়া আসিলে যেমন তাহাতে কয়লা কিংবা কাষ্ঠ খণ্ড প্রদান করিলে উহার তাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তেমনি অনল উল্কা পিণ্ড সকল সূর্য্যমণ্ডলে পতিত হওয়ায় সূর্য্যের তেজ ও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং সূর্য্যের যে উত্তাপ বিকীর্ণ হইয়া হ্রাস হইতেছে উল্কাপাতের দ্বারা তাহার ক্ষতিপূরণ হইতেছে। কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে এ পর্য্যন্ত সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী আকাশে খুব বেশী সংখ্যক উল্কার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। একজন জ্যোতির্ব্বিদ বলিয়াছেন—"If we were to grind the moon into fragments like meteorites and feed the sun with them, they would maintain his radition for something li e a year."

অর্থাৎ চন্দ্রমণ্ডলকে ভাঙ্গিয়া যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উল্কাপিণ্ডে পরিণত করা যায় এবং সেই উল্কা পিণ্ড সকল যদি সূর্য্যের বিক্ষিপ্ত তাপের ক্ষতিপূরণের জন্য সূর্য্যদেহে নিক্ষিপ্ত করা হয় তবে ইহাতে মাত্র এক বৎসর কাল উহার উত্তাপের সমতা রক্ষিত হইবে। সৌরজগতের সমগ্র গ্রহ সকল উল্কাপিণ্ডাকারে ভগ্ন করিয়া যদি সূর্য্যমণ্ডলে নিক্ষেপ করা যাইত তাহাতেও ৫০ হাজার বৎসরকাল মাত্র সূর্য্যোত্তাপের ক্ষতিপূরণ হইত সূর্য্য ১০ কোটি বৎসর যাবৎ তাপ বিতরণ করিতেছে। এত বৎসরের তাপের ক্ষতিপূরণ করিতে পারে এমন উল্কারাশি আকাশে থাকা অসম্ভব। যদি সূর্য্যোত্তাপের ক্ষতিপূরণ করিবার উপযোগী উল্কারাশি সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী আকাশে থাকিত তবে উল্কাপাতে সূর্য্যের নিকটতম গ্রহ বুধের আয়তন ও অনেক বৃদ্ধি পাইত এবং বুধ এখন যে কক্ষে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে সেই কক্ষে থাকিত না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে সূর্য্যের তাপ ক্ষয়ের ক্ষতিপূরণ বাহির হইতে হইতেছে না। এইজন্য আধুনিক পণ্ডিতগণ সূর্য্যের নিজ সম্পত্তিই তাহার আয়ের একমাত্র অবলম্বন বলিয়া বিচার করিতেছেন। মাধ্যাকর্ষণ হেতু সূর্য্য দেহের পরমাণু সকল কেন্দ্রের দিকে সংকুচিত হইতেছে, তাহাতে অবিশ্রান্ত তাপ উৎপন্ন হইতেছে। শেল, হেল্‌মোটজ কেল্‌ভিন্ এবং নিউকোম্ প্রভৃতি অসামান্য মনীষীগণ এই মত সমর্থন করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকগণ এই কথা স্বীকার করেন যে সূর্য্য দেহ প্রকৃত পক্ষে সংকুচিত হইতেছে এবং সেই সংকুচন হেতু তাপের উৎপত্তি হইতেছে। কিন্তু এই সংকুচন দ্বারা সূর্য্যোত্তাপের ক্ষতিপূরণ কতদিন হইতে পারিবে? পণ্ডিতেরা অনুমান করেন সংকুচন দ্বারা সূর্য্যোত্তাপের ক্ষতিপূরণ ২॥ কোটি বৎসরের বেশী চলিতে পারে না। কিন্তু সূর্য্য নাকি ১০ কোটি বৎসর ব্যাপিয়া আলোক উত্তাপ ও বিতরণ করিতেছে। এত দিন সূর্য্য নিষ্প্রভ হয় নাই কেন? সম্প্রতি সূর্য্য মণ্ডলে রেডিয়াম নামক এক পদার্থের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া পণ্ডিতেরা বলিতেছেন। এই পদার্থের এমনি গুণ যে রেডিয়ামের একটী ক্ষুদ্র পরমাণু বহু বৎসর পর্য্যন্ত

অসামান্য আলোক ও উত্তাপ বিতরণ করিতে পারে এবং তাহাতেও রেডিয়ামের পরমাণুর বিন্দুমাত্রও ক্ষয় লক্ষিত হয় না। এই রেডিয়াম ধাতুই নাকি সূর্য্যোত্তাপের ক্ষতিপূরণ করিতেছে। কিন্তু কতকাল এই ক্ষতিপূরণ চলিবে তাহা বলা অসাধ্য। পৃথিব্যাদি গ্রহ যে সকল উপাদানে গঠিত সূর্য্যও সেই উপাদানে গঠিত। সূর্য্য ও গ্রহ সকল এক সময়ে এক বিরাট জ্যোতিষ্কেরই অংশ ছিল। রেডিয়াম ধাতু পৃথিবীতে থাকা সত্ত্বেও পৃথিবী নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। বুধ, শুক্র, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহ ও উপগ্রহ সকল নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং একদিন আমাদের সূর্য্যও নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অনন্ত আকাশের অগণিত নক্ষত্র সমস্ত এক একটি বিরাট সূর্য্য। ঐ সকল দূরবর্ত্তী সূর্য্যের আলোক বিশ্লেষণ করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ বলিতেছেন ইহাদের কোন্ কোনটীর উত্তাপ কমিতেছে এবং আলোক ও ক্রমশঃ মৃদু হইয়া আসিতেছে অর্থাৎ ইহাদের ক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। সূর্য্যের সম্বন্ধে ও সেই কথা খাটে। ইহাদের জীবনের ধারা এক ভাবে চলিয়াছে। জ্যোতিষ্কদিগের উৎপত্তি স্থিতি এবং লয় সম্পূর্ণ একই নিয়মের অধীন। পণ্ডিতেরা বলেন আকাশে বহু সংখ্যক আলোকহীন নির্ব্বাপিত সূর্য্য অবস্থিত আছে। অন্ধকারে যেমন মালগাড়ী গুলি চলে তেমন ঐ সকল মৃত সূর্য্যের দেহ-পিণ্ড নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করিতেছে। সুতরাং আমাদের সূর্য্যেরও মৃত্যু অনিবার্য্য! সূর্য্যও একদিন নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে! এখন সূর্য্য যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় যদি কেবল নিজ দেহ সংকুচিত করিয়াও সূর্য্য নিজ তাপের সমতা রক্ষা করে তাহা হইলেও আরও ২॥ কোটি বৎসরের পূর্ব্বে সূর্য্য নির্ব্বাপিত হইবে না। সুতরাং আপাততঃ কোন চিন্তার কারণ নাই।

আমরা বলিয়াছি আমাদের সূর্য্য ও আকাশের নক্ষত্ররাজি দিন দিন হীনপ্রভ হইয়া ক্ষয়ের দিকে চলিয়াছে। কালে আকাশে সকল জ্যোতিষ্ক একে একে নিবিয়া যাইবে। তবে কি ভগবানের বিরাট নাট্যশালা চির অন্ধকার আচ্ছন্ন থাকিবে? বিধাতার বিশ্বলীলার কি সে দিন অবসান হইবে? সৃষ্টির আদিতে যেমন সৎ অসৎ কিছুই ছিল না; কেবল সূচীভেদ্য অন্ধকার জগৎ আচ্ছন্ন করিয়া ছিল,—আবার কি সেই অবস্থা হইবে? চিরলয় কি জগতের পরিণাম? বৈজ্ঞানিকগণ আমাদিগকে অভয় দিয়া বলিতেছেন সৃষ্টি প্রবাহ চির অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এই বিশ্ব-নাট্যশালায় কখনও যবনিকা পতিত হইবার আশঙ্কা নাই। একদিকে যেমন নক্ষত্র সকল আলোকহীন হইয়া নিবিয়া যাইতেছে আর-এক দিকে তেমনি নীহারিকা হইতে নূতন সূর্য্যের সৃষ্টি হইতেছে। সুবিখ্যাত ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদপণ্ডিত ফ্লামারিয়া বলেন "সূর্য্যগণ একবার নিবিলে যদি পুনরায় জ্বালাইবার ব্যবস্থা না থাকিত, তবে এত দিনে আমরা আকাশে একটীও তারা দেখিতে পাইতাম না। সৃষ্টির আরম্ভ অবধি এ পর্য্যন্ত অসংখ্য সূর্য্য জ্বলিয়াছে এবং অসংখ্য সূর্য্য নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে।" অনন্তকালের দিক দিয়া দেখিলে বর্ত্তমান সূর্য্যগুলিকে নিতান্তই নূতন বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

স্নেহের দান।

(১৫)

বৎসর ঘুরিয়া আসিয়াছে। মাখন বার্ষিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। পরীক্ষার সপ্তাহ পূর্ব্বে সতুর খুড়া মহাশয়ের এক পত্রে মাখন অবগত হইল যে সতুর ভয়ানক বসন্ত হইয়াছে, সে আর এবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারিবে না।

মাখন তাঁহাদের স্নেহ ও অনুগ্রহের ঋণ পরিশোধ করিবার এই সুযোগে পরিত্যাগ করা সঙ্গত মনে করিল না। নিষেধ করিবে তাহাকে এখন আর কে?

পরীক্ষার পর মাখন জেঠামহাশয়ের অনুসন্ধান করিবে স্থির করিয়াছিল। পূজার বন্ধে ও সে কিশোরী বাবুর নির্দ্দেশ অনুসারে সেই যজমানের বাড়ীতে যাইয়া তাঁহাদের খোঁজ লইয়াছিল। সেখানে সে জানিয়াছিল, তিন সপ্তাহ যজমান বাড়ীতে বাস করিয়া তারপর যে তাঁহারা কোন স্থানে চলিয়া গিয়াছেন তাহা যজমানেরাও ভাল করিয়া জানে না। যাহা হউক, বার্ষিক পরীক্ষার পর সে পুনরায় অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদিগের তত্ত্ব খবর গ্রহণ করিবে; ইহাই ছিল তাহার নির্দ্ধারিত প্রধান কর্ম্ম। কিন্তু এখন এই জন-সেবারূপ মহৎ কর্ম্ম

আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ায় সেই অশ্রু-কর্ত্তব্য কার্য্যে বিলম্ব ঘটিয়া গেল।

প্রবেশিকা পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। মাখন সকল প্রশ্নেরই সম্পূর্ণ উত্তর দিয়াছে। তাহার একটী উত্তরও ভুল হয় নাই, জানাইয়া সে কিশোরী বাবুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া নৈহাটী যাত্রা করিল। কিশোরী বাবু মাখনের পরীক্ষার ফলকে তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির মান দণ্ড স্বরূপে লক্ষ্য রাখিয়া দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মাখন সতুর অবস্থা দেখিয়া প্রথমে ভয় পাইয়া গিয়াছিল। সতুর মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত ওষ্ঠে-পৃষ্ঠে-ললাটে আর তিলটী রাখিবার স্থান ছিল না। বসন্তগুলি পাকিয়া পূঁজ লইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছিল মাখন আর কখনও বসন্তের রোগী দেখেনাই। নিজের না হইলে, এ রোগ এবয়সের কেহ প্রায় দেখে না—অতি আপন জনেও প্রায় দেখে না।

মাখন ভয় পাইয়াছিল—নিজের প্রাণের জন্য নহে; তাহার প্রাণের মমতাকে সে, মনকে দৃঢ় করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। বন্ধুর অবস্থা অত্যন্ত সাংঘাতিক বুঝিয়া তাহার মনে আতঙ্ক হইয়াছিল, দুদিনের মধ্যেই তাহার চক্ষে তাহা সহনশীল হইয়া পড়িল। সে আপ্রাণ চেষ্টায় বন্ধুর সেবা করিতে লাগিল। সতুর মা প্রাণ খুলিয়া মাখনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—"বাবা তোমার বাসনা পূর্ণ হউক।"

সতুর মা ও মাখন ব্যতীত সতুর ঘরে আর প্রায় কেহ আসিত না। চিকিৎসকের সঙ্গে তাহার খুড়া মহাশয়ও আসিতেন কিন্তু তিনি অত্যন্ত ভয়ের সহিত আসিতেন। রাত্রিতে যখন সতু বেদনায় চীৎকার করিত তখন তাহার মাও একমাত্র ছেলের জন্য কাঁদিয়া আকুল হইতেন। মাখন উভয়কে সান্ত্বনা দিয়া সতুর বেদনার স্থান চুলকাইয়া দিত, কবিরাজের নির্দ্দেশ মত সাবধানে বসন্তগুলি গালিয়া দিত। এইরূপে প্রায় আড়াই মাস উৎকট যন্ত্রনা ভোগ করাইয়া সতুর বসন্ত শুখাইবার পথে আসিল। শুখাইবার সময় বসন্তের যন্ত্রণা ভয়ানক অসহ্য হইয়া উঠিল। মাখনের স্নেহ ভালবাসা পূর্ণ সান্ত্বনা সকল সময়ই সতুর যন্ত্রণাকে ভুলাইয়া রাখিতে সমর্থ হইত। সতু মাখনের মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার শুশ্রূষায় মুগ্ধ হইয়া সকল গ্লানি ভুলিয়া যাইত।

একদিন মাখন সতুর বসন্তগুলি কবিরাজের নির্দ্দেশ মত ঔষধের জল দিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দিতেছিল, সতুর মা বলিলেন—"বাবা! তুমি আর কত খাটবে, তুমি বোসো আমি এগুলি পরিষ্কার করি; এ মায়েরই কাজ"

মাখন বলিল—"না, জেঠাই মা, আপনি পারিবেন না; আর এ অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ; মা হারা জীবন যে কি কষ্টের তাহা আমি বুঝি জেঠাই মা।

সতু ধীরে ধীরে বলিল—"মা থাকিলে কি তুমি আর আসিতে পারিতে ভাই!"

মাখন—"নিশ্চয় না।"

সতু—"এ ছোয়াচে রোগ, তোমার যদি হয়, তুমি কি উপায় করিবে?"

মাখন—"এরূপ চিন্তা মনে স্থান দিতে নাই ভাই, যদি সকলেই এইরূপ চিন্তা করে, বিপন্নকে সাহায্য করিতে বা উদ্ধার করিতে বিপদের ছায়া দেখে, তবে কি জগতে বিপন্নকে কেহ আশ্রয় দেয়, না কাহারও বিপদে কেহ সহায় হয়। দরিদ্রকে পোষণ করিতে ধণীর অর্থ ব্যয় হয়, এ ব্যয়কে ক্ষতি ভাবিলে কি দরিদ্রের পোষণ হয়? না অতিথি সৎকার হয়, না জগতের কোন শ্রেষ্ঠ কার্য্য সংসাধিত হয়। মনুষ্যত্বের আদান প্রদানে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, বৃদ্ধিরই লোকে আশা করিয়া থাকে মৃত্যুকে ক্ষতি মনে করিতে পার কিন্তু এইরূপ মৃত্যুর কারণ জগৎকে যে শিক্ষা দেয়, তাহা মৃত্যুর ক্ষতির তুলনায় মহালাভ জনক।"

এই সময় সতুর খুড়া মহাশয় মহা আনন্দের সহিত সতুর ঘরে আসিয়া বলিলেন মাখন তুমি এন্ট্রেন্স পরীক্ষায় নবম স্থান অধিকার করিয়াছ কুড়ি টাকা স্কলারসিপ পাইবে নেহাত অদৃষ্ট মন্দ হইলে পনর টাকার আর মার নাই ... ...

মাখনের মন আনন্দ সংবাদে স্তম্ভিত হইয়া গেল, সে কোন কথাই বলিতে পারিল না।

সতুর ও মনে মহা আনন্দ হইয়াছে, সে ধীরে ধীরে তাহার খুড়া মহাশয়ের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া বলিয়া নবম হইয়াছে তো কুড়ি টাকা পাইবে না কেন?

খুড়া মহাশয় বলিলেন—"হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের আর দুটী ছেলের সংঙ্গে এক ব্রাকেটে হইয়াছে, সুতরাং আশা কম।"

সতু বলিল "আপনি স্থির করুন, মাখনকে লইয়া

ঠাকুদ্দার নিকট যান, ও কিছুতেই সহজে যাইতে দেওয়া যেন না হয়।”

খুড়া মহাশয় বলিলেন “তা ঠিক, কালই চল মাখন—কলিকাতা যাই—কুড়ি টাকাই রাখিতে হইবে ”

সতুর মা মাখনের পাসের ও বৃত্তির সংবাদে তাহাকে হাসিমুখে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আজ আড়াই মাস পরে এই তাঁর প্রথম হাসি। তাঁহার হাসি মুখের দিকে চাহিয়া মাখনের আড়ষ্ট ভাব ভাঙ্গিয়া গেল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে ও খুড়ামহাশয়কে প্রণাম করিল।

মাখনের চরিত্রের প্রতিই এতদিন তাঁহাদের স্নেহের ভাব ছিল, আজ তাহার কৃতকার্য্যতা ও ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে চাহিয়া তাঁহারা তাহার প্রতি আরও অধিকতর আশক্ত ও শ্রদ্ধায় নত হইয়া পড়িলেন। সতুর মন ও মাখনের এইরূপ কৃতকার্য্যতায় মুগ্ধ হইয়াগেল।

খুড়া মহাশয় অনেক সুপারিস ধরিয়া বি ্র ঘুরাঘুরি করিলেন; কিছুতেই কোন উপকারের পথ আবিষ্কারে সমর্থ হইলেন না। হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের নামের দাবী অটুট রহিল। মাখন বিভাগীয় বৃত্তি পনর টাকা পাইল।

নাম ও স্থান মাহাত্ম মাখন খুব স্বীকার করিত; তাই সে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িবে বলিয়া প্রবেশিকা পরিক্ষার ফিস দাখিলের সময় লিখিয়া দিয়াছিল। এই ঘটনাটী তাহার সে ভাবকে অটুট রাখিল। কার্য্যতঃ সে যেরূপই হউক ভাবনার বেলায় সে উচ্চভাব সর্ব্বদা পোষণ করিত; তাই, সতু ও তাহার মা মাখনকে তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিয়া হুগলী কলেজে পড়িতে অনুরোধ করিলে সে সেই অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিল না।

সতুর অবস্থার ক্রমশ উন্নতি দেখিয়া মাখন তাহার নিকট তাহার জেঠা মহাশয়ের অনুসন্ধানের কথা তুলিয়া এবং নিজের কলিকাতা বাসের যোগাড় যন্ত্রের জন্য বিদায় চাহিল। সতু অম্লান বদনে তাহাকে বিদায় দিল। এবং কলেজ খুলিবার পূর্ব্বে নৈহাটী চলিয়া আসিতে অনুরোধ করিয়াদিল।

মাখন পুনরায় তাহার জেঠা মহাশয়ের অনুসন্ধানে তাহাদের আত্মীয় সজনের ও যজমানদের বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিতে বাহির হইল। এবং অনুসন্ধানে জানিল তাহার জেঠা মহাশয় ত্রিপুরা জেলার একগ্রাম্য স্কুলে পণ্ডিতের চাকুরী লইয়া সপরিবারে তথায় চলিয়া গিয়াছেন। গ্রামটীর নাম সে কিছুতেই সংগ্রহ করিতে পারিল না। যাহা হউক, মাখন সান্ত্বনা পাইল—ভগবান যখন তাঁহাদের জীবন রক্ষার উপায় করিয়া দিয়াছেন, তখন আর চিন্তার বিষয় কি? এখন নিজে মানুষ হইয়া তাঁহাদের দুঃখ শোকের ভাগী হওয়া যাইবে।

মাখন আপাততঃ এই চিন্তাকেই পরম শ্রদ্ধার সহিত বরণ করিয়া লইয়া মন হইতে যাবতীয় চিন্তা দূর করিয়া দিল। এবং কিশোরী বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কলেজ খুলিবার পূর্ব্বেই নৈহাটী চলিয়া আসিল।

(১৬)

মাখন কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে। কিন্তু থাকিবার সুবিধামত স্থান করিয়া উঠিতে পারিনাই। হোটেলে খরচ দিয়া থাকিবার সঙ্গতি কোথায়? সুতরাং নৈহাটী হইতে আসিয়াই কলেজ করিতেছিল। ইহাতে যে পরিশ্রম, তাহা, তাহার পক্ষে খুব বেশী পরিশ্রম বলিয়া মনে হইতেছিল না। সতুদের বাড়ী হইতে নৈহাটী ষ্টেসন অর্দ্ধ মাইল, আর শিয়ালদহ হইতে কলেজ স্কোয়ার এক মাইল - এই দেড়মাইল বা দুইমাইল স্থান নন্দীগ্রাম হইতে রায়পুরের পথের অর্দ্ধেক পথ। সে পথ ছিল নিরবচ্ছিন্ন এক ঘেয়ে দৃশ্য দেখিয়া দেখিয়া দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড রৌদ্র ও তপ্ত বাতাস ঠেলিয়া যাওয়া: আর এ কত বৈচিত্রের ভিতর দিয়া নানা দৃশ্য, দেখিয়া, নানা বর্ণের নানা ধর্ম্মের, নানা ধাতুর লোকের নানাপ্রকারের বিচিত্র কথা শুনিয়া চলিয়া যাওয়া। কত প্রভেদ! অসুবিধা যা কিছু কেবল সময়ের হিসাব করিয়া চল। পড়ায় হিসাব কথায় হিসাব, স্নানে হিসাব, বসায় হিসাব, চলায় হিসাব সময়ের সদ্ব্যবহার শিক্ষার পক্ষে সেটাও নেহাৎ মন্দ নহে। মাখনের নিকট সেটা নিতান্ত মন্দ বোধ হইতেছিল না।

প্রেসিডেন্সিতে পড়িতে যাওয়া যে তার মত দরিদ্রের পক্ষে একটা বিষম 'ঘোড়া রোগ' হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহা সে অতি অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই অনুভব করিতে পারিয়াছিল।

জীবনে কখনও জুতা ব্যবহার করে নাই। স্কুলে ইনিস্পেক্টর আসিলে সে ধার করিয়া পয়ের পিড়ান গায়ে দিত। কিন্তু এটাতো তাদের গ্রাম্য স্কুল নহে; সুতরাং এখানে তেমন ভাবে চলা অসম্ভব। সতুর জুতা ও কোট লইয়া সে

কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিল। এ কোট জুতাতো তার চিরদিন থাকিবে না। ইহার উপর আরো কত সমস্তা আছে।

মাখন এসব চিন্তা করিয়া আরও অন্তত কয়েকটী টাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছিল।

হেড মাষ্টার কিশোরী বাবুর ভাই বাঁশরী বাবু হাইকোর্টের উকীল; ভবানীপুরে তাঁহার বাসা। কিশোরী বাবু তাঁহার সহিত মাখনকে যাইয়া সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছিলেন এবং প্রতি চিঠিতে তাহা করিতে উপদেশ দিতেছিলেন।

মাখন এই সকল চিন্তায় বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাই আজ ২টার ছুটির পর ভবানীপুর চলিয়াগেল।

বহু অনুসন্ধান করিয়া সে বাঁশরী বাবুর বাড়ী বাহির করিল। তিনি বাড়ীতেই ছিলেন; মাখন তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল।

তিনি মাখনের মুখে দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন চিনিতে তো পারিলাম না হে তোমাকে?

মাখন নম্রভাবে উত্তর করিল আমি বায়পুর স্কুল হইতে এবার পাস করিয়াছি। হেড মাষ্টার বাবু আমাকে আপনার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে লিখিয়াছেন।"

বাঁশরী বাবু বলিলেন—বোসো, তুমিই এবার কুড়ি টাকা স্কলারসিপ পাইয়াছ?'

মাখন কুড়ি টাকা পাই নাই, পনর টাকা পাইয়াছি।"

বাঁশরী—দাদার চিঠিতে কুড়ি টাকার কথাই যেন লিখা, আমিও সেইরূপই বলিয়াছি।

মাখন বাঁশরী বাবুকে তাহার বঞ্চিত হইবার সমস্যাটী বুঝাইয়া বলিল শুনিয়া বাঁশরী বহু বলিলেন ভারী অন্যায়—ভারি অন্যায়!"

বাঁশরী খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—দাদা লিখিয়াছিলেন, তোমাকে একটা স্থান করিয়া দিতে; আমার এক জমিদার মোয়াক্কেলের ছেলেকে যদি coach করিতে পার, আমি সেখানে তোমার স্থান করিয়া দিতে পারি। ছেলেটা তেমন সুবিধার নয়, তাহাকে সৎ সংসর্গে রাখিয়া যেমন তেমন করিয়া পাস করাইতে হইবে। দাদা তোমার কেরেক্টার ও কয়ালিফিকেসন যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে এ বন্দোবস্ত আমি উত্তম মনে করি, ছেলের পক্ষে ও তোমার পক্ষেও।"

মাখন বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"ছেলেটী কোন ক্লাশে পড়ে?"

বাঁসরী—সেও এবার এণ্ট্রেন্স পাস করিয়াছে।

মাখন সঙ্কুচিত ভাবে বলিল—তবে আমি তাহাকে কেমন করিয়া পড়াইব?

বাঁশরী তোমাকে পড়াইতে হইবে না তাহাকে তোমার সহবাসে চরিত্রবান রাখিতে হইবে? তোমার রুটিন অনুযায়ী তাহাকে চালাইতে হইবে। জমিদারের ছেলে এখন একটা প্রকাণ্ড বাড়ী ভাড়া করিয়া আছে, তার বাবাও এখানে আছে মাষ্টার কয়েক জনই রাখা গিয়াছে। ইহাতে তাহার চরিত্রের উন্নতি তেমন বেশী যে হইবে তাহা মনে হইতেছে না, এরূপে হইতে পারে ও না। অথচ মাসে মাসে হাজার টাকা খরচের বরাদ্দ হইয়াছে। জমিদার মহাশয়ের খরচ কমানো ইচ্ছা। আমাদের ইচ্ছা ছেলেটীকে একটী উৎকৃষ্ট ছাত্রের সংসর্গে হোষ্টেলে রাখিয়া দেই। তোমরা দুজনে একত্র থাকিবে খরচ পত্র সরকার হইতে পাইবে। প্রাইভেটটিউটার আসিয়া নিয়মমত উভয়কেই পড়াইয়া যাইবে। এইরূপ বন্দোবস্তে হাজার টাকার স্থলে দুশ আড়াইশ টাকার মধ্যেই হইয়া যাইবে। এ প্রস্তাব আমার দেখ জমিদার ইহাতে স্বীকৃত আছেন। যদি সাহস পাও, আমি বলি, এ অতি উত্তম সুযোগ যাকে ইংরেজিতে বলে স্বর্ণ সুযোগ।

মাখন বলিল 'জমিদারের ছেলে, এক ক্লাসে পড়ি সে আমার কথা শুনিবে কি? যদি না শুনে!

বাঁশরী বলিলেন 'আমার ছেলের জন্য আমি এইরূপ একটী Companion tutor রাখিয়াছি। সেতো আমার ছেলেকে একটী কথা ও বলে না। সে সংছেলে, তাহার সৎগুণে বসিভূত হইয়া নিষ্কর্ম্মা বা দুষ্ট ছেলেরা ও ভাল হইয়া যায়। আর এক ক্লাসের উত্তমছেলের সংসর্গ ও অধমের পক্ষে ভাল সংসর্গ শিক্ষক অপেক্ষা ও উত্তম। সংসর্গের। দোষেই আমাদের দেশের বড় লোকের ছেলেগুলি প্রধানতঃ নষ্ট হইয়া যায়। এ ব্যবস্থা খুব ভাল আমার পরীক্ষিত এবং সে জন্যই আমি ইহা পছন্দ করি এবং তোমাদের উভয়ের জন্য ঠিক করিয়াছি।

মাখন মৃদুস্বরে বলিল আচ্ছা, আমি যাইব।"

বাঁশরী বলিলেন তুমি পরশু রবিবার তিনটায় এখানে আসিও আজ রাত্রিতে জমিদার বাড়ীর লোক আমার নিকট আসিবে আমি পরামর্শ ঠিক করিয়া রাখিব পরশু রবিবার

মাখন অভিবাদন করিয়া উঠিল। বাঁশরী বাবু বলিলেন "তুমি কলেজ হইতে আসিয়াছ কিছু খাও নাই; সামান্য জল খাবার কিছু খাইয়া যাও।" বাঁশরী একটী লোককে ইঙ্গিত করিলেন।

মাখন বিনত ভাবে বলিল— 'আমি জল খাবার খাই না; আমার অভ্যাস নাই আমি বাড়ীগিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক করিয়া একেবারে রাত্রির খাওয়া খাইব।"

বাঁশরী জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি থাক কোথায়?"

মাখন বলিল "নৈহাটী হইতে আসিয়া পড়ি।"

বাঁশরী—"সর্ব্বনাশ! ইহাতে কষ্ট হয় না?"

মাখন—"বেড়ীতেও আমরা ৪ মাইল হাঁটিয় বায়পুরে যাইতাম; তাহা অপেক্ষা এখানে অনেক কমই হাঁটিতে হয়।"

"ট্রামে যাতায়াত কর না?"

"আজ্ঞা না, এত পয়সা কোথায় পাইব?"

"এখানে ট্রামে আইস নাই?"

"দুইটায় কলেজ ছুটি হইয়াছিল সুতরাং হাঁটিয়া আসিবার যথেষ্ট সময় ছিল; এখনও হাঁটিয়াই শিয়ালদহ চলিয়া যাইব।"

বাঁশরী বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"হাঁ বাবা, তোমারই লেখাপড়া হইবে! যাক্ কিছু না খাইয়া দাদার প্রিয় ছাত্র তুমি—কিছুতেই যাইতে পার না।"

মাখন অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিল—"কিছু মনে করিবেন না, বাজারের জিনিস আমি এখনও খাই না।"

বাঁশরী বলিলেন "আমার ঘরের প্রস্তুত্ন্যচ মোহন-ভোগ খাইবে। আমিও খাইব, তুমিও খাইবে।

মাখনের আপত্তি ফুরায় না —"আমি হাত মুখ ধুই নাই।"

বাঁশরী সরল শ্রদ্ধার সহিত বলিলেন—"কোন চিন্তা-নাই, সব হবে; তোমার এসকল আপত্তিকে আমি খুব মূল্যবান বলিয়া মনে করি, এবং ভরসা করি, কলিকাতার জল বায়ু তোমার মনে কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিবে না।"

(১৭)

মাখন সোজা গড়ের মাঠে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ফুটবল খেলার সে একজন খেলোয়ার; সুতরাং খেলাটা ২১ বাজি দেখিয়া যাইবার সখ্ কিছুতেই সে দমন করিয়া উঠিতে পারিল না। সে খুব দ্রুত চলিয়া আসিয়া একদিকে বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল, এবং নিবিষ্ট ভাবে খেলা দেখিতে লাগিল।

খেলার মাঠে সোডা, লেমনেড্, চীনেবাদাম, অবাক্ জলপান, চা, চুরট, সিগারেট, পানের খিলির অভাব ছিল না। মাখনের দৃষ্টি এগুলির উপর একেবারেই নিবদ্ধ হইল না। সে খেলার ভাবে এত মজিয়া গিয়াছিল যে সে পাগলের মত খেলোয়ারদের ক্রটী ও কৃতকার্য্যতায় শরীরের যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির চালনা দ্বারা অভিনয় করিয়া সময় সময় অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল।

একা একধারে বসিয়া যখন মাখন এইরূপ ভাব উন্মাদনার অভিনয় করিতেছিল, তখন তাহারই সমবয়স্ক একটী যুবক আসিয়া তাহাকে ধরিয়া আর একদিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিতেছিল।

মাখন বুঝিল, ছেলেটা আর একদিকে চাহিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে অসাবধানতা প্রযুক্ত আসিয়া তাহার উপরে পড়িয়াছে; সে উঠিয়া সরিয়া গেল।

যুবকটী বলিল—"আপনাকে ডাকিতেছেন—ঐ যে সেখানে বসা।"

ছেলেটী অল্প দূরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল।

মাখন দেখিল, বেলা নাই, যাইতে হইবে প্রায় ২৯৷০ মাইল। সে তাহার পুস্তকগুলি হাতে লইয়া যুবকটীর অনুসরণ করিল।

অদূরে কয়েকটী যুবক একত্র জমিয়া জটলা করিতেছিল। কেহ পকেট হইতে চীনাবাদাম লইয়া নখে খোসা ফেলিয়া একটী একটী করিয়া চীনাবাদাম খাইতেছিল, কেহ সিগারেট টানিতেছিল, কেহ লেমনেড্ খাইতেছিল। একজন আর একজনকে তৃতীয় ব্যক্তির উপর ঠেলিয়া ফেলিয়া আমোদ করিতেছিল, এইরূপ অবস্থায় সেই স্থলে মাখনেরমত একটী সুন্দর মূর্ত্তির আবির্ভাবে সকলের দৃষ্টি হঠাৎ তাহার দিকে আকৃষ্ট হইল। একটী গৌরকান্তি সোনার চশমা পরা যুবক মাখনকে সম্ভাষণ করিয়া বলিল—"আসুন।"

যুবকটী একখানা বেঞ্চে বসিয়া একটা চুরট টানিতে-ছিল; মাখনকে নিকটে বসাইয়া নিজ পকেট হইতে চুরট কেসটা বাহির করিয়া মাখনের সম্মুখে ধরিয়া বলিল—"নিন।"

মাখন লজ্জিত হইয়া বলিল—"ক্ষমা করিবেন, এ আমার অভ্যাস. নাই।"

যুবকটী লজ্জিত হইয়া বলিল—"প্রথম সম্ভাষণটাই বাতিল করিয়া দিলেন যে। একটা লেমনেড্ খাইবেন কি?"

মাখন যোড়হাত করিয়া বলিল—আমি এসব কিছুই খাই না। আমাকে আপনি ডাকাইয়াছেন?

যুবক—"হাঁ, একটা পাম খান্।"

"আজ্ঞা, আমার অভ্যাস নাই।'

যুবকটী অধিকতর লজ্জিত হইয়া বলিল—"আপনি এখন বাড়ী যাইবেন অবশ্যি?'

মাখন—"৭টা ১৫ মিনিটের গাড়ীতে যাইব।"

যুবকটী বিস্ময়ের সহিত বলিল—"কোথায় যাইবেন? কোন ষ্টেসন হইতে?'

মাখন—"শিয়ালদহ যাইব, নৌহাটী থাকি।"

যুবক তাহার রিষ্ট ওয়াচ্টী হাত ফিরাইয়া দেখিয়া বলিল—তবেতো আর বেশী দেরী নাই।"

মাখন বলিল—"তবে অমাকে এখনই যাইতে হইবে।"

"চলুন" বলিয়া যুবকটী উঠিয়া পড়িল। মাখন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি আমাকে ডাকিয়াছেন?"

যুবকটী তাহার মুখের দিকে সরল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"আলাপ পরিচয় করিব বলিয়াই ডাকাইয়াছি।"

মাখনের মনে উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছিল, এই সরল উত্তরে সে উদ্বেগ অনেকটা কমিয়া গেল। দুই জনেই স্পেলনেডের দিকে যাত্রা করিল। অল্প খানি দূরে আসিয়াই যুবকটী কথা তুলিল—"আপনার সঙ্গে আলাপ করিব বলিয়া কয় দিন মনে হইতেছিল; আপনি উর্দ্ধশ্বাসে আসেন, আর উর্দ্ধশ্বাসে চলিয়া যান, তাই ইচ্ছা সত্বে ও ধরিতে পারি নাই; আজ বড় সুযোগে সাক্ষাৎ হইল।"

মাখন যুবকের কথায় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিল—"আপনি আমাকে কোথায় দেখিয়াছেন, বলুন দেখি?

যুবক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—"কেন, প্রতিদিন ক্লাসে দেখি, আপনি আমাকে দেখেন নাই কি।"

মাখন লজ্জিত হইয়া বলিল—"ক্ষমা করিবেন, আমি এখানে নিতান্ত নিঃসহায়, তারপর নূতন; লজ্জা বশতঃ ক্লাসে কারো সহিত মিলিতে পারি নাই। আপনি আমাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, সে আপনার অনুগ্রহ; দয়া রাখিবেন আমার প্রতি।'

যুবকটী নানা বিষয়ের আলাপে মাখনের সহিত বেশ্ মিশিয়া পড়িল। মাখনও এতদিনে ক্লাসে একটী নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু পাইল ভাবিয়া মনে বেশ সাহস ও উৎসাহ বোধ করিতে লাগিল।

স্পেলনেডে আসিয়া মাখন বলিল—"আপনি ট্রামে যাইবেন, তবে আমি বিদায় হই।"

যুবক "আপনি এত দূর হাঁটিয়া যাইবেন, আশ্চর্য্য!"

মাখন—আমার হাতে পয়সা নাই; আর আড়াই মাইল হাঁটা আমার নিত্য অভ্যাস......"

যুবক আর কোন কথা না বলিয়া মাখনের হাতে ধরিয়া লইয়া গিয়া ট্রামে উঠিল। ট্রামেও উভয়ে যুবক-সুলভ বহু বিষয়ের আলাপ হইল; তারপর শিয়ালদহে নামিয়া যুবকটী একেবারে মাখনকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া বিদায় হইল।

আলাপের সূত্রেই মাখন যুবটিকে পূর্ব্ববঙ্গের লোক বলিয়া বুঝিয়াছিল; তাই সে নিঃসঙ্কোচে তাহার সহিত মিশিতে পারিয়াছিল।

পরদিন সে হাঁপাইয়া কলেজে আসিয়া আর যুবকটির সহিত আলাপ করিতে সুযোগ পাইল না বটে, কিন্তু ক্লাসে বসিয়া উভয়ে উভয়ের সহিত বারংবার দৃষ্টি বিনিময় করিয়া মনে মনে যথেষ্ট প্রীতি অনুভব করিয়া লইল।

শনিবারের ছুটির পর যুবকটি তাহাকে লইয়া মিউজিয়াম দেখাইতে গেল। এবং পূর্ব্বদিনের ন্যায় খেলার মাঠ ঘুরাইয়া আনিয়া ৭—১৫ মিনিটের গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেল।

বিদায় কালে যুবক বলিল—"কাল সাক্ষাৎ হইতে পারে কোথায়?"

মাখন বলিল—"কাল্ আর সাক্ষাৎ করিবার সুবিধা করিতে পারিব না বিশেষ দরকারে অন্যত্র যাইব।"

(ক্রমশঃ)

শ্রাবণের রস-ধারা।

বর্ষার সঙ্গীতে সাহিত্য ভরপুর। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে যখন পর্ব্বতের সামুদেশ গভীর কালো মেঘে ছাইয়া গেল, তখন হইতে কাব্যের সৃষ্টি এবং মাহ ভাদরের ভর বাদরে কাব্যের চমক সার্থকতা। যখন ভুবন ভরিয়া বরিষা অবিরাম ঝর ঝর ধারায় ঝরিয়া পরিতেছে তখন ময়ুর নাচে কেন, দাদুরীর দল মত্ত হইয়া ডাকে কেন, ডাহুক ডাহুকী আনন্দ-উৎসবে মাতে কেন, বিরহমিলনের সুর মানুষের মনে ঝঙ্কার দিয়া উঠে কেন? এ 'কেনর' উত্তর কে জানে?

বর্ষা যে প্রাণের পর্দ্দায় পর্দ্দায় কি গানের সুর জাগাইয়া তোলে বর্ষার ঝর ঝর ধারায় কি যে আনন্দ ক্ষরিয়া পড়ে; কাব্যে অলঙ্কারে ছন্দে গানে তাহা যুগ যুগান্তের কবিগণ গাহিয়া শেষ করিতে পারেন নাই।

বর্ষার এক প্রকাশ উহার বৃষ্টিধারায়; অন্য প্রকাশ নদী খালবিল মাঠ ঘাট হাওর ভরিরা জলরাশির খেলায়। বৃষ্টিধারায় যে সঙ্গীত ঝঙ্কৃত হয় তাহা যেমন অপূর্ব্ব, নদ-নদী-বিল-হাওড়-সাগর প্রাণে যে সঙ্গীত তরঙ্গ সৃষ্টি করে তাহাও তেমনি অপূর্ব্ব। হাওরের বুক ভরিয়া, আকাশের সহিত যেখানে পৃথিবীর মিলন ঘটিয়াছে সেই মিলনস্থান, অবধি কালো জলের স্নিগ্ধ, প্রশান্ত, অসীম আবেষ্টনের মধ্যে বৎসরের সমস্ত কর্ম্মের অবসানে, যে মধুর অবসর ঘটিয়া থাকে, সেই অবসর সময়ে ভাটী অঞ্চলে যে আনন্দোৎসব হইয়া থাকে তাহা সেই বর্ষার অসীম কালো জলরাশির সঙ্গীতের সঙ্গে সুর বাঁধা। বস্তুতঃ যিনি দিগন্ত বিসারী হাওরের জলরাশির মধ্যে বসিয়া ভাটী অঞ্চলের নৌকা বাচের আনন্দ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন বাইচের "সারিগাণ" অপূর্ব্ব উন্মাদনা ও আনন্দের সামগ্রী কিনা? এবং যিনি এই অসীম স্নিগ্ধ প্রশান্ত জলরাশির আবেষ্টনের মধ্যে বসিয়া কর্ম্মহীন মধুর সন্ধ্যায় ঘাটুগান গাহিয়াছেন বা শ্রবণ করিয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন এই ঘাটুগান বর্ষার সঙ্গীতের সঙ্গে সুর বাঁধা কিনা। প্রকৃত প্রস্তাবে "সারিগাণ" ও "ঘাটুগান" ভাটীরই সামগ্রী এবং উহা দাদুরীর সঙ্গীত, ময়ুরের নৃত্য এবং ডাহুক ডাহুকীর আনন্দোৎসবের মত বর্ষার আবেষ্টনের মধ্যে একান্ত স্বাভাবিক সুসঙ্গতও।

ঘাটুরগান ও নাচ সম্বন্ধে আমি আজ কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। কিন্তু ঘাটু কি, তাহা অনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। ঘাটু নৃত্যগীত ব্যবসায়ী ছোকরা। কিন্তু ঘাটুগান ঘাটুর মুখ উচ্চারিত গান নহে। ঘাটুগানের যৌগিক অর্থ আছে। এই গান মজলিশের রসামোদী ব্যক্তিগণ (ভাই আপগণ) কীর্ত্তন গানের মত সকলে মিলিয়া গাইয়া থাকেন। এবং ঘাটু নামধেয় বালকটী নারীবেশে একবিশিষ্ট ধারায় অঙ্গভঙ্গী ও অঙ্গ সঞ্চালন পূর্ব্বক এই ঘাটুগান গুলিকে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলে। ঘাটুর এই বিশিষ্ট অঙ্গ চেষ্টাই ঘাটুর নৃত্য। ঘাটুরগান বহু গ্রাম্য কবির চিন্তায় এবং বৈষ্ণব কবিগণের রস সৌন্দর্য্যের ভরপুর। ঘাটুনাও এই বিশুদ্ধ রসধারার সঙ্গে সুসঙ্গত এক অপূর্ব্ব বিশিষ্ট নৃত্যকলা।

যাহারা বালক কণ্ঠ নিঃসৃত প্রেম সঙ্গীত শুনিতে ঘাটুর মজলিসে উপস্থিত হইবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ঘাটুগানের ও ঘাটুনাচের স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হইবেন না। ঘাটু ছোকরা যে গান আপনার মনোরঞ্জনের জন্য গাহিবে, তাহা গ্রাম্যতাদোষ দুষ্ট এবং তানলয় বিহীন মনে হইবে; এবং আপনি যদি তাহার নিকট থিয়েটারী নাচ দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে সে আপনাকে এমন নিকৃষ্ট অনুকরণ দেখাইবে যাহা যাত্রার নাচ অপেক্ষাও অমার্জ্জনীয়—বেয়াদপী মাত্র। কিন্তু আপনি যদি ঘাটুগাণের সঙ্গে তানলয় যুক্ত বিশিষ্ট ধারায় ঘাটুর নৃত্য দর্শন করেন, তবে আপনি যে রসাভাষ পাইবেন, তাহা অপূর্ব্ব।

পূর্ব্বকালে—গ্রামের কৃত্যবিদ্য কৃতকর্ম্মা ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত ঘাটুগানে আহার নিদ্রা ভুলিয়া থাকিতেন। কোন একটা গভীর রসের আস্বাদ না পাইলে কেবলমাত্র তরল চটুল সঙ্গীতে এই শ্রেণীর লোক মাতোয়ারা হইয়া থাকিতেন না। যে অমৃত এই সঙ্গীতের প্রাণ, যে অমৃতের আস্বাদনে ভাইআপগণ আহার নিদ্রা ভুলিয়া থাকিতেন, তাহা বাস্তবিকই অমৃত। শ্রীচৈতন্য দেবের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া এই অমৃত বাঙ্গালীর সাহিত্যে ও চিন্তায়, বাঙ্গালী জীবনের প্রত্যেক স্তরে স্তরে রস স্বরূপ বিদ্যমান। এই

অমৃতের একাংশ ঘাটুগানে সংরক্ষিত। ইঁহারই আস্বাদনে তৎকালের ঘাটুগান প্রিয় ভাইআপগণ ভরপুর থাকিতেন। বস্তুত বাঙ্গালী জীবনের প্রকৃত প্রাণ-বস্তু শৌর্য্য নহে, বীর্য্য নহে; উহা রস। রস ও আনন্দেই বাঙ্গালা জীবনের পূর্ণ পরিণতি।

কয়েকটী ঘাটু গানের নমুনা দিতেছি। এই সমস্ত সঙ্গীত দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে যে হিন্দু মুসলমান উভয় প্রকার কবিগণই এই সমস্ত সঙ্গীত রচনা করিয়া বাঙ্গালীর রসের মজলিসে যোগান দিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বহু সঙ্গীতে উর্দ্দু ও পারসীক শব্দের প্রাচুর্য্য দেখা যায়।

(১)

আগোণে জড়াও বিরহেকে জিয়ারা।
কৌণে ছাপাওয়ে নিঠুর প্রিওয়া॥
আরে সখি—
যো দিন মোহন মোহেরে ছোড়ি
তানা মানা আগোণে দহে হামুনারী
কৈছে কহুরে হামুনারী—
আরে কোই নাই হামারি
কৈছে রহুরে—হামুনারী—
বিনে দরশওয়া॥
কৌণে ছাপাওয়ে নিঠুর প্রিওয়া—

(২)

ঝুটা জিন্দিগি লিয়ে গোঞাই মৌহলমে রোঁয়ে।
কিধার যায়েঙ্গে মাইকো দেওয়ে বাতাইয়ে॥
হোয়ে আখের দম
দরদে আলম—রে—
ছুফতাব জিগারদম-ইত্যাদি।

(৩)

ও তেরে স্বহস্তে সংসার মুজকুর পরিধায় গিয়ে—
এই ছাই বেহুদার কর গিয়ে— ইত্যাদি।

পাঠকগণ দেখিবেন ২।৩নং গানে পারশীক শব্দের প্রাধন্য কিরূপ দেখা যাইতেছে। আমি এ সকল গনের অনেক কথাই নিজে বুঝিতে না পারিয়া কেবল নমুনা হিসাবে দুই এক পদ মাত্রউদ্ধৃত করিয়াছি। এইরূপ বহু সঙ্গীতের অনেক অংশ সম্যক বুঝিতে পারি নাই। অধিক পরিমাণে সংগ্রহ হইলে এই সমস্ত সংশয় দূর হইবে।

এই সমস্ত সঙ্গীত বৈষ্ণব পদাবলীর মত গৌর, রূপ, বংশী বা মুররী, মিলন, বিরহ, ইত্যাদি শাখায় বিভক্ত। নিম্নে দুই এক পদ করিয়া কয়েকটি নমুনা দিতেছি।

(৪) গৌর—

গৌর আমার সুন্দর, নয়নের তারা।
রাত্রি নিশাকালে গৌর হইয়াছি হারা॥
যে অবধি গৌর গেল
সোনার নইদা আন্ধাইর হৈল
(বিপদ ঘটিল)
সেই অবধি শচী রাণী জীয়ন্তে মরা।

(৫) গৌর।

ঝড়কা বিজুলী যৈছে
কাঞ্চন গৌর ঐছে
ধরাক নীচে—ইত্যাদি।

(৬)

এয়ছা রূপ ঝলকে ও রামা
আরে—যমুনাকো ঝলকে মিলাও।
নীল কলেবর শ্যামই সুন্দর
বাকা বিজলী ছটকে।
আরে—যৈছে তামামানা হরলিয়ে যাও
আরে যমুনাকো ঝলকে মিলাও। ইত্যাদি।

(৭) বনশী।

আরে সেইঞাকো বনশী বাজে কোন্ বনমে শুনি
রহিতে না পারি ঘরে—
রোয়ে আশমান
কোনিয়ে রাস্তামে যাইয়ে
ধাধা মদন বানে সাকিম্না হামারি,—
রইয়ে রইয়ে বাজায় বনশী বেরল ধ্বনি।
ইত্যাদি।

(৮ মুররী।

যমুনা বয়রে উজান রে মুররীকা ধুন শুনি
উর্দ্ধ কি ত্যাজিলা দণ্ডকমণ্ডলু (?)

শুনিয়া বন্‌শী ধ্বনি উনমত্ত কামিনী
যোগীজন ছাড়ে যোগ ধ্যানরে মুররীকা ধুন শুনি।
ইত্যাদি।

(৯) মুররী।

মোহন কা মোহন মুররী—
আরে বাজেরে -
কোন্ গহিন্ বনমে—
আছানক্ ক্যা শুনি।
মধু বরষে)
বন্‌শীমে কেয়া জানি
দিল মেরে মোহিনীয়া মন—
আরে—ও প্রাণ সজনি—
যমুনা উলট বহে ধুন শুনি। ইত্যাদি।

(১০) মুরলী।

মুরলী কা ধুন শুনি গহিন বনমে।
শুনিয়া পলটের পাখী—
ঐ—যৈছে বান্ধা রয় পিঞ্জরামে॥
নামেতে ফুকারে মুরলী মধুর ধুনে,
জিউ নাহি মানে
মাইকো লিয়ে চলে সে গহন বনে—
চিত্তে সমঝ্ না মানে। ইত্যাদি।

(১১) মুররী।

ঘড়ি ঘড়ি নাম ধরি।
বাজাওয়ে শ্যাম মুররী॥
রহিতে না পারি ঘরে
চিত্ত মোর বাহুরী॥
ভুজঙ্গিনী বৈরী—সইগো
কাল ননদিনী।
শ্যাম বিচ্ছেদে প্রাণ দহে—
বাঁশী হৈল প্রাণের বৈরী।
চিত্ত মোর বাহুরী॥

(১২) স্বপণ।

প্রিও সনে শয়ান মেরে থাকিয়া
হাসি খুসী করে ও কাছে বসিয়া
আরে মুই শেজোয়ামে শুইয়া—
হাসি খুসী করে ও কাছে বসিয়া॥
ভুলে পড়ি যে মুই শেজোয়ামে শুইয়া—
হাসি খুসী করে ও কাছে বসিয়া॥
সখিরে—খোয়াপে হেরি ছাতিয়া লাগাইদেমুই—
তাপিণী গণে ধরাই—
জাগিয়ে নাইগো হেরি
প্রিউ গিয়ে মুই ছোড়ি।
ও সখিরে—
নয়ন আকুলরে—পলকে নাহি নিন্দেয়া।
হাসি খুসী করে ও কাছে বসিয়া।

(১৩) ভোর।

মেরে মোহন আসিবে আশাতে বসিয়া।
প্রিউ নাই আওএরে মুই একেলা মন্দরোয়া।
নীরে ভাসাওয়ে ফুল শেজোয়া।
ফুলনি সেজোয়া—
যমুনায় মোর সাকিয়া—
নীরে ভাসাওয়ে ফুল সেজোয়া।
বনদল কি শতদলে ফুল মালতীয়া,
স্বর্ণ পালঙ্ক হে বিছানায় সাজাইয়া,
সব সখি লিয়ে—আরে বিফলে রাতিয়া,
সুখ নিশি ভোর হৈল রে সাকিয়া,—
নীরে ভাস ও যে ফুল শেজোয়া।

(১৪) বিরহ।

এয়ছে সময়ে মুইকো ছাড়া। ও—এ
শূন্য মন্দরে—ও আরে,
কি ধারছে যা ও প্রাণ পিয়ারা।
দহেরে ছাতিয়া হামারা॥
শুতি শেজোয়া পর রাতি মোহলে ও,
পলকে পলক না রয় জাগিয়ে গোঙাও,
গুজারা গিয়ে মধুমাস
যেয়ে পর এ পরবাস
এয়ছে দরদী নাহি হামকো মিলায় দেও,
কি ধারছে যা ও প্রাণ পিয়ারা।
দহেরে ছাতিয়া হামারা॥

এই সংগ্রহ অত্যন্ত অপ্রতুল ও বিশেষত্ব বর্জ্জিত। তাহার কারণ ব্যক্তিগত আলস্যতা। উদ্যোগী রসামোদী যোগ্যতর ব্যক্তি দ্বারা এই সংগ্রহ কার্য্য সম্পন্ন হইলে এই সঙ্গীত মালা বাঙ্গালা ভারতীর নিতান্ত অবহেলার সামগ্রী হইবে না।

ঘাটুর নৃত্য সম্বন্ধে প্রধান কথা এই যে উহা এক বিশিষ্ট ধারার নৃত্য কলা। নৃত্য সর্ব্বদাই পৃথিবীতে সমাদর লাভ করিয়া আসিতেছে। অধুনা সভ্য জগতে নৃত্যের নানারূপ ভঙ্গী আবিষ্কৃত হইয়া, নানারূপে মার্জ্জিত হইয়া লোকের মনোরঞ্জনের প্রয়াস করিতেছে। আমাদের দেশের থিয়াটারেও নৃত্য এক প্রধান অঙ্গ বিশেষ। থিয়েটারে আমরা সচরাচর যে নৃত্য দেখিতে পাই উহা বহির্ম্মুখ (objective)। নর্ত্তনশীল ব্যক্তির নানাপ্রকার কসরৎ এই নৃত্যের সফলতা দান করে। কসরৎ দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই; তাহার কারণ অঙ্গ ভঙ্গী সকল অত্যন্ত ক্ষিপ্র ও জড়তাশূন্য এবং অঙ্গের লাবণ্য ও রূপের জ্যোতি মিশিয়া এক উজ্জ্বল মধুর তরঙ্গ সৃষ্টি করে, আমরা সে তরঙ্গে হাবুডুবু খাই। নর্ত্তনশীল ব্যক্তির অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সম্যক ভাব প্রদর্শনেই এই নৃত্য সীমাবদ্ধ। ইহা দর্শকের অন্তরকে বিশ্বের নৃত্যের তালে তালে স্পন্দিত করে না। বিলাস এই নৃত্যের জনক এবং ভোগ ইহার সহচর।

এই বহির্ম্মুখ (objective) নৃত্যের তিনটী ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ পাশ্চাত্য জগতের প্রচলিত বল-নাচ প্রভৃতি। প্রারম্ভে বল নাচ প্রাণের উদ্দাম শক্তির আনন্দ গতির আবেগ স্বরূপে হইলেও বর্ত্তমানে নানা বিচিত্র ব্যূহ রচনার প্রয়াসের সঙ্গে জড়িত হইয়া উহা একান্ত শিষ্টাচারে পরিণত হইয়াছে। ইহার অনুকরণ আমাদের থিয়েটারী নৃত্যে কতক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। রমণী এই নৃত্যের ঋষি, চটুল চঞ্চলতা ইহার ছন্দ, কাম ইহার দেবতা, ভোগবিলাসে ইহার বিনিয়োগ।

বহিরঙ্গ (objective) নৃত্যের দ্বিতীয় ধারাকে মোগলাই ধারা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। করাঙ্গুলীর বিচিত্র ভঙ্গী এই নৃত্যের বিশেষত্ব। সাঁওতালী নৃত্যের একখানা চিত্র প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল, এই চিত্রে যে নৃত্যের ধারা সূচিত হইয়াছে, তাহাকেই বহির্ম্মুখ নৃত্যের তৃতীয় ধরা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই শেষোক্ত নৃত্য অন্তর ও বাহিরের সন্ধিস্থলে অবস্থিত।

আরও এক প্রকার নৃত্য আছে, তাহা অন্তর্ম্মুখ Subjective) এই অন্তরঙ্গ নৃত্যে—নর্ত্তনশীল উপলক্ষ মাত্র নিমিত্তস্বরূপে উহা আমাদের প্রাণে একটা ভাবতরঙ্গ (suggestiveness) জাগাইয়া দেয়। নৃত্যশীল ব্যক্তিটী আমার লক্ষ্য বস্তু (Centre of interest) নয়। আমার অন্তরে বিশেষ পুলক স্পন্দন জাগাইয়া দিয়া উহার কার্য্য শেষ হয়। এই পুলক স্পন্দন, বিশ্বের এই উচ্ছ্বাস, এই পূর্ব্বরাগ মিলন বিলাপ বিরহের ঘাত প্রতিঘাত—ইহাই তখন আমার অন্তরের একমাত্র সত্যবস্তু হইয়া দাঁড়ায়। এই অন্তরঙ্গ নৃত্যের লীলা প্রকাশক যে অঙ্গভঙ্গী তাহা জড়িমা ময়, গভীর আত্ম নিবেদনের বিকাশ। অঙ্গটী যেন পূজার নৈবেদ্যের মত আপনার পবিত্র নির্ম্মলতায় জ্বল্ জ্বল্। প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীতে যেন বিশ্বের একটা ইঙ্গিত আকুল হইয়া ফুটিয়া উঠে। যে ভাবের প্রেরণা এই নৃত্যের মূলে নিহিত আছে, তাহার পক্ষে এই বাহ্যিক উপাদান গুলি অত্যন্ত অপ্রচুর। নৃত্যের এই বাহ্যিক উপাদানগুলি যে অন্তরতম বস্তুটী প্রকাশ করিতে চায়, তাহা যেন প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারে না। ভাবের আতিশয্যে দেহে-প্রাণে যে সাড়া দেয় সেই সাড়াই এই নৃত্যের প্রাণ। ভাবের প্রেরণায় দেহে যে পুলক বিবশ অবস্থা আনয়ন করে তাহার মুখে স্রোতোজলে বেতসীর মত দেহের যে আক্ষেপ তাহাই এই নৃত্যের স্বরূপ।

বর্ষার প্রারম্ভে যখন পর্ব্বতের সানুদেশ আচ্ছন্ন করিয়া ঘনঘটার সমাবেশ হয় তখন ময়ূরের নৃত্য দেখিয়াছেন কি? হাস্যময় শিশু যখন চঞ্চল অস্থির চরণে অকারণ নৃত্য করিয়া থাকে, তখন প্রাণ দিয়া এই নৃত্য দর্শন করিয়াছেন কি? যদি করিয়া থাকেন তবে এই অন্তরঙ্গ নৃত্যের আভাষ পাইয়াছেন। অন্তরঙ্গ নৃত্যের সার্থকতা এইখানে যে উহা জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত চিত্তনিরুদ্ধ আবেগ আকাঙ্ক্ষা আনন্দকে পুলকে, স্পন্দনে, অশ্রুতে, ক্রন্দনে অসীমে ছড়াইয়া দেয়। আত্মহারা মানব রসের সাগর পাড়ি দিয়া কোন্ দুর্লভ বৈকুণ্ঠে আপনার আনন্দে আপনি মস্‌গুল্ হইয়া থাকে।

এই আত্মহারা, ভাবে অবশ. দিব্য নৃত্য শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীঅঙ্গ হইতে নদীয়ায় ঝরিয়া পড়িয়া ছিল। আমার মনে হয় শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীঅঙ্গ ক্ষরিত সেই সুধাধারা হইতে বঙ্গদেশজগণ যে যত পারিয়াছিল কলসী ভরিয়া ভরিয়া সুধা ধরিয়া রাখিয়াছিল। তাহারই এক কণা এখন এই ঘাটুর নৃত্যে আমরা আস্বাদ করিতে পারি!

ভাবই এই নৃত্যের প্রাণবস্তু। ভাব ঘনীভূত না হইলে দেহে তাহার সাড়া আসিতে পারে না। সুতরাং ভাবের অভাব ঘটিলে এই নৃত্য প্রাণহীন বস্তুমাত্র। বাঙ্গালী সমাজের প্রাণে যে রসবস্তু অবস্থান করে তাহার সন্ধান কাহারো অবিদিত নহে। এই রস সঞ্জীবনী বাঙ্গালীর প্রাণকে অনন্তকাল পর্য্যন্ত জীবিত রাখিবে। এই অন্নবস্ত্রে মহাসমস্যার দিনেও শুনিবেন বাঙ্গালার পথে ঘাটে সেই সুর—"শ্যামবন্ধু কালিয়া—এলনা শ্যাম কি দোষ জানিয়া।" বাঙ্গালীর সমস্ত বেদ উপনিষৎ ব্রহ্মজ্ঞান ছাপাইয়া, তাহার সাকার নিরাকারের দ্বন্দকে উপক্ষা করিয়া সেই শ্যামবন্ধুর বাঁশীর সুর থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। কবে কোন্ "গহিন বনে" সেই বাঁশীর সুর বাজিয়াছিল আজিও বাঙ্গালীর চিত্ত সেই সুরে "বাহুরা" বাঙ্গালী জীবনের এই রস সমুদ্রে তুফান উঠিত বলিয়াই বাঙ্গালী 'রাধা' বলিতেই অজ্ঞান। এই ভাবাতিশয্য বাঙ্গালীর হৃদয়ের গোপন তলে অবস্থিত থাকে বলিয়াই ঘাটুগানে "ভাই-আপগণ" এতই মাতোয়ারা। এই ভাবাতিশয্যকে আশ্রয় করিয়া যে নৃত্যের উদ্ভব, এই ভাবাতিশয্যের উপর যে নৃত্যকলার বিকাশ সেই নৃত্যকলা অ শুই রসজ্ঞের মনোজ্ঞ বস্তু। যেখানে এই ভাবাতিশয্য সম্ভব সেইখানেই এই নৃত্যকলার বিকাশ হইতে পারে, মড্ এলেনের নৃত্যের ভিতরে ঘাটুগানের প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি হইতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঘাটুগানকে মূর্ত্তিমান করিয়া তোলার জন্য ঘাটুনাচের সৃষ্টি এবং ঐ তোলাতেই ঘাটুনাচের সার্থকতা। সঙ্গীতের ভাবার্থটী ঘাটু নিজ দেহভঙ্গী দ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকে। এই নৃত্যে চঞ্চলতা নাই, চঞ্চল চরণ ভঙ্গী নাই, সৌন্দর্য্য প্রদর্শনের কৃত্রিম চেষ্টা নাই। একটী ভাবকে মূর্ত্তিমান করিয়া তোলার জন্য দেহকে এলাইয়া, দোলাইয়া, তলাইয়া, বিলাইয়া ঘাটু নৃত্য করিয়া থাকে। আমার বিশ্বাস নৃত্যকলার ইহা এক বিশিষ্ট ধারা।

ভাবের অভাবে এই নৃত্য কৃত্রিম অঙ্গভঙ্গী মাত্র। আজকাল ঘাটুনাচ এই কৃত্রিম অঙ্গভঙ্গীতে পরিণত হইয়াছে। কারণ বাঙ্গালী সমাজের প্রত্যেক স্তরে স্তরে যে বর্ণ পরিচয় হীন একটা 'কালচার' (culture) চলিতেছিল, অধুনাতন সভ্যতার সংঘর্ষে, পৃথকীকরণ কার্য্য সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়া শিক্ষাকে প্রাণ হইতে এবং শিক্ষিতকে জাতি হইতে পৃথক করিয়া ঐ "কালচারকে" বিনষ্ট করিয়াছে। ঘাটুগান ও নাচ এই সভ্যতার ফলে ক্রমশ কোণ ঠেশা হইতে হইতে হয়ত অচিরেই লোপ পাইবে। অধুনা আমরা ঘাটুকে অশিক্ষিত বর্ব্বরের অবৈধ আনন্দের আশ্রয় মনে করিয়া নাক সিটকাই। কিন্তু পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সমষ্টির প্রাণে এই ঘাটুনাচ-গানের যে প্রভাব লক্ষিত হয়, জাতীয় মূলধনের হিসাব নিকাশের দিনে তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি. এল.।

আঁধার মানিক।

(উত্তর)

বুঝলাম দাদা, তুমি একজন আচ্ছা তামাক খোর,
দুপুর রাতেও বিশ্রাম দাওনা বউ দিদিরে মোর।
সারা দিনের খাটুনির পর রাতে একটু শুয়ে,
তারে তুমি উঠাও মরতে টিকের আগুন ফুঁয়ে,
"পতি সেবার প্রীতি নাই তার বিন্দু অনাদর,
খাটুনি খেটে দিনরাতে তাঁর নাইকো অবসর।
চাঁপার কলি আঙ্গুলগুলি তাতে টিকের ছাই
মাখতে দিলেই ঐ আপত্তির কারণ হয় রে ভাই।
তা না হলে উনুন ফুঁকি বিধু মুখীর দল
টিকে ফুঁকে কোন দুঃখে হবে হীন বল?
একেই তুমি অসময়ে ঘুম ভাঙনের শনি,
আবার বল মাখতে কালি হাতে মনা মন।
কাজে কাজেই বিরূপ হ'য়ে দু'চার কথা বলে,
ফলে কিন্তু তামাক খাওয়া নিতুই তোমার চলে।
আমরা এমন 'আঁধার মানিক' দেখতে যাওয়ার লোভে
চাঁপা ফুলে কালি মেখে মরতে চাইনা ক্ষোভে।
লওনা কেন পরামর্শ এখন হ'তে মোর,
সন্ধ্যাকালে খেও একটু আফিম্ আর গুড়।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ।

দাদা।

ভাদ্রের দিবা কোন মতেই আর কাটিতেছিল না। রবিবার হাইকোর্ট বন্ধ। মোকদ্দমা পরিচালকদের ও চলাচল বন্ধ। উকীল মোহিনী বাবু নিজের বৈঠকখানায় তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন। মোহিনী বাবু একজন খ্যাত নামা উকীল, খুব পসার সুতরাং অনেক টাকা কড়ি করিয়াছেন। দাতাও তিনি বিলক্ষণ, দানের খাতায় লক্ষ টাকা সহি করিতেও কাঁপেন না। এত বড় একজন কর্ম্মী লোক কর্ম্ম অভাবে আজ ছটফট করিতেছিলেন।

ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ করিয়া চারিটা বাজিয়া গেল কলিকাতার প্রশস্ত রাজ পথে গাড়ী ঘোড়া মোটর সাইকেল হন্ হন্ গতিতে চলিয়াছে। ফুটপাতের উপর লোকের ঠেশা ঠেশিতে পিপীলিকার সারিকেও হার মানিতে হইয়াছে। 'চাই বেল ফুল', 'চাই বরফ' অবাক্ জলপান—ফেরীওয়ালার ডাক হাক অসংখ্য চলিয়াছে। বাবু বসিয়া বসিয়া যেন একখানি চিত্রপট দর্শন করিতেছিলেন।

(৩)

শচীন ছেলে ও রমেন ভাইর বেটা, ফরাসের চাদরে জল ছবি লাগাইতে ছিল। শচীনের ছবিটা একটু বাঁকা হইয়া গেল, তাই সম্মুখের কলমদানি হইতে সে চাকুখানা তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল; তার অশান্ত অঙ্গুলির ব্যগ্র তাড়নায় কলমগুলি ঘর ঘর করিয়া উঠায় মোহিনী বাবুর ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি ভাই বেটাকে বলিলেন, "রমেন আমার জন্য ভিতর হইতে বরফ লইয়া আইস তো? সে ভিতর বাড়ীর দিকে গেলে তিনি তাড়াতাড়ি একটা ছানা বড়া তাঁহার পুত্র শচীনের হাতে দিয়া বলিলেন, "কোঠাতে যাইয়া চুপে চুপে খাইয়া ফ্যাল, রমেন যেন দেখিতে না পায়। রমেন না দেখিলেও উহা অন্য এক জনের দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না।

(৪)

মানুষের অনুমান সব সময়ই ঠিক হয়না। এত যে ছিল শক্তি সম্পন্ন রাজা দশরথ তাঁর শব্দ ভেদী বাণে একদিন কি অনর্থই না সংঘটিত হইয়াছিল! তিনি ভাবিলেন হরিণ, হইয়া গেল "মুনি পুত্র! এ ঘটনাও হইল ঠিক ঐরূপ।

পরদিবস কিশোরী আসিয়া বলিলেন—"দাদা আমরা পৃথক হইয়া যাইব"

মোহিনী বাবু হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কেন কিশোরী?"

"কেনর কি কোন উত্তর আছে দাদা?"

"আমার অপরাধ?"

"কিছু না।"

"তবু কোন কিছু ঘটিতে পারে, যাহা তুমিই জান, আমি নাও জানিতে না পারি।"

"দাদা, তবে শুন—কালিকার একটি ঘটনায় প্রাণে বড় আঘাত পাইয়াছি, তুমি খোকাকে সম্মুখ হইতে সরাইয়া দিয়া তোমার ছেলের হাতে খাবার গুঁজিয়া দিলে! কেন তাহা আধা আধি করিলে না দাদা?"

মোহিনী বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন "আরে পাগল, তোর ছেলের যে সর্দ্দি জ্বর হইয়াছে, সে খবর রাখিস্ কি তুই?"

কিশোরীর সংশয় জাল ছিন্ন হইয়া গেল। মুক্ত পরাণে কৃতজ্ঞতা ভরে নমিত হইয়া তখন অগ্রজকে বলিলেন—"আঃ বাঁচা গেলে; দাদা, তবু চল আমরা পৃথক হইয়া যাই; হয়ত সংসারের আর কোন্ কুটিল বাষ্পে আমাদের চিত্তের শুভ্রতাকে শ্রীভ্রষ্ট করিয়া তুলিবে—হয়ত এইরূপ সন্দেহের উপরই আমরা ঝগড়া ঝাটি করিয়া লোক হাসাইবে .. ...

মোহিনী গম্ভীর ও স্নেহ সূচক স্বরে বলিলেন—"যদি তাহাই তোর ইচ্ছা, তা হউক। তুই মাত্র উকিল হইয়াছিস এখনো তোর পসার হয় নাই; এদিকে আমি জীবনে যথেষ্ট টাকা উপার্জ্জন করিয়াছি, পৌতৃক জমিদারীর এক কপর্দ্দিকও আমি চাইনে।"

কিশোরী—দাদা "বলিয়া মোহিনীর পায়ে পড়িয়া গেলেন; তাহার মুখ আর হইতে কোন কথা বাহির হইল না; চক্ষু হইতে কৃতজ্ঞতার ধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কবিভূষণ।

চাষীর প্রতি।

তোর মাটি তোর ভুঁই, ক্ষেতভরা ধান তোর,
তুই তবু খোচ্চোর, দিনরাত শ্রান্তি!
দুই মুঠো ভাত তুই, দুই বেলা কই পাস্?
নাই দৃঢ় বিশ্বাস, নাই তোর শান্তি!

পাট গেল পর্‌দেশ, শাগ তোলো তাই ফের্,
ফের্ বৃথা দুঃখের তুই খুব টান্‌বি!
হায় বোকা, তায় মেষ, দ্যাখ্ ভেবে একবার!
এই ধোঁকা ভাঙ্‌বার, —একবার জাগ্‌বি!

তোর ধনে রাম শ্যাম লাখ্‌পতি ধনবান,
পাস্ করে সম্মান, বস্‌বার চৌকি!
সেই বড়, তার নাম গায় সবে দিনরাত’
তুই ‘চাষা’, ‘বজ্জাৎ’! তোর বৌ বৌ কি!

*　　*　　*

আর কিরে ভুল হবে? হাল কসে’ ধর্‌বি!
এই দিনে ভাত বিনে, আর কত মর্‌বি!
তুই বাবু হোগনারে, থাক্ চাষী শক্ত;
দেখ্‌লিনা বার হোলো মুখ দিয়ে রক্ত!

দুদিনে পাস না তো ভাত কভু চাট্টি!
কষ্ট ছিল নৌ-ঝিয়া, ঘর বেড়া টাট্টি?
কোন্ ধনী দ্যায় তোরে একটুকু নেংটি!
তুই যদি যাস্ কাছে খুব মারে খেংটি!

তোর খেয়ে তোর পরে’ সব ছিরিমন্ত!
তোর নোড়া তোর শিলে তোর ভাঙে দন্ত!
তুই কবে টের পাবি — তোর মহাশক্তি!
চায় কবি তোর কাছে দেশ্-অনুরক্তি।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

ময়মনসিংহের প্রাচীন কথা।

(১)

বাঙ্গলা ১২৭৭ সনে আমি ময়মনসিংহ জেলায় চিকিৎসা কার্য্যোপলক্ষে আসি। তখন আমার বয়স ২৬ বৎসর মাত্র। সে সময় ভিন্ন জিলা হইতে নৌযানে কিংবা পদব্রজে ভিন্ন এখানে আসিবার অন্য কোনও উপায় ছিলনা। আমি বরিশাল হইতে নৌকা যোগে কোনও বার দশদিনে কোনও বারবা একাদশ দিনে ময়মনসিংহে পৌছিয়াছি।

দীর্ঘকাল নৌকায় বাস করায় বিরক্তি বোধ হইলেও পথে নানা স্থানের নানা রূপ মনোহর দৃশ্য অবলোকনে এবং খাদ্য দ্রব্যাদির সংগ্রহের নিমিত্ত নানা স্থানের হাট বাজারে নানাবিধ বস্তু দর্শনে একপ্রকার স্ফূর্ত্তি ও আনন্দে থাকিতাম বলিয়া পথের কষ্ট একেবারেই অনুভূত হইত না। ময়মনসিংহ পৌছিলে যেন ভারতবর্ষ ছাড়িয়া অন্য দেশে আসিলাম বলিয়া বোধ হইত; কারণ আজকাল ১০।১২ দিনে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া অনায়াসে অন্যদেশে উপস্থিত হইতে পারাযায়। বর্ত্তমানে আমার বয়স ৭৭ বৎসর। এই ময়মনসিংহে আমি ৫২ বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছি। ৫২ বৎসর পূর্ব্বে ময়মনসিংহের যে অবস্থা ছিল এবং অত্রস্থ যে সকল ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা অনেকের নিকটেই অপরিচিত ও অপরিজ্ঞাত সুতরাং এগুলি লিপিবদ্ধ করিলে যুবক ও বালক দিগের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্বাবস্থা জানিতে পারিবেন বলিয়া কয়েকটী কথা লিপিবদ্ধ করিলাম।

রাস্তাঘাট।

৫০ কি ৫২ বৎসর পূর্ব্বে ময়মনসিংহে তিনটী মাত্র পাকারাস্তা ছিল, আর সমস্ত রাস্তাই কাঁচা; পাকা রাস্তার মধ্যে নদীর পারের রাস্তাটীই ভালছিল, আর দুইটী কোনও রকমে মেরামত করা হইত। তখন ময়মনসিংহে বৃষ্টির মাত্রাও কিছু অধিক ছিল, বর্ষাকালে কাঁচা রাস্তায় মনুষ্যের পাদপদ্ম অর্দ্ধহস্ত পর্য্যন্ত কর্দ্দমে নিমগ্ন হইয়া যাইত; তখন সকলেই রবারের জুতা ব্যবহার করিতেন। কেহ রবারের, কেহ বা রবারের মধ্যে চামড়ার জুতা প্রবেশ করাইয়া ব্যবহার করিতেন।

বৃষ্টির পরিমাণ অধিক হইলে তাহাতেও কুলাইত না,

তখন নগ্ন পদেই হাটা-চলা করিতে হইত। উকিল মোক্তার আমলা প্রভৃতি সকলেরই ছাতি বেহারা ছিল, তখন ছাতি বেহারা না রাখিলে তাঁহাকে কেহ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক বলিয়াই মনে করিত না। বেহারায় পরিচয় নিষ্প্রয়োজন, ছাতির পরিচয়ের দরকার। তখনকার ছাতি তালপত্র ও বংশ-শলাকা রচিত প্রকাণ্ড প্রকারের এক একটা পাহাড় পর্ব্বত বলিলেও বলা যায়, এহেন ছত্র, বংশখণ্ড সংযোগে বেহারার স্কন্ধ হইতে ৭।৮ হাত উত্থিত হইয়া চলিত। এদিকে আবশ্যক মত জিনিষ অর্থাৎ হুকা, কলিকা, তামাক, টীকিয়া, চুঙ্গা, ঝারি, গামছা, জুতা, বস্তা প্রভৃতি ছাতির সঙ্গে উপরে লট্‌কান থাকিত। কাছারিতে পৌছিলে বেহারা জল আনিয়া দিত, কর্ত্তারা পা ধুইয়া, মুছিয়া জুতা পায় দিয়া আফিসে গিয়া বসিতেন। তখন এহেন ছত্রে সম্ভ্রম রক্ষা হইত বটে কিন্তু বৃষ্টি হইতে দেহ রক্ষা হইত না। ছাতির নীচ দিয়া বাত বিক্ষিপ্ত বারি ধারা প্রায়ই কর্ত্তাদের শরীর অভিষিক্ত করিয়া দিত। লোকে সাধারণ কথায় বলে যা'ক প্রাণ থা'ক মান, অর্থাৎ প্রাণ গিয়াও মানীর মান থাকা ভাল, কর্ত্তারা এই নীতির অনুসরণ করিয়াই বোধ হয় বৃষ্টিতে অভিষিক্ত হইয়াও ছাতি বেহারা রক্ষার সম্ভ্রম পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। একবার এক কর্ত্তা বড় শক্ত বিপদে পড়িয়াছিলেন; গমনের সময় ছাতিতে লটকান ঝারি দড়ি ছিড়িয়া, কর্ত্তার মাথায় পড়িয়া গেল। ঝারির পতনের সঙ্গে সঙ্গেই কর্ত্তারও পতন এবং মুর্চ্ছা হইল, মস্তক হইতে রক্তধারা বেগে পতিত হইতে লাগিল, রাস্তায় একটা হুলুস্থুল লাগিয়া গেল। ধরাধরী করিয়া রক্তাক্ত কর্দ্দম লুণ্ঠিত কর্ত্তাকে অতি কষ্টে বাসায় উপস্থিত করা গেল। সেই আঘাতে কর্ত্তা মহাশয় প্রায় ২মাস কাল শয্যাগত ছিলেন।

আমাকে আমার অনেক বন্ধুবান্ধব ছাতি-বেহারার কথা বলিতেন। আমার তাহাতে একেবারেই মত ছিলনা; অনেক বলা-কহার পর আমার কিছু কিছু মত হইলেও কর্ত্তার মাথাফাটা দেখিয়া আমি কিছুতেই বন্ধু বান্ধবের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। আমি কাপড়ের ছাতি ব্যবহার করিতাম; ৪।৫ বৎসর পরে অনেকেই ক্রমে ক্রমে কাপড়ের ছাতি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ভালরূপে বৃষ্টি মানিত না বলিয়া আর একটা শাদা কাপড়ের বেষ্টন দিয়াও কেহ কেহ কাপড়ের ছাতি ব্যবহার করিতেন।

তখন সহরের বিস্তার এত অধিক ছিল না। পাট গুদাম, রেলষ্টেশন, কলেজ কোয়ার্টার, বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট স্কুলের নিকটবর্ত্তী স্থান, ষ্টেশনের দক্ষিণদিক, ব্রাহ্মপল্লী, নূতন বাজারের পশ্চিমাংশ, তদানীন্তন নাটক ঘরের দক্ষিণ ও ইটখোলা, এই সকল স্থানের কতক জঙ্গলাকীর্ণ কতক মুসলমানদিগের বসতি-স্থান ছিল। ঐ সকল জঙ্গলে ব্যাঘ্র-ভল্লুক না থাকিলেও ছোট ছোট চিতাবাঘ ও অন্যান্য বন্যজন্তু এবং বহু পরিমাণে শৃগাল বাস করিত। সহরে ভাড়া'টে গাড়ী একেবারেই ছিলনা, নিজস্ব গাড়ীও কেহর ছিলনা। গভর্ণমেণ্টের উকিল পূর্ণ বাবুর একখানা শোয়ারিগাড়ী ছিল। সহরের লোকে এই একখানা মাত্র গাড়ী দেখিতে পাইতেন। পূর্ণবাবু অতি উদারচেতা লোক ছিলেন। তিনি এই একমেবা দ্বিতীয়ং গাড়ীতে উঠিয়া কাছাড়ি যাইতেন, বেড়াইতে যাইতেন, আবার চাকর লইয়া বাজারে গিয়া আম কাঁঠাল প্রভৃতিও গাড়ীতে ভরিয়া আনিতেন।

তখন মফঃস্বলে হইলে পাল্‌কী কি হাতী বা পদব্রজে ভিন্ন যাইবার উপায় ছিল না। তখন অনেকেরই হাতীর প্রয়োজন হইত, জমিদারগণের বহুল পরিমাণে হাতী থাকিত। এমন কি মধ্যবিত্ত লোকের মধ্যেও অনেকেরই ২।১টা হাতী থাকিত, নচেৎ জিনিষপত্র আনা ও যাতায়াতের ব্যাঘাত ঘটিত। এই সহরে ৩টী মাত্র স্কুল ছিল, গবর্ণমেণ্ট এণ্ট্রান্সস্কুল, হাডিঞ্জস্কুল ও নর্ম্মাল স্কুল। জানকী বাবু হাডিঞ্জস্কুলের হেড্‌পণ্ডিত ছিলেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এখানে নর্ম্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ছিলেন তখন উমাচরণ বাবু। কালনা নিবাসী ঈশানচন্দ্র বিদ্যারত্ন এই স্কুলের হেড্‌পণ্ডিত ছিলেন। সে সময় ময়মনসিংহে চিকিৎসকের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। সরকারী ডাক্তারখানায় একজন নেটিভ ডাক্তার থাকিত, উপরে একজন সিভিলসার্জ্জন ছিলেন। বাহিরে নপাড়ার ডাক্তার শ্রীকান্ত বাবু বহুদিন হইতে টাউনে থাকিয়া টাউনে ও মুক্তাগাছা প্রভৃতির জমিদারবাড়ী চিকিৎসা করিতেন। ডাক্তার বরদা বাবু এবং

সারদা বাবুও টাউনে থাকিয়া সর্ব্বত্র চিকিৎসা করিতেন। সরকারী ডাক্তার সমেত এখানে মোট ৫জন ডাক্তার ছিলেন। বলাবাহুল্য যে ইহার একজনও পরীক্ষোত্তীর্ণ আসিষ্টাণ্টসার্জ্জন ছিলেন না। সহরে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক আমরা ৫ জন মাত্র ছিলাম। সেরপুরের বাসায় ছিলেন কালীকবিরাজ ও রামপ্রসাদ কবিরাজ, বড় বাসাতে ছিলেন দ্বিতীয় কালীকবিরাজ, মৃত্যুঞ্জয় স্কুলের নিকটে ছিলেন ভারত কবিরাজ, গাঙ্গিনার দক্ষিণে ছিলাম আমি। সে সময় সমাজে ডাক্তার কবিরাজের খুব সম্মান ছিল।

সে সময় চিকিৎসক অল্প ছিল এবং লোকের কর্ত্তব্য পরায়ণতা অধিক ছিল বলিয়া সকলেই চিকিৎসকের সম্মানের ও অর্থ সাহায্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। উচিত রূপে ঔষধের মূল্যাদি দিয়াও অনেকে পূজার সময় বার্ষিক প্রদান করিতেন। পূজার সময় কেহ কেহ চাউল, পাঠা, কলা, তারকারী প্রভৃতি বার্ষিক উপঢৌকনে নৌকা বোঝাই করিয়া ফেলিতেন।

ঔষধ পত্রের মূল্য নিয়া পশ্চাতে তর্ক বিতর্ক হইত না। রাজা জমিদার প্রভৃতি ধনিগণ কিরূপ উদারচেতা ছিলেন তাহা নিম্ন লিখিত বিবরণ দ্বারা অনায়াসে অনেকে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

স্কুলাডপুটী ইন্‌সপেক্টার বৈকুণ্ঠ বাবুর পিতা গোপাল ডাক্তার বা গোপাল কবিরাজ নামক একজন চিকিৎসক এখানে ছিলেন। তিনি কি ডাক্তার কি কবিরাজি কোন শাস্ত্রেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন না; কিন্তু ভাগ্য বড় ছিল। তৎকালে তিনি ময়মনসিংহের জমিদারগণের নিকট ভাল চিকিৎসক বলিয়া বিশ্বস্ত ও প্রিয়পাত্র ছিলেন।

একদা কালীপুরের জমিদার ধরণী বাবুর পিতা ৺তারিণীকান্ত লাহিড়ীর একটী ফোঁড়া হইয়া পাকে, ঐ ফোঁড়া গোপাল ডাক্তার কাটিবেন বলিয়া কৃত নিশ্চয় হয়। মাঘ মাসের দিন। ডাক্তার বাবুর ১ জোড়া মান্ধাতার আমলের জীর্ণাতিজীর্ণ শতচ্ছিদ্র বিশিষ্ট পুরাতন শাল ছিল। (বলা বাহুল্য যে তাহা একবারেই ব্যবহারের অনুপযুক্ত) পরদিন প্রাতে সুচতুর ডাক্তার বাবু এহেন শাল গায় দিয়া অস্ত্রশস্ত্র নিয়া কর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইলেন। অস্ত্র প্রয়োগের পূর্ব্বে কি কি যোগাড় করিতে হইবে, তাহা কিছু না বলিয়া ফোঁড়া কাটিয়া দিয়াই—কে আছরে শীঘ্র পরিষ্কার নেতা নিয়া আস, বলিয়া হাকাহাকি ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। একটু পরেই—আঃ গাধা বেটারা এখনও কাপড় আনিলনা—বলিয়া নিজের শাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া কর্ত্তার ফোঁড়া বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। কর্ত্তা বলিলেন—আ হা হা একি করিলে, শালজোড়া ছিড়িলে। ডাক্তার বলিলেন, হুজুর! যদি আপনার ফোঁড়া বাঁধিতেই না পারি, তবে এই ছাই শালের প্রয়োজন কি। এই বলিয়া বন্ধন শেষ করিয়া ডাক্তার বাবু নগ্নগাত্রে কাঁপিতে আরম্ভ করিলেন। একেই মাঘের শীত, তারপর কম্পের ভঙ্গীও কিছু অধিক মাত্রায় চলিল। জমিদার বাবু বলিলেন আর কাঁপিবেন না, ঐ আলনা হইতে আমার নূতন শালজোড়া গায় দিয়া ফেল। ডাক্তার বাবু তাহাই করিলেন এবং আস্তে আস্তে বাসার দিকে চলিলেন।

২।৩ দিন পরে ডাক্তার বাবু বলিলেন কর্ত্তা এখনও কাপড় কিনিতে পারি নাই, শীঘ্রই কাপড় কিনিয়া শাল-জোড়া দিয়া যাইব। কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন আর তুমিও দেবে, আমিও নেব; ওশাল তোমাকে একেবারেই পুরস্কার দিয়াছি। ডাক্তার বাবু সামান্য একটা ফোড়া কাটার পুরস্কার ৬০০৲ টাকার জুড়িশাল পাইলেন।

আমি ময়মনসিংহে আসিয়াই নারায়ণডহরের জমিদার রামগতি মজুমদারের বাতব্যাধির চিকিৎসায় যাই। সেখানে আমার ১মাস থাকিয়া চিকিৎসা করার কথা হয়। তাহাতে ঔষধের মূল্যবাদে ১মাসে ৪০০৲ টাকা নগদ ও ৩ জনের বাসা খরচ দেওয়ার কথা হয় এবং ৪০০৲ প্রথমেই আমার হাতে দেওয়া হয়। সেখানে ১৫ দিন থাকিয়া দেখিলাম, রোগী ঔষধ খায়না, কথামত পথ্যাদিও গ্রহণ করেনা। তখন আমি বিরক্ত হইয়া বাড়ীর কর্ত্তা রামজয় মজুমদারের নিকট চলিয়া আসিবার প্রার্থনা করিলাম এবং ১৫ দিনের ২০০৲ ফেরত দিতেছি বলিয়া তাহার সমীপে রাখিলাম। তিনি দুঃখিত হইয়া বলিলেন, যখন ঔষধ খায়না তখন আপনার থাকা নিষ্প্রয়োজন বটে কিন্তু আপনাকে যে টাকা দিয়াছি তাহা আর ফিরাইয়া নিবনা। আপনার এই টাকা নিতেই হইবে, নচেৎ আমাদের দুর্নাম রটনা হইবে।

চিকিৎসকের প্রতি ধনীদিগের এরূপ উদারতা ক্রমেই বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ন।

আমার কথা।

আমি যা কে? যখন মনে হয় ;
তখন যেন বিশ্বটা কোন্
দূরে সরে' রয়।

'আমার' 'আমার' বলে' যাদের
ভেবেছিলাম মনে,
তখন যেন 'আমার তারা'
থাকে না মোর সনে।

হাসি-ভরা যাদের মুখ,
ঘুচ্‌ত দেখে মনের দুখ,
তখন যেন তাদের দেখে
মনের লাগে ভয়।

যখন ভাবি এ পৃথিবীর
সকল আপনার,
আর যেন গো কিছুই আমার
রয়না ভাবনার ;—

তখন দেখি বিশ্বমাঝে,
কি এক সুরে বাঁশী বাজে,
আনন্দেরি ঢেউ খেলে যায়
সারা জগৎ ময়।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ।

বিবিধ সংবাদ।

শোক সংবাদ।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যাঁহাদের সাহিত্য সাধনায় ময়মনসিংহ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, একে একে তাঁহাদের সকলই চলিয়া যাইতেছেন। এই কয় বৎসরের মধ্যে আমরা কয়েকটী প্রবীণ সাহিত্যিককে বিদায় দান করিয়াছি। এই সময়ের সর্ব্বপ্রথমে উৎসাহদাতা শ্রদ্ধেয় অমরচন্দ্র দত্তের তিরোভাব ভুলিতে না ভুলিতেই আমরা কবিবর গোবিন্দচন্দ্রকে হারাইলাম। গোবিন্দনাথের শোক ভুলিতে না ভুলিতেই, [illegible], [illegible], প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা মহেন্দ্রচন্দ্র [illegible] মহাশয়কে শ্মশানে তুলিয়া দিয়াছি। সে আজ দুই মাসের কথা—তাঁহার শ্মশান ভস্ম নিবিতে না নিবিতেই বিগত ২০শে শ্রাবণ আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রবীণ সুলেখক ও সুবক্তা "ছাত্র জীবন", 'নব প্রবন্ধ' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা বাবু ব্রজনাথ বিশ্বাস মহাশয়কে চিরবিদায় প্রদান করিয়াছি। তাঁহাদের অভাব কবে পূরণ হইবে জানিনা। ইহা ময়মনসিংহের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

সাহিত্য সংবাদ।

"চিত্রে চন্দ্রশেখর" বাহির করিয়া, বঙ্গভাষায় এক অভিনব বৈচিত্র প্রদান করা হইয়াছিল। এখন সেই পথ অনুসরণ করিয়া বাজারে অনেক গ্রন্থই বাহির হইয়াছে।

এবার পূজার বাজারে সুবিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক আশুতোষ লাইব্রেরী "সতী চিত্রে" উপহার প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে পাঁচটী সতীর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার চিত্র দ্বারা পাঁচটী পৃথক পৃথক সতী কাহিনী বিবৃত করা হইয়াছে। গ্রন্থের মুদ্রণ পরিপাটী দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। উপহার গ্রন্থরূপে ইহা সর্ব্বত্র আদৃত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মূল্য ২।০ আনা। কাগজ বাঁধাই, প্রচ্ছদ পত্র, উপহার পৃষ্ঠা সমস্তই অভিনব।

* * *

আমরা অবগত হইলাম সুসঙ্গের বর্ত্তমান মহারাজা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বি,এ বাহাদুর তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ বি,এ, বাহাদুরের লিখিত প্রবন্ধাবলী সংগ্রহ করিয়া মুদ্রণের ব্যবস্থা করিতেছেন। মহারাজা বাহাদুরের এ আয়োজন প্রশংসনীয়।

* * *

আগামী ১লা আশ্বিন হইতে "ময়মনসিংহ সমাচার" নামে একখানা সাপ্তাহিকপত্র স্থানীয় কমলাপ্রেস হইতে বাহির হইবে। আমরা নবীন সহযোগীকে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

* * *

ময়মনসিংহ ধর্ম্মসভার আচার্য্য ও দর্শন চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিন্দ্রনাথ বেদান্তরত্ন মহাশয়ের "তত্ত্ব-মীমাংসাদর্শনম্" নামক একখানা দর্শন সম্বন্ধীয় পুস্তক বাহির হইয়াছে। তাঁহার রচিত বেদান্তদর্শন গ্রন্থও সত্বরই বাহির হইবে।

ময়মনসিংহ সিদ্ধিপ্রেসে, শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
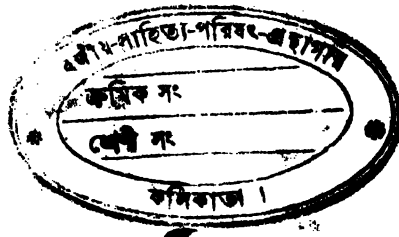
দশম বর্ষ। ময়মনসিংহ, আশ্বিন, ১৩২৯ সন। নবম সংখ্যা।

অর্থ শাস্ত্রে বয়ন শিল্প।

গত বৎসর হইতে চরকা ও বয়ন শিল্প অবলম্বন করিয়া জাতীয় আন্দোলনের একটি নূতন ধারা প্রবাহিত হইতেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই চরকা কি ভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিল কিংবা স্বরাজ সাধনের ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা কিনা, তদ্বিষয়ে আলোচনা আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ভারতের ভাবী নক্ষত্র, গগণের কোন কোণে প্রকাশিত হইবে, ভারতের চন্দ্রমা কবে পবিত্র স্বাধীনতার স্নিগ্ধ আলোক রশ্মি সঞ্চারিত করিয়া কি ভাবে দেশবাসীগণের নবপ্রাণে নূতন আলোক বিকীর্ণ করিয়া বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে শান্তি আনয়ন করিবে, তাহাও জানি না; ভারতের নবসূর্য্য কবে উদ্ভাসিত হইয়া অত্যাচারে উৎপীড়িত, অনাচারে উচ্ছৃঙ্খল, বিপথগামী ভারতবাসীকে নব কিরণমালায় বিধৌত করিয়া পূত ও শুদ্ধ করিবে তাহাও জানিনা এবং আলোচনাও করিব না কিন্তু ইহা ধ্রুব, সত্য ও সনাতন নিয়ম যে এই তমসা একদিন দূরীভূত হইয়া নূতন আলোক সঞ্চারিত হইবেই। যাহা হউক, এই যে জাতীয় দৈন্য দূর করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী "বয়ন শিল্পের" পুনরুদ্ধার কল্পে অসীম যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন ও দেশবাসিগণকে সেই পন্থা দ্বেষশূন্য হইয়া পবিত্র হৃদয়ে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিতেছেন এবং যাহার প্রবর্ত্তনের জন্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ মহারথীগণ দেশব্যাপী আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে বর্ত্তমান শাসক সম্প্রদায়ের সহিত অনৈক্য হইতে পারে, রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে ভীতিপ্রদ বিভীষিকা দেখিয়া শাসন যন্ত্র এই আন্দোলনকে নিষ্পেষিত করিবার চেষ্টা করিতে পারেন কিংবা এতদ্ সম্বন্ধে দ্বৈধভাব অবলম্বন করিতে পারেন কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোনও একটা জাতির পক্ষে এইরূপ আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিবার প্রচেষ্টা স্বাভাবিক ও ন্যায় সঙ্গত তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব এই যে, প্রতি গৃহস্থের গৃহে গৃহে এযাবৎকাল যে চরকা চলিয়া আসিয়াছিল, ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেশবাসী যে আপনার বস্ত্রের জন্য কখনও পরমুখাপেক্ষী হয় নাই, তাহার প্রধান কারণ এই যে এই বয়ন শিল্প দেশের অন্যান্য শিল্পের ন্যায় শাসক বর্গ কর্ত্তৃক পোষিত হইত এবং কেবল মাত্র পোষণ নহে পরন্তু ইহার উন্নতি কল্পে নিয়মিত ভাবে রাজকীয় শক্তিও প্রযোজিত হইত।

আর্য্য শাস্ত্রের "চতুঃষষ্ঠীকলা বিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে প্রাচীনকালে ভারতীয় আর্য্যগণ কেবল সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম বিদ্যা সম্বন্ধেই যে জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন এমন নহে, পরন্তু বিবিধ কলাবিদ্যা বিষয়েও উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। জীবনটাকে সর্ব্বপ্রকারে উপভোগ করিবার প্রণালী তাঁহাদের জ্ঞাত ছিল। প্রাচীন আর্য্যগণের কলা কৌশল বিষয়ে সম্যক প্রকারে আলোচনা করিলে অর্থাৎ কেবলমাত্র দার্শনিক ও পারলৌকিক জ্ঞান ব্যতিরেকেও বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতার বিষয়ে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে অর্থনীতি বিষয়ে কখনও তাঁহারা পর-মুখাপেক্ষী ছিলেন না, পরন্তু তাঁহারা ঐহিক ও ব্যবহারিক দিকটাও যতটুকু সম্ভব সুখ ও স্বচ্ছন্দতার জন্য প্রস্তুত করিয়া লইতেন। জ্ঞানের দিক হইতে দেখিলেও ইহাই প্রতীয়মান হয় যে যেমন একদিকে অধ্যাত্ম জগতে গভীর চিন্তার উন্মেষণা ছুটাইয়া অলৌকিক তত্ত্ব সকল আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন,

তেমনি সামাজিক জীবনের ক্রমোন্নতির জন্য—এই জগতে মানবের হিতসাধনের জন্য জ্ঞানের বিবিধ ভাণ্ডারের অন্বেষণ করিয়া উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। জগতের সুখ ও সুবিধার দিক্‌টা অবহেলা করিয়া অর্থাৎ বাস্তব বিষয়গুলিকে অবজ্ঞা করিয়া প্রাচীন ভারতীয় মনীষিগণ যে কেবল একটি মাত্র পথই অবলম্বন করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহারা যে কেবল পারলৌকিক তত্ত্ব লইয়াই গবেষণা করিতেন, ইহা মনে করা নিতান্তই ভ্রম, পরন্তু যুগ ও কাল বিবেচনা করিলে মানবীয় সুখ সাধনের জন্য নানাবিধ কলা বিদ্যায় * তাঁহারা যে গভীর জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে ও বিস্মিত হইতে হয়।

এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় বয়ন শিল্প ও কলা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। যথা :—শুক্রনীতিসারে :—

স্ত্রাদি রজ্জু করণ বিজ্ঞানং তু কলা স্মৃতা।
অনেক তন্তু সংযোগৈঃ পটবন্ধঃ কলা স্মৃতা॥

সুতরাং দেখা গেল সূত্রাদি, রজ্জু প্রভৃতি প্রস্তুত করণ এবং অনেক সূত্রসংযোগে বয়ন কার্য্যও শিল্প মধ্যে পরিগণিত।

রামায়ণেও প্রসঙ্গ ক্রমে যে সকল শিল্পীর উল্লেখ দেখা যায়, তাহাতেও সূত্র নির্ম্মাণ কার্য্য একটি প্রশস্ত কলার মধ্যে গণ্য—এইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। যথা :—

অথ ভূমি প্রদেশজ্ঞাঃ সূত্রকর্ম্ম বিশারদাঃ।
স্বকর্মাভিরতাঃ শূরাঃ খনকা যন্ত্রকা স্তথা।
* * * * * * * * * *
মণিকারাশ্চ যে কেচিৎ কুম্ভকারাশ্চ শোভনাঃ।
সূত্রকর্ম্ম কৃতশ্চৈব যে শস্ত্রোপজীবিনঃ॥ ইত্যাদি

তবেই দেখা যায় যে বয়ন শিল্প অন্যান্য শিল্পকার্য্যের ন্যায় দেশের সামাজিক ও আর্থিক সমস্যা পূরণের একটা প্রকৃষ্ট উপায় ছিল। আমরা প্রাচীন সাহিত্যের নানা গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারি যে বয়ন শিল্পটা চিরকালই আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল এবং ইহার উন্নতি সাধনের জন্য রাজন্যবর্গ সর্ব্বদাই ব্যগ্র ছিলেন।

অন্ন ও বস্ত্র সমস্যা পূরণের জন্য কোনও স্বাধীন কিংবা পরাধীন জাতি পর মুখাপেক্ষী না থাকিয়া যে উহা গৃহ কার্য্যের ন্যায় সর্ব্বদা সুসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিবে উহা স্বাভাবিক।

যাঁহারা "বাৎসায়নকামসূত্রম" গ্রন্থখানি মনোনিবেশ সহকারে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে এই পুস্তকে কলা বিদ্যা সম্বন্ধে নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই পুস্তকের "ভার্য্যাধিকারিকাধিকরণম্‌" অধ্যায়ে স্ত্রীলোকের সাধারণ কৃতকর্ম্ম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে; তন্মধ্যে একস্থানে এইরূপ আছে :—

"ভোজনাবশিষ্টাদ্দোরসাদ্ ঘৃতকরণম্ তথা তৈল গুড়য়োঃ। কার্পাসস্যচ সূত্র কর্ত্তনঞ্চ, সূত্রস্য বানম্, শিক্য রজ্জু পাশ বল্কল সংগ্রহণম্। কুট্টন কণ্ডনাবেক্ষণম্।" ইত্যাদি।

অর্থাৎ ভোজনাবশিষ্ট দুগ্ধ হইতে ঘৃত প্রস্তুত করিবে, ও আবশ্যক সর্ষপ ও ইক্ষু কাণ্ডের অবশিষ্ট ভাগ হইতে তৈল ও গুড় প্রস্তুত করিবে। কার্পাসের সূত্র কর্ত্তন ও সূত্রের বাণ (আচ্ছাদনার্থ বসন) প্রস্তুত করিবে এবং শিক্য (ভাণ্ড স্থাপনার্থ), রজ্জু, পাশ, বল্কল সংগ্রহ করিবে। (ধান্যের) কুট্টন ও কণ্ডন (তণ্ডুলের) পরীক্ষা করিবে।

তবেই দেখা যায় সূতা কাটা এবং বস্ত্র নির্ম্মাণ স্ত্রীলোকদিগের একটি নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের মধ্যেই পরিগণিত ছিল। গৃহস্থের কুটির হইতে এই সকল অতি প্রয়োজনীয় শিল্পগুলি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া আর্থিক ও সামাজিক হিসাবে কতদূর অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

দেশের এই মঙ্গলময় বয়ন শিল্প যাহার উন্নতি ও বৃদ্ধিতে ভারতের বস্ত্র সমস্যায় পূরণ হইত এবং অনেকাংশে দরিদ্রদিগকে পোষণ করিয়া তাহাদিগের আর্থিক দীনতা কতক পরিমাণে লাঘব করিত—সেই বয়ন শিল্প যে কেবল মাত্র গৃহস্থের কর্ত্তব্যের মধ্যেই পরিগণিত ছিল এমন নহে, পরন্তু যাহাতে এই কুটির শিল্পটি উপেক্ষিত না হয় তজ্জন্য প্রাচীনকালে রাজন্যবর্গ সবিশেষ যত্ন করিতেন, তাহারও উল্লেখ আমরা দেখিতে পাই। চানক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত প্রণীত "অর্থশাস্ত্র" যাহা এক্ষণে শিক্ষিত মণ্ডলীর নিকট "কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র" নামে পরিচিত তাহাতে এই বয়ন শিল্প সম্বন্ধে কি ভাবে আলোচিত হইয়াছে আমরা এই প্রবন্ধে সংক্ষেপতঃ তদ্বিষয়ে আলোচনা করিব। কৌটিল্য,

---

* এই চতুঃষষ্টি কলা বিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা কিংবা কেবল ঐ সকল বিষয়ের উল্লেখ করাও এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের পক্ষে অতি বৃহৎ ব্যাপার হইয়া উঠিবে। সুতরাং আমরা এতৎ সম্বন্ধে কৌতুহলী পাঠকবর্গকে নিম্নলিখিত গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করিব।

চতুঃষষ্টি কলা বিদ্যা :—শুক্র নীতিসার চতুর্থ অধ্যায় তৃতীয় প্রকরণং। ললিতবিস্তর—কৃষবিভাত্যান প্রকরণ। সরল সূর্য্যোদয় ৫ম অধ্যায়। প্রবন্ধমঞ্জরী। বাৎসায়ন কামসূত্র; রামায়ণ প্রভৃতি।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের সমসাময়িক লোক এবং তিনিই সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহারই ব্যবস্থামত রাজকার্য্যের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যসমূহ সুচারুরূপে ও নিয়মিত ভাবে যাহাতে সুসম্পন্ন হয় তাহা পরিদর্শন করিবার জন্য প্রত্যেক বিভাগে পৃথক্ পৃথক্ অধ্যক্ষ নিয়োজিত হইতেন। এই প্রণালী অবলম্বনে সূত্র নির্ম্মাণ ও বয়ন শিল্প পরিদর্শনের জন্যও একজন অধ্যক্ষ নিয়োজিত ছিলেন। তিনি কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে "সূত্রাধ্যক্ষ" নামে পরিচিত। যাহাতে সূত্র, বর্ম্ম, বস্ত্র, রজ্জু নির্ম্মাণ কার্য্য উপেক্ষিত না হয় তজ্জন্য সূত্রাধ্যক্ষ, বিধবা, বিকলাঙ্গ স্ত্রীলোক, বালিকা, প্রব্রজিতা নারী, দণ্ডাপ্রতিকারিণী (যে স্ত্রীলোক দণ্ড দিতে অক্ষম), পতিতা নারীর মাতা, বৃদ্ধ রাজদাসী, এবং যে সকল দেববাসী মন্দির কার্য্য ত্যাগ করিয়াছে এই সকলকে উনা, বল্কল, কার্পাস, তুলা, শণ ও ক্ষৌম বয়নের জন্য নিযুক্ত করিবেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যাহারা কর্ম্মে অপটু হইয়া কেবল মাত্র সমাজের ভারবাহ হইয়া পড়ে তাহারা যাহাতে সামান্য বয়ন কার্য্য করিয়া সমাজকে সাহায্য করে এবং অর্থও সঞ্চয় করিতে পারে তজ্জন্য রাজার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল।

এই বয়নকার্য্য সাধনের জন্য কিরূপ বেতন রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইত তাহারও ব্যবস্থা আছে। সূত্রের পরিমাণ ও কর্ত্তন নৈপুণ্যের স্থূল সূক্ষ্মতা বিচার করিয়া কর্ম্মীকে আমলকী ফলের তৈল ও পিণ্যাক (খইল) দ্বারা পুরস্কৃত করা হইত। এই তৈল ও পিণ্যাক দেওয়া সম্বন্ধে কৌটিল্য অর্থ শাস্ত্রের অনুবাদক আর, শ্যামশাস্ত্রী মহোদয় নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য করিয়াছেন :—

As a balm to keep the head and eyes cool and as an inducement to others to work in earnest.

শ্লক্ষ্ণ স্থূল মধ্যতাং চ সূত্রস্য বিদিত্বা বেতনং কল্পয়েৎ। বহুল্পতাং চ সূত্র প্রমানং জ্ঞাত্বা তৈলা মলকোদ্বর্ত্তনৈরেতা অনুগৃহ্নীয়াৎ।

আবশ্যকমত এই সকল শিল্পীদিগকে অধিক বেতন দিয়া ছুটির দিনেও (তিথিষু) কার্য্য করানের ব্যবস্থা আছে। যদি প্রদত্ত দ্রব্য হইতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সূত্র না হয়, তবে দ্রব্যের গুণানুসারে মূল্যের তারতম্য করিতে হইবে এবং তদনুযায়ী যদি তদপেক্ষাও সূত্রের পরিমাণ কম হয় তবে বেতনও কম দিতে হইবে।

"সূত্র হ্রাসে বেতন হ্রাসঃ দ্রব্য সারাৎ।"

কেবলমাত্র উল্লিখিত স্ত্রীলোকেরাই যে সূত্রাদি কর্ত্তন করিবেন এমন নহে, পরন্তু যাহারা নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সূত্র কর্ত্তন করিতে পারিবে তাহাদিগকেও এ কার্য্যে নিয়োগ করা যাইতে পারে।

অধ্যক্ষ সর্ব্বদাই শিল্পীদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া কার্য্য পরিচালন করিবেন। ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিলেই কার্য্যের দোষ ও গুণ এবং সততা সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবে জ্ঞাত হওয়া যায়।

যাহারা পশমি বস্ত্র, রেশম, কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্র কিংবা পোষাক বয়ন করিবে তাহাদিগকে গন্ধদ্রব্য, মাল্য অথবা অন্য কোনরূপ উৎসাহবর্দ্ধক দ্রব্যাদি দ্বারা বিশেষভাবে পুরস্কৃত করিতে হইবে। প্রাপ্য বেতনাদি দান ব্যতিরেকেও শিল্পের উন্নতি বিধানার্থ যে বিশেষ বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থাও ছিল, তাহা দেখা যাইতেছে। প্রকৃত পক্ষেও কোনও একটা শিল্পের বিশেষতঃ যে সকল কুটির শিল্প সাধারণ লোকের সামান্য চেষ্টা নিয়োজিত হইলে দেশের আর্থিক মঙ্গল সাধিত হইতে পারে তৎসমুদায়ের উন্নতির জন্য রাজকোষ হইতে অর্থ ব্যয়িত না হইলে অর্থাৎ রাজন্যবর্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হইলে প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয় না।

যে সকল ভদ্রনারী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়েন না, অথবা যাহার স্বামী দেশান্তরে গিয়াছেন, অথবা যিনি বিকলাঙ্গ বা অসহায়া বালিকা যদি কখনও আত্ম পোষণের নিমিত্ত অভাবানুভব করেন তবে বয়নাধ্যক্ষ স্বীয় বিভাগের দাসীগণ দ্বারা তাহাদিগকে বয়ন শিল্পকার্য্যে নিয়োজিত করিবেন। সমাজের আর্থিক উন্নতির পক্ষে এইসকল নিয়মাবলী যে কতটুকু উপকারী তাহা পাঠকবর্গ সহজেই অনুমান করিতে পারেন।

যে সকল স্ত্রীলোক বয়নশিল্পকুটিরে স্বয়ংই আসিতে সক্ষম তাঁহারা প্রত্যূষে তথায় আসিয়া সূত্রের পরিমিত বেতন গ্রহণ করিবে। যথা :—

"স্বয়মাগচ্ছন্তীনাং বা সূত্রশালাং প্রত্যূষসি ভাণ্ডবেতন বিনিময়ং কারয়েৎ।"

এই উদ্ধৃত বাক্যে "সূত্রশালাং" শব্দটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। অনুমিত হয় যে বর্ত্তমান Factory প্রভৃতির ন্যায় বয়ন সম্বন্ধেও সেকালে রাজকীয় বিভাগে বয়নশিল্প-কুটির প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সূত্রশালাতেই বয়ন কার্য্য সম্পন্ন হইল এবং সর্ব্বপ্রকার দেনাপাওনার হিসাব করা হইত। দেশীয় শিল্পীর নির্ম্মিত সূত্রাদি প্রায়ই রাজ সরকারে গৃহীত হইত সুতরাং বিক্রয় সম্বন্ধে শিল্পীগণের চিন্তার কারণ ছিল না। সূত্রশালাতে কেবল সূত্রপরীক্ষার্থ যেরূপ প্রদীপের আবশ্যক তাহাই রক্ষিত হইত। যথা :—"সূত্রপরীক্ষার্থমাত্রঃ প্রদীপঃ।" অধিক আলো শিল্পীগণের চক্ষুর অহিতকারী বলিয়া এবং সম্ভবতঃ অগ্নিভীতি আশঙ্কায় এইরূপ বিধি ব্যবস্থিত হইয়াছিল।

সাধারণতঃ এই সকল শিল্পকার্য্য স্ত্রীলোকদ্বারাই সাধিত হইত এবং তাহারা সূত্রশালাতে গমন করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা আবশ্যকানুযায়ী কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া নিজের ও দেশের অর্থ সমস্যা ও বস্ত্র সমস্যা পূরণের জন্য দিন যাপন করিতেন; সুতরাং যাহাতে শিল্পকুটিরে ঐ সকল স্ত্রীলোকদিগকে কোনও প্রকারে অসম্মানিত না করা হয় তজ্জন্য ইহাও বিধিবদ্ধ ছিল যে সূত্রাধ্যক্ষ কর্ম্মীদিগের মুখাবলোকন করিলে অথবা কার্য্য ব্যতিরেকে অনর্থক সম্ভাষণ করিলে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। যথা :—

"স্ত্রিয়া মুখ সন্দর্শনেঽন্যকার্য্যং সংভাষায়াং বা পূর্ব্বঃসাহসদণ্ড।"

যদি সূত্রাধ্যক্ষ বেতন দিতে অন্যায়ভাবে কালাপহরণ করেন, তথাপি তিনি দণ্ডিত হইবেন। সময়মত বেতন প্রদত্ত না হইলে কর্ম্মীদিগের আর্থিক ক্লেশ ও কার্য্যে নিরুৎসাহ হইবার সম্ভাবনা সুতরাং এইরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা আছে। কৃতকর্ম্মের উপযুক্ত বেতন যথাসময়ে না দিলে যেমন সূত্রাধ্যক্ষ দণ্ডিত হইবেন, তেমনি অকৃত কার্য্যের বেতন দিলেও তিনি দণ্ডিত হইবেন। যদি কোনও শিল্পী পূর্ব্ব বেতন গ্রহণ করিয়া কার্য্য হইতে অনুপস্থিত হইত তবে তাহার অঙ্গুষ্ঠ কর্ত্তন করা হইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই সূত্র নির্ম্মাণ ও বয়ন কার্য্যে উৎসাহিত করিবার জন্য রাজকোষ হইতে প্রদত্ত অগ্রিম বেতনের যাহাতে অপব্যবহার না হয় তজ্জন্য কঠোর শাসনেরও ব্যবস্থা রহিয়াছে। "গৃহীত্বা বেতনং কর্ম্ম অকুর্ব্বন্ত্যাঃ অঙ্গুষ্ঠসংদংশনং দাপয়েৎ।"

এই সকল কুটির শিল্পের প্রচারের জন্য এবং প্রসিদ্ধির জন্য আবশ্যক শিল্প দ্রব্যাদি (যথা তুলা, পশম ইত্যাদি) সংগৃহীত রাখিয়া শিল্পীদিগকে দেওয়া হইত এবং ঐ সকল প্রদত্ত দ্রব্যাদি অগ্রিম গ্রহণ করিয়া কেহ পলায়ন করিলে তাহার পূর্ব্বোক্তরূপ কঠোর শাস্তিভোগ করিতে হইত। শিল্পীদিগকে অপরাধের জন্য সাধারণতঃ তাহাদের বেতন হইতে অর্থদণ্ড করা হইত। যথা :—"বেতনেষু কর্ম্মকরানামপরাধতো দণ্ডঃ। সূত্রাধ্যক্ষ রজ্জু প্রভৃতি নির্ম্মাণ কার্য্যেরও পর্য্যবেক্ষণ করিবেন এবং সূত্র ও বেত্র এবং বংশ ছিলকা দ্বারা রজ্জু প্রণয়ণ করিবেন। যথা :—

সূত্র বল্কলময়ীরজ্জুঃ বরত্রা বেত্র বৈণবেঃ।
সান্নাহ্যা বন্ধনীয়াশ্চ যানযুগ্যান্ত কারয়েৎ॥

আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের বয়নশিল্প সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছি; এতদ্ভিন্ন আইন ই আকবরী গ্রন্থে এবং বিদেশী পর্য্যটকদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্তে এই শিল্পের উন্নতির যথেষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে।

এইসকল শিল্পজাত দ্রব্যাদির উপর কর নির্দ্ধারিত ছিল। নৃপতি বিক্রয়লব্ধ মূল্যের দশমাংশ মাত্র গ্রহণ করিতেন। যথা :—

ক্ষৌম (Fibrous garments), দুকুল (cotton cloths), ক্রিমিতান (silk) কঙ্কট হরিতাল, মনঃশিলা * * * সুরাদণ্ড জিন ক্ষৌম দুকুল নিকরান্তরণ প্রাবরণ ক্রিমিজাতানাম জৈলকস্য চ দশভাগঃ পঞ্চদশ ভাগো বা।

এই সকল শিল্পকার্য্যে যেমন একদিকে সামাজিক ও আর্থিক হিসাবে অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইত এবং অনাথার অন্নসংস্থানের ও ভরণপোষণের উপায় হইত, তেমনি রাজকোষেরও পুষ্টি এবং উন্নতি হইত। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের এমনি দুরবস্থা যে বিদেশীয় বস্ত্রাদির আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে দেশ হইতে অতি দ্রুতগতিতে—প্রায় ৫০ বৎসরের মধ্যে অত্যুন্নত বয়নশিল্পটি, যাহাদ্বারা একদিন মসলিন প্রভৃতি উৎপাদিত হইয়া জগতের সম্মুখে ভারতের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল—সেই শিল্প বিলুপ্ত; এমন কি গৃহস্থের গৃহ প্রাঙ্গনে এখন আর একটি কার্পাস গাছও দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইহা সর্ব্বজন বিদিত সত্য যে ইউরোপে কার্পাস বস্ত্র বয়নের প্রচেষ্টারও প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই ভারতে বস্ত্রবয়ন,

সূত্র নির্ম্মাণ ও বস্ত্র রঞ্জনের উৎকৃষ্ট প্রণালী জ্ঞাত ছিল। প্লিনী, হেরোডোটাস প্রভৃতি পর্য্যটকগণও এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। এবং ঐ সব স্বীকার করিয়াছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রভুত শক্তি লাভ করিয়া ভারতে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে প্রবৃত্ত হইল তখন হইতেই নানারূপ অত্যাচার ও উৎপীড়নে বয়নশিল্পীদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া দেশী সূত্রের উপর অন্যায়মত অত্যধিক পরিমাণে শুল্ক বসাইয়া এই বয়ন শিল্পটিকে প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে পরাভব স্বীকার করাইতে বাধ্য করিল। সেই সঙ্গেই ভারতে অন্নবস্ত্রের অভাবধ্বনি শ্রুত হইল এবং এক্ষণে ইহা যে আকার ধারণ করিয়াছে তাহার আলোচনা বাহুল্য।

আমাদের দেশে ধনী, গৃহস্থ এমনকি সাধারণ কৃষক শ্রেণীরও পরিবারবর্গের পুরমহিলাগণ আলস্যে কিংবা উপন্যাস পাঠে যে ভাবে সময় অতিবাহিত করেন তাঁহারা যদি ঐ অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট না করিয়া প্রত্যহ ৩।৪ ঘণ্টা লজ্জা নিবারণের জন্য বিদেশীর দ্বারস্থ হইবার কল্পনা ত্যাগ করিয়া সূত্র নির্ম্মাণের জন্য যত্ন করেন, তবে যে কেবল বস্ত্রের অভাবই দুরীভূত হইবে এমন নহে পরন্তু বস্ত্রাদি সম্বন্ধে আমরা যেরূপ বিলাসী হইয়া পড়িতেছি তাহারও অনেকটা লাঘব হইয়া অর্থকষ্টও অনেক পরিমাণে দুরীভূত হইবে এবং তাহা গৃহে শান্তি অ নয়ন করিবে। আমাদের হস্তে প্রভুত্ব শক্তি না থাকায় আমরা অর্থশাস্ত্রের অনুমোদিত নিয়মাবলী অনুসারে বয়নশিল্পের পরিচালনা করিতে পারিব না সত্য কিন্তু উক্ত নিয়মাবলী কতক পরিমাণে পরিমার্জ্জিত করিয়া কার্য্য করিবার চেষ্টা করিলে এখনও এই শিল্পের পুনরুত্থান হইতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতে ত্রইরূপ অনেক জাতি আছে যাহারা আমাদের মত সুশিক্ষিত বলিয়া অভিমানী নহে, অথচ তাহাদের অন্ন বস্ত্রের অভাব নাই— বিলাস এখনও তাহাদের গৃহ দ্বারে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই; তাহারা জাতীয় শিল্পদ্বারা কায় ক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে এবং ঘরে বুনা সুতার বস্ত্র পরিধান করিয়া তাহারা সুখেই আছে। তাহাদের কুটীরে কুটীরে এখনও চরকা চলে এবং ঐ চরকার কাটা সুতার দ্বারা যে ২।৪ খানা বস্ত্র নির্ম্মিত হয়, তাহাতেই তাহাদের অভাব মোচন হয়। চর্‌কা কাটার সঙ্গে সঙ্গে বিলাস কমাইতে হইবে। আমাদের মত তাঁহাদের ৫ জোড়া কাপড়, ৬খানা সাট, ৩টী গেঞ্জী, ৩ জোড়া মোজা, রুমাল ইত্যাদি দেহের সাজ সজ্জার—গৃহ সজ্জার আস্‌বাবের কথা নাই বলিলাম—এত আবশ্যক তাহাদের হয় না সুতরাং চর্‌কাই তাহাদের অভাব মোচন করে। সুসভ্য আমাদের দৃষ্টি সাজ-সজ্জায় অসভ্য তাহাদের দৃষ্টি জাতিটাকে স্বাবলম্বী করিবার দিকে। আমার ঘড়ের চরকা কাটা সূতা দ্বারা যদি আমার অভাব পুরণের চেষ্টা না থাকিল তবেত পরের দ্বারস্থ হইতেই হইবে। বিধির বিধানে 'দেশের উলটে গেছে হাওয়া' এই সুযোগ যদি ভারত বাসী নিজের নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করিয়া শক্তি অনুসারে ব্যবস্থা করিতে পারে— যদি বিদেশীর চাকচিক্যময় মোহিণী, নিষ্পেষণকারী বিলাসরূপ ষড়যন্ত্রের নিষ্পেষণী শক্তি হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া স্বীয় সভ্যতার ও আদর্শের প্রতি সংযত চিত্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে পারে, তবে এখনও ভারতের "হা অন্ন" রব রুদ্ধ করা যাইতে পারে। নিজের জিনিষে সন্তুষ্ট থাকা চাই এবং সংযত হওয়া চাই, তবেই আত্মার উন্নতি হইবে ও দেশের কল্যাণ হইবে। বিপুলতাগ্রস্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত প্রতিযোগী হওয়ার আবশ্যকতা আমাদের নাই; আমাদের ভারতভূমিই যে একটা মহাদেশ। আমাদের সভ্যতা, আমাদের বিদ্যা, আমাদের বুদ্ধি ও ক্ষমতা এমন একটা আদেশে গড়িয়া তুলিব যাহা জগতে বরেণ্য হইবে এবং সেই সভ্যতার আদর্শে ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া যেরূপে ইচ্ছা ক্রীড়া করিব, তবেইত সন্তোষ আসিবে।

শ্রীঅরুণচন্দ্র সিংহ।

ময়মনসিংহের প্রাচীন কথা।

দেবালয় ও ধর্ম্ম সভা।

আমি এখানে আসিয়া ৬টী দেবালয় ও একটী ধর্ম্মসভা বিদ্যমান দেখিয়াছি:—(১) কালী বাড়ী, (২) রঘুনাথ জির আখরা, (৩) কানাই বলাইর আখরা, (৪) দশভুজার বাড়ী, (৫) থানার মঠের শিব, (৬) দশ মহাবিদ্যার বাড়ী এবং দুর্গাবাড়ী ধর্ম্ম সভা।

ইহার সবই এখনও আছে, কেবল দশমহাবিদ্যার বাড়ীর কীর্ত্তিই লোপ পাইয়াছে। সহরে সর্ব্ব প্রথমেই কালী বাড়ীর কালী মায়ের মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

এই জেলা স্থাপনের অব্যবহিত পরেই ত্রিপুরা জিলা নিবাসী হরিনারায়ণ ব্রহ্মচারী বর্ত্তমান কালী বাড়ীতে কালী মূর্ত্তি স্থাপন করেন। কথিত আছে যে সেই মূর্ত্তি তিনি ভাওয়ালের এক সাধু পুরুষের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন ছনের ঘরেই মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদের জমীদার আশুবাবুর প্রপিতামহ নরসিংহ রায় এখানে কাল্‌েক্টারির সেরেস্তাদার ছিলেন। তিনি ত্রিপুরা জেলায় সরাইল পরগণার জমীদারী খরিদ করেন। এই জমীদারী সংক্রান্ত একটী মোকর্দ্দমায় জয় লাভ করার জন্য কালী বাড়ী মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিবেন বলিয়া মানসিক করিয়াছিলেন; জয় লাভ হওয়ার বহুদিন পরে তিনি মায়ের মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়া ছিলেন। মূর্ত্তি স্থাপয়িতা হরিনারায়ণ ব্রহ্মচারীর উত্তরাধিকারীগণ আজ পর্য্যন্ত মায়ের পূজার তত্ত্বাবধান ও কালী বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন।

এই দেবালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য কোন দেবত্র সম্পত্তি নাই, হিন্দু ধর্ম্মবলম্বী নানা লোকের প্রদত্ত দ্রব্যাদি দ্বারাই পূজা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এখানে পাঠা দিলে।৴০ আনা দক্ষিণা দিতে হয়, বলির দক্ষিণা ও পূজার দক্ষিণা প্রভৃতি দ্বারা যাহা আয় হয় তদ্দ্বারা সমস্ত খরচ কুলাইয়া উত্তরাধিকারীদিগের কিছু কিছু লাভও হইয়া থাকে।

মায়ের মন্দিরের সম্মুখের চৌয়ারী ঘর খানা স্থানীয় উকিল ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন এবং মায়ের রৌপ্য ময় চৌকী ভবানীপুরের জমীদার রায় সতীশচন্দ্র বাহাদুর প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন।

পরমসুক দিচ্ছিদ নামে একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ রণ ভাওয়াল পরগণার মধ্যে রৌহা গ্রামে বাস করিতেছিলেন। তিনি সেখানে ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার একটী দুগ্ধবতী তেজস্বিনী গাভী ছিল। একদা মোগল জমীদারের কার্য্যকারক মুছলমানগণ ঐ গাভী মারিয়া ভোজন করায় দিচ্ছিদ মহাশয় নিতান্ত দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া মনে করিলেন, যে স্থানে গো বধ হইয়াছে তথচ প্রতিকারের উপায় নাই অত্যাচারী বিধর্ম্মী বেষ্টিত সেই পাপ স্থানে আর বাস করিবনা। এইরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া দিচ্ছিদ মহাশয় সে স্থানের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এই সহরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

গাজিমার পর্ব্বপার দিয়া দক্ষিণ দিকে যে রাস্তা গিয়াছে ঐ রাস্তার পশ্চিমে ও মহেশ সান্যালের বাড়ীর দক্ষিণে দিচ্ছিদ মহাশয়ের বাসভবন ছিল।

দিচ্ছিদ মহাশয়ের পুত্র সন্তান ছিলনা; একমাত্র কন্যাসন্তান ছিল। তাহার জামাতা বেণীমাধব পাঁড়েও ঐ বাড়ীতেই বাস করিতেন। তিনি রৌহা ছাড়িয়া সহরে আসিয়া দশমহাবিদ্যার বাড়ী, মন্দির ও মূর্ত্তি স্থাপন করেন, এবং স্থানীয় শিব দয়াল তেওয়ারিকে তত্ত্বাবধানের জন্য উইল দ্বারা অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া দেন। দিচ্ছিদ মহাশয়ের বার্ষিক ১২।১৩ শত টাকা আয়ের তালুক মায়ের সেবার জন্য দেবত্র রূপে প্রযুক্ত হইয়াছিল। তৎকালে এই দশমহাবিদ্যার বাড়ীর মনোহর দৃশ্য দেখিলে মনে যার পর নাই শান্তির উদ্রেক হইত এবং পাষণ্ডের হৃদয়েও ভক্তি রসের আবির্ভাব হইত।

চতুর্দ্দিক পরিখা দ্বারা বেষ্টিত, মধ্যস্থানটী কাশ্মীরের ভাসমান পর্ব্বতের ন্যায় যেন জলের উপরে ভাসিতেছে।

চতুর্দ্দিকে বেলী গোলাপ চম্পক প্রভৃতি ফুলের উদ্যান, মধ্যে প্রকাণ্ড মন্দির। মন্দিরের মধ্য খানে বৃহদাকারের শিব লিঙ্গ স্থাপিত, অপর চারিদিকের আঙ্গিনায় দশটী প্রকোষ্ঠ। তাহাতে কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা এই দশমহাবিদ্যার মনোহারিণী মৃণ্ময়ী, মূর্ত্তি স্থাপিতা।

শিব লিঙ্গের সম্মুখে দক্ষিণে, বামে কালী ও তারা মূর্ত্তি স্থাপিতা। অন্যান্যদিকে মণ্ডলাকারে আর আটটী মূর্ত্তি স্থাপিতা, মন্দিরের মধ্যে চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আর আটটী মূর্ত্তি দর্শন করিতে হইত। মন্দিরের বাহির হইতে সম্মুখের ও পশ্চাৎ ভাগের মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখা যাইত, অন্যান্য মূর্ত্তি তত স্পষ্ট দেখাযাইত না। পূর্ব্বদিকে আর একটী মঠ ছিল, তাহাতেও গণেশের মূর্ত্তি ও শিব লিঙ্গ স্থাপিত ছিল। প্রতি দিন শঙ্খ, ঘণ্টা, ঢাক, কাশর বাজাইয়া মধ্যাহ্নে পূজা ও সন্ধ্যাবেলা আরতি ভক্তি ভরে সম্পাদিত হইত। মধ্যে মধ্যে ২।১টী সাধু সন্ন্যাসী আসিয়াও ২।৪ দিন বাস করিত। স্থানটী যেন ঠিক মুনি ঋষি দিগের তপোবনের ন্যায় শান্তিকর ছিল। সন্ধ্যা আরতির পর এখানে আর

লোক জন থাকিত না, সুতরাং নিশাযোগে এই কোলাহল শূন্য স্থানটী ধ্যান ধারণা জপাদিরত উপাসক দিগের পক্ষে বড়ই সুবিধা জনক ছিল। কালের কুটিল কটাক্ষে এই শান্তি ময় স্থান এখন প্রায় শশ্মান ক্ষেত্রে পরিণত। আর সে মন্দির নাই, মূর্ত্তি নাই, পূজা নাই, পূজক নাই, আছে কেবল একটী শিবলিঙ্গ মাত্র। তাহার ও রীতিমত অর্চ্চনাদি কিছুই হয় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শিবদয়াল তেওয়ারী এই দেবালয়ের তত্ত্বাবধারক ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র বন্দিকা রতন তেঁওয়ারী এই দেবালয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহার সহিত পরম সুখ দিচ্ছিদের জামাতা বেণীমাধব পাঁড়ে ও তৎ পুত্র পার্ব্বতী শঙ্করের মনোবাদ হওয়ায় বন্দিকা বাবু তত্ত্বাবধানের কার্য্য পরিত্যাগ করেন। সেই হইতেই পতন আরম্ভ হয়, তৎপর বেণীমাধবের মৃত্যুর পর পার্ব্বতী-শঙ্করের আমলে একবারেই সব নষ্ট হইয়া যায়, দেবত্রের তালুক গুলি দেনা-ডিক্রিতে নিলাম হইয়া যায়। সেটেল-মেন্টের সময় পার্ব্বতী শঙ্কর দেবত্র ভূমি নিজ নামে লিখিয়াছিল বলিয়া নিলাম হইল, নচেৎ তাহার ঋণে দেবত্র নিলাম হইত না। আত্মম্ভরিতাই এই অধঃপতনের মূল কারণ। ইহাদের বাড়ী ঘরও বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। দিচ্ছিদ ঠাকুরের সমস্ত কীর্ত্তিই উত্তরাধিকারির দোষে সমূলে নির্ম্মূল হইয়াছে।

সহরে কানাই বলাইর মূর্ত্তি পাবনা নিবাসী অত্রস্থ ভূতপূর্ব্ব পুলিশ ইনস্‌পেক্‌টর ব্রজলাল সরকার দ্বারা স্থাপিত। সরকার মহাশয় পরম বৈষ্ণব ছিলেন, তাহার পুত্র মুকুন্দলাল সরকার এখনও জীবিত আছেন। উকিল নীলকমল নিউগীর বাসাই ব্রজলাল বাবুর বাসা ছিল। পূর্ব্বে কানাই বলাইর মন্দিরের সম্মুখে ইষ্টক ময় একটী নাট মন্দির ছিল, সেখানে কীর্ত্তনাদি হইত।

ব্রজলাল বাবুর অভাবের পর হইতে ক্রমেই মন্দিরাদির অস্তিত্ব লোপ পায়, একখানা টীনের ঘরে কানাই বলাই আশ্রয় গ্রহণ করেন। বহুদিন এইভাবে অতীত হওয়ার পর রামদীন কোহর (পাল) নামক একটি লোক ভোগমন্দির ও কানাই বলাইর মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিতেছেন। তাহার হোটেলের দালান ও তাহার পশ্চাৎ ভাগের ভাড়াটীয়া বাড়ী, আরও একটী দালান ও নগদ প্রায় ২০০০ টাকা কানাই বলাইর নামে দান করিয়া সেবাদির জন্ত ১৩২৫সনের ১৩কার্ত্তিক নিম্নলিখিত ব্যাক্তি গণকে ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিয়া দলিল রেজেষ্টারি করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীপরেশচন্দ্র লাহিড়ী, উকিল কামিনীকমল সেন, উকিল প্রশন্ন কুমার গুহ রামদীন স্বয়ং, মহেশচন্দ্র সাহা, বিরাজমোহন সেন কবিরাজ, ও শরৎ চন্দ্রদাস ইহারাই ট্রাষ্টি।

রঘুনাথজির আখরা বহু দিনের স্থাপিত। উহা সেরপুরের লস্কর দের পূর্ব্ব পুরুষের কোন ব্যক্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

অতিপূর্ব্বে গোপীনাথ ঠাকুর বলিয়া একজন পূজক ব্রাহ্মণ এখানে থাকিতেন। এই গোপীনাথের সময়ই গঙ্গা মাই নাম্নী একটী হিন্দু স্থানী রমণী তাঁহার স্বামীর সহিত আখরাতে আসিয়া থাকেন। গোপীনাথের মৃত্যুর পর গঙ্গা মাইর স্বামীই রঘুনাথজীর পূজারির কার্য্য সম্পাদন করিতে থাকেন। ইহারা রঘুনাথজির সেবার জন্ত কিছু কিছু জমি খরিদ করেন এবং অন্যান্য রকমে কিছু কিছু আয় বৃদ্ধি করেন ও ঠাকুর সেবার বিশেষ বন্দোবস্ত করেন। কতক গুলি গাভীও এখানে পালিত হইতে থাকে। গঙ্গা মাই গাভীগুলির পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন কিন্তু নিজে দুগ্ধ পান করিতেননা, দুগ্ধ ঠাকুর সেবায় লাগিত।

ইহারাই ছিউরাম দাসকে পূজারি ব্রাহ্মণ রাখেন। আমরা এখানে আসিয়া বিধবা গঙ্গামাইকে ও ছিউরাম দাসকে প্রায় বৃদ্ধাবস্থায় দেখিয়াছি। ছিউরাম দাস মরণের পূর্ব্বে ট্রাষ্ট উইল দ্বারা আনন্দ বনিক্য, কালীমোহন সাহা, প্রসন্নকুমার গুহ ও কামিনীকমল সেনকে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। এই অধ্যক্ষ-গণই রামহরেক দাস নামক বর্ত্তমান বাবাজিকে আখরার তত্ত্বাবধারক রাখিয়াছেন।

বর্ত্তমান বাবাজি আখরার অনেকটা উন্নতি সাধন করিয়া-ছেন। তিনি আর একখানা ঘাটলা দিয়াছেন, মন্দিরেরও সংস্কার করিয়াছেন। নদীর পার কতকটা স্থান পোস্তা বান্ধিয়া দিয়াছেন। এই ঘাটে মুছলমানগণ আসেনা, গরু গোড়া কুকুর স্নান করান ও সবান মাখা, কি কাপড় কাচা নিসিদ্ধ। ঐ ঘাটে হিন্দুগণ নিরুপদ্রবে বিশুদ্ধ জলে সন্ধ্যা তর্পণাদি করিতে পারেন। এই মন্দিরে লক্ষ্মী নারায়ণ, শিব, গোপাল, শালগ্রাম প্রভৃতি বহু বিগ্রহ আছেন।

দশভূজার বাড়ীতে ধাতুময়ী দুর্গামূর্ত্তি প্রায় ৮০।৮৫ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল। তখন মূর্ত্তি, ছনের ঘরে স্থাপিত ছিল। প্রায় ৫০ বৎসর হইল রাধানাথ চন্দ নামক জজকোর্টের একটী উকিলের উদ্যোগে দশভূজা মায়ের পাকা মন্দির নির্ম্মিত হয়।

দশভুজার মন্দিরের সম্মুখের টীনের চৌয়ারিখানা হাসনপুরের হরনাথ তালুকদার প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন; সে প্রায় ৩০।৩৫ বৎসরের কথা।

দশভুজার বাড়ীর সংলগ্ন কয়েক ঘর প্রজা আছে, তাহার খাজানা ও সাধারণের সাহায্য দ্বারা আজকাল সেবার কার্য্য চলিতেছে।

এখন কাছারির নিকট যে মস্‌জিদ্‌ প্রস্তুত হইয়াছে পূর্ব্বে ঐ স্থানে কালেক্টরির পেস্কার বার্ড সাহেবের বাসা ছিল। গোপীকৃষ্ণ সেন ঐস্থান খরিদ করেন এবং সেখানে ব্রাহ্মসভা স্থাপন করেন। ১৮৬৫ সনে কেশবচন্দ্র সেন স্থানীয় ব্রাহ্মদিগের অনুরোধে নৌকাযোগে ময়মনসিংহে আসিয়া ব্রাহ্মদিগের উৎসাহানল প্রধূমিত করিয়া দিয়া যান। পরে ১৮৬৭ সনের প্রথমভাগে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এখানে আসিয়া ওজস্বিনী বক্তৃতা দ্বারা অনেকের মনে ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎসাহানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। কেশব বাবুর আগমন হইতে এখানেঅনেকেরই কিছু কিছু চক্ষুঃ বোজার অভ্যাস হইয়াছিল, তার পর গোস্বামী মহাশয়ের বক্তৃতার তেজে অনেকেই ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিলেন। ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস, জমিদার রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ওভারসিয়ার গোপালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এবং জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী উপবীত ছিন্ন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

গোপীকৃষ্ণ সেন প্রভৃতি গোস্বামী মহাশয়ের সহিত প্রকাশ্যে আহারাদি করিতে লাগিলেন, হিন্দু সমাজে একটা হুলুস্থুলু বাধিয়া গেল। গোস্বামী মহাশয় এখানে থাকিতেই প্রাচীন হিন্দুগণ স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ বদ্ধ পরিকর হইলেন।

খরি চারি আনীর মোক্তার কালীপ্রসাদ ঘটক, দুর্গাপুরের মোক্তার রামকুমার সান্যাল, আদালতের সেরেস্তাদার মসুয়া গ্রাম নিবাসী হরিকিশোর বাবু ও রামকৃষ্ণ মুন্সী মিলিত হইয়া অন্যান্য প্রাচীন হিন্দুদিগের সহানুভূতিতে আঠারবাড়ীর বাসাতে, হিন্দুধর্ম্মের আলোচনার জন্য একটা ধর্ম্মসভা স্থাপন করিলেন। ঐস্থানে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা, উপদেশাদি দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝাইয়া দেওয়া হইত। এইভাবে ৪।৫ বৎসর ধর্ম্মচর্চ্চার পর কালেক্টরির সেরেস্তাদার দীননাথ সরকার ও পূর্ব্বোক্ত কালীঘটক প্রভৃতির চেষ্টায় জমীদারগণের অর্থ সাহায্যে দুর্গাবাড়ীতে একটা ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মিত এবং সমারোহের সহিত তাহাতে ধর্ম্মসভা স্থাপিত হইল। এই ধর্ম্মসভা স্থাপনের বহু পূর্ব্ব হইতেই কালেকটরির সেরেস্তাদার নরসিং রায়ের উৎযোগে এইস্থানে বাসন্তী দেবীর বার্ষিক অর্চ্চনা হইত। তদবধি আজ পর্য্যন্ত এখানে কালেকটরির আমলাগণের নেতৃত্বে বাসন্তী পূজা চলিতেছে। এজন্য এস্থান দুর্গাবাড়ী নামে পরিচিত।

এই ধর্ম্ম সভা স্থাপনের অব্যবহিত পরেই ব্রাহ্মদিগের আন্দোলনে বাধা পড়িতে লাগিল।

হিন্দু ধর্ম্মের মর্ম্ম বোধে এবং সামাজিক শাসনে রামচন্দ্র বাবু প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপবীত গ্রহণ করিলেন, অগ্নিহোত্রী মহাশয় উপবীত ত্যাগ করা অস্বীকার করিলেন, কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ, জগদানন্দ সেন, কমলাপ্রসন্ন বল, অন্নদা প্রসাদ দাস ও গোবিন্দ বসু ব্রাহ্ম ভাব পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু ভাব অবলম্বন করিলেন।

হিন্দুদিগের প্রতাপে সহরে ব্রাহ্ম মন্দিরের স্থান হইল না। তৎকালে আলেকজাণ্ডার সাহেব জেলার কালেক্টর ছিলেন, ব্রাহ্ম গোপীকৃষ্ণ সেন তাঁহার প্রিয় খাদাঞ্চি ছিলেন; তাঁহার চেষ্টায় কালেকটারের অনুগ্রহে গভর্ণমেণ্টের জমীতে সাহেব কোয়াটারে একটু জমী পাওয়া গেল এবং ঐ স্থানে ১২৭৬ সনের ৫ই পোষ ব্রাহ্মমন্দির স্থাপিত হইল।

তৎকালে এই ধর্ম্ম সভার সভাপতি মহারাজ রাজকৃষ্ণ সিংহ, সহকারী সভাপতি রামগোপালপুরের জমীদার কাশীকিশোর রায় চৌধুরী এবং সম্পাদক মসুয়া নিবাসী কায়স্থবংশজ হরিকিশোর চৌধুরী ছিলেন।

ধর্ম্ম সভার ব্যখ্যাতা ও বক্তা ৩ জন পণ্ডিত ছিলেন। পণ্ডিত লালমোহন ব্যাকরণ কেশরী বেদান্ত উপনিষৎ ও গীতার ব্যাখ্যা করিতেন, বিক্রমপুর নিবাসী দুর্গারাম ন্যায়ালঙ্কার পুরাণের ব্যাখ্যা করিতেন, ঈশানচন্দ্র বিদ্যারত্ন নানা বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিতেন।

এই সভার নাম ছিল হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞান প্রদায়িনী সভা। ঐ নামে একখানা পাক্ষিক পত্রিকাও সভা হইতে বাহির হইত।

প্রতি বর্ষে বৈশাখ মাসেমাসভরা সংকীর্ত্তন বাহির হইত। এই সংকীর্ত্তনে প্রতি দিনই ৫।৬ শত লোক হইত। সবজজ, মুনসেফ, ডিপুটী, উকিল, মোক্তার, আমলা প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত শিক্ষিতগণ সকলেই নগ্ন পদে সংকীর্ত্তনে যোগ দিতেন।

এই ধর্ম্ম সভায় সমাজের অনাচারের বিচার হইত এবং সে বিচার সমাজ অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেন।

এখানে বাসন্তী পূজা, দোল, কালী পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা অতি সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইত; পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে ছাত্রদের সম্মিলন উপলক্ষে বিষ্ণু পূজা হইত এবং তাহাতে জেলাস্থ বড় বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া বিদায় দেওয়া হইত।

হিন্দু শাস্ত্রের কোন্ কোন্ জটিল বিষয়ের মীমাংসা করা হইবে, তাহা নিমন্ত্রণ পত্রে লিখিয়া দেওয়া হইত। পণ্ডিতগণ আসিয়া ঐ সকল বিষয় বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিতেন। কোন কোনও বার এই উপলক্ষে তাঁহাদিগকে ২।৩ দিনও প্রশ্নের মীমাংসার জন্য থাকিতে হইত।

পূর্ব্বে সভায় সরস্বতী পূজা হইত না, ঐ সময় সহরের অন্যত্র সারস্বত উৎসব হইত। সকলে তাহাতে যোগদান করিতেন। একবার সারস্বত উৎসবে রাত্রে একটী অভিনয় দেখান হয়।

একখানি মৃণ্ময়ী সরস্বতী মূর্ত্তি স্থাপিত, তাহার সমীপে দুই জন ভক্ত সরস্বতীর স্তুতি করিতেছেন, এমন সময় একব্যক্তি আসিয়া একটী পদ্য পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই পদ্য হিন্দুর দেবতার ও হিন্দু সমাজের কুৎসা কীর্ত্তনে পরিপূর্ণ। অর্থাৎ মুনিঋষিরা মাটীর সরস্বতী পূজা করিতেন না, অশিক্ষিত হিন্দুরা মাটীর পুতুল পূজা করে, সুতরাং এই মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি পদাঘাতে চূর্ণ চূর্ণ করিয়া ফেল।

"দেখহ চিড়িয়া বুক, নাহি রক্ত একটুক,
পদাঘাতে চূর্ণ চূর্ণ কর এই মাটী।"

ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই পদ্য পাঠ শুনিয়া হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী অনেকেই মর্ম্মাহত হইলেন এবং যারপর নাই অবমান বোধ করিলেন। অনেকে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন।

পর দিন দুর্গাবাড়ীতে এক সভা হইল এবং সভায় স্থিরীকৃত হইল যে আমরা আর সারস্বত উৎসবে যোগ দিব না; এইখানে সরস্বতী পূজোপলক্ষে আমোদ প্রমোদ করিব। সেই হইতে দুর্গাবাড়ীতে সরস্বতী পূজা চলিতেছে। পদ্য পাঠের কিছুদিন পরে পাঠক অনুতপ্ত হইয়াছিলেন বটে, আমরা কোন ঘটনায় তাহা পূর্ণ মাত্রায় উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। কিন্তু অনুতপ্ত হইলে কি হয়, কাজের তীর নিক্ষেপ করিলে আর ফিরাইয়া আনা যায় না।

এই সরস্বতী পূজায় প্রতি বৎসর বিপুল আয়োজনে নগর সংকীর্ত্তন হইত। ১ কি ২ জন বড় বড় বক্তা ক্রমে ৩।৪ দিন বক্তৃতা করিতেন। শশধর তর্ক চূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, অম্বিকা বিদ্যারত্ন, কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ, শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, কালী বিদ্যারত্ন প্রভৃতি প্রধান প্রধান বক্তৃগণ সকলেই এখানে আসিতেন। বক্তৃতান্তে ভাল ভাল গায়ক দ্বারা কীর্ত্তন করা হইত। ছাত্রদিগের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর বিষয়ে যে ভাল প্রবন্ধ লিখিত, তাহার একজনকে ১০৲ টাকা একজনকে ৫৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইত এবং গরীব দুঃখিকে তণ্ডুল বিতরণ করা হইত।

বলা বাহুল্য যে এই সকল ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য জমীদার বাড়ীর সাহায্য ও স্থানীয় লোকের কিরি গ্রহণ করা হইত।

আদালতের কালীপূজায় পূর্ব্বের বড় বড় কবির দল আনিয়া গান দেওয়া হইত। কবিগণের নাম শুনিয়া হয়তো কেহই লজ্জা ও ঘৃণা বোধ করিতে পারেন কিন্তু আমি চিরদিনই কবির পক্ষপাতী। কবিগানের দোষত্রিমটী। অনেক কবির দলে বেশ্যা থাকে, তাহাদের বীভৎস নৃত্য অনেকের নিকট লজ্জাকর ও বিরক্তি কর বোধ হয়।

আর একটী দোষ, যে দলে মেয়েলোক নাই সে দলেও নৃত্যের একটা পাত্রাপাত্র জ্ঞান নাই। ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ এমন বিকট তঙ্গীতে নৃত্য আরম্ভ করিবে যে তাহা দেখিলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। তৃতীয় দোষ, অনেক সময় অশ্লীল ছড়া পঠিত হইয়া থাকে।

এটি কেবল কবিওয়ালার দোষ নহে, তাহারা নানা রকমের লোকের মনস্তুষ্টির জন্য নানা রকমের আয়োজন করিয়া রাখে; সভার সভ্যগণ অশ্লীল গান করিতে অনুমতি না দিলে তাহারা কখনও ঐরূপ গান করিতে সাহস পায় না।* মেয়ে কবিদারের দল না আনিলেই লজ্জার কারণ থাকে না। এই সামান্য দোষ পরিত্যাগ করিলে কবিগান সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

একপক্ষে গান করিয়া গেলে অপর পক্ষের লেখা নাই পড়া নাই চিন্তা নাই কাল বিলম্ব নাই তখনই গিয়া মুখে মুখে উত্তর দিতে হইবে। ইহা সামান্য বুদ্ধি ক্ষমতা ও সামান্য কবিত্বের পরিচায়ক নহে। বিশেষতঃ কবির সরকারগণ প্রায়ই অশিক্ষিত। তাহাদের কোনও শিক্ষা নাই, কেবল অভ্যাস ও প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের গুণে সাধারণ কথায় এমন উত্তর দেয় যে শিক্ষিত কবিদিগের নিকটও সেরূপ আশা করা যায় না।

এই ধর্ম্ম সভাতেই অনেক দিন হইল একবার আদালতের নাজির বিশ্বনাথ রায়ের নেতৃত্বে রাজরাজেশ্বরী পূজা হইয়াছিল। সে অতি সমারোহের পূজা, পূজাপলক্ষে ৫০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। বিক্রমপুরের তিলক পালের দল আসিয়া রাজরাজেশ্বরীর মূর্ত্তিও নানাবিধ ছবি প্রস্তুত করিয়াছিল। ৩ দিনে ৩।৪ শত পাঠাবলি ও ৩টী মহিষ বলি হয়। সহরের সমস্ত লোককে প্রসাদ দেওয়া হয়। কাঠিয়ালের সিদ্ধবংশের সন্তান একটী পণ্ডিত পূজক ছিলেন, সর্ব্ববিদ্যার সন্তান মধুসূদন ভট্টাচার্য্য তন্ত্রধর ছিলেন। এই পূজায় উক্ত ২ জনে স্বর্ণালঙ্কারাদিতে প্রায় ২ হাজার টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নানা দেশ হইতে বড় বড় গায়ক ও বাদক আসিয়াছিল। মাণিকগঞ্জ হইতে আসিল ভৈরব মজুমদার ও ঈশান মালীর কবির দল। তৎকালে এই দুইটী দল কবিদারের মধ্যে প্রধান ছিল।

সুসজ্জিত আসরে ঢাকার গন্নুবাইর গান হইতেছে, সভায় রাজা জমিদার সম্ভ্রান্ত লোকের অভাব নাই, এদিকে পুরা মজলিশ চলিতেছে। গন্নুবাই পরম সুন্দরী, যুবতী, তারপর আবার সুগায়িকা। এ ক্ষেত্রে কবিওলার স্থান থাকিতে পারেনা, সুতরাং দুর্গাবাড়ীর পুষ্করিণীর দক্ষিণ পারে সামান্য চন্দ্রাতপের নীচে কবিওলার স্থান হইল। সেই দিনই ময়রাপট্টী আগুণে পুরিয়া যায়। ঈশানের দল আসরে আসিয়া প্রথম মালসীগান ধরিয়াই গাহিতে লাগিলেন—

ব্রহ্মময়ি। মা একি হলো,
থাকিতে তুমি বিদ্যমানে ময়রাপট্টী পুরে গেল।
(আবার) সামান্য গণিকার গানে সভাশুদ্ধ মুগ্ধ হলো।
ধিক্ পুরুষে! মা আমাদের চান্দার নীচে আসিতে হলো॥

তারপর ভৈরবের দল আসিয়া মালসীর শেষ ভাগে গান করিল—

মা ব্রহ্মময়ি! বুঝি বিধির লেখা ছিল;
আসরেতে বাই, লোকের সীমা নাই,
তাই আমাদের ঠাই পুকুর পারে হলো।

এইরূপ সাধারণ কথায় তৎক্ষণাৎ স্বাভাবিক বর্ণনা করায় যাহারা কবিত্বের সৌরভ অনুভব করিতে পারেন না তাহাদিগকে নাসাহীন শ্রোতা বলিলেও অত্যুক্তি হইতে পারেনা। যাহা হউক এই প্রকার গানে কর্ত্তারা কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া পরদিন সজ্জিত আসরে প্রথম রাত্রেই কবিদারগণের গাহিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সে দিনও তাহারা একদল স্বপক্ষে একদল বিপক্ষে দাড়াইয়া গানের মধ্যে কর্ত্তাদের বিবেক বুদ্ধির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিল বটে। তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষের কেহ কেহ বিরক্ত হইয়াছিলেন। সে বিরক্তির ফলে তিলক পাল প্রভৃতি সকলেই পুরস্কার লাভ করিল, কবির দলে কিছুই পুরস্কার পাইলনা। ইহাতে একটী দলাদলী উপস্থিত হইল। মাণিকগঞ্জের ও অন্যান্য জেলার কতকলোকে বিক্রমপুরবাসীদিগকে তিলক ভাইর দল বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন।

কুমার কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন সভায় ২ বার আসিয়াছেন দ্বিতীয়বার বাল্যাশ্রমের ছাত্র মুরারিমোহন চৌধুরী প্রভৃতির উদ্যোগে সভা হইতে "কুমার" নামে এক খানা পাক্ষিক পত্র বাহির হইয়াছিল। পত্রে সারগর্ভ প্রবন্ধ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা থাকিত, অল্প দিনের মধ্যেই তাহার প্রচার বৃদ্ধি ও সদালোচনা বাহির হইয়াছিল। কালের কুটিল কটাক্ষে আজ সেই ধর্ম্মসভা অস্থি চর্ম্মাবশিষ্টা মাত্র রহিয়াছে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ন।

স্নেহের দান।

১৯

রবিবার অপরাহ্নে বাঁশরী বাবু মাখনকে লইয়া আসিয়া তাঁহার জমিদার মোক্তারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জমিদার মহাশয় তখন তাঁহার দোতলার উপর মেজের

ঢালা ফরাসে বসিয়া একজন অন্তরঙ্গ মুসাহেবের সহিত ষ্টার থিয়েটার বড়, কি বেঙ্গল থিয়েটার বড়, সুকুমারী ভাল গান গায়, কি কাদু ভাল 'এক্ট' করে, সেরী মদটাই সাহেবরা বেশী খায় না শ্যামপিনটার সাহেব মহলে আদর বেশী ইত্যাদি নানা জটিল সমস্যার আলোচনা করিতেছিলেন। এমন সময় দ্বারে বাঁশরী বাবুকে সমাগত দেখিয়া জমিদার মহাশয় তাঁহার নিজ সুবিশাল বাপু কোন প্রকারে তাকিয়া হইতে একটু তুলিতে চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন।

"আগুন, আসিতে আজ্ঞা হউক, উকীল বাবু!"

বাঁশরী বাবু জুতা ছাড়িয়া ফরাসের উপর আসন লইয়া বসিয়া বলিলেন—"এই ছেলেটার কথা আপনাকে বলিয়াছিলাম—বসো মাখন।"

মাখন জমিদার মহাশয়কে অভিবাদন করিয়া সেই ঢালা ফরাসের এক কোণে উপবেশন করিল।

জমিদার মহাশয় তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নাম কি হে বাবু?"

মাখন মাথা নত করিয়া বিনীত ভাবে বলিল—"মাখন লাল ভট্টাচার্য্য।"

"নিবাস?"

"পদ্মাতীরে—নন্দীগ্রামে ছিল।"

জমিদার হাসিয়া বলিলেন—'ছিল' কথাটা অতীত বাচক, তাহার একটা বর্ত্তমানও চাই।"

মাখন—"গ্রামখানা এক বৎসর হইল পদ্মার গর্ভে স্থান পাইয়াছে—বর্ত্তমানে কোন বাড়ীঘর নাই।"

জমিদার—"পিতা মাতা কোথায় স্থান লইয়াছেন?"

মাখন—"আমার পিতামাতা জীবিত নাই।"

জমিদার মহাশয় মাখনের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলেন।

জমিদার বাবু খুব সন্দেহ পরায়ণ লোক, বাঁশরী বাবু তাহা বেশ জানিতেন, তাই জমিদার মহাশয় যখন মাখনকে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া বাঁশরী বাবুর দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন তখন তিনি বলিলেন—"অজ্ঞাত কুল-শীল বলিয়া সন্দেহ করিবার কিছু নাই। আমি নিজে তার জামিন। ছেলেটা আমার দাদার প্রিয় ছাত্র, এবার তাঁর স্কুল হইতে পনর টাকা বৃত্তি পাইয়াছে—কুড়ি টাকাই পাইয়াছিল—অদৃষ্ট মন্দ তাই কুড়ি, পনর টাকায় পরিণত হইয়াছে।"

এই কথা বলিয়া বাঁশরী বাবু সবিস্তারে তাহার অদৃষ্টের নিস্ফলতার ইতিহাসটুকু বিবৃত করিলেন।

জমিদার মহাশয় শুনিয়া বলিলেন—"দুঃখের কথাইতো—তা বেশ, তাহা হইলে ছেলের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া আমাকে নিষ্কৃতি দেন আর কি?"

বাঁশরী বলিলেন—"তাহাই করিব।"

জমিদার তাঁহার মুসাহেবটীকে বলিলেন—"বোকা বাবু, মণিকে ডাক দেখি একবার!"

মণি জমিদার মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। তাহার সংসর্গ ও পাঠ পরিচালনের সুবিধার জন্য মাখনের নিয়োগ ব্যবস্থা উকীল বাবু করিয়াছেন। পিতাপুত্রে ঠিক এক জায়গায় থাকিয়া মনের স্বাধীন ইচ্ছামত অনুষ্ঠান চলে না, তাই জমিদার মহাশয়ের ইচ্ছা পুত্রকে আপাততঃ হোষ্টেলে রাখিয়া দিয়া নিজে গৃহে চলিয়া যান। ইহার পর যদি কোন নূতন পৃথক ব্যবস্থা তাঁহার নিজের জন্য করিতে হয়, তাহার সম্বন্ধে পশ্চাতে বিবেচনা করা যাইবে।

জমিদারের ছেলে সাধারণতঃ যেরূপ হইয়া থাকে মণিরও মেজাজ-মর্জ্জি-চলা-ফিরার অবস্থা সেইরূপ। পিতার এক মাত্র পুত্র—সুতরাং আদরের আতিশয্যে বেজায় অসহিষ্ণু; পুত্রের মত না লইয়া কিছু করিবেন তেমন সাহস জমিদার মহাশয়ের নাই। তাই মণিকে ডাকা হইল।

মণি আসিয়া এক কোণে জড়সড় ভাবে মাখনকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া নিতান্ত আগ্রহের সহিত বলিল—"এই যে আপনি—কতক্ষণ আসিয়াছেন, আমাদের বাড়ীর আপনি সন্ধান পাইলেন কেমন করিয়া?"

মাখন সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া মণিবাবুর কথার কি উত্তর দিবে ভাবিতেছিল।

বাঁশরী বাবু বলিলেন—"এই যে, ওদের সঙ্গেতো তাহা হইলে বেশ পরিচয়ই আছে।"

মণিবাবু বলিলেন—"খুব—আমরা এক ক্লাসেই পড়ি।"

জমিদার—"ও ছেলেটীর পরিচয় তুমি জান কি মণি?"

মণি বলিল—আমাদের একসঙ্গে পড়েন, এই তো যথেষ্ট পরিচয়, ইহা অপেক্ষা বেশী পরিচয় কারো জানিতে যাওয়া out of atequate এবং নিষ্প্রয়োজন।"

বাঁশরী বলিলেন—"কোন অপরিচিত লোকের সহিত মিশিতে হইলে তাহার সম্বন্ধে অনেকখানি জানিয়া নেওয়া উচিত।"

মণিবাবু মনে করিল মাখনের সহিত অবাধে মিশিবার বিরুদ্ধে ইহাঁরা মন্তব্য করিতেছেন। সে উগ্র মেজাজে বলিল—"ওর স্বভাব আমি খুব ভাল বলিয়াই জানি, আপনারা হঠাৎ কোন ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে ওরূপ কোন মন্তব্য করিবেন না। মানুষের সহিত আলাপ করিতে হইলেই যে তার নাম গোষ্টি গোত্রের পরিচয়, গরীব কি ধনী, ব্রাহ্মণ কি কায়স্থ—এ সকলেরই অনুসন্ধান নিতে হইবে, সে Foolish idea আর নাই; এখন icmic days—সময়ের মূল্য অনেক—বাজে কথার দিন মোটেই নাই।"

ছেলের রাগ হইয়াছে বুঝিয়া জমিদার মহাশয় বিচলিত হইয়া বলিলেন—"বেশ, এ ছেলেটীকে তুমি যদি ভালই জান, বেশ। ইহাকে তোমার সঙ্গে রাখ; এ আমাদের পূর্ব্ব বাঙ্গালার লোক, ব্রাহ্মণ, কুড়ি টাকা স্কলারসিপ পাইয়াছেন। সৎসঙ্গে থাক, ইহার নিয়ম মত চল। কেমন, তোমার কি মত।"

ছেলেটী স্কলারসিপ পাইতেছেন শুনিয়া মণি বিস্ময়ের সহিত তাহার দিকে তাকাইল এবং পিতার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরে বলিল—"বেশ তো।"

পিতার কথার উত্তর দিয়া মণি মাখনকে প্রশ্ন করিল—"আপনি স্কলারসিপ পাইতেছেন, সেতো জানিনা! আপনিও ত বলেন নাই!"

জমিদার মহাশয় বলিলেন—"লোকের সঙ্গে অবাধে মিশিবে, তাহার দোষ গুণ বিচার করিবে না—এ কদাপি ভাল নহে। আজ হইতে মাখন বাবুর নির্দ্দেশ মত তুমি চল।"

পিতার কথা শেষ হইতে না হইতেই মণি মাখনকে হাতে ধরিয়া লইয়া উৎসাহের সহিত ভিতরে চলিয়া গেল।

বাঁশরী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"আজকালকার ছেলেদের পরিচয়ের ব্যাপারটা দেখিলেন কি? নামটী পর্য্যন্ত জানা নাই, অথচ মস্ত পরিচয়—সভ্যতা! ইহারই নাম এটিকেট—"

জমিদার মহাশয় বলিলেন—"এইরূপ সংসর্গ বুঝিয়া না চলিবার কারণেই তো জমিদারের ছেলেরা নষ্ট হয়, আমাদের মত সঙ্গ বুঝিবার শক্তি কি ইহাদের আছে—না এরূপ সভ্যতার নিয়মে জন্মিতে পারে?"

মুসাহেব বোকা বাবু বলিলেন—"তা বটেই তো, তা বটেই তো।"

২০

৫৭নং হেরিসন রোডের ত্রিতলে পূর্ব্ব বঙ্গের কয়েকটী যুবক মিলিয়া একটী উচ্চ শ্রেণীর হোষ্টেল খুলিয়াছিল। মণিবাবু ও মাখনের স্থান সেই হোষ্টেলে করিয়া দিয়া এবং সঙ্গে একজন খেজমতকার বৃদ্ধ ভাণ্ডারী রাখিয়া জমিদার মহাশয় দেশে চলিয়া গিয়াছেন।

মাখনের সহিত খেলার মাঠে পরিচিত সেই রূপমুগ্ধ যুবকটীই যে এই জমিদার পুত্র মণিবাবু তাহা বলাই বাহুল্য।

মাখনের সংসর্গে আসিয়া মণিবাবু ওরফে মণিমোহন শর্ম্মা চৌধুরী তাহার চরিত্রের জমিদারী বাজে খেয়াল গুলি প্রায় সকলি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। চা-চুরট-পানের খিলি যাহা না হইলে তাহার দিন চলা ভার ছিল, স্ফূর্ত্তি-জরদা নস্তের ডিবা যাহা তাহার চির সহায় ছিল—দুদিনের চেষ্টায় সে তাহা ত্যাগ করিল। দিনে আট টার পূর্ব্বে মণির ঘুম ভাঙ্গিত না, এখন মাখনের সঙ্গে অতি প্রত্যুষে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। সন্ধ্যা, আহ্নিক, আচার, ব্যবহার সকল বিষয়েই মণি মোহনের ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল।

জমিদার পুত্রের চাল-চরিত্রে এই পরিবর্ত্তন গুলি তাহাদের খেদমতকার গোপী ভাণ্ডারীর চক্ষে বড়ই অস্বাভাবিক বোধ হইতে লাগিল। জমিদারের একমাত্র ছেলে, কিসের অভাব? তাঁহার কেন এরূপ সামান্য লোকের মত উদাসীন ভাব?

পান খান না, চুরট খান না, চা ত্যাগ করিয়াছেন; আতর গোলাপ, পমেটম এখন আর ব্যবহার করেন না; সোডা, লেমনেড, কুলপি বরফ—একেবারে সব ত্যাগ! এতে যে দৃষ্টি নীচ হয়, প্রকৃতি ছোট হইয়া যায়। গোপী ভাণ্ডারীর এগুলি ভয়ানক ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল।

গোপী কত আকাশ পাতাল লাভ লোকসান খতিয়ান করিয়া তবে মণির সঙ্গে থাকিতে রাজি হইয়াছে; এখন তাহার সে সব লাভের কল্পনা চুরমার হইয়া গেল। এই

সকল ক্ষতির বিষয় চিন্তা করিয়া গোপী কোন প্রতিকারের উপায় দেখিতেছিল না।

প্রথম প্রথম গোপীকে প্রয়োজনীয় বাজার সওদা করিতে হইত, তাহাতে তাহার বেশ একটা প্রাপ্য ছিল; এখন কোন জিনিসই আর তাহা দ্বারা ক্রয় করান হয় না। সমস্ত কাপড়, চাদর, সার্ট, কোট, জুতা, মোজা বাবু মাখনের সহিত বেড়াইতে গিয়া নিজ হাতে ক্রয় করিয়া আনেন। মণির পরিত্যক্ত জিনিসগুলি গোপীর অবশ্য প্রাপ্য, তাহাও সে এখন পাইতেছে না। বাবুর আপত্তি সত্ত্বেও তাহার পুরাতন সার্ট-কোট-জুতা মাখন ব্যবহার করে—দেখিয়া মণি বাবু আর কোন জিনিসই একেবারে অব্যবহার্য্য না করিয়া পরিত্যাগ করেন না।

ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া আনিলে, সে তাহা হইতে কিছু পাইত; থিয়েটার বায়োস্কোপের ব্যাপারে বাজে খরচ হইত; সে সব প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। এখন যাতায়াতের প্রয়োজন হইলে এত বড় জমিদারের বেটা ধাঁ করিয়া যাইয়া ট্রাম ধরিয়া ফেলে।

খাইবার বেলায় দধি, ঘোল, সরবৎ, রাবড়ী; জল খাবারের সে মিষ্টি মিঠাই ছানা বড়ার প্রয়োজন এখন একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। হোষ্টেলের সাত-সতর-জাতের সহিত একত্র বসিয়া এক খাদ্য আহার করা এখন বাবুর এক বিষম সখ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গোপী এই সকল বিষয় ভাবিয়া গভীর ক্ষোভে ও দুঃখে তিন মাস কাটাইয়া দিল।

পূজা আসিয়াছে। মণিবাবু প্রস্তাব করিল—"মাখনবাবু এবার কিন্তু আমাদের বাড়ীর পূজা দেখিতে হইবে।"

মাখন বলিল—"দেখিব।"

মণি বলিল—"দেখ ভাই, বলিটা কিন্তু উঠাইয়া দিতে হইবে, সেটা বড় নিষ্ঠুরতার কার্য্য, দুর্ব্বল ছাগশিশুর প্রতি ঐরূপ অত্যাচার—ধর্ম্মের নামে—"

মাখন বলিল—"সেটা ন্যায় কি অন্যায় আমাদের মত শাস্ত্র জ্ঞানহীন ব্যক্তির পক্ষে তাহা বিচার করিতে যাওয়া ঠিক নয়। আমাদের আগে শাস্ত্র পড়া উচিত, তার পর শাস্ত্রের সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা উচিত। জ্ঞানহীন মতের মূল্য কি?"

মণি—"প্রাচীন কুসংস্কারগুলির মূলচ্ছেদ আমি সমাজের পক্ষে মঙ্গল জনক বলিয়া মনে করি।"

মাখন—একজন যাহা মঙ্গল জনক মনে করে আর এক জন ঠিক সেইটীকেই অমঙ্গল জনক বলিয়া মনে করে। এবং বাস্তবিক পক্ষে কোনটী অমঙ্গল জনক, তাহা কেহ সিদ্ধান্ত করিয়া বলিতে পারে না।

মাখন টেবিলের উপর করাঘাত করিয়া বলিল—"কুসংস্কার যে কুসংস্কার, কদাপি সু নহে, তাহা তুমি স্বীকার করিতে চাও না? কি আশ্চর্য্য!"

মাখন—"কুসংস্কার, সুসংস্কারের কোন মানে নাই, তুমি যাহা কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছ, আমি তাহা সমাজের মঙ্গল জনক ব্যবস্থা বলিয়া সাদরে রক্ষা করিতেছি। সমাজের সকলে যে দিন যে ব্যবস্থাকে দোষণীয় বলিয়া পরিত্যাগ না করিবে, কদাপি তাহা সমাজ হইতে পরিত্যক্ত হইতে পারে না। তাহার সংস্কার জন্য মানুষের মত মানুষের আবির্ভাব প্রয়োজন। তবে তুমি তোমার গৃহে, আমি আমার গৃহে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারি, তাহা সংস্কার নহে খেয়াল মাত্র।"

মাখন বলিল—"আরে ছাই! ভাল মন্দটাওকি লোকে সহজ চক্ষে বুঝিতে পারে না?"

মাখন—"নিশ্চয় পারে না।"

"কারণ?"

"সকলের রুচি ও সংস্কার একরূপ নহে। তুমি যে গুলিকে কু বলিবে আর কতগুলি লোকই সেইগুলিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিবে সু বলিয়া............"

মাখন দুঃখিত হইয়া বলিল—"এই জন্যেই আমাদিগকে সাহেবরা বলে বর্ব্বর।"

মাখন বলিল—"বাইবেল পড়িয়া দেখ, ইয়ুরোপের লোক কত বর্ব্বরতার এখনও পূজা করিয়া থাকে।"

"সেদিন আর এখন নাই।"

"নবীনের ও প্রাচীনের সংঘর্ষ ষ্টেট-চার্চে সর্ব্বত্র এখনও বিরাজমান। রাহু চণ্ডালের সূর্য্যগ্রাসের কথা শুনিলে আমরা নূতন সম্প্রদায় হাসিয়া উড়াইয়া দেই; ইয়ুরোপও প্রাচীনের ও নবীনের সংস্কারে এইরূপ বিরোধ আছে। বৃদ্ধ পাদরী কেরাবকে তাঁহার নবীন শিষ্য বলিয়াছিলেন গুরুদেব

দুরবীণ সাহায্যে সূর্য্যমণ্ডলে আমি একটী মস্ত কলঙ্ক চিহ্ন দেখিতেছি। কেয়ার বলিলেন অসম্ভব। শিষ্যটী জেদ করিলে তিনি রাগ করিয়া বলিলেন—বাবা অনেক শাস্ত্র পড়িয়া ঝাঁ ঝাঁ হইয়াছি, আমার তিন কাল গিয়াছে, সূর্য্যের কলঙ্ক কথা কোথাও শুনি নাই। কোন শাস্ত্রে পড়িও নাই সুতরাং ও কলঙ্ক সূর্য্যের নহে, তোমাদের আধুনিক চক্ষের। এইরূপ সংস্কারের বিরোধ চিরকাল থাকিবে। মানুষের মত মানুষের আবির্ভাব না হইলে সংস্কার-দ্বন্দ্বের মীমাংসা নাই।"

মাখনের সহিত মণির এইরূপ তর্ক প্রায় সকল বিষয়েই হইত এবং অবশেষে মাখনের নিকট প্রবোধ পাইয়া মণি মাখনের মতানুসরণ করিত।

২১

৺শারদীয় পূজায় মাখন মণিমোহনদের নিজ গ্রাম ডহরে আসিয়াছে। প্রাসাদ প্রাচীর পরিবেষ্টিত ডহরের জমিদার বাড়ী জমিদার-বাড়ীর হিসাবে নগণ্য নহে। বাড়ীটীর দুই হিস্যার অগণিত খণ্ড—বাহের খণ্ড, পূজার খণ্ড, গৃহদেবতার আঙ্গিনা, অতিথিশালা স্তরে স্তরে সাজান। গৃহদেবতার আঙ্গিনা দুই হিস্যায় এজমালীতে। দেবতার নিকট যে নিত্য ভোগ হয়, সেই ভোগের প্রসাদে দুই হিস্যার বিধবাদের আহার হয়। মণিমোহনদের হিস্যা বড় হিস্যা। বড় হিস্যার মধ্য আঙ্গিনায় এক বৃহৎ ঘরে রাবণের চুল্লির মত অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে। এই চুল্লির মালীক কটক নিবাসী কতিপয় ব্রাহ্মণ। পালাক্রমে তাহারা রান্নার কার্য্য করিয়া থাকেন। বড় হিস্যার কর্ত্তা-মহারাজ হইতে দাসদাসী সকলেরই আহারের যোগান এই গৃহ হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। কর্ত্তারা ও মেয়েরা বাড়ীর ভিতরে বসিয়া আহার করেন, অপর সাধারণ এই ঘরেরই এক অংশে স্থান লইয়া পান ভোজনের কার্য্য শেষ করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে মণিমোহন বাড়ীর ভিতরে আহার করিত, এবার মাখন এক সঙ্গে আসায় মণিমোহন তাহাকে লইয়া তাহাদের মধ্যখণ্ডের একটী সুসজ্জিত কক্ষে শয়ন ও পান ভোজনের কার্য্য করিয়া থাকে।

জমিদার বাড়ীর গৃহস্থালীর এইরূপ অনন্য সাধারণ অবস্থা ও ব্যবস্থা দেখিয়া তাহার নিকট জমিদারী জীবনটা বড়ই অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতেছিল। দরিদ্রের পারিবারিক জীবন, এই ধন ঐশ্বর্য্যের আবেষ্টনের ভিতরের শোচনীয়তা অপেক্ষা যে কত সুখের তাহার সে তুলনাই করিতে পারিতেছিল না।

জমিদার মহাশয় থাকেন স্বতন্ত্র বাগান বাটীতে। সেখানে তিনি মোসাহেব দিগের চাটুকারিতার ভিতর আত্ম প্রসংশার গুঞ্জনধ্বনি শুনিয়া দিনরাত অষ্টপ্রহর অতিবাহিত করেন। সে পারিষদ সংঘের অকরণীয় কোন কাজ নাই। নেসা বেশ্যাতো সে সকল অকরণীয় কর্ম্মের তুলনায় অতি তুচ্ছ। এইরূপ জীবনযাত্রা পরিচালনে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের সুখ দুঃখ চিন্তার স্থান নাই। তাহার জন্য দায়িত্ব কর্ম্মচারীদিগের, দাস-দাসীদিগের—যাহাদিগের সহিত সংসারে দুঃখ দরদের কোনও সম্পর্ক নাই। মাখন এই সকল অস্বাভাবিক রীতিনীতি দর্শন করিয়া এবং এই সকল ব্যাপারের আনুসঙ্গিক ফল প্রত্যক্ষ করিয়া মনে মনে বুঝিল—হিন্দু মুসলমানের ন্যায় জমিদারও একটী পৃথক, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতির অন্তর্গত জীব।

মাখন ইতঃপূর্ব্বে আর জমিদার বাড়ীর ছায়া মাড়ায় নাই। বিদেশীয় ভদ্র পরিবারে সতু বাবুর বাড়ীতে সে যতখানি আদর আহ্লাদ ও মাতৃ স্নেহের অংশ পাইয়াছে মণি বাবুদের পরিবার হইতেও সে ততখানি মনে মনে আশা করিয়াছিল। এ আশা যে তাহার পক্ষে এইরূপ বামনের চাঁদ ধরিবার দুরাশায় পরিণত হইবে তাহা সে তাহার অনভিজ্ঞ জ্ঞান বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পারেনাই। পারিলে সতুর অকৃত্রিম অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া পূজায় মণিমোহনদের প্রাণহীন সঙ্গ সে কখনই সাগ্রহে বরণ করিত না।

মণি বাবু যে তাহাকে সতুবাবু অপেক্ষা কম আদর যত্ন করিতেছিল তাহা নহে, বরং সতুর ক্ষুদ্র সংসারের সাধারণ আদর আপ্যায়ন অপেক্ষা দাস নফরের বাহুল্যে এখানে আদব কায়দার ছন্দ অভিনয় অসাধারণ রকমেরই হইতেছিল। কিন্তু মাখনের স্নেহতৃষ্ণার্ত্ত প্রাণ যে সর্ব্বত্র মাতৃস্নেহেরই ক্ষীরধারা আকাঙ্ক্ষা করিয়া ঘুরিতেছিল। আড়ম্বরের অভিনয় কি সে প্রাণের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে?

দশহরার পরদিন বিকালে মাখন মণিকে বলিল "ভাই, এখন আমি বিদায় চাই; কাল কিন্তু চলিয়া যাইব।"

"চল যাই, নিরিবিলিতে বসিয়া সে বিষয়ের পরামর্শ করিব।" বলিয়া মণি মাখনের হাত ধরিয়া তাহাকে

লইয়া তাহাদের বাড়ীর পশ্চাৎ দিকের খিরকী বাগানে চলিল।

ঘাটের চারিদিকে সুন্দর ফুলবাগান। বাগানের উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিমে উচ্চ প্রাচীর পূর্ব্ব দিকে জমিদার বাড়ীর অন্তঃপুর। ঘাটলায় দাঁড়াইলে পশ্চিমের প্রাচীরের উপর দিয়া অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকুও দেখা যায়। বড় হিস্তায় ও ছোট হিস্তায় দুটী ঘাটই এক ছাঁচে বাধা এবং যথা ক্রমে উত্তরে দক্ষিণে বিরাজমান। উত্তর ঘাটলার দুই পার্শ্বে দুটী করিয়া শাখা পত্র বহুল বৃহৎ বকুল বৃক্ষ বিরাজ মান থাকিয়া তাহাদের ঘন পত্র চ্ছায়ায় ঘাটলা দুটীকে কুঞ্জ সদৃশ শ্রীসম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। পশ্চিমের শেষ বেলায় সূর্য্য কিরণ তখন পুষ্করিণীর তটদেশ ও বকুল কুঞ্জের ছায়া শীতল স্থানকে উদ্ভাসিত করিতেছিল। দক্ষিণের ঘাটলায় নীচের সিড়ি গুলি পুকুরের অপর পারের একটী বৃহৎ আম্রবৃক্ষের ছায়ার আশ্রয়ে বেশ ঠাণ্ডা বোধ হইতেছিল। মনি বাবু মাখনকে লইয়া আসিয়া সেই ছায়ার আশ্রয়ে উপবেশন করিল।

মণি বলিল—"তুমি এ সপ্তাহে কিছুতেই যাইতে পার না।"

মাখনের মন কিছুতেই এখানে পোষ মানিতেছিল না। এ বিরাট জমিদার গৃহ, মনুষ্যত্বের বিমল আনন্দ হীন পশু-শালার ন্যায় তাহার নিকট প্রতীয়মান হইতেছিল। সে বলিল—"কারণ?"

মণি মাখনের মুখের উপর তাহার বিমল হাস্য দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বলিল—"বাঃ শোন নাই! আশ্চর্য্য! আমার যে বিবাহের পাত্রী দেখিতে যাইতে হইবে; সে তুমি ছাড়া কি হইতে পারে ভাই?"

মাখন অসহিষ্ণু ভাবে বলিল—"সে কবে, কোথায়?"

মণি দুঃখিত হইয়া বলিল—"তোমার মনে স্ফূর্ত্তি নাই, আমি বলিব না।"

মাখন ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"সময়ে স্ফূর্ত্তি অবশ্যই হইবে। আমাকে এখন একবার ত্রিপুরা জেলায় যাইতে হইবে। তোমার বিবাহের কোথায় প্রস্তাব হইয়াছে? যাইতে হইবে কবে? তুমি নিজেও যইবে কি?"

মণি বলিল—"এত কথার উত্তর একেবারে চলে না। দুচার দিন মধ্যেই যাবার মত করিব—আমিও যাইব বৈকি?"

মাখন বলিল—"এরূপ জমিদারী চালের কথা আমি একেবারেই পছন্দ করি না। আজই তুমি দিন স্থির করাও, বিলম্ব দেখিলে আমি এক পাক্ ঘুরিয়া আসিয়া পরে যাইব।"

মণি হাসিয়া বলিল—"সবুরে মেওয়া ফলবে ভাই; আমি যে কেবল আমারই জন্য ব্যস্ত, তেমনটী কখনও মনে করিও না।"

মাখন হাসিয়া বলিল—"আপাততঃ নিজের চরকায়ই তেল দাও......"

এই সময় একটী রমণী ঘাটে আসিয়া নামিতে নামিতে হঠাৎ মাখনকে দেখিয়া ফিরিয়া কুণ্ঠিতা হইয়া মাথার উপরের ঘোমটা একটু টানিয়া ধরিয়া দাঁড়াইলেন।

মণি তাঁহার কুণ্ঠার ভাব বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিল "এ যে আমরা খুড়ীমা, কোন চিন্তা নাই, আপনি জলে যান—স্নান করুণ......"

মণিবাবুর খুড়ীমা না জানিতে পারিয়া হঠাৎ মাখনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া লজ্জা পাইয়াছেন, ভাবিয়া মাখন নিজকে অত্যন্ত অপরাধী মনে করিতে লাগিল। তাহার মুখ চোক লজ্জায় লাল হইয়া গেল। সে মনে মনে ভাবিতেছিল, হায় কেন এমন স্থানে আসিয়া-ছিলাম?

মণির খুড়ীমা যে স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া মাখনের প্রতি স্থির প্রখর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। মাখন লজ্জায় জড়সড় হইয়া মাথা নত করিয়া রহিল।

মণি একটু বিচলিত হইয়া ম্লান হাসির সহিত বলিল—"খুড়ীমা, এ আমার বন্ধু মাখন, কলিকাতা এক সঙ্গে থাকি, পূজায় সে আমাদের বাড়ী আসিয়াছে। বরং আমরা চলিয়া যাইতেছি—আপনি জলে যান্......"

মাখন মাথা নত রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, মণিও উঠিল।

খুড়ীমা আর এক পা তাহাদের দিকে অগ্রসর হইয়া বিস্ময়ের সহিত বলিলেন—"মাখন তোমার নাম? চাও দেখি আমার দিকে বাবা!"

মাখন তাহার লজ্জা রক্তিম মুখ খানা ধীরে ধীরে তুলিয়া

খুড়িমার দিকে চাহিয়া বিস্ময়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল। তারপর বাষ্পজড়িত কণ্ঠে বলিল—"মাসীমা—"মাখনের মুখ হইতে আর কথা বাহির হইল না।

খুড়ীমা বলিলেন—হাঁ বাবা, মনে আছে কি মাসীমার কথা?"

মাখন আবেগ ভরে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাসীমার চরণে প্রণত হইল।

মাসীমা তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া বলিলেন—"ষাট বাবা, দীর্ঘজীবী হও।"

মণিমোহন মাখনের ও খুড়ীমার সম্বন্ধ ভাবিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রহিল। ক্রমশঃ—

কেষ্টমোহন।

১

কেষ্টমোহন সাধু সজ্জন অতি সুভাজন তিনি;
অনেক কষ্টে অর্থ জমায়ে করেছেন বহু গিনি!
কষ্টের পরে কেষ্ট মিলিল, কপাল মেহাৎ ভালো!
ষষ্ঠীর বরে সব ক'টা ছেলে, হোক্ না বেজায় কালো।
ছেলে বেচে তিনি ঢের পেয়েছেন, তিন সিন্ধুক ভরা;
তাইতো এদেশে ছেলের বাবারা ধরাকে দেখেন সরা।
অর্থের বলে ভদ্র মহলে আসনটি বেশ বড়;
যদি কোথা যান সবাই দাঁড়ান্, চারিপাশে হন জড়ো।
মৌচাক-ভাঙা মধু বুঝি তাঁর ভুড়িতে মজুৎ আছে;
নহিলে মানুষ-পিঁপড়ের দল ঘোরে কেন পাছে পাছে!

২

বাজে কথা বলে' কাজ কি এখন, আসল কথাটি পাড়ি;
বোষ্টম তিনি কেষ্টের জীব আমিষ দেছেন ছাড়ি'।
'কাটা' কথা তিনি আনেন না মুখে, শোনেন না কভু কানে;
পাছে পাপ হয় এই বড় ভয়,—সাধু বলি' সবে মানে।
শিরের শিখাটি, গলার মালাটি নিয়ত সঙ্গী তাঁর;
কতদিন নাকে তিলক দেখিয়া বলেছি 'চমৎকার!'
সভ্য যুগের সাধু বলে' তিনি দস্তুরমত বাবু;
একসেট তাঁর হ্যাট্ কোট্ আছে, হাঁটিতেও হন কাবু।
মিথ্যা কথাটি বলিব না আজ, কিছু তো স্বার্থ নাই!
'রাম-পাখী' খাওয়া ছেড়েছেন কিনা আজিও শুনিনি ভাই!

৩

একদিন কোনো বেয়ানের বাড়ী গেলেন কি যেন কাজে;
কাজ সেরে সুরে আসিতে তাঁহার বেলাও বারটা বাজে!
অসময়ে গৃহে অনাহারে তাঁর ফিরিতে বাসনা দেখি',
সবাই বলিল, "তাকি হয় কভু? না, না, খেয়ে যান, সে কি?"
বেয়ান তাঁহারে ধরে' পড়িলেন, স্বীকার হলেন, শেষে;
সিনান্ সারিয়া টেড়ি বাগালেন কুঞ্চিত কালো কেশে।
'শতনাম' গান গায়িলেন শেষে শিখাটি ক'বার টানি';
মেয়েরা তখন চুপি চুপি কন্, "ধন্য হৃদয় খানি!"
নাম গান তাঁর শেষ হোলে পর খেতে বসিলেন গিয়ে;
খেতে লাগিলেন ধীরেও সুস্থে তরী তরকারী দিয়ে।

৪

আয়োজন কিছু কম ছিল বলে' গিন্নী আসিয়া কন্—
"লজ্জিত বড়! নিরামিষ দিয়ে খাওয়াতে ওঠেনা মন!
মাংস রেঁধেছি, তাইতো আজিকে তরী তরকারী কম;
শুনিলাম ভালো হয়েছে মাংস, সুস্বাদু মনোরম!"
কেষ্টমোহন হাসিয়া কহেন, "মাংস খাইনে আমি!
ঝোল খেতে পারি, ঝোলে দোষ নেই, কন্ অন্তর্য্যামী।"
গৃহিণী যখন ঝোল ঢালিলেন, মাংস গড়ায় দেখি,'
চামচে মাংস চেপে ধরিলেন; বেয়াই বলেন, "একি!
স্বেচ্ছায় যাহা গড়াইয়া পড়ে পড়ুক্ না তাহা পাতে!
সে যে নিরামিষ, ঢেলে স্থান্ সবি স্বেচ্ছায় একসাথে!"

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

মায়ের ইচ্ছা।

বড় তরফের আঙ্গিনায় মহাসমারোহে ঢাকঢোল বাজিয়া উঠিয়াছে। বিষষষ্ঠীর সন্ধ্যা, মায়ের অধিবাস আরম্ভ হইবে। তখনও চন্দ্রদেব পূর্ণজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হন নাই, তখনও তপনের শেষ রশ্মিটুকু পশ্চিমগগন হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই। পাখীগণ কুলায়ে গমন করিতেছে, অন্ধকার সুযোগ বুঝিয়া ধীরে ধীরে ধরণীর গায়ে তিমির বসন পরাইবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইতেছে; সান্ধ্য আকাশে দুটী

একটী চতুরা তারকা এসমস্ত রঙ্গ দেখিয়া হাসিতেছে। বড় তরফে আনন্দের সীমা নাই, ঘন ঘন হুলুধ্বনি এবং রমণী-কুলের আকুল গীতিতে কর্ণকুহর বধির করিয়া তুলিতেছে।

ছোট তরফেও পূজার অনুষ্ঠান হইয়াছে, দশভুজা মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে; কিন্তু আনন্দময়ীর আগমনে ছোট তরফে আজ আনন্দ নাই। নিরানন্দের অলক্ষিত মূর্ত্তি যেন সর্ব্বত্র অতিসন্তর্পণে বিচরণ করিতেছে। বাড়ীতে লোকজন আছে, কোলাহল নাই; স্ত্রীলোক আছে, হুলুধ্বনি নাই; গায়িকা আছে, সঙ্গীত নাই; বালকবালিকা আছে খেলাধূলা নাই, হাসি তামাসা নাই; ঢাকঢোল আছে কিন্তু প্রাণমাতানো বাজনা নাই; সবই আছে তবু যেন কি নাই, কি নাই। মা আনন্দময়ি! এ তোর কেমন মহিমা মা? একবাড়ী আনন্দ কোলাহলে ভরপুর, হর্ষোচ্ছ্বাসে মুখরিত, অথচ উহারই সংলগ্ন ভবন নিরানন্দের গভীর বেদনায় ব্যথিত ও জর্জ্জরিত।

দুই তরফের মাঝে একটা মাত্র প্রশস্ত আঙ্গিনা, পরন্তু সেই আঙ্গিনার মাঝখানে দৃঢ় নির্ম্মিত সমুন্নত এক প্রাচীর দুই বাড়ীর মাঝে ব্যবধান জন্মাইয়া দিয়াছে। প্রাচীরটী লম্বালম্বি ভাবে অবস্থিত থাকিয়া বাড়ীর বাহিরের অংশ অবধি ভিতরের অংশ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র গমনাগমনের পথ রুদ্ধ করিয়াছে। বাহিরের অংশে একটী মাত্র কাঠের দরজা, তাহাও বৃহৎ অর্গলে সমাবদ্ধ, অধিকন্তু তদুপরি কুলুপ, তদুপরি দরজার উপরেরও নীচের অংশ অসংখ্য ক্রুদ্বারা আটকান। দরজার মূর্ত্তিখানি নিপুণভাবে লক্ষ্য করিলেই হৃদয়ঙ্গম হয়, উভয় তরফে বৈরিতার মাত্রা কতদূর পাকা।

এবার ছোট তরফে একজন নূতন পুরোহিত আসিয়াছেন। বীরভূম অঞ্চলে মায়ের পূজাকালে যিনি পূজার পুথি বলিয়া দেন তাহাকে আচার্য্য পুরোহিত বলা হয়, অন্ত কোনও অঞ্চলে তিনি তন্ত্রধার পুরোহিত। যিনি স্বয়ং পূজা করেন তাহাকে বলা হয় পূজক। অপরাপর বৎসরের পুরাতন পুরোহিতকে আশাতীত প্রলোভনে লুব্ধ করিয়া বড় তরফে আবদ্ধ করা হইয়াছে। নবীনাগত বৈদেশিক আচার্য্য দুই তরফের ভাব চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কিকারণে যে দুইপক্ষে এত গভীর মনোমালিন্ত তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। শুধু এই মাত্র শুনিয়াছিলেন যে গত বর্ষে উভয় হিস্তায় একটা ফৌজদারী হইয়াছিল, তাহার পর হইতেই বাড়ীর মধ্যভাগে প্রাচীর এবং দুই হিস্তায় দুই পূজা। নতুবা গত বৎসরও এক বাড়ীতে একই মূর্ত্তিতে পূজা হইয়াছে। পূজার মন্দির ছোট তরফেই ছিল, বড় তরফে নূতন উঠিয়াছে মাত্র। খরচের ভাগ অবশ্যই তখনও পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

(২)

সেবার সন্ধিপূজা ছিল বেলা বারটায়। অষ্টমী পূজা শেষ হইয়া গিয়াছে, সন্ধিপূজার সময় নিকটবর্ত্তী। নবাগত আচার্য্য পূর্ণানন্দ বিদ্যারত্ন মণ্ডপে বসিয়া আছেন, ছোট তরফের কর্ত্তা নিকটেই সন্ধিপূজার আয়োজন করিতেছেন, কর্ত্তার বয়স ৫৪ বৎসর, নাম গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তিনি কাজ করিতেছে এবং সেই সঙ্গে আচার্য্যদেবের সহিত বিবিধ সংলাপে রত আছেন। দেয়ালের ঘড়ীতে ঢং করিয়া সাড়ে এগারটা বাজিল, অমনি গিরিশবাবুর বাক্যালাপ বন্ধ হইল, সহসা তিনি পুরোহিত মহাশয়ের পদতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

"একি হ'ল একি হ'ল" বলিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাড়াতাড়ি গিরিশ বাবুর পুত্রগণ আসিয়া পিতাকে ধরাধরি করিয়া ভিতর বাড়ীতে লইয়া গেলেন। শুশ্রূষা চলিতে লাগিল; কোনও প্রকারে সন্ধিপূজা সমাপ্ত হইল। আচার্য্যদেব মনে করিলেন, ঘড়ীর সাড়ে এগারটার সঙ্গে ঐ মূর্চ্ছার নিশ্চয়ই কোন সম্পর্ক আছে।

লোকের নিকট প্রকাশ না করিলে মনের রুদ্ধ আবেগ প্রশমিত হয়না, তাই গিরিশবাবু ইচ্ছা করিয়াই সন্ধ্যার পরক্ষণে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট আসিয়া বসিলেন। এখন তাহার শরীর কতক সুস্থ। আচার্য্য দেবের বয়স অল্প হইলেও বিচক্ষণ লোক, সাংসারিক অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট। এই দুই তিন দিবসেই গিরিশ বাবুর নিকট বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পাণ্ডিত্য অনেক অংশে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণঃ। গিরিশ বাবু কায়স্থ হইলেও সংস্কৃতজ্ঞ, অথচ পূজা আর্চ্চায় মন্ত্রজ্ঞানে পাকা। তিনি আচার্য্য দেবের নিকট স্বেচ্ছায় আত্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে বসিয়াছেন।

"আপনি হয়ত দিনের বেলায় আমাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া

বিস্মিত হইয়াছেন।" এই বলিয়া তিনি এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন ; অন্তরের তপ্তবায়ু বাহিরে আসিয়া অন্তরেরই তপ্তজ্বালা প্রকাশ করিল। তারপর বলিতে লাগিলেন—"ঘটনা যদি আদ্যন্ত শোনেন পণ্ডিত মহাশয় তবে আপনারও চক্ষে জলধারা বহিবে ; স্থির থাকিতে পারিবেন্ না। বলিব কি পণ্ডিতমহাশয়, গতবৎসর অষ্টমী পূজার দিন ঠিক সাড়ে এগারটার সময় অ হু হু, বলিতে যে বুক ফাটিয়া যায়—আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে।—আমার ৩২ বৎসরের ছেলে উমাপ্রসন্ন"—আর বলিতে পারিলেন না, বৃদ্ধ থামিলেন ; তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল। ক্ষণকাল পর আবার বলিতে লাগিলেন—'উমাপ্রসন্নকে ভয় না করিত তেমন লোক গ্রামে ছিল না। কিবা ছিল তার বুকের পাটা, কিবা লম্বা চৌড়া চেহারা। তার দাপটে এই গোটা গ্রামের ভিতর কোথাও কোনদিন চোর ডাকাতের প্রবেশ হয় নাই। আহা, বাছার আমার, সেই শারীরিক শক্তিই অবশেষে কাল হইয়া দাঁড়াইল।"

বৃদ্ধের চক্ষে অবিরল জলধারা বহিতেছিল। "উমাপ্রসন্ন আমার, বন্দুক ছুড়িতে, বাঘের সঙ্গে লড়াই করিতে, ঘোড়ায় চড়িতে মজবুত। তাহার শাসনে ও চরিত্রবলে গ্রামের দুষ্ট দলের আড্ডা ভাঙ্গিয়া গেলে। আজ তার অভাবে—সন্ধ্যা পার হইয়া যায় তবু মায়ের মন্দিরে আলো জ্বলেনা। আর আর বৎসর মন্দিরের যত আলো সমস্তই জ্বালিত উমাপ্রসন্ন ; তারপর বাড়ীতে যত ঝাড়, লণ্ঠন ও ফানুস্ দেখিতেছেন সমস্তের ভার ছিল তার উপর। সারাদিন পরিশ্রমেও তাহার শ্রম বোধ হইত না। জ্যেষ্ঠের অভাবে তার কনিষ্ঠ আজ সেই ভার গ্রহণ করিয়াছে। ঐ যে দেখ্ছেন কমলাপ্রসন্ন আলো জ্বলিতেছে, ও আমারই তৃতীয় ছেলে। উমাপ্রসন্নেরই নিকট সে কুস্তি কসরৎ শিখিয়াছে।"

বৃদ্ধ তখনও উমাপ্রসন্নের মৃত্যু বিবরণ বলিতেছেন না,মনে যে বড়ই কষ্ট, সে কথা যে মুখে আনিতে বুক ফাটিয়া যায়! 'গিরিশবাবু আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন "বড় হিস্তার সঙ্গে আমাদের কোনরূপ মনোবিবাদ ছিল না। দুই তরফের বাড়ীঘর স্বতন্ত্রবটে কিন্তু চিরকাল একত্র একসঙ্গে পূজা হইয়াছে। বড় তরফের কর্ত্তা মধুসুদনের জ্যেষ্ঠপুত্র পাঁচু গোপাল—।" বৃদ্ধ আবার থামিলেন, পুরোহিত ঠাকুর শুধু শুনিয়া যাইতেছিলেন।—"পচু গোপাল উমাপ্রসন্নের সমান বয়সী। বলব কি পণ্ডিত মহাশয়! গত বৎসর এই মহাষ্টমীর দিবসে আমার উমাপ্রসন্ন মায়ের চরণে বলি হইয়া গিয়াছে, জানিনা অসুরনাশিনী আমার সরলপ্রাণ উমাপ্রসন্নের তপ্ত রক্তের নিমিত্ত এত লোলুপ হইয়া ছিলেন কেন? বেলা ঠিক সাড়ে এগারটার সময় পাঁচুগোপালের বন্দুকের গুলি উমাপ্রসন্নের বিশাল বক্ষ ভেদ করিয়া—ও হো হো—।" আর বলিতে পারিলেন না, বৃদ্ধ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

(৩)

অষ্টমীর সন্ধ্যারতি সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। বড় হিস্তায় এখনও পঞ্চম স্বরে সানাইয়ের গান চলিতেছে। শ্রোতা অসংখ্য। এদিকে ছোট হিস্তায় আচার্য্য দেব জল পানান্তে শয্যার উপবিষ্ট আছেন। শেষ বেলায় আহার হইয়াছে, আজ আর নৈশভোজন হইবে না। অবসর বুঝিয়া গিরিশ বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র রমাপ্রসন্ন, পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট স্বতন্ত্র একখানা টেবিলে আশ্রয় লইয়া বলিতে লাগিল "বাবার শরীর বড় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।. এই বৃদ্ধ শরীরে দুইবার দিনের মধ্যে মূর্চ্ছা,তার উপর ভাঙামন,বড় দুর্ব্বল,বড় কাহিল এ সংসারে শত্রু বলিতে বাবার কেহই ছিল না। এমন কি এই সুদীর্ঘ ৫০ বৎসরে তিনি অনেক শত্রুকেই মিত্র করিয়া তুলিয়াছেন—এমনই তার প্রভাব। যোগশাস্ত্র ও তন্ত্র শাস্ত্রের অনেক প্রক্রিয়াই বাবা শিখিয়াছেন। ক্ষমা ও আত্মসংযম তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব। পুত্রহারা হইলেন, মিথ্যা মোকদ্দমায় অযথা অর্থব্যয় হইল এবং অবশেষে মোকদ্দমায় হারিলেন ; তথাপি তাঁহার অটল ধৈর্য্য। কোনরূপ প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনা নাই, যা করেন মা ভগবতী। ভগবতীর উপর তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি। এই বয়স ; তথাপি মায়ের জন্ত তিনি শতবাহু হইয়া কাজ করেন। আমরা যে তাহার চারি আনা কাজও কুলাইয়া উঠিতে পারি না। জানেন্না আপনি, অপরাপর বৎসর তিনি সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী এই তিন দিবস উপবাসী থাকিয়া একাই প্রায় পূজার সমস্ত কাজ নির্ব্বাহ করিতেন।"

রমাপ্রসন্ন এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের বৃত্তান্ত বলিলেন, তাহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ গৌরসুন্দর ঘোষ কোথায় কি কাজ করিতেন

তাহা বলিলেন; কি প্রকারে প্রপিতামহ কমললোচন ঘোষ নসীপুরের রাজার অধীনে মফস্বলে নায়েবতি কাজ গ্রহণ করেন এবং স্বকীয় বুদ্ধিমত্তায় ও বিচক্ষণতায় বহু ধনের অধিকারী হন তাহা বলিল, কলপুরের এই জমিদারী যে তাঁহারই স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি তাহাও ইঙ্গিতে প্রকাশ পাইল। তাঁহার দুইটী কন্যাসন্তান জন্মিবার পর বহুদিন পর্য্যন্ত অপর কোনও সন্তান হয় নাই। ইচ্ছা ময়ীর ইচ্ছায় সেই কন্যা দুইটী একই সময়ে অকালে কাল কবলিত হয়। তখন আশ্বিন মাস। উভয় সন্তানের অকাল মৃত্যুতে আত্মহারা হইয়া প্রপিতামহ, পত্নী সমভিব্যাহারে দুর্গামন্দিরে ধন্না দেন এবং দুর্গাদেবীর নামে মানস করিয়া দুর্গারই প্রসাদে পরবৎসর এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। তাহার নাম রাখা হয় দুর্গা-প্রসাদ। তিনিই আমাদের পিতামহ।”

আচার্য্য পূর্ণানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, “মধুসূদন বাবু ত আপনার পিতার সাক্ষাৎ ভাগিনেয় নহে, তবে তিনি মাতামহ সম্পত্তির দশ আনা অংশ কিরূপে পাইলেন? আপনারাই বা পাঁচ আনা কেন?”

“আমার ঠাকুরদাদার তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ মহেশচন্দ্র মধ্যম সতীশচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ আমার পিতা—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ। কলপুরের সমস্ত জমিদারী তখন এই তিন ভাইয়ের মধ্যে একত্র ছিল। বড় দুই ভাইর দুই কন্যার জন্মের পর ঐ সম্পত্তি তিনভাগে বিভক্ত হয়। বাবার অংশে একভাগ পড়িল। অনেক তদ্বির ও বহু অর্থ ব্যয়ের পর জ্যেষ্ঠ কন্যার সন্তান মধুসূদন সিংহ একা অবশিষ্ট দুইভাগের মালিক হইলেন। সেই সময় বাবার সঙ্গে তাহার একটা উইল ঘটিত মোকদ্দমা চলে। দুইভাগে দশ আনা সোয়া তের গণ্ডা একক্রান্তি এবং একভাগে পাঁচ আনা সাড়ে ছয় গণ্ডা দুই ক্রান্তি। লোকে সাধারণতঃ দশ আনা—পাঁচ আনার হিসাবই বলিয়া থাকে।

ঐ হিসাব পাঁচুগোপাল “বড় তরফের বড় ছেলে”, সেমাকে আর মাটিতে পা পড়ে না। উমাপ্রসন্নের ভয়ে গায়ের শয়তানের আড্ডা ভাঙ্গিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে পাঁচুগোপালের প্রতিপত্তি কমিয়া আসিল। তারপর বিগত মহাষ্টমী দিবসে যে লোমহর্ষণ কাণ্ডের অভিনয় হইয়া গিয়াছে তাহা আপনি শুনিয়াছেন। বাবার পক্ষ হইয়া আমরা কোর্টদারীতে নালিশ রুজু করিলাম। অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া সেই মোকদ্দমায় তাহারাই আমাদের উপর সমস্ত দোষ চাপাইল। মোকদ্দমায় তাহাদেরই জয় লাভ হইল। সেই অবধি পিতা-ঠাকুর মহাশয়ের মন মুস্‌ড়িয়া গিয়াছে। দেহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পারেন যদি পণ্ডিত মহাশয়, বাবাকে প্রবোধ দিবেন। আপনি জ্ঞানী, আপনার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ তিনি অবশ্যই মানিয়া চলিবেন।” আচার্য্য পূর্ণানন্দ তন্মুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া কি জানি কোন্ অভিপ্রায়ে বড় তরফে চলিয়া গেলেন।

(৪)

দিকে দিকে নবমীর নহবৎ বাজিয়া উঠিয়াছে। শারদীয়া পূজার আজ শেষ দিন। ভোরের বেলায় উঠিয়া পূর্ণানন্দ বিদ্যারত্ন গিরিশ বাবুর খবর লইলেন। তিনি এখন অনেকটা সুস্থ। প্রাতঃস্নান সমাধা করিয়া গিরিশ বাবু বহিরাঙ্গনে আসিলেন। ইত্যবসরে আচার্য্য দেবও স্নান করিয়া আসিয়াছেন। “শুনুন গিরিশবাবু” বলিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় গিরিশবাবুকে বলিতে লাগিলেন; আপনার শোক অসহনীয় তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু আপনি ত জানেন এই দেহ অনিত্য, সুখ দুঃখ অনিত্য, সংসার অনিত্য। বিজ্ঞ ব্যক্তি এই নশ্বর সুখ দুঃখে মুহ্যমান হন না। যাহার জন্ম আছে, তাহারই মরণ আছে, জননশীল মাত্রই বিনাশশীল; অতএব তাহার জন্য আবার শোক কি? মনে রাখিবেন মা ভগবতীর প্রসাদে আপনাদের বংশ রক্ষা হইয়াছে, আপনার পিতা দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ দুর্গারই প্রসাদে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। দুর্গার দয়া না হইলে আপনার পিতার জন্ম হইত না, আপনিও কোথায় থাকিতেন নিশ্চয়তা নাই; পরন্তু আপনার পুত্রগণ যে কাহার ঔরষে কাহার গর্ভে জন্মধারণ করিত তাহাই বা কে বলিতে পারে? মায়ের ইচ্ছায় সৃষ্টি, মায়ের ইচ্ছায় স্থিতি এবং মায়ের ইচ্ছায়ই প্রলয়। আপনি সর্ব্বদা চণ্ডীপাঠ শুনিয়া থাকেন, চণ্ডীর ব্যাখ্যা জানেন্ত? “হে জগন্মাতঃ! জগতের আদিকালে তুমি সৃষ্টি রূপিণী, পালনে স্থিতি রূপিণী এবং প্রলয়ে সংহার রূপিণী। করুণাময়ীর করুণায় দুর্গাপ্রসাদ দ্বারা বংশ রক্ষা হইল, আর তিনি কি দয়া করিয়া আপনার বংশ হইতে একটী মাত্র সন্তান প্রসাদ স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারেন

না? তিনি বংশ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু—ভাবিয়া দেখুন বংশ হরণ করেন নাই। এখনও আপনার চারি পুত্র বর্ত্তমান। মায়ের প্রতি ভক্তিমান থাকুন, শান্ত হউন। মায়ের অপার ইচ্ছার পারে যাওয়া আমাদের সাধ্যাতীত, আমাদের এই ক্ষীণ শক্তিতে চিন্তা করিলেও সর্ব্বদা মায়ের মঙ্গলময়ী ইচ্ছাই প্রত্যক্ষ করি। উমাপ্রসন্নের একটী পুত্র ও একটী কন্যা বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভাবুন দেখি, ইহাও কি মায়েরই ইচ্ছা নহে? মায়ের নিকট প্রার্থনা করুন যেন সেই শিশু দুইটী দীর্ঘজীবী হয়। আপনি প্রাচীন ও বিচক্ষণ, সংসারের মায়ায় বিজড়িত হইয়া আত্মাকে মায়াবদ্ধ রাখিবেন না। মরণশীল সংসার, বৃথা শোকে আত্মার অবনতি ভিন্ন উর্দ্ধগতি নাই।" আরও অনেক উপদেশ তিনি প্রদান করিলেন। বৃদ্ধ গিরিশবাবু সকল কথাই মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিলেন। গত বিষয়ের অনুশোচনায় কোন ফলোদয় নাই তাহা তিনি জানেন, কিন্তু দুই বাড়ীতে দুইটী ভিন্ন ভিন্ন পূজা হইতেছে, বড় তরফে পুর্ণোত্তম, আর ছোট তরফে মাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিবার লোক নাই; এই দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? অন্য বৎসর শত শত লোক তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া আমোদ উৎসব করে, প্রসাদ গ্রহণ করে; আর আজ সকল বাড়ীতে নিরানন্দের ঘনচ্ছায়া। বড় তরফের প্রতাপে সকলেই তাহাদের বশীভূত, সকলেই যেন গিরিশ-বাবুর শত্রুতাচরণ করিতেছে। শত্রুনাশিনীর এ কেমন বিচিত্র লীলা! শত্রুক্ষয়ের জন্য মায়ের পূজা, অথচ তাহাতে শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধি। তার উপর বাড়ীর মধ্য উঠানে উচ্চ এক প্রাচীর তাহার বহু দিনের আত্মীয় বান্ধবকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। পুত্র গিয়াছে—আর আসিবে না; কিন্তু তাহার দারুণ শোকে সান্ত্বনা দিবার মিষ্টবাণী নাই, ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিবে তেমন সহানুভূতি নাই, এই ধিক্কার যে মৃত্যু অপেক্ষাও অসহ্য। শরীরের ইন্দ্রিয় রিপুগুলিও যে ইহাতে উন্মাদের মত তাণ্ডব নৃত্য করিয়া উঠে।

পূজার লগ্ন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, আচার্য্যদেব উঠিবার উপক্রম করিয়াছেন, গিরিশ বাবু অবসন্নদেহে ভূতলে বসিয়া আছেন, তাহার মনে শান্তি নাই, আনন্দ নাই। সহসা সেই বিশাল দেয়ালের দরজা ঝণাৎ করিয়া খুলিয়া গেল, বড় তরফের হর্ষোচ্ছ্বাস ও উচ্চকলরব জমাট বাঁধিয়া ছোট তরফের বহিরঙ্গনে ছুটিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে শুভ্র দুধ-গরদ পরিহিত সৌম্যমূর্ত্তি মধুসূদন বাবু, পুত্র পাঁচুগোপাল সহ ছোট তরফে আসিয়া গললগ্নী কৃতবাসে সপুত্র গিরিশ বাবুর পদতলে পতিত হইলেন। গিরিশ বাবু বিস্মিত, আশেপাশের লোক স্তম্ভিত। মধুবাবু বড় আবেগের সহিতই বলিয়া উঠিলেন "মামা, মামা, যাহা কিছু অপরাধ হইয়াছে, সবই ক্ষমা করিতে হইবে, পাঁচুগোপাল কখনও স্বেচ্ছায় সেই অপকার্য্য করে নাই। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, বিশ্বাস করুন। দৈবে যাহা করিয়াছে, তাহা মানুষে খণ্ডাইবার সাধ্য নাই। সকলই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা। কাল বিজয়া দশমী, আর যেন আমাকে শত্রু মনে না করেন। এই আমি আপনার পায়ের ধূলায় পড়িয়া রহিলাম, আপনি প্রসন্ন না হইলে ফিরিবনা; অদ্যকার পূজা তবে এইখানেই সম্পন্ন হবে।—ওরে কে আছিস্, সরকার মহাশয়কে খবর দে, প্রাচীরটা ভাঙ্গিয়া ফেলুক।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে বিশাল প্রাচীরের উন্নত গর্ব্ব ভূমিসাৎ হইল, মান-অভিমান চলিয়া গেল, দ্বেষ বিদ্বেষ দূরে পলাইল; মাতুল ভাগিনেয়কে বক্ষে ধারণ করিলেন, দশমীর সখ্য আলিঙ্গন নবমীর পূর্ব্বাহ্নেই সূচিত হইল। সকলে বিদ্যারত্ন মহাশয়কে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল, অদূরে মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি হাসিয়া উঠিলেন।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

স্মৃতির আরতি।

৪

প্রথমেই বলিয়া রাখি—বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখকের ন্যায় স্কুল পরিবর্ত্তন বিষয়ে অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী ছেলে সে কালে বোধ হয় খুব কমই ছিল। সে সময় এই সহরে যতটী স্কুল হইয়াছিল—তাহার প্রত্যেকটীতেই শ্রীযুতের নাম রেজেষ্টারী ভুক্ত হইয়াছিল। এইরূপ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগগুলির মধ্যে একটী ছিল এই যে সে কালের সেই অন্ধ যুগে সার্টিফিকেট লইয়া ভর্ত্তির বালাই ছিলনা। যাক্!

১৮৮২ সালের সেপ্টেম্বর। শরৎ চৌধুরী মহাশয়ের মাইনর স্কুলটী স্থানান্তরিত হওয়াই বোধ হয় কিছু দিনের জন্ম আসিয়া জেলা স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। এই সময় সুপ্রসিদ্ধ বাঘের মোকদ্দমায় ময়মনসিংহের ছাত্র সমাজে এরূপ বিরাট আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল যে আজ চল্লিশ বৎসরের মধ্যে স্থানীয় ছাত্র সমাজে এরূপ উত্তেজনা আর দেখিতে পাই নাই।

মহারাজা বাহাদুরের বর্ত্তমান রাজ-গৃহ 'শশীলজের' সম্মুখে —রাজপথের উত্তরে যে বৃহৎ টিনের ঘর, যাহা বর্ত্তমানে সেটেলমেণ্টের 'রেকর্ডরুম' রূপে ব্যবহৃত হইতেছে—এই গৃহের ভিত্তির উপর ছিল স্থানীয় জেলা স্কুলের একতালা অট্টালিকা। ঐ অট্টালিকা ভূমিকম্পে বিচূর্ণ হইলে, সেই ভিত্তির উপরই এই গৃহ নির্ম্মিত হয়। এই অট্টালিকায় ছিল আমাদের স্কুল; আর আমাদের হেড্ মাষ্টার ছিলেন তখন বাবু (পরে রায় সাহেব) রত্নমণি গুপ্ত।

এই স্কুল গৃহের উত্তর পশ্চিম দিকে যে বৃহৎ খেলার মাঠ (মহারাজার খেলার মঠ) ঐ স্থানে ছিল মিঃ টি, টি, কালানোজের কুঠি। বৃদ্ধ কালানোজ বড়ই সৌখিন পুরুষ ছিলেন। তাঁহার অসংখ্য গাড়ী ঘোড়া ছিল; হরিণ, ময়ুর, গিনি কুক্কুট ইত্যাদি ছিল। এই সঙ্গে একটা বাঘও ছিল। ব্যাঘ্রটী রক্ষিত হইত একটা কুঠরীতে চারিদিকের দরজায় লোহার সিক ছিল। সেটী ছিল, আমাদের জেলা স্কুলের অতি নিকটে—স্কুলের উত্তর, পশ্চিম কোণে রাস্তার অপর পারে।

বালকদিগের স্কুলে অগ্রে যাইয়া গোলমাল ও লাফালাফি করিবার নেশা সনাতন। সুতরাং আমরাও যে সে সনাতন প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করিতাম না ইহা বলাই বাহুল্য। আমরা প্রত্যহ স্কুলে যাইয়াই বাঘটী দেখিতাম, ঢিল মারিতাম, বাঘের সম্মুখে হটাৎ ছাতি মেলিয়া ধরিয়া বাঘকে চমকাইয়া দিতাম; বাঘ লাফাইয়া উঠিয়া গর্জ্জন করিত; আমরা আমোদ উপভোগ করিতাম। এ ছিল স্কুলে অগ্র-যাত্রীদের একটা নিত্যকার ব্যবস্থা।

যাদবচন্দ্র রায় নামে একটী বালক আমাদের এক বাসায় থাকিত। সে জেলা স্কুলের নবম শ্রেণীতে পড়িত। যাদব প্রতিদিনই সকলের অগ্রে আহার করিয়া স্কুলে চলিয়া যাইত। সে দিনও সে তাহাই করিয়াছিল। আমরা একটু পরে গিয়াছিলাম। আমরা স্কুলের সম্মুখস্থ দীঘির দক্ষিণ কোণায় আসিয়াছি, এমন সময় দেখি বালকেরা চীৎকার করিয়া স্কুল গৃহ হইতে দৌড়িয়া বাহিরে আসিতেছে এবং "কি হইয়াছে; কি হইয়াছে" বলিয়া পুকুরের স্নান-নিরত বয়স্কগণ স্কুলের দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

বয়স্ক ভদ্রলোকগণ স্কুল গৃহের বারান্দায় প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া বালকগণও ফিরিয়া চলিল এবং চীৎকার করিয়া পুনরায় স্কুল গৃহে প্রবেশ করিল। আমরাও কৌতূহলের বশে দৌড়িয়া গিয়া স্কুলের বারেন্দায় প্রবেশ করিলাম।

আমরা যাইবার পূর্ব্বেই ঘটনার যবনিকা পতন হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং যাইয়া প্রকৃত ঘটনার কিছুই দেখিতে পাইলাম না। শুনিলাম, আমাদের যাদবচন্দ্র ব্যাঘ্র শাবকের সম্মুখে যাইয়া হটাৎ ছাতা খুলিয়া তাহাকে খেপাইয়া তুলিয়াছিল; সেজন্য ব্যাঘ্র রক্ষক মাম্‌দী তাহাকে চপেটাঘাত করিয়াছিল এবং দৌড়াইয়া স্কুলগৃহ পর্য্যন্ত তাড়া করিয়া আসিয়াছিল। এই ঘটনায় স্কুলে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছাত্রেরা মামদীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে ব্যাঘ্র রক্ষক মাম্‌দী মিঃ কালানোজের অশ্ব রক্ষক হামু খাঁ (আর নাম মনে নাই) প্রভৃতি কে লইয়া দীর্ঘ দীর্ঘ বংশ দণ্ডের সাহায্যে স্কুলগৃহে প্রবেশ করিয়া ছাত্রদিগকে আক্রমণ ও প্রহার করে। এইরূপ অন্যায় আক্রমণে স্নানার্থী ভদ্রলোকগণ ও কাছারী যাত্রী আমলাগণ ছাত্রদিগকে অভয় প্রদান ও সমর্থন করেন।

তখনও ১১টা বাজে নাই; তখনও উপরের ক্লাশ সমূহের কোন শিক্ষকই আসেন নাই। আমরা স্কুল ভাঙ্গিয়া যাইবে বলিয়া আনন্দে হৈ চৈ করিতে লাগিলাম।

কাহার পরামর্শে কি হইতেছিল, বলিতে পারি না। আমরা একে অন্যের দেখাদেখি ক্লাসে ক্লাসে ভাঙ্গা ইট কুড়াইয়া আনিয়া স্তূপ করিলাম। শুনিলাম, এই গুলি দেখাইয়া বলিতে হইবে—আক্রমণকারীরা আমাদিগকে তো স্কুল চড়াও করিয়া মারিয়াছিলই এতদ্ব্যতীত এই সকল ইষ্টক খণ্ড দ্বারা ঢিলাইয়াও ছিল।

আমাদের সহিত সতীশচন্দ্র গুহ নামে একটী ছাত্র পড়িত। ইষ্টক সংগ্রহ করিতে যাইয়া একজন তাহার

মাথায়ই এক ঢিল নিক্ষেপ করিল; সতীশের মাথা হইতে দর দর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। গগণচন্দ্র ধর ছাত্রদিগের সমর্থ করিতে আসিয়াছিলেন; (ইনি গারো ভাষার দ্বভাষী (interpreter) ছিলেন।) তিনি সতীশের রক্তাক্ত মস্তক দেখিয়া বলিলেন—"ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য—এ ছেলেই হবে আমাদের পক্ষের প্রবল সাক্ষী।" গগন বাবু সতীশের সদ্য রক্ত মেঝে ফেলিয়া তাহা তদন্তকারী রাজপুরুষদিগর পরিদর্শনার্থ রাখিলেন।

ইতিমধ্যেই ঘটনার সংবাদ শুনিয়া হেডমাষ্টার রত্নমণি বাবু, দ্বিতীয় মাষ্টার কালীকুমার গুহ, তৃতীয় মাষ্টার মহিমচন্দ্র বসু প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মন্ত্রণা হইল। শুনিলাম—উভয় পক্ষেই ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে প্রতিকারপ্রার্থি হইয়া case করিয়াছেন। আর শুনিলাম আজই অপরাধীদিগকে identify করিতে আসিবে। এই মোকদ্দমা উপলক্ষে বহির্জগতের বহু ইংরেজী শব্দ আমরা শিখিয়াছিলাম; সেগুলির মধ্যে এই দুটী শব্দের কথাই এই প্রৌঢ় বয়সেও কোনও কোনও কারণে স্মরণ আছে।

তখন জিলা মাজিষ্ট্রেট ছিলেন গান সাহেব ও পুলিস-ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন কক্স সাহেব। শুনিলাম ইহারা কালানোজের অনুরোধে তাঁহার লোকজন লইয়া স্কুলের ঘণ্টায় অপরাধী ছাত্রদিগকে সেনাক্ত বা identify করিতে আসিবে। হেড্‌মাষ্টার রত্নমণি বাবুকে এইরূপ কার্য্যের জন্য পুলিস সাহেবকে স্কুলে প্রবেশ করিতে না দিবার জন্য অনেকেই উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধের সে পরিমাণ সাহস হইল না। আক্রমণকারীদিগকে লইয়া পুলিস আসিয়া বহু জোয়ান জোয়ান ছাত্র দেখিয়া identify করাইল। এই কাণ্ডে রত্নমণি বাবুর বেজায় বদনাম রটিল। স্কুল হইতে বহু ছাত্র বাহির হইয়া গিয়া নাসিরাবাদ এণ্ট্রেন্স স্কুলে স্থান লইল। এবং এই সুযোগে ১৮৮৩ সালের ১লা জানুয়ারী সিটি স্কুল জন্মগ্রহণ করিল।

এই সময় সকলের মুখেই এই ছড়াটী শুনা যাইত।

"কক্সগান সহরের কর্ত্তা কালানুজতাদের ভর্ত্তা।
আমাদের রাজা বাহাদুর * * * * * ।
রত্নমণি অতি বুদ্ধিমান, তাতেই ছাত্রদের এত অপমান।
বুড়কালে বুদ্ধি-লোপ—সভাই বলে 'চুপ! চুপ!'

এই মোকদ্দমায় ময়মনসিংহে জীবন্ত উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। তখন ময়মনসিংহে রেল বা তার ছিল না। নারায়ণগঞ্জ যাইয়া টেলিগ্রাফ করিতে হইত, গোয়ালন্দে যাইয়া রেলে উঠিতে হইত। প্রথমে শোনা গেল ছাত্রদের পক্ষে ছাত্রবন্ধু ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু আসিবেন। পরে শুনিলাম তিনি অসুস্থ।

এদিকে গান সাহেব মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলেন। ছাত্রদিগের পক্ষে ৫ জনের মধ্য গারোভাষী গগণচন্দ্র ধর ৫০৲ টাকা করিয়া জরিমানা, স্কুলের দারোয়ানের দশ টাকা জরিমানা। অপর পক্ষে আক্রমণকারীদের তিনজনের কারাদণ্ড।

প্রবন্ধটা নিরেট সাহিত্য-রস-শূন্য হইয়া পড়িল। তাই উপসংহারে তৎকালীন স্থানীয় সংবাদ পত্র "ভারত মিহিরে" এই মোকদ্দমা বা case সম্বন্ধে যে রসাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা উদ্ধৃত করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের আরতি করিলাম।

"ছাত্রদের case হইয়াগেল, এখন ছাত্রগণকে জিজ্ঞাসা করি, এটী Nominative না Objective case! যাহা হউক আমি এই মোকদ্দমা উপলক্ষে তোমাদিগকে গ্রামার বুঝাইয়া দিতেছি।

তোমরা যখন বাঘের ছানার কাছে Hurrah করিলে এই হইল Interjection।

কেলোনান সাহেবের ভূমিতে প্রবেশ হইল verb, বাঘকে উত্যক্ত করিয়াছে, এটী ভারি গুরুতর verb, adverb তার সঙ্গে।

সাহেবের লোকের সঙ্গে যখন তোমাদের ধৃতরাষ্ট্র কোলাকুলি তখন conjunction।

যখন লোকে শিক্ষককে coward বলে, অভিভাবকেরা তোমাদিগকে naughty বলেন, মাষ্টার মহাশয়েরা disobedient বলেন, এই হইল adjective। noun এবং pronoun যদি না বুঝিয়া থাক তবে সরস্বতীকে সেলাম দিয়া বাড়ী চলিয়া যাও।

Preposition হইতেছে to তে, in মধ্যে। এ ব্যাপারে preposition ঠাহর করা কঠিন; তবে ইংরেজী স্কুলের বারান্দায় প্রিপজিসন পাওয়া যাইতে পারে। প্রি এবং পজিসন অ|লেদা আলেদা।

Case বুঝিবার আর বাকী নাই। Sentence বুঝিয়াছত ? Sentence ৫০৲ টাকা জরিমানা।

সম্পাদক মহাশয় যাহা লিখিলেন তাহার নাম Article.

সন্ধি—Compromise এই কথা তোমাদের অনেক দিন স্মরণ থাকিবে। তোমাদের হিতের জন্য যাহা তাহা তৎ+হিত=তদ্ধিত।”

শ্রীঃ—

অঞ্জলি।

লবণ।

আমেরিকার ডাঃ কেলগ্ (Dr H. L. Kellag) স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একখানা মাসিক পত্রিকায় ভারতে লবণ ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিব। বহুদিন যাবৎ দেখা গিয়াছে যে ল্যাপলণ্ডের ইস্‌কুইমো এবং মেরু প্রদেশের অন্যান্য লোক লবণ ব্যবহার করেনা। ইহার কারণ ঐ সকল জাতীয় লোক মাংস খাইয়াই জীবন ধারণ করে, বিশেষতঃ অত্যন্ত শীত বিধায় তাহাদের চর্ম্মের কার্য্য মোটেই হয়না। সেজন্য শরীর হইতে ঘাম বাহির না হওয়ায় শরীরের লবণও ক্ষয় হয় না। অন্যান্য শীত প্রধান দেশেও লবণ কম ব্যবহারের ইহাই কারণ। বর্ত্তমানে অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে মানবের খাদ্যে অতি সামান্য লবণেরই প্রয়োজন। আমাদের খাদ্য দ্রব্যে যে লবণ আছে তাহাই আমাদের জীবন ধারণের পক্ষে যথেষ্ট। আচার্ড (Achard) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন যে আমাদের দৈনিক ½ ড্রাম লবণ হইলেই চলিতে পারে। কিন্তু আমরা অনেকেই ইহার ৮।১০ গুণ বেশী লবণ খাইয়া থাকি। সাধারণ খাদ্য বস্তুতে যে লবণ আছে তাহাই আমাদের প্রয়োজনের দ্বিগুণ। কাজেই লবণ ভিন্ন ভাবে খাওয়ার কোনই প্রয়োজন নাই। লবণ সাধারণতঃ বিশেষ কোন উত্তেজনা করেনা বলিয়াই আমরা লবণ ভিন্নভাবে খাইয়া সামাল দিতে পারি, কিন্তু ইহার মাত্রা কিঞ্চিদধিক হইলে ইহা পাকস্থলী, মূত্রযন্ত্র এবং খুব সম্ভব অন্যান্য যন্ত্রের উপরে ক্রিয়া করিয়া থাকে। উষ্ণ প্রধান দেশের নিরামিষ ভোজী যদিও অতিরিক্ত লবণ সেবন করিয়া থাকে কিন্তু তথায় ঘর্ম্ম অধিক হয় বলিয়া তাহাদের বিশেষ কোন অনিষ্ট করেনা। শীতকালে ঘর্ম্ম না হওয়াতে পিপাসাও কম হইয়া থাকে, সেজন্য কোন কোন মানুষ বহুদিন জল না খাইয়া থাকিতে পারে। আশ্চর্য্যের বিষয় মরুভূমির অধিবাসীরা বহুদিন জল খায়না। ঘর্ম্মের সহিত শরীরের অতিরিক্ত লবণ বাহির হওয়ার জন্য দৈনিক অন্ততঃ ৫।৬ গ্লাস জল খাওয়া উচিৎ।

শৈত্য।

কিছুদিন হয় পৃথিবীর নানা-স্থানের তাপের এক পরিমাপ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। শাইবেরিয়ার ভারখয়নাস্কে (Verkhoy Nask) ১৮৮৫ সনের ১৫ই জানুয়ারীতে শৈত্যের পরিমাণ ফাঃ হিঃ তাপযন্ত্রে ০ শূন্যের ৯০'৪ ডিগ্রি নিম্নে হইয়াছিল, অন্য কথায় বলিলে তুষার হইতে ১২২'৪ ডিগ্রি তাপ কম ছিল। সেই স্থলে বর্ত্তমানে শীত ফাঃ হিঃ যন্ত্রের ৯৭'৬ ডিগ্রি নিম্নে। মেরু প্রদেশেও এত শীত দেখা যায় না। সাইবেরীয়ার এই প্রদেশে শীত ও গ্রীষ্মের তাপের প্রভেদ এত হইয়া থাকে যে পৃথিবীর কোথাও এরূপ দেখা যায় না ? কারণ গ্রীষ্মের সময়ে উত্তাপ ফাঃ হিঃ যন্ত্রে ৮৮° উর্দ্ধে উঠিয়া থাকে; কাজেই তথায় তাপের বৈসম্য শীত ও গ্রীষ্ম ১৮৫ ডিগ্রি হইয়া থাকে। বিষুব রেখার নিকটে উত্তাপ অধিক হইবার কথা কিন্তু যবদ্বীপে বায়ু মণ্ডলের ১০ মাইল উর্দ্ধে শৈত্য ফাঃ হিঃ যন্ত্রের ১০০° ডিগ্রি নিম্নে এবং মধ্য আফ্রিকায় বিষুব রেখার উপরে ১৬২° ডিগ্রি নিম্নে তাপ পাওয়া গিয়াছে।

অপূর্ব্ব বৈদ্যুতিক বাতি।

আমেরিকার ট্রিবিউন পত্রে একরূপ বৈদ্যুতিক বাতির কথা বাহির হইয়াছে, যাহা কোন ব্যাটারী হইতে কারেণ্ট না পাইয়াই তিন বৎসর জ্বলিবে। ইহার আবিষ্কর্ত্তা 'জোয়ান্ টোমাডেলী নামক একজন ইটালী বাসী ইঞ্জিনিয়ার। তিনি এই বাতির নাম রাখিয়াছেন “সঞ্চিত সূর্য্য কিরণ।” ইহার

নির্ম্মাণ কৌশল ইত্যাদি অত্যন্ত গোপন রাখা হইয়াছে। নিউ জার্সিতে (New jersey) ইহার নির্ম্মাণ কারখানায় দিবা রাত্রি থাকে। ইহার আবিষ্কর্ত্তা বলেন এক ক্ষুদ্র যৌগিক ধাতু খণ্ড হইতে এই আলো বিকিরণ হইয়া থাকে। আলোর আর একটা গুণ এই যে ইহাতে বিশেষ উত্তাপ হয় না, ইহার তাপ মাত্র ১০ ডিগ্রি ফাঃ হিঃ। এই আলোর তেজ বাড়ান ও কমান যায়; ইহা দ্বারা গৃহের আলো, রাস্তার আলো এবং সিনেমার আলোর কাজও করা যায়। গৃহের কার্য্য করার জন্য একটী বাতির দাম হয়ত মাত্র ১২ শিলিং পড়িবে। সম্ভবতঃ এই গ্রীষ্মের সময়েই ইহা বাজারে বাহির হইবে।

নেপোলিয়ান।

আজ যাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় বিজ্ঞানের দ্বারা কাল তাহা অনায়াসে সাধ্য হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? যখনি নেপোলিয়ান বিজয়-গৌরব-মণ্ডিত হইয়া ইংলণ্ডের উপর লোলুপ দৃষ্টি স্থাপন করেন তখন সামান্য জলরাশি ইংলিস্ চ্যানেল তাঁহার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই চ্যানেল পার হইতে পারিলে হয়ত তিনি ইংলণ্ডে এক অঘটন ঘটাইতে পারিতেন। সে সময়ে অষ্টার্লিজের যুদ্ধের পরে এক যুবক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতের কিছুকাল পরে দেখা গেল যুবক নেপোলিয়ানের কক্ষ হইতে দৌড়াইয়া পলাইতেছে এবং নেপোলিয়ান উন্মাদ ইত্যাদি বলিয়া গালি দিতে দিতে তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছেন। এই যুবক আবিষ্কারকের নাম রবার্ট ফুল্টন্ (Robart Fulton)। তাহার অপরাধ তিনি নেপোলিয়ানের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে ফরাসি সৈন্যদিগকে ষ্টিমার যোগে ইংলিস্ চ্যানেল পার করিয়া দেওয়া যায়। দাঁড় ও পালের সাহায্য ব্যতীত যে কোন জলযান্ ষ্টীমযোগে চলিতে পারে তাহা নেপোলিয়ানের নিকট একান্ত বাতুলতা মনে হইয়াছিল!

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

ভুক্তভোগী।

আফিসে গেলেই মনিবের তাড়া
বাসায় এলেই গিন্নি;
রাত না পোহাতে চাকরের হাতে
দীর্ঘ সওদার সিন্নি।
খাই যতমত হাবাতের মত
কত বা বলিব শেষটা,
ভাবি দয়াময় কেন হেন হয়?
কম ত করিনা চেষ্টা।
মেয়ের শ্বশুর করেনি কসুর
ফর্দ্দ হাঁকিতে লম্বা,
বাবাজী জামাই করেনি কামাই—
'পাশ'কে দেখাতে রম্ভা।
গিন্নির সুর,—জামাই বাপুর
বংশের খেয়াতি মস্ত,—
যদিও সে ফেলও—মন্দের ভালো,
কেন বা হয়েছ ব্যস্ত?
মাসের পহেলা চাহে ছেলেগুলা
কাগজ বেতন চাঁদা
চুকাইতে চাই—পাই বা না পাই—
মাথাটারে দিয়া বাঁধা।
রাত না পোহাতে আসে খাতা হাতে
চুকাতে যে যার পাওনা,
করি কত স্তুতি শুনেনা মিনতি,
মিষ্ট কথাটী?—তাও না!
দু মাসের বাকী, তাই আজ না কি
জবাব দিয়াছে গোয়ালা,
দুধ ছাড়া চা, কচি খোকা টা—
জানেন উপরওয়ালা!
ঠাকুর, চাকর, ঝি, অতঃপর
গিয়াছে ধরিয়া বায়না,
গিন্নির কথা, কি বলিব তা
হাসি মুখে কথা কয় না!
সারাদিন খাটী দেহ করি মাটী
পাই না কারুই মর্জ্জি,
দুঃখের আপীল করিতে দাখিল
কোথায় করিব আর্জ্জি?

শ্রীকুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
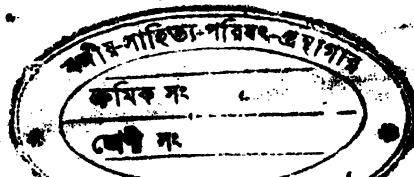
সৌরভ

দশম বর্ষ। ময়মনসিংহ, কার্ত্তিক, ১৩২৯ সন। দশম সংখ্যা।

স্নেহের দান।

মণিকে সম্বোধন করিয়া খুড়ীমা বলিলেন—"এই মাখনের কথাই কি বলিয়াছিলে মণি ?"

মণিমোহন বলিল—"হাঁ খুড়ীমা, এখন দেখিতেছি তোমাতে তাহাতে বেশ আপনা আপনি সম্বন্ধই আছে।"

খুড়ীমা মণির মন্তব্য সম্বন্ধে কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন "স্নান করিয়া আহ্নিক করিব ; আজ একাদশী। সন্ধ্যার পর মাখনকে লইয়া আমার নিকট যাইও মণি !"

মণি ঘাড় কাত করিয়া বলিল—"যাইব খুড়ীমা" !

পুকুরে বেশ বড় বড় মাছ ছিল। অপর পারে চৌকী ফেলিয়া বসিয়া মণির মাতুল ভাই হরকুমার বাবু আলবুলাতে তামাকু টানিতে টানিতে বড় বড় কয়েকটী ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন। মাখন বলিল—"নিষ্কর্ম্মারি কর্ম্ম মাছ ধরা, চল তাহাই করি গিয়া ; এ বিষয়ে আমি কিন্তু একের নম্বর ওস্তাদ—বাড়ীতে মাছ ধরিয়াই দিন কাটাইয়াছি।"

মাখনকে লইয়া মণিমোহন সেই দিকেই চলিল। চলিতে চলিতে মণি একটু দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিল—"খুড়ী মা যে তোমার মাসীমা হন, সে কথা তো কখনও তুমি আমাকে বল নাই। তুমি কিন্তু বড় অসরল ভাই।"

মাখন খুড়ীমার সহিত গোয়ালন্দ ষ্টিমারে সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয় কোন কথার উল্লেখ না করিয়া বলিল—"মাসীমার যেএই বাড়ী, তাহা তো আমি জানিনা, সে বিষয়টা বোধ হয় আজকার অবস্থা দেখিয়াই বুঝিয়াছ ; তবে আর আমাকে⋯"

কথা শেষ হইতে না দিয়া মণি বলিল—"একটা মস্ত কল্পনা তুমি আমার ভাঙ্গিয়া দিলে আজ—সে কত সুখের কল্পনা !"

মাখন আসিয়া হরকুমারের একটা বর্শির ছিপ লইয়া দাঁড়াইল।

হরকুমার বাবু বলিলেন—"অভ্যাস আছে কি হে মাখন বাবু !"

মাখন লজ্জিতভাবে বলিল—"ছিল তো একদিন।"

হরকুমার বাবু তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বর্শির ভাসমান পাত্তা কাঠির উপর রাখিয়া বাম হস্তে তার সুগন্ধী চার দেখাইয়া বলিলেন—"এই নাও, এক দিকে বসিয়া যাও।"

মাখন বোতল হইতে চার লইয়া তাহার যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়া নিবিষ্ট চিত্তে একস্থানে বসিয়া গেল এবং অনতি বিলম্বেই হরকুমার ও মণির চক্ষে তাক্ লাগাইয়া দিয়া একটা বিশাল মৎস্তকে আটকাইয়া ফেলিল।

হরকুমার ওস্তাদ শিকারী। তিনি আর নিজ স্থানে চৌকী আটকাইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, দৌড়াইয়া গিয়া মাখনের হাত হইতে ছিপটী লইয়া মৎস্তটার জাতি, বর্ণ ও ওজন ঠিক করিয়া ফেলিলেন। কত 'এঙ্গল' দূরত্ব লইয়া কিরূপ ওজনে ছিপ টানিলে বর্শি মৎস্তের তালুতে আটকাইবে ও তাহার পর কি প্রক্রিয়াতে তাহাকে কিনারায় আনিয়া তুলিতে হইবে—সেই সকল বৈজ্ঞানিক প্রণালী মাখনকে অত্যন্ত স্নেহের ভঙ্গিতে বুঝাইয়া দিতে দিতে সেইরূপ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। এ দিকে মৎস্ত তাহার সকল বৈজ্ঞানিক প্রণালীকে সজোড়ে ছিন্ন করিয়া সমস্ত পুকুর আলোড়ন পূর্ব্বক একদিকে চলিয়া গেল।

হরকুমার নিরাশ হইবার লোক নহেন। উচ্চ কণ্ঠে পলায়মান মৎস্তকে উদ্দেশ করিয়া শুনাইয়া দিলেন—"যাবে কোথায় মাছের পো ? কালই তোমার মাথায় মুক্তিস্তে

খাইব।" তারপর মাখনের দিকে চাহিয়া স্নেহের স্বরে বলিলেন—"কাল এটাকে কিন্তু ধরাই চাই দাদা—কি বল তুমি?"

মাখন বলিল—"আচ্ছা।"

(২২)

ভীষণ মরুভূমিতে ওয়েসিসের ন্যায় এই জমিদার পুরীতে মাসীমা ও বর্ণি এই দুইটী আশ্রয় করিয়া মাখন আরো কয়েকটা দিন সেখানে কাটাইতে প্রস্তুত হইল।

মাসীমার প্রীতি ও স্নেহের নিলয় মাখনের নিকট নিদাঘ তপ্ত মরুভূমির শান্তি নির্ঝর হইলেও তাহাতে থাকিয়া মাখনের প্রাণ আইঠাই করিত। সেই শান্তি নির্ঝরের তপ্ত হাওয়া ছিল মাখনের পক্ষে—মাসীমার একমাত্র স্নেহের দুলালী কনক।

কনক মায়ের সৌন্দর্য্যশ্রী ছানিয়া লইয়া কুসুমের মতই কৈশোরযৌবনের সঙ্গম স্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; তাহার এক পায়ে ছিল প্রস্ফুটিত কৈশোরের অপূর্ব্ব সুষমা, অপর তীরে দেখা যাইতেছিল মুকুলিত যৌবনের অস্ফুট উন্মেষ। জমিদার গৃহের পোষাকী মেয়ে ছন্দে-মাধুর্য্যে, রূপে-লাবণ্যে পরিপূর্ণ।

কনককে দেখিয়াই মাখনের কুসুমের কথা মনে হইয়াছিল। কুসুমের খেলার প্রণয় একদিন মাখনের বিরুদ্ধে উৎকট অভিযোগের জন্ম দান করিয়াছিল, তাই কনককে দেখিলেই মাখন শিহরিয়া উঠিত।

মাসীমা সেদিন সন্ধ্যার পর যেমন ভাবে মাখনের পারিবারিক কথাগুলি একটা একটা করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—জেঠা মহাশয় কোথায় আশ্রয় নিয়াছেন, জেঠিমা কেমন আছেন, জেঠতাত ভাই ভগ্নী কেমন আছে, ঘর বাড়ীর অবস্থা, পিতা মাতার মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ ইত্যাদি শুনিয়া মণিমোহনের আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। মাখনের এত খবর মণিমোহন নিজেও জানিত না। কথাবার্ত্তার মাঝখানে মণি একবার মাত্র শুধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"খুড়ীমা, তুমি তার এত খবর রাখ, আর যে কিনা তোমার বাড়ী কোথায় তাহারই খোঁজ রাখেনা; আশ্চর্য্য!"

এ কথার উত্তরে খুড়ীমা বলিয়াছিলেন—"বাবারে মণি, নারীর প্রাণ বোনপুতের জন্য পুড়ে কি না, জিজ্ঞাসা করিও তাহা তোমার মার কাছে। তুমি তো তোমার মাসীমাদের কোন খবরই রাখ না। কে কোথায় আছেন, খবর রাখ কি? তোমার মা কিন্তু বোন্‌পুতদের সংবাদ না রাখিয়া পারেন না। তিনি তাহার সব সংবাদই রাখেন।"

হিসাব লইয়া অনুসন্ধান করিতে গেলে যে মাসীর সংখ্যা মণিমোহনেরও নেহাত কম হইবে না, তাহা ভাবিয়া এবং খুড়ীমার মাখনের পারিবারিক অবস্থা সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা দেখিয়া মণিমোহনের আর সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রহিল না; বরং সে একটু লজ্জিত হইল।

মাখন মাসীমার নিকট হইতে আসিয়া মণির নিকট তাহার জ্ঞাতব্য আরো অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল।

মাখন জানিল—মাসীমা মণিমোহনদিগেরই সমান অংশের মালিক। মণির স্বর্গীয় খুড়া মহাশয় পুষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি রাখিয়া গিয়াছেন, মণিমোহনের পিতাও সেজন্য তাঁহাকে এতদিন যথেষ্ট তাগাদা দিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা নাই। তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার একমাত্র কন্যাকে পাত্রস্থা করিয়া জামাইটীকেই ঘরে রাখেন। তাঁহার ইচ্ছা, জামাইটী হয় অবস্থায় দরিদ্র, গুণে পণ্ডিত।

মাখনের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলীর উত্তর দিয়া মণি বলিল—"এখন হাসি পায় ভাই, খুড়ীমার নিকট আমি তোমারই জন্য উমেদার ছিলাম; তিনিও নিম্ রাজী ছিলেন, অবস্থাহীন ব্যক্তিকে জমিদারের জামাতা করা সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে একটু মতভেদ ছিল—তাই কথাটা পাকিয়া উঠিতে ছিল না; তুমি তাহা এখন একেবারেই কাঁচাইয়া দিলে।"

ইহার পর জমিদার বাড়ীর সকলেই অবগত হইল, মাখন বাবু ছোট হিস্যার কর্ত্রী ঠাকুরাণীর বোন্‌পো। সুতরাং মাখনের ব্যক্তিত্ব ও পদ মর্য্যাদা যে জমিদার বাড়ীতে একটু রূপান্তরিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই ভাবটী বুঝিতে মাখনের কয়েকদিন বিলম্ব হইয়াছিল।

(২৩)

ডহরের জমিদার বাড়ীর বড় হিস্যা ও ছোট হিস্যার প্রাসাদ প্রাচীর বেষ্টিত পুরীর ভিতরভাগ বা অন্তঃপুর একটী উচ্চ দেওয়ালে দ্বিধা বিভক্ত; বহির্ভাগে তেমন কোন বিশেষ ভাগ বাটোয়ারার চিহ্ন নাই। জমিদার বাড়ী বহু খণ্ডে বিভক্ত। উত্তরের খণ্ডগুলি বড় হিস্যার ও দক্ষিণের খণ্ডগুলি ছোট হিস্যার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতেছে। পূজার আঙ্গিনা ও গৃহ দেবতার আঙ্গিনা অবিভক্ত এজমালী দখলে আছে। পূর্ব্বে জমিদারী

আদায় তহসিল একত্রই হইত ; এখনও মফস্বলের কাছারী-গুলিতে এজমালী কর্ম্মচারীই নিযুক্ত আছে। সদরে বা বাড়ীতে কর্ম্মচারীর বন্দোবস্ত পৃথক। বড় হিস্তায় একজন ম্যানেজার আছেন ; তাঁহার অধীন অন্যান্য কর্ম্মচারী আছেন। ছোট হিস্তায় একজন নায়েব ও কয়েকজন গোমস্তা আছেন। দাসদাসীর সংখ্যাও ছোট হিস্তা অপেক্ষা বড় হিস্তায় বিস্তর বেশী।

এজমালী গৃহ দেবতার জন্য যে নিত্য ভোগ হয়, সেই নিত্যভোগের প্রসাদ সমানে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া উভয় হিস্তায় যায়। ছোট হিস্তার ভোগের প্রসাদে ছোট হিস্তার কর্ত্রীর ও কনকের এবং কোন কোন দাসদাসীদের আহার চলে। অন্যান্য কর্ম্মচারীদের জন্য বড় হিস্তার ন্যায় ছোট হিস্তায়ও এক পৃথক খণ্ডে পৃথক বন্দোবস্ত আছে।

মাসীমা মাখনকে বলিয়া দিয়াছিলেন—"বাবা, এখন আর তোমার শঙ্কা করিবার কোন কারণ রহিল না ; তুমি যখন খুসি আমার নিকট আসিও এবং বসিয়া গল্প করিও। এ তোমার মাসীমার বাড়ী—আপন বাড়ী।"

পরদিন প্রাতে মণি তাহার নিজ কার্য্যে কোন্ দিকে গিয়াছিল, একা একা মাখনের ভাল লাগিতেছিল না ; সুতরাং তাহার মাসীমার নিকট যাইয়া বসিয়া একটু আলাপ করিতে ইচ্ছা হইতেছিল।

ছোট হিস্তার কর্ত্রীর খুব নিকট আত্মীয় স্বজন আসিলে যে গৃহে তাঁহাদের স্থান দেওয়া হয়, সেই গৃহখানা মণি বাবুর গৃহের সংলগ্ন—মধ্যখণ্ড ও অন্তঃপুরের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত, কর্ত্রীও এই গৃহে আসিয়া প্রয়োজন হইলে বাহিরের ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া থাকেন। গত রাত্রে মণিমোহন গৃহগুলি তাহাকে পরিচয় করিয়া দিয়াছিল এবং এই গৃহের ভিতর দিয়াই ছোট হিস্তার অন্তঃপুরে তাঁহাকে লইয়া গিয়াছিল।

মাখন এই পরিচিত পথে আসিয়া ধীরে ধীরে অন্তঃপুরের কপাট খুলিতেই দেখিল—সেই দালানেরই বারান্দার শেষ প্রান্তের আলিসায় বসিয়া কনক—তাহার সম্মুখ স্থিত একটা চা'র টেবিলের উপর নানা বর্ণের ফুল রাখিয়া মালা গাঁথিতেছে। কনক একটী সেফালিকা লইয়া তাহার নীচ দিয়া সুতা ভিরাইতে চেষ্টা করিতেছিল—তাহার অখণ্ড মনোযোগ ফুল ও সুতার দিকে নিবিষ্ট থাকায় সে মাখনকে লক্ষ্য করিতে পারিল না।

কনককে সম্মুখে দেখিয়া মাখনের পা লজ্জায় জড় হই করিয়া উঠিল। পা যেন অবশ হইয়া আসিল। সে ধীরে ধীরে দরজাটী বন্ধ করিয়া দিল। এইবার দরজার আন্দোলনে কনকের দৃষ্টি মাখনের উপর পড়িল।

মাখন দরজা টানিয়া দিয়া সেই ঘরের কুলঙ্গী হইতে একখানা অতি প্রাচীন সংবাদ পত্রিকা কুড়াইয়া লইয়া পড়িতে চেষ্টা করিল ; তারপর পুনরায় দ্বার খুলিল।

কনক মাখনকে দেখিয়া মালা রাখিয়া উঠিয়া পড়িয়াছিল। সে নিজেই মাখনকে আসিতে বলিবে, কি মাকে যাইয়া খবর দিবে—চিন্তা করিতে করিতে মাখন সেখানে তখনো আছে কি না দেখিতে আসিয়া যে মুহূর্ত্তে দরজা খসিয়াছে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মাখনও পুনরায় দরজা টানিয়া একেবারে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

মাখনের অন্তঃরাত্মা হঠাৎ পদতলে-সর্প-দৃষ্ট পথিকের মত যেন আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল ; সে অধিকক্ষণ এইরূপে দাঁড়াইয়া থাকা সঙ্গত মনে না করিয়া কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল—"মাসীমা ঘরে আছেন কি ?"

কনকও লজ্জায় জড়সড় হইয়া বলিল—"আসুন আপনি"—তাহার মুখে আর কথা ফুটিল না। সে ত্রস্ত পদে আঙ্গিনা পার হইয়া চলিয়া গেল।

মাখন ধীরে ধীরে আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইতেই মাসীমা তাহাকে সস্নেহে আহ্বান করিলেন।

মাখন আঙ্গিনা পার হইয়া আসিয়া পশ্চিমের বড় দালানের বারান্দায় রক্ষিত একখানা হেলান বেঞ্চের উপর বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মণি কোথায় গেল মাসীমা ?"

মণির গন্তব্য স্থান সম্বন্ধীয় কোন অভিজ্ঞতা যে মাসীমার না থাকাই সম্ভব তাহা মাখন বুঝিত, তথাপি সে এইরূপ কথাই বলিল।

মাসীমা নিজ হস্তে মাখন ও মণির প্রাতর্ভোজনের জন্য লুচি মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি গামছায় হাত মুছিতে মুছিতে বলিলেন—"সেতো এদিকে আসে নাই। গোপাল তোমাদের দুজনকে আনিতে গিয়াছিল, সেও তো ফিরিল না!"

গোপাল ছোট হিস্তার ছোকরা চাকর।

মাখন বলিল—"না মাসীমা, আমার সহিত কারো সাক্ষাৎ

হয় নাই, আমি মণিকে না পাইয়া নিজ হইতেই এখানে আসিয়াছি।"

মাখন মাসীমার সহিত কথা বলিতে বলিতে চারিদিক লক্ষ্য করিতেছিল। হঠাৎ তাহার দৃষ্টি কোঠার অভ্যন্তরে আকৃষ্ট হইল; কনক দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। মাখনের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িবা মাত্র কনক তাহার দৃষ্টি ফিরাইয়া নিল।

এই সময় ছোকরা চাকর আসিয়া মাখনকে সেখানে উপবিষ্ট দেখিয়া বলিল—"মণি বাবুকে পাইলাম না।"

মাসীমা মাখনকে বলিলেন—"একটু জল খাও বাবা, মণি আসিলে সে পরে খাইবে।"

মাখন ঘরের ভিতরের দিকে চাহিয়া দেখিল, সেখানে দুখানা আসন পাতিয়া ঠাঁই করা রহিয়াছে। সে হাসিয়া বলিল—"আমি তো মাসীমা স্নান আহ্নিক না করিয়া কিছু খাই না; আমাকে এ বিষয়ে মাপ করিবেন না কি?

মাসীমা হাসিয়া বলিলেন—"ছেলে মানুষ এখনই এত নিষ্ঠা?"

মাখন ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"না করিয়া উপায় কি মাসীমা। ব্রাহ্মণের ছেলে তো, তারপর চিরদিন গরীব বামুনের যে ধারায় চলিবে, সে ধারাতেই চালাইতে হইবে।"

মাসীমা—"বামুন হইলেই কি সকলে তা করে? বড় লোক বামুন কত অনাচার করে।"

মাখন—"যে অনাচার করে সে বামুন নয়—আর বামুনের মাসীমা—বড় লোক হইতে নাই। জমিদারী করাতো বামুনের পক্ষে ঘোর অনাচার।"

হাত মুছিয়া আসিয়া বারান্দায় গালিচার আসনে বসিয়া মাসীমা বলিলেন—"তবে তুমি খাইবেই না মাখন, আমি ভোরে উঠিয়াই যে তোমার জন্য নিজ হাতে লুচী মোহনভোগ করিয়াছিলাম।"

মাখন মাসীমার মনের ভাব বুঝিয়া বলিল—"খাইব মাসীমা, আপনার স্নেহ-অনুরোধ কি অগ্রাহ্য করিতে পারি? এ পর্য্যন্ত আমি কোন দিন খাই নাই, আজ এখানে খাইলে মণি দুঃখিত হইতে পারে। মণি আসিলে খাইব, স্নান আহ্নিক করিয়া খাইব।"

মাসীমা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"কাজ নাই বাবা তোমাকে [illegible] করিয়া, আমি স্নান করিয়া আবার তোমাকে করিয়া দিব; এগুলি আমি স্নান করিয়াও করি নাই। তুমি মণির সঙ্গে থাকিয়াও যে এত নীতি-নিষ্ঠা-নিয়ম চালাইয়া আছ, তাহা আমার মনেই ধারণা হয় নাই।"

মাখন হাসিয়া বলিল—"নীতি-নিষ্ঠা-নিয়ম কিছুই না মাসীমা, এ অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা।"

মাসীমা একটু চুপীচুপী জিজ্ঞাসা করিলেন—"শুনিয়াছি তোমাকে তাঁহারা মণির সঙ্গে সমানেই খরচপত্র দেন, তবে আর অবস্থায় ব্যবস্থা কেন বাছা?"

মাখন বলিল—"আজ জমিদারী চালে চলিলে কাল আমায় শেষ রক্ষা করিবে কে মাসীমা? নিজের অবস্থা বুঝিয়া তো চলিতে হইবে? তারপর মাসীমা, দুঃখিত হইবে না, শাস্ত্রে বলে, বড় লোকের প্রসাদ-অনুগ্রহ বড়ই ভয়ানক! আজ আছে, কাল নাই! আমার দারিদ্র্যতো চিরদিনের।"

মাসীমা বলিলেন—"ঠিক বলিয়াছ বাবা।" ইহার পর মাসীমা কথাটা অন্য দিকে ফিরাইয়া বলিলেন—"তুমি পরীক্ষায় জলপানি পাইয়াছ শুনিয়া মনে কত আনন্দ হইয়াছে"।

মাখন বলিল "আমার মা নাই মাসীমা, আপনার আনন্দ-আশীর্ব্বাদই আমার মায়ের আশীর্ব্বাদ; স্নেহ দৃষ্টি রাখিবেন—আমার প্রতি।"

মাখন লক্ষ্য করিতেছিল, ঘরের অন্য এক প্রকোষ্ঠ হইতে জানালার অল্প ফাঁক দিয়া কনক এক দৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তাহার মুখের কথাগুলি শুনিতেছিল। কনক এরূপ আড়ালে আড়ালে সঙ্কুচভাবে থাকে, মাখনের সেরূপ ইচ্ছা নহে। সে দ্বিধাশূন্য মনে কনকের কথা তুলিয়া বলিল—"কনকের বিবাহের কোন প্রস্তাব আছে কি? এখন তো বয়স হইয়াছে।"

মাসীমা বলিলেন—"উপস্থিত আছে, কিন্তু আরো দু এক বৎসর না দেখিয়া বিবাহ দিব না মনে করিতেছি।"

মাখন ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"বয়স্থা করিয়া যখন বিবাহ দিতে আপনার আপত্তি নাই; তখন বোধ হয় লেখাপড়া শিখাইতেও আপনার আপত্তি নাই।"

মাসীমা—"আজ দুই বৎসর যাবৎ মাষ্টার বিদায় করিয়াছি, ইহার পূর্ব্বে রীতিমত মাষ্টার রাখিয়াই মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইয়াছি। উল সুতার কাজ, কাগজ কাটা, চিত্র আঁকা এসকল বিষয়ে কনকের খুব হাত আছে। এই বলিয়া তিনি

একটি দাসীর উপর কনককে ডাকিয়া আনিবার আদেশ দিলেন।

মায়ের আদেশ শুনিয়াই কনক পাছের দরজা দিয়া বাহির হইয়া দাসীর চক্ষে ধরা দিল। তখন দাসীও সহজেই তাহাকে কর্ত্রীর আদেশ শুনাইয়া দিল।

কনক ধীরে ধীরে মায়ের সম্মুখে আসিয়া কনক প্রতিমাটীর মতই দাঁড়াইল।

মা বলিলেন—"তোর মাখন দাদাকে দেখা দেখি—উইলের কাজ, কার্পেট বুনা, কাগজ কাটা, তোর হাতের লেখা…"

কনক মনে ইচ্ছা ও অনিচ্ছার সংগ্রাম লইয়া ধীরে ধীরে আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। মাসীমাও মাখনকে লইয়া হলঘরে প্রবেশ করিলেন এবং হলের চারদিকে আয়নার ফ্রেমে আটা কার্পেটের চিত্র, টেবিলের উপরে বিন্যস্ত টেবিল ক্লথ, তার উপরে রক্ষিত উলের ফুল, জানালার পর্দা ইত্যাদি দেখাইলেন। উপরে দেয়ালের গায়ে রবিবর্ম্মার দোল খাওয়া মোহিনীর বৃহৎ ছবিখানা দেখাইলেন। মোহিনীকে কনক পৃথক জড়াও কাপড় পরাইয়া একেবারে জীবন্ত করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। ছবিখানা বৃহৎ আয়নার ভিতর দুই তাকেয় ফ্রেমে আটা। মাখন অনেকক্ষণ ছবিখানার প্রতি তাকাইয়া রহিল। তারপর কনকের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এ তুমি নিজে করিয়াছ কনক?"

কনক মুখে কাপড় জড়াইয়া মার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া তারপর মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

মাখন বলিল—"বেশ হইয়াছে।"

মাখন হলের চারিদিক দেখিয়া দেখিয়া ঘুরিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার কি কথা স্মরণ হওয়ায় সে বলিল, মাসীমা এখন আমি যাই; একটা কাজের কথা ভুল হইয়া গিয়াছে; আপনি তো দ্বিপ্রহরে ঘুমান না, সে সময় আসিয়া কনকের লেখা দেখিব, আর আর কথাও বলিব।"

মাসী মা বলিলেন—"আজ থেকে এখানেই খাইও মাখন। আমি নিজ হাতে রাঁধিয়া তোমাকে খাওয়াইব।"

মাখন বলিল—"সেটা মাসীমা মণির নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা হয় করিবেন। দেখিবেন যেন সে দুঃখিত না হয়। আপনি নিশ্চয়ই আমার এই কথায় দুঃখিত হইবেন না।"

মাসীমা হাসি মুখে বলিলেন—"ঠিক কথা; আমি বলিয়া পাঠাইতেছি তোমরা দুজনেই এখানে খাইবে। (ক্রমশঃ)

ময়মনসিংহের প্রাচীন কথা।

উকিল ও বিচার বিভ্রাট।

৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে ময়মনসিংহে মোট ২৫।৩০ জন উকিলের অধিক ছিল না। তখন উকিলদিগের মধ্যে কেহই ইংরাজি জানিতেন না, প্রায় সকলেই বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষিত ছিলেন। ২।১ জনে পার্শিভাষাও জানিতেন। আমি যখন এখানে আসি তখন গঙ্গাটীয়ার ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী, জগৎচন্দ্র চৌধুরী, যষ্টিধর মজুমদার, গোবিন্দপ্রসাদ বসু, নন্দকুমার বকসি, কালীকুমার দত্ত, গঙ্গাধর ঘোষ, কালীমোহন দত্ত, ও গঙ্গাদাস গুহ ময়মনসিংহের প্রধান উকিল ছিলেন।

বলা বাহুল্য যে ইঁহাদের মধ্যে গঙ্গাদাস গুহ ভিন্ন আর কেহই ইংরাজি জানিতেন না। ইংরাজি ভাষায় অভিজ্ঞ উকিল গঙ্গাদাস গুহই এখানে প্রথম উকিল, কালীশঙ্কর গুহ তাহার কিছুদিন পরে এখানে ওকালতী আরম্ভ করিয়াছিলেন।

এখানে জজের এজলাসে কেহরই বসিবার আসন বা বিধি ব্যবস্থা ছিলনা। সকল উকিলকেই দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত।

৫৬।৫৭ বৎসর পূর্ব্বে হোসেনপুরের অন্তর্গত ভুলদিয়া নিবাসী উকিল কালীমোহন দত্ত জজের সহিত বহু তর্কবিতর্ক করিয়া উকিলদিগকে বসিবার আসন দেওয়াইয়াছিলেন। কালী মোহন বাবু খুব আইনজ্ঞ ও সাহসীপুরুষছিলেন।

বিক্রমপুর নিবাসী উকিল কালীকুমার দত্ত দেশ বিখ্যাত ধন্য পুরুষ ছিলেন। তাঁহার দান শক্তি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার বাসায় প্রতি দিন বহু লোক আহার করিত, আত্মীয় পরিচিত অপরিচিত সকলেই তাঁহার নিকট সমভাবে আদর পাইত। যিনি উপস্থিত হইতেন তিনিই সেখানে খাইতে পাইতেন। নানা শ্রেণীর লোক নানা কার্য্যে এখানে আসিয়া এবং উপার্জ্জন উপলক্ষে এখানে থাকিয়া তাঁহার বাসায় আহার করিতেন। আপদে বিপদে অর্থ সাহায্য দ্বারাও তিনি অনেকের উপকার করিয়া গিয়াছেন।

সর্ব্ব সাধারণে তাঁহাকে দাতা কালীকুমার বলিত। এরূপ লোকহিতকর ক্ষণজন্মা পুরুষ সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।

সে সময়ে হাকিমদিগের মধ্যেও অনেকে ইংরাজী জানিতেন না।

পূর্ব্বে আমাদের দেশের স্মৃতি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মুনসেফ ও সবজজের পদে নিযুক্ত হইতেন। তাঁহারা হিন্দুর দায়ভাগ মতে আদালতে বিচার করিতেন।

এখনকার সবজজকে তখন লোকে সদর আলা বা, আলা সদর আমিনও বলিত। সে সময় উৎকোচের মাত্রাও অধিক পরিমাণে চলিত। এমন কি বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষ হইতেই উৎকোচ গ্রহণ করা হইত; পরে, যে পক্ষের উৎকোচের মাত্রাধিক্য থাকিত, সেই পক্ষেরই জয় লাভ হইয়া যাইত।

আমি প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট শুনিয়াছি, বরিশালে আলাসদর-আমিন নরহরি শিরোমণির আমলে অন্য একটী হাকিম এক পক্ষে ৮০০ টাকা অপর পক্ষে ১২০০ টাকা গ্রহণ করিয়া ১২০০ টাকা দাতার পক্ষে ডিক্রি দিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় যিনি ঠকিতেন তাঁহার আর টু শব্দটি করার অধিকার থাকিত না, চোরের কিল খাওয়ার ন্যায় নীরবে মর্ম্ম যাতনা ও নিজের বর্ব্বরতা চাপা দিয়া রাখিতে হইত।

শুনিয়াছি, পশ্চিম বঙ্গের ব্রাহ্মণ কুল জাত একটী হাকিম বহু পূর্ব্বে ময়মনসিংহে ছিলেন। তাঁহার পেস্কারের নাম ছিল গণেশ। সে কালের নিয়মানুসারে এজলাসে চৌকীর উপরে ফরাস বিছানা থাকিত। বিছানার উপর তাকিয়া, পানের ডিবা ও লম্বানলের ফরাসী হুকা থাকিত। আহারান্তে হাকিম আসিয়া প্রথম কাচারিতে ফরাস বিছানায় কিছুকাল নিদ্রা যাইতেন। এ দিকে বাদী প্রতিবাদী উকিল মোক্তার আসিয়া হুজুরের নিদ্রা ভঙ্গের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতেন।

হাকিম গাত্রোত্থান করিয়া মুখ প্রক্ষালনান্তে তাম্বুল চর্ব্বন করিতে করিতে ফরসির নল মুখে দিয়া পেস্কারের প্রতি কটাক্ষ পূর্ব্বক বলিতেন—গণেশ! আজকে সাজানো মোকদ্দমা আছে? পেস্কার বলিলেন—হুজুর! আছে।

বলাবাহুল্য যে সে কালে সাক্ষীর জবানবন্দি প্রভৃতি সকলই পেস্কার বাবু হাকিমের অসাক্ষাতেও লিখিতেন; হাকিম তাহা শুনিয়া ডিক্রি কি ডিসমিস এইরূপ একটা শব্দ উচ্চারণ করিতেন। তারপর ডিক্রি বা ডিসমিশের কারণাদি দেখাইয়া রায় লিখিয়া পেস্কার সে মোকদ্দমা শেষ করিতেন।

সাক্ষীর জবানবন্দী প্রভৃতি লিখিয়া মোকদ্দমা তৈয়ার করিয়া রাখিবার নামই তৈয়ারী মোকদ্দমা। গণেশ বাবু বলিলেন—তৈয়ারি মোকদ্দমা আছে। হাকিম বলিলেন—পড়।

গণেশ বাবু সাক্ষীর জবানবন্দী পড়িতে আরম্ভ করিলেন। ২১৪ পংক্তি পড়িতেই এক পক্ষের উকিল বলিলেন "ধর্ম্মাবতার। আমার মক্কেলের সাক্ষী কখনও একথা বলে নাই, আমি সপথ করিয়া বলিতে পারি, একথা একেবারেই বলে নাই; সমস্তই মিথ্যা লেখা হইয়াছে।"

তখনই অপর পক্ষের উকিল বলিলেন—"হুজুর, সাক্ষী ঠিক এই কথাই বলিয়াছে; আমিও সপথ করিয়া বলিতে পারি, ইহার একটী অক্ষরও মিথ্যা লেখা হয় নাই।"

হাকিম বলিলেন—"থামো, থামো, গোল করিওনা; আমাকে মোকদ্দমার অবস্থাটা শুনিতে দেও, পরে যাহার যাহা ইচ্ছা, বলিও।" তখন আর কে থামে, কাকেইবা কে থামায়! উভয় পক্ষের উকিল মোক্তারে একটা বাগযুদ্ধ লাগিয়াগেল। এক পক্ষের উকিলের মুখ চাপিয়া ধরিয়া আর এক পক্ষের উকিল বলিতে আরম্ভ করিলেন। একটা হুলুস্থুলু ব্যাপার বাধিয়া গেল। হাকিম হস্তোত্তোলন করিয়া অনেক বার থামো, থামো, বলিলেন; কিন্তু ফল কিছুই হইল না। ক্রমে বাগ যুদ্ধ মল্ল যুদ্ধে পরিণত হইয়া উঠিল। তখন হাকিম বিরক্ত হইয়া বলিলেন্ কিছুতেই থামিলে না, তবে শুন—এই বলিয়া ডিক্রী কি ডিস্‌মিস ইহার কোনও একটা কথা ক্রোধ ভরে তখনই বলিয়া ফেলিলেন।

এক পক্ষের উকিল—"হুজুর সর্ব্বনাশ করিলেন।" বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হুজুর বলিলেন—"আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাকে অবস্থা শুনিতে দেও, তাহা দেও নাই, এখন স্বকর্ম্মের ফল ভোগ কর।" অপর পক্ষের উকিল মল্ল যুদ্ধে সুফল ফলিয়াছে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বাহিরে চলিয়া আসিলেন। এই একটু মাত্র নমুনা দিলাম। সেকালে বহু স্থানেই এরূপ অভিনয় চলিত।

নানা কথা

জেলা স্থাপনের সময় কলিকাতা হইতে ঢাকা হইয়া ৬ দিনে ময়মনসিংহে ডাক পৌঁছিত। তখন মণিঅর্ডরের ব্যবস্থা ছিলনা। ১৮৬২ সনে সদরে মণিঅর্ডারের ব্যবস্থা হইল। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জেলার সৃষ্টি। জেলাসৃষ্টির ৫ বৎসর পরে পৃথক জিলার নক্সা গভর্ণমেণ্টে প্রস্তুত হয় এবং ৬০০৬ টাকা ব্যয়ে জেলখানার পাকা গৃহ প্রস্তুত হয়। ইতিপূর্ব্বে কাচারি গৃহের এক প্রকোষ্ঠেই কয়েদিগণ থাকিত। ঐ জেলার বহুপূর্ব্বে এ জেলার

একটীও ইংরাজী নবিশ ছিলেন না। কালী কেরাণী নামে বিক্রমপুর নিবাসী একটী ব্রাহ্মণ ইংরাজি শিক্ষা করিয়া এখানে আসিয়া কালেক্টরির কেরাণী হন, ইনিই ইংরাজি নবিশের প্রথম। বাঙ্গালী ইংরাজি শিক্ষা করিয়া আসিয়াছে বলিয়া অনেকেই আশ্চর্য্য বোধ করিত এবং বহু দূর হইতে বহু লোক তাঁহাকে দেখিতে ও তাঁহার ইংরাজি ভাষা শুনিতে আসিত। কেরাণী মহাশয় আমাদের পাড়াতেই ছিলেন; তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যাকে হেমনগরের জমীদার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চৌধুরী বিবাহ করিয়াছেন।

খাদ্য দ্রব্যাদি

৫২ বৎসর পূর্ব্বে এখানে খাদ্য দ্রব্যাদি মহা সুলভ ছিল। আমি তের আনা কি চোদ্দ আনা মূল্যে কালীজীরার আতপের মণ বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি। সাধারণ চাউল ॥৶০ আনা ৸০ আনা মণ বিক্রয় হইত। এক জনের মাসিক আহারের ব্যয় এক মণ চাউলের মূল্যের সমান ছিল।

সে সময় কালীজীরা চাউলের ও তাহার ভাতের অতি মনোহর সৌরভ ছিল। ভাত পাক হইলে সুগন্ধে সে বাড়ী আমোদিত হইত। এখন সে গন্ধ একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে। পাকা আম, কাঁঠাল, বেল, ইলিশ মৎস্য ভাজা, মুগ প্রভৃতি সমস্তের গন্ধই লোপ পাইয়া গিয়াছে, তথাপি অন্য বস্তুর কিছু কিছু গন্ধ আছে, কালীজীরা চাউলের গন্ধ একেবারেই নির্ম্মূল হইয়াছে।

বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, ভূগর্ভস্থ কয়লা গন্ধক প্রভৃতি বিবিধ বস্তুর বহুল পরিমাণে উত্তোলনই এই গন্ধ নাশের কারণ। আমাদের দর্শন শাস্ত্রের মতও ঠিক ঐরূপ, আমাদের মতে গন্ধ ভূমির গুণ, ভূমির গর্ভে বিবিধ ধাতু ও গন্ধকাদি যে সকল সম্পত্তি আছে, ক্রমে ক্রমে তাহা নিঃশেষ হইয়া যাওয়াতেই পার্থিব বস্তুর গন্ধ লোপ পাইয়া যাইতেছে।

তখন উত্তম সবরিকলা ও ছোট ছোট চালকুমরা পয়সায় ৬।৭ টা পাওয়া যাইত, মিঠা আলু ১৲ টাকায় চারি মণ এবং আবার ফাও এক পাখারি পাওয়া যাইত। দুগ্ধ ১৫।১৬ সের টাকায় মিলিত। এক একটা বড় বড় পাঠা ॥৵ আনা ॥৴ আনা মূল্যে বিক্রয় হইত, ছোট পাঠা টাকায় ৪ টা বিক্রয় হইত। মৎস্য শীতের দিনে প্রচুর পরিমাণে মিলিত। নাসাইল প্রভৃতি স্থান হইতে নৌকাযোগে বড় বড় রোহিত, কাতল সহরে আমদানি হইত। অতি বৃহৎ বৃহৎ রোহিত কাতলের মূল্যও একটাকার অধিক ছিলনা। কিন্তু শীত অতীত হইলে অতি সামান্য মৎস্য মিলিত, তার পর বর্ষাগমে মৎস্য একেবারেই পাওয়া যাইত না। কোনও কোন দিন ব্রহ্মপুত্রের ইলিস মৎস্য ২।৪ টা, কোনও দিন বা ১০।১২ টা বাজারে দেখা যাইত। দশ বার আনা কি এক টাকা পাঁচ সিকা পর্য্যন্ত এক একটার মূল্য হইত।

ভৃত্যের মাহিনা ২ টাকা ১॥০ টাকার অধিক ছিল না, এই বেতনেই তাহারা তৎকালে নিজের পরিবার রক্ষা করিতে পারিত। আমি আমার খুড়া মহাশয়ের নিকট বাল্যকালে শুনিয়াছি, আমাদের একজন বাহিরের চাকরের মাহিনা মাসিক ॥০ আনা ছিল। সে দিবা রাত্রি খাটিত, আর লোকের নিকট বলিত, দিবা রাত্রি না খাটিলে মুনিবে ॥০ আনা মাহিনা দিবে কেন? ইহাতে বোধ হয় সে সময়ের ॥০ আনা বেতনই উচ্চ হারের বেতন; ৷৵০ আনা ৷৶০ আনা মাসিক বেতনেও চাকর পাওয়া যাইত।

কি সুখের দিন চলিয়া গিয়াছে, যখন ৷৴ আনা ৷৶০ আনা মাসে উপার্জ্জন করিয়াও লোকে পরিবার প্রতিপালন করিতে পারিত। এখন ঐ উপার্জ্জনে একজনের জল খাওয়াও হয় না। আমার খুড়া মহাশয় প্রায়ই বলিতেন লোকের খাওবার চিন্তা কি, শৃগাল কুকুরেও আহারের সংগ্রহ করিয়া থাকে। লোকে চিন্তা করে মান সম্ভ্রম বিত্ত পশারের দালান কোঠার জন্য, পেটে খাওয়ার জন্য মানুষে চিন্তা করিবে কেন?

এখন পেটে খাওয়ার জন্যই মানুষের জীবন সংগ্রাম করিয়া কাটাইতে হয়। আমরাই বাল্যকালে দেখিয়াছি, একজন জমীদারের সরকারে ৪ টাকা কি ৫ টাকা বেতনে চাকরি করিতেন, আর তাঁহার ২৫ জন আত্মীয়স্বজন আমোদ প্রমোদ খণ্ডামি গোণ্ডামি করিয়া বেড়াইত, কিছুমাত্র উপার্জ্জন করিত না। লোকে বলিত ওদের বড় কর্ত্তা ৫ টাকা বেতনে চাকুরি করিতেছেন, আর চিন্তাকি। এখন ভদ্র সমাজেও মুটে মজুরের ন্যায় স্ত্রী পুরুষের খাটিয়া খাওয়ার দিন আসিতেছে। আর তখন মাসিক ৫ টাকা বেতনের কর্ম্মচারী দোল দুর্গোৎসবাদি বার্ষিক কার্য্য রক্ষা করিয়া ২৫।৩০ জন লোকের প্রতিপালনে সমর্থ হইতেন।

৫০ বৎসর পূর্ব্বে এ জেলার মধুসাহার দালান, কালীবাড়ীর মন্দির, দশমহাবিদ্যার মন্দির, কানাই বলাইর মন্দির, ব্রজলাল বাবুর দালান, শিবদয়াল তেওয়ারির দালান, নদীর পারে হোটেল, বড়বাজার সাহাদের দালান, লালাবাবুর একতালা দালান ও কাচারীর কয়েকটী দালান মাত্র বিদ্যমান ছিল, আর সমস্তেরই ছনের ঘরে বাস করিতে হইত। অগ্নিদেব বৎসরে ২।৩বার করিয়া বহু গৃহ আত্মসাৎ করিয়া ফেলিতেন, প্রায় সকলেরই আগুণের ভয়ে ব্যতীব্যস্ত থাকিতে হইত। এই অগ্নিকাণ্ড অনেক সময় বেশ্যাবাড়ী হইতেই আরম্ভ হইত; কামলারাও কাজকর্ম্ম না পাইলে সময় সময় আগুন লাগাইয়া দিত।

তৎকালে এখানে বেশ্যার সংখ্যা অত্যধিক মাত্রায় ছিল। আমলাপাড়া আমরা বেশ্যাপাড়ায় পরিপূর্ণ দেখিয়াছি, দুর্গাবাড়ীর পূর্ব্বদিগের রাস্তার দুই পার্শ্বই বেশ্যাপাড়ায় পরিপূর্ণ ছিল। অন্যান্য স্থানেও বহু বেশ্যা ছিল। ১৮৮৫ সালের ২রা চৈত্রের বড় আগুনের সময় বেশ্যালয় হইতে আগুন আসিয়া অর্থাৎ তৎকালের সুতারপট্টি হইতে আগুন লাগিয়া মেছোবাজার, ছোট বাজার, বড়বাজার নিঃশেষ করিয়া সে আগুন কালীবাড়ী পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল। ঐ অগ্নিকাণ্ডে কত লোক ধনেপ্রাণে মারা গিয়াছিল, কত লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। তখন প্রায় ১২৫ জন লোক আগুনে পুড়িয়া মরে। মৃত ব্যক্তিগণের অস্থিখণ্ড যে স্তূপীকৃত হইয়াছিল, তাহা দেখিলে ভয়ে ও দুঃখে বিহ্বল হইয়া যাইতে হইত। মফস্বলের ও স্থানীয় লোকের অর্দ্ধ দগ্ধ দেহে ডাক্তারখানা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ইহার একটী লোকও বাঁচে নাই; ঘোড়া গরু কুকুর বিড়াল যে কত মরিয়াছিল, তাহার সংখ্যা করাই সাধ্যাতীত। তাহার পর হইতেই এখানে টীনের ঘরের প্রচলন হইতে থাকে, ইতিপূর্ব্বে টীনের ঘর ছিল না। শেরপুরের বাসার দ্বারকা ডাক্তারের ছোট একখানা টীনের ঘরই এখানে প্রথম প্রস্তুত হইয়াছিল।

তখন অনেকেরই কূপের জল ব্যবহার করিতে হইত, কলেরা ও বসন্তের ভয়ও অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল।

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ন।

সন্তান রহস্য।

কেন জীবের পুত্র সন্তান জন্মে আর কেনই বা কন্যা সন্তান জন্মে, এই জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য অতি প্রাচীনকাল হইতে সভ্য সমাজে নানা প্রকার পরীক্ষা ও পর্য্যালোচনা চলিয়া আসিতেছে। উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে অন্যূন পাঁচ শত বিভিন্ন মত প্রচলিত ছিল। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ ঐ সকল মত পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে উহাদের অধিকাংশই কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। যে কয়েকটী বৈজ্ঞানিক মত বর্ত্তমানে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং আংশিক সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া পাঠকদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে প্রয়াস করিব।

যাঁহারা ঈশ্বরে নির্ভরশীল তাঁহারা পুত্র বা কন্যা সন্তান জন্মিবার কারণ ভগবৎ ইচ্ছা বলিয়া বিশ্বাস করেন। ভগবানের দান পার্থিব অবস্থার অধীন নহে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ যাবতীয় জাগতিক ব্যাপার বিশেষ বিশেষ কারণের ফল বলিয়া মনে করেন। কোন্ কার্য্য কোন্ কারণের ফল তাহা নির্দ্ধারণ করাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। বৈজ্ঞানিকগণ সেই কারণ নির্দ্ধারণ করিতেই সর্ব্বদা ব্যস্ত।

কি জন্য পুত্রসন্তান জন্মে এবং কিজন্য কন্যা সন্তান জন্মে তাহার কারণ আবিষ্কার কল্পে বৈজ্ঞানিকগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। জর্ম্মাণ দেশীয় পণ্ডিতগণই এই বিষয়ে বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সন্তানের জন্ম নানাপ্রকার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। এই বিষয় ভগবৎ ইচ্ছা অথবা বিধি নির্ব্বন্ধের কোন আধিপত্য আছে, তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। অনেকেরই এখন জানিবার জন্য কৌতূহল হইতে পারে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া ইচ্ছামত সন্তান উৎপাদন করা সম্ভব কিনা। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ অত্যুচ্চ মূল্যে বর বিক্রয় হইতেছে এবং তজ্জন্য কন্যার বিবাহ দেওয়া যে প্রকার ব্যয়সাধ্য হইয়াছে, তাহাতে সকলেরই পুত্র সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু পুত্রসন্তান প্রজনন মানবের ইচ্ছাধীন হইলেও বর বিক্রয়ের ব্যবসা অধিক দিন চলিবে না। খরিদ্দারের অনুপাতে জিনিসের পরিমাণ অধিক

হইলে তাহার মূল্য হ্রাস হওয়া অনিবার্য্য। সেইরূপ, সকল দম্পতীই কেবল পুত্র সন্তান উৎপাদন করিলে অত্যল্প সময়ের মধ্যে যে কন্যার অভাব ঘটিবে তৎবিষয়ে আর সন্দেহ মাত্রও নাই। তখন কন্যার মূল্য অত্যধিক হইবে এবং কন্যারত্ন লাভের জন্য দম্পতীগণ লালায়িত হইবেন। প্রজনন বিধি প্রকৃতির অনুশাসনে ও মানব সমাজের প্রয়োজনানুসারে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সেই কথা পরে বলিতেছি।

প্রাচীনকালের পণ্ডিতগণের বিশ্বাস ছিল, স্ত্রীদেহে দুই প্রকার অণ্ড (ova) বর্ত্তমান আছে। এক প্রকার অণ্ড হইতে পুত্র ও অপর বিধ অণ্ড হইতে কন্যা সন্তান উৎপন্ন হয়। আধুনিক প্রাণিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ দুইপ্রকার অণ্ডের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এদিকে একপ্রকার অণ্ড অন্য বিধ অণ্ডের উপর কিরূপে আধিপত্য বিস্তার করিয়া নিজ শক্তি প্রকটিত করে তাহা ও ধারণাতীত। এই সম্বন্ধে প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন :—

"The theory that there are two kinds of ova respectively destined to develop into males or females is more then a mere begging the question." *Evolution of sex.*

কোন কোন আধুনিক পণ্ডিত পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন বিবাহিত স্ত্রী পুরুষের বয়সের উপর পুং ও কন্যা সন্তান জনন অনেক পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। বালিকার প্রথম ঋতুমতী হইবার অব্যবহিত পর গর্ভসঞ্চার হইলে সাধারণতঃ কন্যা সন্তান হয় কিন্তু স্ত্রীলোকের অধিক বয়সে গর্ভসঞ্চার হইলে পুত্র সন্তান হয়। থারি (Thury) একজন পশুপালক ছিলেন। তিনি গো-মহিষাদির সন্তান প্রজনন ব্যাপার বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে স্ত্রীজাতির যত অল্প বয়সে সন্তান জন্মে তত বেশী কন্যাসন্তান হইবার সম্ভাবনা। হেনসেন (Hensen) নামক আর একজন প্রাণিতত্ত্ববিৎ এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে যদি অল্প বয়সের পুরুষ দ্বারা তরুণা যুবতীর গর্ভোৎপত্তি হয় তবে কন্যা জন্মিবার অধিকতর সম্ভাবনা থাকে। ঐ সকল পণ্ডিতদিগের মতে স্ত্রীলোকের অধিক বয়সে পুত্র সন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা বেশী। আর একদল প্রাণিতত্ত্ববিৎ বলেন পুত্র কিম্বা কন্যা সন্তান উৎপত্তি জনকজননীর বয়সের উপর আংশিক নির্ভর করে বটে কিন্তু উহা একমাত্র নিয়ামক নহে। স্ত্রী পুরুষের বয়স ব্যতীত তাহাদিগের খাদ্যের পরিমাণ ও গুণাগুণ এবং গার্হস্থ্যজীবনের কার্য্যাবলী দ্বারা ভাবী সন্তানের লিঙ্গ নিরূপিত হইয়া থাকে।

পারিপার্শ্বিক আহার পরীক্ষা ও পর্য্যালোচনা করিয়া আধুনিক প্রাণি তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে খাদ্যদ্রব্যের উৎকর্ষ ও পরিমাণের দ্বারা ভাবী সন্তানের লিঙ্গ ভেদ ঘটিয়া থাকে। যে স্থানে উৎকৃষ্ট খাদ্য সামগ্রী সহজে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় সেই স্থানে বেশীসংখ্যক কন্যাসন্তান জন্মে, আর যেস্থানে খাদ্য নিকৃষ্ট ও অপ্রচুর সেইস্থানে কন্যা অপেক্ষা পুত্র সন্তান বেশী ভূমিষ্ঠ হয়। ইহাই সাধারণ নিয়ম। যে দেশ সমৃদ্ধিশালিনী, যে দেশের জন সাধারণ খাদ্যাভাবে কষ্ট পায় না, সেই দেশে কন্যা সন্তান অধিক জন্মে। আর দরিদ্র দেশে পুত্র সন্তান অধিক হয়। এইজন্য উপযুক্ত খাদ্যাভাবে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও যুদ্ধের পর কন্যা অপেক্ষা অধিকতর পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। সৌভাগ্যের দিনে লক্ষ্মী স্বরূপিণী কন্যার আবির্ভাব হয় আর দুঃখও অভাবের দিনে শ্রমশীল কর্ম্মী পুত্রের জন্ম হয়। তুলনায় ধনীর গৃহে অধিক সংখ্যক কন্যা ও দরিদ্রের গৃহে অধিক সংখ্যক পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। সাধারণতঃ যে পরিবারের স্ত্রীলোক বিলাসী ও শ্রমবিমুখ এবং আহার বিহার ও গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া দিন কর্ত্তন করে সেই পরিবারেই পুত্র অপেক্ষা কন্যার আধিক্য বেশী। দরিদ্র পল্লীবাসীর পুত্রসন্তান অধিক জন্মে আর ধনী নাগরিকদিগের গৃহে কন্যা রত্নই অধিক শোভা পায়।

"In towns and in prosperous families there are more females while male are more numerous in the country and among the poor."

ইয়ং (Yung) নামক একজন জর্ম্মাণ পণ্ডিত উপর্য্যুক্ত সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য কতকগুলি ভেক লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সাধারণ অবস্থায় ভেকের একশত সন্তানের মধ্যে ৪৩ হইতে ৫৭টী স্ত্রী সন্তান জন্মিয়া থাকে। তিনি পুং ও স্ত্রী ভেককে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া উহাদিগকে প্রথম গোমাংশ ভক্ষণ করিতে দেন। সেইবার

তাহাদিগের যে সন্তান হইল তাহার মধ্যে স্ত্রী সন্তানের সংখ্যা শতকরা ৫৪টী হইতে ৭৮টী হইল। তারপরের বার উহাদিগকে কেবল মাছ খাইতে দেওয়া হইল, তখন স্ত্রী সন্তানের সংখ্যা ৬১ হইতে ৮১টী হইল। তৃতীয়বার ততোধিক পুষ্টিকর আমিষ খাদ্য দেওয়ায় দেখা গেল স্ত্রী সন্তানের সংখ্যা বাড়িয়া ৬১ হইতে ৯২ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। উপর্য্যুক্ত পরীক্ষার ফলে জানা গেল, জনকজননী যত পুষ্টিকর খাদ্য খাইবে তাহাদের তত অধিকসংখ্যক কন্যা সন্তান জন্মিবে।

গিরো (Girou) নামক আর একজন জর্ম্মাণ প্রাণিতত্ত্ববিৎ কতকগুলি মেষ বিভিন্ন প্রকার খাদ্য দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে যত ভাল খাদ্য দেওয়া যায় ততই উহাদের স্ত্রীসন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং যত অল্পপরিমাণ ও নিকৃষ্ট আহার দেওয়া যায় তত পুং সন্তান বেশী জন্মে। ডুসং (Dusang), হার্টউইগ (Hertwig) কাওয়ালস্কি (Kowalewsky) প্রমুখ সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ পণ্ডিতগণ দীর্ঘকাল নানাপ্রকার ইতরপ্রাণী ও মানবের প্রজনন ব্যাপার পরীক্ষা ও পর্য্যালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে মাতা দুর্ব্বল ও কৃশ হইলে অধিকতর পুত্র সন্তান জন্মে এবং বলশালিনী ও স্থূলদেহা হইলে কন্যা সন্তান অধিক হয়।

বহু প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মক্ষিকা পুষিয়া উহাদিগের প্রজনন ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন মক্ষিকাদিগকে প্রচুর উৎকৃষ্ট খাদ্য দিলে রাণী মক্ষিকা জন্মে। রাণী মক্ষিকা সন্তান ধারণ করিতে পারে। তদপেক্ষা অল্প পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করিলে স্ত্রী সন্তান জন্মে বটে কিন্তু উহাদের সন্তান ধারণোপযোগী শক্তি থাকে না। উহারা শ্রমিক (Worker) স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। আরও নিকৃষ্ট ও অল্প খাদ্য দিলে পুংমক্ষিকা জন্মে। গুটিপোকা সম্বন্ধেও সেই নিয়ম খাটে। গুটিপোকা গুলিকে ভাল ও প্রচুর খাদ্য দিলে স্ত্রী সন্তান জন্মে কিন্তু অল্পাহার দিলে পুং সন্তান জন্মে। আবার ইহাও পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে ইতর প্রাণীদিগের গ্রীষ্মকালে স্ত্রীসন্তান অধিক হয় এবং শীতকালে পুং সন্তান অধিক জন্মে। ইহার কারণ এই যে গ্রীষ্মকালে প্রচুর খাদ্য মিলে এবং শীতকালে অতিশয় খাদ্যাভাব ঘটে। এইরূপ আরও নানাপ্রকার পরীক্ষা করিয়া বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, জনকজননী প্রচুর উৎকৃষ্ট খাদ্য পাইলে উহাদের কন্যা সন্তান অধিক হয় এবং নিকৃষ্ট ও অপ্রচুর খাদ্য পাইলে পুংসন্তান অধিক হয়।

ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুখ স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হয়। তেমন ধনী লোক সাধারণতঃ ভোগবিলাস পরায়ণ হইয়া উঠে। বিলাসিতা প্রিয় লোক স্বভাবতঃ অলস ও শারীরিক পরিশ্রম বিমুখ হয়। যে পরিবারের এই অবস্থা সেই পরিবারে বৈজ্ঞানিকদিগের মতে কন্যা সন্তান অধিক জন্মিবার কথা। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন এই কথা যদি ঠিক হইত তবে দরিদ্রের ঘরে বেশীসংখ্যক কন্যা জন্মিত না। বর্ত্তমান দরিদ্র পিতামাতাই কন্যাদায়ে অধিকতর বিব্রত। অতি নিঃস্ব পিতার গৃহে বহু সংখ্যক কন্যা রত্ন শোভা পাইতেছে, এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। দরিদ্র ব্যক্তি যদি ধনীর সুখ-পালিতা কন্যা বিবাহ করিয়া থাকেন অথবা ধনীর ঘরে যেরূপ ভোগ বিলাসের মধ্যে কন্যাগণ লালিতা পালিতা হয় দরিদ্র পতি ঋণগ্রস্ত হইয়াও যদি নিজ পত্নীকে তাদৃশ সুখস্বচ্ছন্দে প্রতিপালন করেন এবং অপেক্ষাকৃত অলস জীবন যাপনের সুযোগ দেন তবে তাহার পুত্র অপেক্ষা অধিকসংখ্যক কন্যা জন্মিবারই কথা। পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে সকল মেয়ের অল্প বয়সে বিবাহ হয় তাহাদের বেশীর ভাগ কন্যাই জন্মিয়া থাকে। দ্বিতীয় কারণেও পুত্র অপেক্ষা অধিকসংখ্যক কন্যাসন্তান জন্মিতে পারে।

প্রথম ঋতুমতী হইলেই প্রকৃতি জ্ঞাপন করিলেন বালিকার এখন জননী হইবার অধিকার জন্মিয়াছে। অতঃপর যত অধিক বয়সে স্ত্রীলোকের বিবাহ হইবে পুত্র সন্তান লাভের সম্ভাবনা তত বেশী হইবে। যে সমাজে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম এবং পুরুষের সংখ্যা বেশী, সেই সমাজে স্ত্রীলোকের বিবাহ সহজ সাধ্য এবং অতি অল্প বয়সেই বালিকার বিবাহ হইয়া যায়। তাই ক্রমে সেই সমাজে মেয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মেয়ের সংখ্যা বাড়িয়া যখন পুরুষের সংখ্যা কম হইবে তখন মেয়েদের বিবাহ দেওয়া কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং বাধ্য হইয়া অধিক বয়সে মেয়ের বিবাহ দিতে হইবে। তখন আবার কন্যা অপেক্ষা পুত্রের জন্মই অধিক হইবে। এইরূপে প্রকৃতি পুত্র ও কন্যাসন্তানের

সমতা রক্ষা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে যুদ্ধ-বিগ্রহ, অন্তর্বিপ্লব মহামারী প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। ইহার ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত।

দুর্ভিক্ষের জন্য খাদ্যাভাব প্রযুক্ত কন্যা সন্তান অপেক্ষা পুত্র সন্তান অধিক জন্মিত। কিন্তু এখন আর প্রাচীনকালের ন্যায় তত যুদ্ধ বিগ্রহ হয় না।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সভ্য জাতিরা প্রয়োজন হইলে খাদ্যদ্রব্য অন্য দেশ হইতে নিজ দেশে আনাইয়া থাকেন। শিল্প ও বাণিজ্য এখন বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এই সকল কারণে স্বাধীন দেশে খাদ্য কষ্ট নাই বলিলেই হয়। স্বাধীন দেশ সকল ক্রমেই ধনী হইতেছে। উহাদিগের ধনৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি হেতু তথায় ভোগবিলাস অতি মাত্রায় বাড়িতেছে। তাহার ফলে ঐ সকল দেশে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী সন্তান বেশী জন্মিতেছে। ইয়ুরোপের আদম সুমারীর হিসাব পরীক্ষা করিলে জানিতে পারা যায় যে তথায় সকল দেশেই স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক। এবং দিনদিনই স্ত্রীলোকের সংখ্যা বাড়িতেছে।

ইংলণ্ডের কথাই ধরা যাউক। প্রতি হাজার পুরুষের অনুপাতে ইংলণ্ডে স্ত্রীলোকের সংখ্যা—

১৮৫১ খৃঃ— ১০৪২ জন
১৯০১ খৃঃ— ১০৬৮ "
১৯১১ খৃঃ— ১০৭৩ "

সুতরাং দেখা যাইতেছে দিনদিন স্ত্রীলোকের সংখ্যা বাড়িতেছে। ইয়ুরোপের মধ্যে আর্লণ্ড অতিশয় দরিদ্র দেশ। তাই সেই দেশের প্রতি হাজার পুরুষের অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা—

১৮৭১ খৃঃ— ১০৫০ জন
১৯০১ খৃঃ— ১০২৭ „
১৯১১ খৃঃ— ১০০৩ „

আর্লণ্ডের নারীর সংখ্যা ক্রমেই কমিতেছে। এখন ভারতবর্ষের কথা আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। নিম্নে সরকারী আদম সুমারীর তালিকা হইতে স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা উদ্ধৃত করিলাম।

সমগ্র ভারতবর্ষে

	১৮৭২ খৃঃ (লক্ষ)	১৮৮১ (লক্ষ)	১৮৯১ (লক্ষ)	১৯০১ (লক্ষ)	১৯১১ (লক্ষ)
পুরুষ	১২,৩৯	১২,৯৯	১৪,৬৭	১৪,৯৯	১৬,১৩
স্ত্রীলোক	[illegible]	১২,৩৯	১৪,০৫	১৪,৪৪	১৫,৩৮
অধিক পুরুষ	৩৮,	৬০,	৬২,	৫৫,	৭৫

বাঙ্গালায় প্রতি হাজার পুরুষের অনুপাতে

১৮৮১—১০০৮ জন স্ত্রীলোক
১৮৯১—১০০৫ „
১৯০১— ৯৯৮ „
১৯১১— ৯৭০ „

পূর্ব্বোক্ত তালিকা দৃষ্টে দেখা যাইবে যে ভারতবর্ষে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং বৈজ্ঞানিকদিগের মতে ইহা ভারতবাসীর দরিদ্রতার অনিবার্য ফল। যুদ্ধের পূর্ব্বে (১৯১১) ইংলণ্ডে ১৭৬ লক্ষ স্ত্রীলোক ও ১৬৪ লক্ষ পুরুষ ছিল অর্থাৎ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১২ লক্ষ অধিক ছিল। ঐ সময়ে ভারতবর্ষে প্রায় ১৬ কোটী ১৫ লক্ষ পুরুষ ও ১৫ কোটী ৩৮ লক্ষ স্ত্রীলোক ছিল অর্থাৎ স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা ৭৫ লক্ষ অধিক ছিল। ১৮৮১ খৃঃ বাঙ্গালায় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা হাজারে ৮ জন অধিক ছিল ১৯১১ খৃঃ পুরুষ অপেক্ষা হাজারে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৩০ জন কমিয়াছে। ইহাই দারিদ্র্যের লক্ষণ। সোনার বাঙ্গালা দিন দিন নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে, তাই লক্ষ্মী স্বরূপিণী কন্যার সংখ্যা কমিতেছে।

আরব দেশ অতিশয় অনুর্ব্বর মরুভূমিময়। তথায় শস্য উৎপাদন দুঃসাধ্য বিধায় জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য জনসাধারণকে কঠোর সংগ্রাম করিতে হয়। দিবারাত্রি হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম না করিলে আরব দেশে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করা যায় না। এই ভীষণ দারিদ্র্য হেতু আরব দেশে কন্যা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক পুত্রের জন্ম হয়। স্ত্রীলোকের অল্পতা হেতু আরব বাসীদিগের মধ্যে বহু পুরুষের এক পত্নী বিবাহের কথা (Polyendry) প্রচলিত ছিল। আবার তুরস্ক দেশ অতিশয় উর্ব্বর ও শস্যশালিনী। এই দেশে অল্পায়াসে প্রচুর খাদ্য উৎপন্ন হয়। তুরস্ক সভ্যতার লীলাভূমি। সিরিয়া, বেবিলনিয়া মেসোপোটেমিয়া প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজ্য সকল এই দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রাচীনকালে তুরস্ক সাম্রাজ্য অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিল। তদবধি তথাকার অধিবাসীরা নিতান্ত ভোগবিলাস পরায়ণ হইয়া উঠে। ঐশ্বর্য্যভোগের ফলে তুরস্কে রমণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তখন বহু বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তন অনিবার্য্য হইল। নীল, ইফ্রিটিস, টাইগ্রীস্ প্রভৃতি নদীর তীরবর্ত্তী উর্ব্বর দেশ সমূহে বহু বিবাহ প্রচলিত

আছে। বাস্তবিক কন্যা সন্তানের আধিক্য একটী গুরুতর সামাজিক সমস্তা। এই সমস্তার সহজ সমাধান সমাজে বহু বিবাহ প্রচলন। পাশ্চাত্য সভ্যজাতি সকল বহু বিবাহের যতই নিন্দা করুন না কেন উহা নৈসর্গিক অবস্থারই ফল। বিগত ইয়ুরোপীয় যুদ্ধের পর ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে বহু বিবাহ প্রচলনের জন্য আইন বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব উঠিয়াছিল। বহু বিবাহ প্রচলিত হইলে তখনকার নষ্ট জনবল বৃদ্ধি পাইত এবং সমাজের পাপস্রোত ও মন্দীভূত হইত।

একজন বৈজ্ঞানিক লিখিয়াছেন—Scarcity of food resulted in on increase of male children which sometimes enabled the vanquished nation to recover by poverty the position it had lost by luxury. But then cause a return of prosperity and with it the superabundance of women.

এমনও দেখা গিয়াছে যে বিলাসিতার আতিশয্যে কোন জাতি শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দারিদ্র্য দশায় পতিত হইয়াছে, তখন পুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় সেই জাতি লুপ্ত স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার সাধন করিয়াছে। কিন্তু ঐশ্বর্য্যের পুনরাগমন হেতু আবার স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কিন্তু খাদ্যাভাব যে জাতির চিরকাল সমান থাকে, তাহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না; সুতরাং সেই জাতির মধ্যে পুত্র সন্তানই অধিক জন্মে। তাতার জাতি অনুর্ব্বর মরু প্রদেশে বাস করে। খাদ্যাভাব তাতারদিগের নিত্য সহচর। অভাবের তাড়নায় তাতার এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বিচরণ করিয়া থাকে। এইজন্য উহাদিগের মধ্যে পুত্র সন্তানের আধিক্য। পার্ব্বত্য জাতিদিগেরও খাদ্যাভাব সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে। উহাদিগেরও পুত্র সন্তান অধিক জন্মে। স্ত্রীলোকের অভাব হেতু ঐ সকল জাতির মধ্যে বহু পুরুষের এক পত্নী বিবাহ প্রথা স্থান পাইয়াছে।

চীনদেশ অতি প্রাচীন কাল হইতে নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে। চীন অতিশয় সমৃদ্ধিশালী দেশ তবু সেই দেশে, পুরুষ হইতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নাই। ইহার কারণ চীনদেশ পাশ্চাত্য জাতিদিগের ন্যায় ভোগবিলাসী নহে। উহারা অতি সাধারণ খাদ্য আহার করে এবং ইন্দ্রিয় সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশেষ মিতাচারী।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

ময়মনসিংহের কবি-কাহিনী।

কবি গোবিন্দ ঠাকুর ও কিঙ্করশীল।

গোবিন্দ ঠাকুর ও কিঙ্করশীল উভয়েরই নিবাস ছিল রামেশ্বরপুর। রামেশ্বরপুর, নেত্রকোণা মহকুমার ৮।৯ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। কাব্যরসোন্মত্ত এই কবিদ্বয়ের মধ্যে একটা পবিত্র প্রীতির বন্ধন ছিল। সাংসারিক কার্য্যের অবসরে উভয়ে একত্র হইয়া প্রায়শঃই কাব্যালোচনা করিতেন।

গোবিন্দ ঠাকুর ছিলেন লগ্নাচার্য্য ব্রাহ্মণ। গীত বাদ্যে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। বেহালা, সারিন্দা, সানাই, এস্রাজ, খোল, ঢোল, ঢুলুক, খমক, খঞ্জরী, সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে তাঁহার সম্পূর্ণরূপ দখল ছিল।

কবিওয়ালাদিগের মধ্যে কণ্ঠস্বরে গোবিন্দ ঠাকুর ছিলেন সকলের উপরে। তাঁহার কবিত্বশক্তি অপেক্ষা আওয়াজের প্রশংসা ছিল বেশী। রাগ-রাগিণীর উচ্চতায়, মধুরতায় গোবিন্দ ঠাকুরের মত সুকণ্ঠ গায়ক বর্ত্তমানে দেখা যায় না। রাগিণীর গুণে তাঁহার ছড়া পাঁচালী অতি মধুর হইত। সুমিষ্ট বাউল সুরে পাঁচালী গাইয়া কবি গোবিন্দ ঠাকুর সভায় শ্রোতৃবর্গকে এক অতুলানন্দের রাজ্যে লইয়া যাইতেন। কবি গানই ছিল তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের অবলম্বন।

৮।৯ বৎসর হইল গোবিন্দঠাকুর মায়িক জগতের অন্তরালে চলিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার তিন পুত্র বর্ত্তমান; গুরুদাস, পরেশনাথ ও জীতেন্দ্র। ইঁহারা কেহই আর পিতৃবিষয়ের অধিকারী হইতে পারিলেন না।

আমাদের দেশ প্রসিদ্ধ অনক্ষর কবি, রামু-রামগতির সঙ্গে এবং রামদয়াল নাথের সঙ্গে প্রায়শঃই গোবিন্দ ঠাকুরের কবির পাল্লা সংঘটিত হইত। আমিও অনেকবার গোবিন্দ আচার্য্যকে প্রতিপক্ষ রাখিয়া কবিগান করিয়াছি। তিনি কবিগান করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুই সঞ্চিত রাখিয়া যান নাই।

"তালের কড়ি ফালে যায়।"

গীত বাদ্যে পারদর্শী ছিলেন বলিয়া এবং আপন সচ্চরিত্রতার গুণে স্থানীয় ব্রাহ্মণ-ভদ্রলোক সকলেই গোবিন্দঠাকুরকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন। এই পল্লী কবি, রামেশ্বর পুরের

রায় মহাশয়দের একজন স্নেহের পাত্র ছিলেন। তিনি সারাজীবন সুখ ভোগ করিয়া শেষ জীবনে কিছু কষ্ট ভোগের পর বার্দ্ধক্যের প্রথম পাদে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন।

কিঙ্কর শীল গোবিন্দ ঠাকুরের কাব্য জগতের এক জন বন্ধু। কিঙ্কর কবিকে কোন কবির আসরে উঠিয়া ছড়া পাঁচালী গাইতে দেখিনাই। কিন্তু তাঁহার রচিত অনেক গীত ও গীতের জওয়াব, টপ্পা শুনিয়াছি। গোবিন্দ ঠাকুরের সঙ্গে কিঙ্করের অনেক সময় ঘরে বসিয়া বৈঠকী ভাবে টপ্পার কাটা কাটি ও সমস্যা পূরণাদি হইত। তাহাতে বুঝা যাইত, কিঙ্কর শীল এক আওয়াজ ছাড়া অন্য কোন অংশে গোবিন্দ ঠাকুরাপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। বরং অনেক স্থলে কিঙ্করের গীতে টপ্পায় কবিত্বের ঝঙ্কার অধিক পরিমাণে পরিস্ফুট বলিয়া বোধ হইত। কাব্য রসে কিঙ্করের বিলক্ষণ বোধাধিকার ছিল।

নিম্নে কবি গোবিন্দ ঠাকুর ও কিঙ্কর শীলের কয়েকটি গীত-কবিতা সন্নিবেশিত করা হইল। আশা করি তৎ পাঠে পাঠকগণ এই উভয় কবির কাব্য রসাধিকারিত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

কবি গোবিন্দ ঠাকুরের
ডাক মাল্‌সী।

দুর্গা আমার দুঃখ হরা, ভবদারা, পরাৎপরা মহেশ মোহিনী।
তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্রী জগজ্জননী॥
সুরা সুর গন্ধর্ব্ব নরে, তোমার বন্দনা করে,
দিবা যামিনী, তুমি সারাৎসারা বহু রূপা শক্তি সনাতনী॥

(অন্তরা।)

মা তোমার মায়া জালে, কালে কালে জড়ায়ে হয়েছি আবদ্ধ।
ছয় জনে ছয় দিকে টানে, কেহইত না কথার বাধ্য॥
মরণ কথা হয় না স্মরণ, মা তোমার মায়ার কারণ,
মন বারণ মানে না বারণ, হয়েছে অসাধ্য,
অধীন গোবিন্দ কয়, যাবার সময়,
পাইযে তোমার শ্রীপাদ পদ্ম॥

কবি কিঙ্কর শীলের
ডাক মাল্‌সী।

শঙ্করি! ও মা শুভঙ্করি! কি করি মা! তরাতে এবার। (মাগো) যে দেখি অকূল, পাইব যে কূল, এমন ভরসা নাই মনে আমার॥

দিলে তুমি চরণতরী, তবে যদি ভবে তরী, কৃপা করি কর মা নিস্তার, (আমার) আর কি আছে বল, পারের সম্বল, ভৈরবি! কেবল ভরসা তোমার॥

(অন্তরা।)

চরণ পাবার আশা আমার আছে কি? (বাবা) ভোলা নাথকে চরণ দিলে আমাকে মা দিয়ে ফাঁকি।

(বাবা) ভাঙ্ খেয়ে বুক পেতে আছে, তুই থাকিস্ মা তাঁরি কাছে, আমি মিছে মা বলে ডাকি, (দিলে) শঙ্করে শঙ্করী চরণ, কিঙ্করে দোষ করেছে কি?

(টপ্পা।)

হনুমন্ত নামটি আমার পবন নন্দন। শক্তি শেলের আঘাতে পড়্‌লেন লঙ্কাতে, আমি আইলাম, ঔষধের কারণ।

আপনার দর্শনেতে যাত্রা সিদ্ধি, সিদ্ধি হবে মনস্কাম। জিজ্ঞাসি তপস্বী ঠাকুর, আপনার কিবা নাম?

অতিথি যেনে মোরে বল্‌তেছেন সমাদরে কিছুকাল করিতে বিশ্রাম,—আমি বিশ্রাম কল্লে পরে, নষ্ট হবে রামের কাম।

গোবিন্দঠাকুর হনুমান হইয়া কপট তপস্বী কিঙ্কর কাল-নিমিকে টপ্পার চিতানে পারাণে আপন পরিচয়, আরআগমনের কারণ জানাইলেন। মিলের পদে সাধু দর্শনের ফল জানাইয়া, মহড়ায় তপস্বীর নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

ভক্তি শাস্ত্রে লিখিত আছে, সাধু সন্ন্যাসীর নাম জিজ্ঞাসা অপরাধ। অন্যের নিকট শুনিয়া লইতে হয়। তবে কবির (কবিগানের) খাতিরে গোবিন্দঠাকুর পরমভক্ত হনুমান হইয়াও সেই সাধু প্রথার অন্যথাচরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অন্তরার পদে কবি, তপস্বীর সৌজন্য স্বীকার করিয়াবলিতেছেন আমি বিশ্রাম করিলে প্রভু রাম চন্দ্রের কার্য্য নষ্ট হইবে।

কিঙ্কর উত্তর করিলেন।

টপ্পা।

রামগিরি, নামটি ধরি জাতিতে ব্রাহ্মণ। যদিও তুমি বানর হও, আমার পক্ষে কমি নও, অতিথ্ রূপে তুমি নারায়ণ। (আমার) সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট হবে তুমি গেলে অভুক্ত। দোহাই তোমার, ফল খেয়ে যাও হনুমান ভক্ত॥

দৈবে আমার শুভ যোগ, না করিলে জলযোগ, থাকে না নিজের মাহাত্ম্য, (তোমার) কার্য্য নষ্ট হইতে পারে, মন্ হইলে মোর বিরক্ত॥

কবি কিঙ্কর শীল, ছদ্ম বেশী কালনিমির ভাব লইয়া বলিতেছেন, "যদিচ তুমি জাতিতে বানর হও, তথাপি অদ্য আমার পক্ষে সাক্ষাৎ নারায়ণ। কারণ; তুমি অদ্য আমার আশ্রমের অতিথি। হে ভক্ত হনুমান! তোমাকে দোহাই দিয়া বলিতেছি, কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া যাও। দৈবে আমার শুভ যোগ উপস্থিত। নতুবা তোমার মত পরম ভক্ত এখানে আসিবে কেন? অত্রাবস্থায় তুমি আমার আশ্রমবাটীতে কিছু না খাইয়া গেলে নিজের মহত্ব নষ্ট হয়।,, এই উক্তি গুলি কালনিমির কাপট্যের আবরণ ভিন্ন কিছুই নহে। কবি কালনিমি মিলের পদে কিছু ভয় দেখাইয়া বলিলেন, "আমার মন বিরক্ত করিয়া গেলে তোমার কার্য্য নষ্ট হইতে পারে।" কার্য্য নষ্ট হইবে শুনিয়া রামগতপ্রাণ হনুমান অবশ্যই আমার অনুরোধ রক্ষা করিবে, কবি কালনিমির ইহাই মনের ভাব।

এখন কিঙ্করের পালা। কিঙ্কর রাবণ পত্নী মন্দোদরী হইয়া কবি গোবিন্দ ঠাকুরকে সুর্পণখার স্থলে রাখিয়া প্রশ্ন করিতেছেন।

টপ্পা।

মন্দোদরী নামটি আমার দানব দুহিতা। তুমি মহারাজের ভগিনী, সম্বন্ধে হও ননদিনী, দিন রজনী কই তোমার কথা।

তোমার মত গুণের ননদ অনেক তপস্যাতে পাই। বল্ শুনিগো ঠাকুর কন্তে, কিজন্তে তোর নাকের আগানাই॥

জিনি রম্ভা উর্ব্বশী, তুমি এমন রূপসী, লঙ্কাপতি রাবণ তোমার ভাই, দেখে তোমার এ দুর্দ্দশা লজ্জা রাখার পাই না ঠাই॥

চির পরিচিতা ননদিনীর নিকট "মন্দোদরী নামটি আমার" বলিয়া পরিচয় দিবার তাৎপর্য্য আর কিছুইনা, এখানে কবি গানের রীতি রক্ষা করা হইয়াছে। এইরূপ স্পষ্ট পরিচয় না দিয়া প্রশ্ন টপ্পা করিলে, সভাস্থ সকলে কেবল টপ্পা শুনিয়া বুঝিতে পারেন না যে উনি কে হইয়া বলিতেছেন। এই টপ্পার আগা গোড়া প্রায় সমস্তই শ্লেষ ব্যঞ্জক বিদ্রূপের ভাবে পরিপূর্ণ।

এই প্রকার টপ্পার উত্তর করা সহজ নহে। কারণ, সত্য ঘটনা প্রকাশ করা যাইতে পারে না। বাধ্য হইয়া সত্য গোপনপূর্ব্বক মিথ্যা বলিতে হইবে। সেই মিথ্যাও সভাস্থ শ্রোতৃবর্গের গ্রাহ্য হওয়া চাই। গোবিন্দ ঠাকুর সত্যে মিথ্যায় জড়াইয়া উত্তর করিলেন।—

বল্ব কি বৌ, দুঃখের কথা, শুভাশুভ কর্ম্মের ফল। পঞ্চবটী কাননে, শ্রীরামের ভাই লক্ষ্মণে, আমার প্রতি করেছিল বল॥

আমি সতীত্ব করেছি রক্ষা, তার বদলে দিছি নাক। রাঙ্ বদলে, সোণা পাইলে, বাজুক না কলঙ্কের ঢাক॥

কর্ম্ম বলে দেবার্চ্চন, কর্ত্তে পুষ্প আহরণ, গিয়াছিলাম জুটে পাইল ফাঁক্।—তুমি মাঝ ঘরে বসিয়া থাকো, তাইতে তোমার এত জাঁক্॥

মন্দোদরীর মিঠা কড়া বিদ্রূপে সুর্পণখা হাড়ে হাড়ে জলিয়াছিল। কাটা ঘায় নুনের ছিটা পড়িয়া গেল। তাই টপ্পার শেষ পদে সুর্পণখার ধৈর্য্যচ্যুতি দেখা যাইতেছে। তুমি মাঝ ঘরে বসিয়া থাকো, তাইতে তোমার এত জাঁক।

সুর্পণখা আপন দোষ গোপন করিয়া, নাক দিয়া, সতীত্ব রক্ষা করিয়াছেন, মন্দোদরীকে ইহাই জানাইলেন। রামের ভাই লক্ষ্মণ বল প্রয়োগে তাহার সতীত্ব রত্নাপহরণ করিতে চাহিয়াছিল, তিনি (সুর্পণখা।) তাহাতে সম্মত না হওয়ায়, রাগে লক্ষ্মণ তাহার নাক কাটিয়া দিয়াছে। সত্য গোপন করিয়া সুর্পণখা এই প্রকার মিথ্যা বলিয়া মন্দোদরীর নিকট আপন মাতবরী রক্ষা করিলেন।

এই পল্লী কবিদ্বয় সময় সময় পদ পুরণ লইয়া আনন্দ-যুদ্ধ করিতেন। অর্থাৎ কোন একটি শেষ পদ একজনে বলিলে আর এক জনে তাহার পূর্ব্বাংশ রচনা করিয়া সেই কথিত শেষ পদের সঙ্গে মিলাইয়া দিতেন। যথা,—গোবিন্দ ঠাকুর শেষ পদ দিলেন, "মানিক পীরের পুথি।"

কিঙ্কর পূর্ব্বাংশ গড়িয়া পুরণ করিলেন—

রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত গীতা।
যার মধ্যে স্ত্রী—সাবিত্রী, লক্ষ্মী, দুর্গা, সীতা।
কবি গাইতে তাই চাই, আর চাই থুঁথি।
চাঙ্গে তুল্যা থও নিয়া তোমার মানিকপীরের পুথি॥

কিঙ্কর শেষ পদ দিলেন,
"সিধা সাদা দুই আনা।"

* থুঁথি অর্থ এখানে—মুখ।

কোন বাড়ী শ্রাদ্ধ হইলে নিমন্ত্রণে যাই।
দধি চিড়া চিনি সন্দেশ পেট ভরিয়া খাই॥
বিদায় হইয়া আসার কালে পাই কিছু দক্ষিণা
বেশী কিছু না পাইলেও সিধা সাদা দুই আনা॥
গোবিন্দঠাকুর কহিলেন—
ইকড় তলী বান্যা। (বর্ষা)
কিঙ্কর পূরণ করিলেন—
"পাঞ্জী লইয়া গনক ঠাকুর যান বাড়ী বাড়ী।
পাছে পাছে ধাইয়া ছুটে পাড়ার পুলা পুড়ী॥
কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে ঠাকুরের ঠাই।
এবার কেমন বর্ষা হবে—ঠাকুর বলেনচাই?
বুড়া ঠাকুর উত্তর করেন কিছু কাশ্যা ২। (কাশিয়া।)
পাঞ্জীর মাঝে লেখে এবার "ইকড়তলী বান্যা।"
কিঙ্কর কহিলেন,—
"তাঁরাই বটে সাধু লোক।"
গোবিন্দঠাকুর পূরণ করিলেন—
"সকলে সমান জ্ঞান, নাহি আত্ম পর।
অহঙ্কার অভিমান শূন্য কলেবর॥
দীনহীন দরিদ্রের বুঝে মনের দুখ।
সংসারের মাঝে—তাঁরাই বটে সাধু লোক।

গোবিন্দ ঠাকুরের গীত।

চিতান,—শ্রীরাধার মানের দায়ে,
বিরহে কাতর হয়ে, বাঁকা বংশী ধারী।
পারাণ,—বৃন্দার উপদেশে, নবীনা নাগরীবেশে,
এসে মান কুঞ্জে উদয় হইলেন, বন্ বিহারী॥
লহর,—তখন হরিকে কালিকা জ্ঞানে,
ভ্রান্ত হয়ে গোপীগণে, প্রণাম করে পায়,
সেই রূপের প্রভায়, সবে মোহ যায়,
গল লগ্নী কৃত বাসে, অতি মৃদু মৃদু ভাষে,
গোপীগণ কয় দেবীর পাশে, স্থান দিওগো রাঙ্গা পায়॥
মিল,—তোমার যে সব সঙ্গিনী, ডাকিনী যোগিনী,
কোথায় বল শুনি? কও শুনি শিবের সঙ্গে কেন ছাড়া হইলে।
মহড়া,—এগো মহেসানী, হইয়ে উদাসিনী, কেন এলে
এ গকুলে?

ধুয়া,—তুমি ক্ষণ কাল নাহি ছাড়, শিবের সঙ্গ, তুমি মহাদেবী
মহাদেবের অর্দ্ধ অঙ্গ, আজ কিভাব তাও বুঝি না, কয়েছ
করে বীণা, হইয়ে দীনা ক্ষীণা কাঁদছ রাধা বলে।
খাদ,—তোমার প্রাণেশ্বর, মহেশ্বর কৈ রেখে এলে?
লহর,—তুমি ত্রিলোচনী দুঃখ হরা, মুক্ত কেশী অসিধরা,
জগতজননী, তুমি শিব রাণী শিব ঘরনী, আজ কেন গো
হরাঙ্গনা, অসিছেড়ে ধরলে বীণা, (বলে) কৃপাকর শ্রীরাধিকে
কাঁদছ অসিত বরনী॥
ঝুমুর,—জানি ভয় পেয়ে কালিকে লোকে তোমায় ডাক্‌লে
বিপদ থাকে না। তুমি মুক্তিদাত্রী, জগৎকর্ত্রী, তোমার কেন
এ বিড়ম্বনা। নমস্তে সর্ব্বানী, ঈশানী ইন্দ্রানী, নমোনমঃ
ত্রি-নয়না, তুমি উগ্রচণ্ডা উমা, ভৈরবীভীমা, তোমার নামে
ঘুচে ভব যন্ত্রনা।

কবি কিঙ্করের গীত।

চিতান,—করে চন্দ্রালয় কৃষ্ণ চন্দ্র নিশি গত।
পারাণ,—রাধার কুঞ্জে এসে, ভোরের বেলায় কাঙ্গাল বেশে,
দাড়াইলেন শ্যাম, চোরের মত।
লহর,—দেখে শ্রীরাধার মান, কম্পবান,
হলেন শ্যাম রায়, পতিত ধরায়,
মানের দায়, হায়! হায়!! গো,—সেধে কেঁদে দেখলেন
কত, মানিনীর মান হয়না হত,
যুক্তি কল্লেন রাধাকান্ত ধর্ত্তে রাধার পায়।
মিল—তখন শ্রীহস্তে শ্যাম রায়, কাতরে ধর্ত্তে যায়, চরণকমলে।
তাই দেখে বৃন্দা বলে রাধার কাছে।
মহড়া—চরণ ঢেকে রাখ, মনোচোরার ভঙ্গী দেখ, ধূলায়
পড়ে কান্তে আছে॥
ধূয়া,—পীত ধরার অঞ্চল ঐ দেখ গলে বেধে, বলে ত্রাহি ত্রাহি
কৃপাকুরু এগো রাধে, মানের দায় শ্যাম নীল পদ্ম, রাই
তোরে কর্ত্তে বাধা, কর পদ্মে তোর চরণ পদ্ম ধর্ত্তে গেছে॥
খাদ—চেয়ে দেখনা এগো রাধে, শ্যামচাঁদের কি দায়
ঘটেছে॥
লহর,—ঐ দেখ ধূলায় লুণ্ঠিত হয়ে কান্দে গুণ ধাম, শ্যাম রাধা
রাধা নাম জপে অবিরাম, হায় গো, মান দেখে তোর
অখণ্ডিত, শঙ্কায় হয়ে শঙ্কিত, রাহু গ্রস্ত শশীর মত, বিপদ
গ্রস্ত শ্যাম॥

নূপুর।—ধনী এই হইল তোর মানে। সে যে পড়েছে তোর চরণ তলে, যারে ইন্দ্র চন্দ্রে মানে॥
কাজকি শ্যামের অপমানে, ক্ষমাদে তোর দুর্জ্জয় মানে, মোর কথা যাইনে, সে যে হৃদয়েরিধন, কালীয়া রতন, অযতনে তারে আর কান্দাস্‌নে॥

শ্রীবিজয় নারায়ণ আচার্য্য।

শিশুর বুলি।

শিশুর প্রথম ফুটছে কথা
কচি রাঙ্গা ঠোটে;
কি দিয়ে যে কইবে, কিছু
ভাবে না সে মোটে।
আধ আধ কতই বুলি,
বলে সে যে পরাণ খুলি;
প্রতি কথায় তাহার মুখে
কতই মধু ছোটে।
কইতে গিয়ে সকল কথা
আধেক বুলি নিয়ে,
নানান্‌ ছবি আকছে মনে
বুলির তুলি দিয়ে।
কথার রঙে ডুবিয়ে রাখে,
মানুষের সুখ দুঃখটাকে
তাহার প্রতি হাস্যরসে
মধুপ মধু লোটে।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ।

প্রাচীন ভারতের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য।

প্রতীচ্য দেশ সমূহ যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, যখন তাহারা কাঁচা মাংস ভক্ষণ করিত, উলঙ্গ দেহে বৃক্ষ-কোটরে অবস্থান করিত, তাহার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এই পরাধীন ভারতবর্ষই কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া ছিল। ভারতের উর্ব্বর ভূমিতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নানা বিধ শস্য উৎপন্ন হইত। ভারতের কৃষি কার্য্যের প্রণালী দৃষ্টে তৎ পরবর্ত্তী অন্যান্য বৈদেশিক জাতি সমূহ তাহাদের দেশে ঐ প্রথা অবলম্বন করিয়াছিল। যে ভারত কৃষি-সম্পদে জগতে গৌরবান্বিতা ছিল, যে ভারত "স্বর্ণ প্রসূ" বলিয়া জগতে আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল, নিয়তি-নেমির আবর্ত্তনে সেই ভারতবর্ষ আজ দৈন্যের শেষ সীমায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী তাহার বক্ষোপরি সগর্ব্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া বিরাজ করিতেছে। এই ভারতের বহু লক্ষ লোক দু'মুঠা অন্নের প্রত্যাশায় আজ শত শত যোজন পথ দূরে সাগর ডিঙ্গাইয়া গিয়া পরদেশে শ্রম সাধ্য ও নিকৃষ্ট কার্য্য করিতে বাধ্য হইতেছে। এবং সেরূপ করিয়াও তথায় তাহারা মনুষ্যোচিত ব্যবহার প্রাপ্ত হইতেছেনা।

বৈদিক যুগ হইতেই যে ভারতবাসীরা কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে অভ্যস্ত ছিল, এই প্রবন্ধে আমরা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে ঋষিরা দেবতা গণের নিকট খাদ্য শস্য, পশুর খাদ্য, গোচারণ ভূমি, কৃষি কার্য্যের উপযোগী বস্ত্র সমূহ ও সুপেয় জলের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছেন। ঐ গ্রন্থের এক স্থানে লিখিত আছে "কৃষি-কার্য্য অবলম্বন কর। তাহা হইতে ক্ষান্ত হইওনা।" অথর্ব্ববেদে তণ্ডুল, কলাই ও তিলের উল্লেখ আছে।

প্রাচীন কালে পৌরহিত্য, যুদ্ধ বিদ্যা এবং বাণিজ্য বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা প্রদান করা হইত। কি প্রকারে এবং কোন্‌ সময়ে বীজ বপন করিতে হয়, ভূমির উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা নির্ণয়, কৃষি কার্য্যের সুবিধা ও অসুবিধা নির্ণয় এবং শস্য উৎপাদনের প্রাচুর্য্যতা বিষয়ে কৃষিজীবী শ্রেণীর প্রত্যেক কে সুদক্ষ হইতে হইত। একথা মনু-সংহিতায় বর্ণিত আছে।

হিন্দুরাই প্রথমতঃ প্রবর্ত্তন করেন যে এক ক্ষেত্রে পর্য্যায় ক্রমে শস্য উৎপাদন করিতে হয়। তাঁহারাই ধান্যের পুনরায় রোপন করা বিষয়ে অবগত ছিলেন। খৃষ্ট পূর্ব্ব ২৭০ অব্দে গ্রীকেরা দেখিয়া গিয়াছেন যে তৎ কালে ভারতে কৃষি জীবীর সংখ্যাই অধিক ছিল এবং তাহারা উৎকৃষ্ট কৃষক

ছিল। Dr. Roxborough বলেন ভারতবাসীরা এক বৎসর এক ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদন করিয়া তাহার ৩য় বা ৪র্থ বৎসর পুনরায় সেই ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদন করিত, তাহাতে ভূমির উৎপাদিকা শক্তিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত। ভূমির শক্তি সম্বন্ধে ভারতীয় কৃষকগণের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।

মনু-সংহিতায় উক্ত আছে যে যদি কৃষকের ত্রুটীতে ভূমি নষ্ট হয় অথবা সে উপযুক্ত সময়ে শস্য বপন করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে দণ্ড স্বরূপ তাহাকে রাজস্বের দশ গুণ অধিক শস্য প্রদান করিতে হইবে। উক্ত গ্রন্থে নীল, চিনি, কার্পাস ও অন্যান্য কৃষি-জাত দ্রব্যের উল্লেখ আছে। তৎকালে পশুদিগের প্রতি বিশেষ যত্ন লওয়া হইত এবং গোচারণ ভূমি নির্দ্দিষ্ট থাকিত।

Ma Twa Sin খৃষ্ট পূর্ব্ব ১২৬ অব্দে ভারতবর্ষ পরিদর্শন করেন। তিনি লিখিয়াগিয়াছেন ভারতবর্ষের অধিবাসীর সংখ্যা অত্যধিক; ইহার ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা। আর্দ্র ভূমিতে বৎসরে চারি বার শস্য উৎপন্ন হয়। যবই অধিক উৎপন্ন হয় এবং ইহার বৃক্ষ উষ্ট্রের সমান উচ্চ হয়।

Fa Hian ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের বহু নগর পরিদর্শন করেন। তিনি লিখিয়াছেন—এই রাজ্য বড়ই উন্নত; ইহার অধিবাসীর সংখ্যাও প্রচুর। মধ্য ভারত, অযোধ্যা ও বেহার প্রদেশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে ইহার অধিবাসীর সংখ্যা অত্যধিক এবং তাহারা সমৃদ্ধশালী! প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত বৈশালী প্রদেশ ধন-জন-সমন্বিত; ইহার অধিবাসী বৃন্দ সন্তুষ্ট-চিত্ত।

কার্পাস ভারতেই উৎপন্ন হইত। ঋগেদে কার্পাস সূত্রের উল্লেখ আছে, যদিও তৎকালে বৃক্ষের ত্বক হইতেও বস্ত্র প্রস্তুত হইত। মনু-সংহিতায় বহু স্থানে কার্পাস বস্ত্রের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত শুধু কার্পাস সূত্রেই নির্ম্মিত হইত।

খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪৪৫ অব্দে Herodotus ভারতে কার্পাস দেখিয়াছিলেন। খৃষ্ট পূর্ব্বে ৩২৭ অব্দে Nearchus লিখিয়াছেন—ভারতবাসীরা কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্র ব্যবহার করিত। মছলী পটনে মছলীন প্রস্তুত হইত। ঢাকার নিকটবর্ত্তী সোনারগাঁও ও মছলীন প্রস্তুত হইত। প্রাচীন কাল হইতে ঢাকায় প্রস্তুত ক্যালিকো (Calicoes) ও অন্যান্য কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্র আরব দেশে রপ্তানী হইত।

প্রাচীনকালে বহুল পরিমাণে রেশম নির্ম্মিত বস্ত্র এদেশে ব্যবহৃত হইত। রাজা, রাণী, সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকগণ ও মহিলাবৃন্দ ধর্ম্মানুষ্ঠানে রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। বিবাহের উপহারেও রেশমী বস্ত্র ব্যবহৃত হইত। আসাম প্রদেশে রেশম উৎপন্ন হইত এবং তাহা নানাস্থানে রপ্তানী হইত। Aristotle এর আমলে ভারতবর্ষ হইতে রেশম গ্রীসে রপ্তানী হইত। আসামবাসীরা একপ্রকার সুদৃঢ় রেশম নির্ম্মিত তাঁবুর বস্ত্র প্রস্তুত করিত। কথিত আছে Julius Cæsar এই বস্ত্র স্বদেশে নিয়া গিয়া তাহা দ্বারা তিনি তাঁবু প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। Tavernier বলেন—তিনি যখন ভারতবর্ষ পরিদর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন তখন তিনি বঙ্গদেশে প্রস্তুত রেশমী বস্ত্র—গুজরাট, আহম্মদাবাদ এবং মিরাটে দেখিয়াছিলেন।

মনু-সংহিতায় পশমের উল্লেখ আছে। শাল ও অন্যান্য দ্রব্য নির্ম্মাণে পশম ব্যবহৃত হইত। মহাভারতের সভা পর্ব্বে বিড়াল ও ছাগলের লোমে প্রস্তুত শাল ও বস্ত্রাদি রাজা যুধিষ্ঠিরকে উপঢৌকন প্রদান করার বিষয় বর্ণিত আছে। কাম্বোজের অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক রাজা যুধিষ্ঠিরকে শাল উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল। সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী প্রদেশবাসীরা তাঁহাকে নানা প্রকার কম্বল উপহার দিয়াছিল। বৌদ্ধদিগের নিদ্রার পরিচ্ছদ মেষ ও কুকুরের পশম হইতে নির্ম্মিত হইত।

মেষ, ছাগ, মহিষ, গণ্ডার প্রভৃতি যাহা বলির জন্য বধ করা হইত, উহাদিগের চর্ম্ম হইতে চর্ম্মকারেরা নানা দ্রব্য প্রস্তুত করিত। হিন্দু চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার্থীরা চর্ম্ম ও মৃত পশুর দেহ শিক্ষার্থ ব্যবহার করিত। কাম্বোজের অধিবাসীরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে বন্য মার্জ্জার এবং গর্ত্তের ভিতরে যে সকল জন্তু অবস্থান করে তাহাদের চর্ম্ম উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিল। দ্বিজ গণের পরিচ্ছদের নিমিত্ত মৃগ চর্ম্ম ব্যবহৃত হইত। Periplus বলেন আসাম হইতে চট্টগ্রামে চর্ম্ম রপ্তানী হইত। রোমকেরা আসাম হইতে আনীত গণ্ডার ও মহিষের চর্ম্মে ঢাল নির্ম্মাণ করিত। কচ্ছ, সিন্ধু, প্রাগজ্যোতিষ এবং কাম্বোজের অধিবাসীরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে অশ্ব উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিল। পূর্ব্বদেশ—বঙ্গদেশ ও আসাম হইতে রাজা যুধিষ্ঠিরকে হস্তী উপঢৌকন প্রদত্ত হইয়াছিল। ঐ সকল হস্তীর যুদ্ধে দক্ষ ছিল। তৎকালে "হস্তীবিদ্যা" সামরিকগণের শিক্ষণীয়

নিযুক্ত ছিল। Rawlinson বলেন পারস্য দেশে গজারোহী সৈন্যগণ সকলের অগ্রভাগে অবস্থান করিত; ঐ সকল হস্তী ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত হইত। ভারতবর্ষ হইতে বস্ত্রাদি—জেরুজালেম, গ্রীস ও মিসরে রপ্তানী হইত।

তণ্ডুল এবং যবের পরেই চিনি এদেশে বহুকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। Morewood বলেন যদিও আরব দেশবাসীরা ইক্ষুর চাষ করিত এবং ইক্ষুজাত চিনি রোম নগরে রপ্তানী করিত, তবুও আরবদেশবাসীরা চিনি প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষার নিমিত্ত ভারতবাসীগণের নিকট ঋণী ছিল। এদেশের প্রস্তুত চিনি গ্রীসে ও রোমে ব্যবহৃত হইত। ঐ সকল দেশে ইক্ষু উৎপন্ন হইত না। আমাদের দেশের চিনিকে গ্রীক ভিষকেরা "ভারতীয় লবণ" বলিত।

প্রাচীন হিন্দুগণ রঞ্জন বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। মনুসংহিতায় নীল হইতে রং প্রস্তুত করার উল্লেখ আছে। Bancroft বলেন বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে নীল ব্যবহৃত হইত। ভারতবর্ষ হইতে নীল আরব, ট্রয় ও মিসরে রপ্তানী হইত। Mill বলেন হিন্দুদিগের প্রস্তুত রং সৌন্দর্য্যে, ঔজ্জ্বল্যে এবং স্থায়ীত্বে বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু হায়! বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে স্থায়ী রং প্রস্তুত হয় না। স্থায়ী রংএর জন্য ভারতবাসীকে বিদেশীর দ্বারস্থ হইতে হয়!

রত্ন প্রসবিনী ভারতভূমি প্রাচীনকালে কিরূপ ঐশ্বর্য্যশালিনী ছিলেন তাহা Tavernier, Hamilton, Heyne প্রভৃতির লিখিত বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায়। তৎকালে গোলকুণ্ডায় হীরকের খনি ছিল। দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বদিকে প্রচুর পরিমাণে হীরক প্রাপ্ত হওয়া যাইত। Malteburn বলেন জগতের কুত্রাপি হীরকের এত প্রাচুর্য্যতা নাই যেরূপ বঙ্গদেশ, বুন্দেলখণ্ড, এলাহাবাদ, উড়িষ্যা, বেরার, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা এবং কর্ণাট প্রদেশে হীরকের প্রাচুর্য্যতা।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে লৌহের খনি ছিল। ফিনিসিয়াবাসীরা ভারতবর্ষ হইতে লৌহ নিয়া কার্য্য করিত। উৎকৃষ্ট ইস্পাত ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইত। রাজা পুরু আলেকজাণ্ডারকে ৩০ পাউণ্ড (১৫ সের) ইস্পাত উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন। মিশর দেশের মন্দির সমূহ ভারতবর্ষীয় লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষের নরপতি, রাজা যুধিষ্ঠিরকে লৌহ দ্বারা এবং হীরকখচিত তরবারী উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন। ভারতে স্বর্ণের খনিও বিদ্যমান ছিল; কোনও পার্ব্বত্য জাতীয় রাজা যুধিষ্ঠিরকে স্বর্ণ উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিল।

প্রাচীন হিন্দুগণ নানাবিধ শিল্পে পারদর্শী ছিলেন। মনুসংহিতায় ঝিনুক, শৃঙ্গ, গজদন্ত প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যের উল্লেখ আছে। সূত্রধর রাজমিস্ত্রি, চিত্রকর লেখক, দরজি, কর্ম্মকার এবং স্বর্ণকারের বিষয়ও মনুসংহিতায় উল্লেখ আছে। প্রাচীন হিন্দুরা সুদক্ষ ভাস্কর ছিলেন। তাঁহাদের প্রস্তুত বহু প্রস্তর মূর্ত্তি ভারতের নানাস্থানে ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। স্থপতি বিদ্যায়ও তাঁহারা যথেষ্ট নিপুণ ছিলেন। নাগপুরে অবস্থিত ২২ ফুট প্রস্থ একটী খিলান আছে। ইহার কোনও অবলম্বন নাই; পাহাড় কাটিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে Captain Mackintosh ইহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। Sir W. Jones বলেন যদিও হিন্দুদের শিল্প শাস্ত্রে ৬৪ কলার উল্লেখ আছে, তবুও আবুলফজল বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন যে হিন্দুরা তিনশত প্রকার শিল্প ও বিজ্ঞানের বিষয় অবগত ছিলেন। কাল-ধর্ম্মে এক্ষণে ইহার অধিকাংশই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে রাজা যুধিষ্ঠির যে উপঢৌকন সমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে উৎপন্ন হইত। ইহাতে অনুমিত হয় ইন্দ্রপ্রস্থ (দিল্লী) হইতে ঐ সকল স্থানে যাতায়াতের রাস্তা ছিল। ঋগ্বেদে বৃহৎ রাস্তা ও ছোট পথের উল্লেখ আছে। মনুসংহিতায় শকট, নদী, রাজপথ ও সেতুর শুল্কের বিষয় উল্লেখ আছে। গ্রীকেরা সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী তক্ষশীলা হইতে লাহোরের মধ্যদিয়া গঙ্গানদীর তীরবর্ত্তী পাটলিপুত্র পর্য্যন্ত রাস্তা দেখিয়াছিলেন।

Colonel Tod বলেন পুরাকাল হইতেই উত্তর ভারত সমৃদ্ধিশালী ছিল। পঞ্জাবে ঘনবসতি ছিল এবং অনেকগুলি সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। Pliny বলেন অন্ধ্র রাজগণ অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। তাঁহাদের দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত ৩০টী নগর ছিল। তাঁহাদের একলক্ষ সৈন্য এবং এক সহস্র হস্তী ছিল। Dr Hunter বলেন ঐ সময়ে কলিঙ্গ বাণিজ্যের প্রধান স্থান ছিল। পর্ব্বত-গাত্রের শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে যে তৎকালে জাহাজে বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। [illegible]

আক্রমণের সময়ে কাবুলে বহু হিন্দু অবস্থান করিতেন। তাঁহারা, তথায় মসলার বৃহৎ ব্যবসায় করিতেন।

অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে আল্লালেয়া পশ্চিমভারতের রাজধানী ছিল। ইহার ৮৪টী বাজার ছিল; তন্মধ্যে বরোচ একটী বাজার, যাহাকে ভারতের ট্রয় বলা হইত। এই ৮৪টী বন্দর হইতে প্রত্যহ একলক্ষ মুদ্রা শুল্ক আদায় হইত। পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতের মধ্যে দেশীয় ক্ষুদ্র জাহাজ দ্বারা বাণিজ্য পরিচালিত হইত। আইন-ই আকবরী গ্রন্থে লিখিত আছে যে সিন্ধুনদে ৪০০০০ নৌ-যান বাণিজ্যার্থ ব্যবহৃত হইত।

Laird বলেন বেবিলনবাসী ও আসিরিয়া বাসীগণ ভারতের সহিত প্রভূত বাণিজ্য করিতেন। ভারতের বহুমূল্য উৎপন্নদ্রব্য সমূহ বেবিলন দেশ হইয়া দূরবর্ত্তী সিরিয়া দেশে নীত হইত। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে Forster লিখিয়াছেন যে তিনি কাস্পিয়ান সাগরে হিন্দুগণকে দেখিয়াছেন। তাঁহারা কান্দাহার ও হীরাট হইয়া এখানে আগমন করিয়াছিলেন।

Dr. Burnes বলেন নাদিরশাহ যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন Totta নগরে ৪০০০০ তন্তুবায় এবং ২০০০০ অন্যান্য শিল্পি এবং ইহা ব্যতীত কুঠীওয়ালা, মহাজন, দোকানদার ও শস্যবিক্রেতা ছিল; অন্যান্যদের সংখ্যা অনুমান ৬০০০০ ছিল।

বহির্বাণিজ্যেও ভারতবাসীরা অভ্যস্ত ছিলেন। তাহার বহু প্রমাণ রহিয়াছে। ঋগেদে আর্য্যগণের সমুদ্র যাত্রার বিষয় বর্ণিত আছে। মহাভারতে সমুদ্রপথে বাণিজ্য করার কথা উল্লেখ আছে। "সূর্য্য-সিদ্ধান্ত" গ্রন্থে রোমকদেশের বিষয় বর্ণিত আছে। মনুসংহিতায় লিখিত আছে যে নদীর স্রোতের অনুকূল ও প্রতিকূল গতিতে দূরত্ব ও সময় অনুসারে নৌকার ভাড়া নির্ণীত হইত। কিন্তু সমুদ্রপথে কোনও নির্দ্দিষ্ট ভাড়া ছিলনা। সমুদ্রপথে বিপজ্জনক যাত্রা হেতু আধুনিক ইনসিওর এর ন্যায় ভাড়া আদায় করা হইত।

Captain Wilford বলেন খ্রীষ্টের প্রথম শতাব্দীতে হিন্দুরা অত্যন্ত ভ্রমণ-প্রিয় জাতি ছিল। তাহাদের নরপতিরা গ্রীস ও রোমের নরপতিদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিতেন এবং কোনও কোনও দূত স্পেন দেশ পর্য্যন্ত গমন করিত। কেহ আলেকজেন্দ্রিয়া ও মিশর দেশে গমন করিত। Ptolemy খ্রীষ্ট ৩য় শতাব্দীতে তাহাদিগকে তথায় দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন। অষ্ট্রেলিয়া, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মধ্য আফ্রিকা এবং কাস্পিয়ান সাগর, পারস্য-উপসাগর ও সিরিয়াতে হিন্দুগণ দৃষ্ট হইত। রোমক সম্রাটের নিকট যে দূত প্রেরিত হইয়াছিল তাহাদের সঙ্গে বহু ব্রাহ্মণও ছিলেন।

ফাহিয়ান ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তৎকালে তাম্রলিপ্ত বা তমলুক বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল। তিনি একটী বৃহৎ অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া যবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে চীনদেশে উপনীত হন। উক্ত অর্ণব-যানে ব্রাহ্মণ বণিক ছিলেন; তাঁহারা চীনদেশের সহিত বাণিজ্য করিতেন। এই চৈনিক পর্য্যটকের মতে তৎকালে গঙ্গানদী হইতে জাহাজ সমূহ সিংহলে গমন করিত এবং তথা হইতে চীনদেশে গমন করিত।

রোমের সহিত ভারতের বাণিজ্যে, রোমের এত অধিক লাভ হইতে লাগিল যে এক এক সময়ে দুই লক্ষ পাউণ্ডও অতিক্রম করিত। ফলে তৎকালে জনৈক রোমীয় প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার দুহিতাদ্বয়ের অঙ্গ, তিন লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের অলঙ্কারে পরিশোভিত হইয়াছিল।

প্রাচীন ভারতে স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন ছিল। ঋগ্বেদে স্বর্ণ মুদ্রার উল্লেখ আছে। আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করিলে এদেশের রাজাদিগের নিকট তিনি বহু স্বর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হিন্দুদিগের সময়ের মুদ্রা নেপাল, আসাম, রংপুর, কোচবিহার জয়ন্তীপুর, মণিপুর, মধ্যপ্রদেশ, রাজপুতনা ও ইন্দ্রপ্রস্থে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। James Prinsep বলেন মুদ্রা নির্ম্মাণ বিষয়ে হিন্দুরা যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। "Commerce, money and Banking" নামক গ্রন্থ প্রণেতা বলেন বহু প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দুরা হুণ্ডীর (Bills of exchange) বিষয় পরিজ্ঞাত ছিলেন। ছয় মাসের মধ্যে বিক্রিত জিনিষের মূল্য প্রাপ্ত না হওয়া গেলে সুদ পাওয়ার ব্যবস্থা "বিবাদচিন্তামণি" গ্রন্থে লিখিত আছে। মনুসংহিতা এবং মিতাক্ষরায় ব্যবসা-ক্ষেত্রে প্রতারণা ও মিথ্যা আচরণের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা লিখিত রহিয়াছে।

উল্লিখিত প্রমাণ সমূহ হইতে আমরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে প্রাচীন ভারতবাসীরা আদর্শ কৃষক, আদর্শ শিল্পী এবং আদর্শ বণিক ছিলেন।

শ্রীরাজেন্দ্রকিশোর সেন।

স্বর্ণ চূর্ণ।

দারিদ্র বিধবার একমাত্র সন্তান ইন্দুভূষণ নিজের অবস্থা বেশ ভালই বুঝিত, তথাপি নিজের সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্বেও কেবল মাতার আগ্রহে ও পড়া চালাইবার অসুবিধায় পড়িয়া ধনী জমিদার রামনাথ ঘোষের কন্যাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হয়।

ইন্দুভূষণ কলিকাতায় থাকিয়া শ্বশুর রামনাথ বাবুর অর্থেই বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি বেশ সুখ্যাতির সহিত পাশ করিয়া এবার মেডিকল কলেজ হইতে ফাইনেল দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। শ্বশুর বাড়ী হইতে খরচ পত্রের জন্য মাসে মাসে যাহা পাইত! তাহা হইতেই সে মাতার জন্য মাসে মাসে কিছু পাঠাইয়া দিত। মাতা এই দান নিজের জন্য ব্যয় না করিয়া পুত্রের মঙ্গল কামনায় দেব সেবায় নিয়োজিত করিতেন। বাড়ীর সামান্য আয়েই তাঁহার দিন চলিত।

বিবাহের পর যে বধূ বরণ করিয়া লইয়াছিলেন সেই দেখার পর আর পুত্র বধূর মুখ সন্দর্শন বৃদ্ধার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। এবার বৃদ্ধার মনে পুত্র বধূর মুখ দর্শনের আশা বড়ই ব্যগ্র হইয়া উঠিল। তিনি পুত্রকে পরীক্ষার পর পুত্র বধূসহ বাড়ীতে পৌছিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া লিখিলেন। মাতার পত্র পাইয়া ইন্দু তাহার মায়ের দুঃখ নিজ প্রাণে অনুভব করিল এবং সেই দিনই শ্বশুরালয়ে, তাহার মাতার পত্রের মর্ম্ম সংক্ষেপে লিখিয়া পাঠাইল। কিছুদিন পরে পত্রের উত্তর আসিল। উত্তরে শ্বশুর মহাশয় তাহাকে যাহা লিখিলেন, তাহা পাঠ করিয়া ইন্দুর মনে নূতন ভাবের বন্যা বহিয়া গেল; ইন্দু নিজের অদৃষ্টকে শত ধিক্কারে ধিকৃত ও বিড়ম্বিত করিয়া পত্নী প্রভাকে একখানা চিঠি লিখিয়া তাহার অভিমান ও মর্ম্ম বেদনা প্রকাশ করিল।

মানুষের স্বভাব তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। ইন্দুর চিঠিখানা প্রভার মনে সাময়িক চঞ্চলতা আনিয়াছিল বটে কিন্তু সে চঞ্চলতা পিতা মাতার সোহাগ ও আদরের বন্যার অল্পকালের মধ্যেই ধুইয়া, মুছিয়া গেল।

(২)

পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। ইন্দু আজ শ্বশুরালয়ে পৌছিবে। প্রভা একথা পূর্ব্বেই জানিত, তাই আজ তাহার মুখ খানা হর্ষোজ্জ্বল। তাহার হৃদয়ে যেন একটা সুখের প্লাবন বহিতেছে। তাহার প্রত্যেক কার্য্যেই আজ ক্ষীপ্রতা, প্রত্যেক কার্য্যেই উৎসাহ। যতই বেলা হইতে লাগিল, প্রভায় ততই আশা ও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

ক্রমে দিনমণি পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িলেন। প্রভা আপন বেশ ভূষার পরিপাট্য বিধানে ব্যস্ত ছিল, এমন সময় বাড়ীর ভিতরে সংবাদ আসিল, 'জামাই বাবু' আসিয়াছেন। এ আনন্দ সংবাদ ভিতর বাড়ীতে একটা স্পন্দনের সৃষ্টি করিল; কিশোরী আসন্ন মিলন প্রতীক্ষায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, মেয়েরা আগতাকে সোহাগে আদরে বরণ করিয়া লইবে বলিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িল।

ইন্দু বাহিরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল, শ্বশুর বাড়ীর সরকার আনিয়া তাহার হাতে একখানা চিঠি দিলেন।

এ চিঠি আজই এই কতক্ষণ পূর্ব্বে এই ঠিকানায় ডাকে আসিয়াছে। পত্র পাঠ করিয়া ইন্দু অস্থির হইয়া পড়িল। তাহার কপাল বাহিয়া বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম বাহির হইতে লাগিল। পত্রে তাহার খুড়া মহাশয় লিখিয়াছেন "যদি তোমার মাকে দেখিবার ইচ্ছা হয়, পত্র পাঠ চলিয়া আসিবা। তাঁহার বড় সাধ, শেষ সময় একবার বধুকেও দেখিয়া যান্।"

ইন্দুর শ্বশুর রমানাথ বাবু সম্মুখেই উপবিষ্ট ছিলেন। সে তাহার খুড়ার চিঠি তাঁহাকে পাঠ করিয়া শুনাইল। তারপর তাঁহার সম্মতির অপেক্ষায় তাঁহার মুখের দিকে জিজ্ঞাসুভাবে চাহিয়া রহিল। রমনাথ বাবু বলিলেন, "তুমি বরং কাল চলিয়া যাও; তোমার মাকে দেখ। তারপর প্রয়োজন মনে করিলে প্রভাকে পাঠাইয়া দেওয়ার বন্দোবস্ত করা যাইবে।"

ইন্দু একটু জেদ করিয়া জানাইল, মায়ের শেষ অবস্থায়, একেবারে গেলেই যেন বেশ ভাল হয়।"

রমানাথ বাবু উদাসীন ভাবে উত্তর করিলেন "তুমি যাও, দেখ, চিকিৎসা পত্রের কি ব্যবস্থা হইয়াছে। খরচ

পত্রের ব্যবস্থা হইলে স্ত্রীকে লইয়া যাওয়া তো আর বেশী কিছু নয় নতুবা এই দুর্দ্দিনে অনর্থক পোষ্য বৃদ্ধি করিয়া বিপন্ন হইবে কেন?"

রমানাথ বাবুর উত্তর শ্লেষ পূর্ণ, তাচ্ছিল্য ব্যঞ্জক; ইন্দুর প্রাণে তাহা দারুণ আঘাত করিল। ক্ষণকাল সকলেই নীরব বসিয়া রহিলেন। তারপর রমনাথ বাবু উঠিয়া গেলেন।

ইন্দু আর তিলার্দ্ধ শ্বশুর গৃহে অপেক্ষা করিল না। রোগ শয্যায় শায়িত মাতার আকুল আহ্বানের দিকে তাহার উন্মত্ত মন পূর্ব্বেই ছুটীয়া গিয়াছিল; এখন ক্লান্ত দেহটীকেও সে সেই পথে তড়িত বেগে ছুটাইয়া চলিল।

(৩)

"বাপ, আসিয়াছ! বৌমা কোথায়? বাবা তাহাকে দেখিতে বড় সাধ হইয়াছে, বৌমা—বৌমা—" বলিতে বলিতে বৃদ্ধার চক্ষু যেন কাহার খোজে চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিরাশ হইয়া শেষ ক্লান্তির অশ্রু ত্যাগ করিল। তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

ইন্দু নীরব। কিন্তু তাহার অন্তরে সে যেন শত সহস্র বৃশ্চিক দংশন অনুভব করিতে লাগিল, অদৃষ্টকে শত সহস্র বার ধিক্কার প্রদান করিল।

দিন দিনই বৃদ্ধার রোগ যন্ত্রনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইন্দুর প্রাণপণ যত্ন ও শুশ্রূষার ক্রটী নাই। কিন্তু রোগীর রোগ বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস পাইবার লক্ষণ দেখাইতেছে না। একদিন জ্বরের ত্রাসে ছটফট করিতে করিতে বৃদ্ধা বলিতে লাগিলেন "মা! তুমি আমার লক্ষ্মী। একদিন তুমি আমার ঘর আলো করিবে; কিন্তু তোমাকে আমি দেখিতে পাইলাম না। বড় দুঃখ রহিল! এ কিন্তু ছিল তোমার স্বামীর ভিটা, এখানকার শাক অন্নই তোমার অমৃত।"

ইন্দু শিহরিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হইয়াছে মা"?

বৃদ্ধা চক্ষু মুদ্রিত রাখিয়াই বলিলেন "বাবা! বৌমাকে দেখিতে বড় সাধ"।

ইন্দু মুখখানি নত করিয়া বলিল "মা! তাহারা শীঘ্রই পাঠাইয়া দিবে।"

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধা বলিলেন "করে, ততদিন কি আমি বাঁচিব? আমার যে দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। তুমি লোক পাঠাও—আমি জন্মের মত দেখিয়া যাই।"

মাতার আদেশ অনুসারে ইন্দু সেই দিনই রামনাথ বাবুর নামে একপত্র লিখিয়া লোক পাঠাইল। যথা সময়ে লোক ফেরত আসিল। পত্রোত্তরে রামনাথ বাবু লিখিয়াছেন— "তোমার মাকে লইয়া সম্ভব হইলে তুমিই এখানে আসিবা। আমি বরং খরচ পত্র বহন করিব। প্রভা সর্দ্দি জ্বরে কাতর, তাহাকে এ সময় ছাড়িয়া দেওয়া ডাক্তারের মত নহে।"

এই সহানুভূতি হীন পত্র পাইয়া ইন্দুর শরীর রাগে গড় গড় করিতে লাগিল। সে প্রাণে বড়ই ক্লেশ অনুভব করিল। মনে মনে বুঝিল, ধনী-দরিদ্র সম্বন্ধ এই জন্যই শোভা পায় না। কিন্তু প্রভারও তো একটা কর্ত্তব্য ছিল। সে কেন পিতামাতাকে বুঝাইয়া আসিবার ব্যবস্থা করিল না। ইন্দুর সকল রাগ কেন্দ্রিভূত হইল প্রভার উপর।

বৃদ্ধা আর পুত্র বধুর মুখ দর্শনের সময় করিতে পারিলেন না।

মায়ের সেই অতৃপ্ত আকাজ্ক্ষার কথা ভাবিয়া ইন্দু শোকে ও দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া গেল। তাহার জীবনে কেমন একটা উদাস ভাব আসিয়া পড়িল; সে আপন ভাবে আপনি আবিষ্ট হইয়া গেল।

শ্মশান ঘাট হইতে চিতা নিবাইয়া বাড়ীতে আসিয়া ইন্দু এক পত্র পাইল। তাহাতে তাহার শ্বশুর লিখিয়াছেন "এই সঙ্গে খরচের জন্য কিছু টাকা পাঠাইলাম, এ সময় প্রভাকে পাঠাইয়া আর তোমায় খরচ বাড়াইতে চাই না। আমার সংসারেও বড় দুঃসময় পড়িয়াছে। তোমায় মা এখন কেমন? বৃদ্ধ জনক জননী লইয়া কেহ চিরদিন কাটাইতে পারে না। তাঁহার বৃদ্ধাবস্থা। শেষ অবস্থায় পুত্রের কর্ত্তব্য করিবা। অধিক কি লিখিব, ইতি।"

পত্র পড়িয়া ইন্দুর আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ উত্তর লিখিল "অনুগ্রহ করিয়া টাকা ফেরত লইবেন। যতদিন টাকা স্নেহের উপহার ছিল, ততদিন গ্রহণ করিয়াছি, এখন তাহা অনুগ্রহে পরিণত হইয়াছে সুতরাং আমার চক্ষে সে টাকা লওয়া নিগ্রহ মাত্র। গরীবের ছেলে অবস্থার উপযোগী শাকান্নে সন্তুষ্ট না থাকিয়া পরের পয়সায় 'বড় মানুষ' হইবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম,

সে স্বপ্ন টুটিয়া গিয়াছে, এখন নিজ দারিদ্র্য লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিব।"

যথা সময়ে পত্রের উত্তর লইয়া বাহক ফিরিয়া আসিল। ইন্দুর পত্র পাইয়া রামনাথ বাবু ভাবিলেন—যৌবনের সাময়িক উত্তেজনা। গরীবের ছেলে অর্থের অভাবে পড়িলেই পথে আসিবে।

প্রভা ও এইসঙ্গে স্বামীর চিঠি পাইয়াছিল। সে চিঠি পড়িয়া প্রমাদ গণিল। পত্রে অভিমানের বেদনা অপেক্ষা অপমানের জ্বালাই তীব্র ভাবে আত্ম প্রকাশ করিয়াছিল। প্রভার প্রাণে তাহা গুরুতর বাজিল।

(৪)

সুদক্ষ নাবিকের যেমন মাঝ দরিয়ায় তুফান উঠিলে, সর্ব্বাগ্রে নৌকা তীরে ভিড়ানই লক্ষ্য হয়—আগে সে নৌকা ভিড়াইয়া পরে নৌকার অবস্থা লক্ষ্য করে, ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য স্থির করে, ইন্দুও কোন মতে নিজের উপায়ের সংস্থান করিয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়া পরে ধনী আত্মীয়ের সহিত সকল সম্পর্ক হইতে মুক্ত হইবে স্থির করিল। ইন্দু মায়ের স্নেহের অমৃতে বর্দ্ধিত হইয়া জীবনে সুখের ও সাফল্যের স্বপ্নেই পা দিতে চলিয়াছিল। সে কখন কল্পনাও করে নাই যে সহসা তাহার সংসারের খেলার ঘর তাসের ঘরের ন্যায় নির্দ্দয় বিধাতার এক ফুৎকারেই উড়িয়া যাইবে।

মাতৃশ্রাদ্ধ শেষ করিয়া ইন্দু দৃঢ়তা সহকারে আপনার আঘাত বেদনা বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া—কোন অজানা দেশে আপন ভাগ্য পরীক্ষা করিবে স্থির করিল।

তখন বাঙ্গালির হাতে সবে মাত্র নূতন অধিকার দান করিয়া বৃটীশ জাতি জগত সমক্ষে বাঙ্গালীকে একটা জাত বলিয়া পরীক্ষিত করিবার জন্য তারস্বরে আহ্বান করিতেছিলেন; বাঙ্গালি ও সে ডাকে সাড়া দিয়া দলে দলে ফরাসি রণাঙ্গনে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক রণ কৌশলী জার্ম্মান শত্রুর সহিত প্রতিযোগীতায় দাঁড়াইবার জন্য ছুটিয়াছিল। সে কি উৎসাহ ও একপ্রাণতা।

সেই ফরাসি রণাঙ্গনে বাঙ্গালি ডাক্তারদেরও ডাক পড়িল। বৃটিশ জাতি তখন মান বাঁচাইবার জন্য অর্থের দিকে চাহিলেন না। ইন্দুও সেই আহ্বানে সাড়া দিল।

ইন্দু এক নিষ্ঠভাবে আসিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে মন দিল। অদৃষ্ট পুরুষ একদিকে তাহাকে তাহার প্রাপ্য দানে বঞ্চিত করিলেও বোধ হয় একটু সঙ্কুচিত ছিলেন, তাই আর একদিকে প্রসন্ন চিত্তে তাহাকে প্রসাদ দিয়া ক্ষতি পূরণের চেষ্টা করিলেন। এক হস্তের ক্ষতি অন্য হস্তের লাভের দাঁড়িতে হার মানিল।

ইন্দু সকল শক্তি নিয়োগ করিল যশ—ও সম্মান অর্জ্জনে।

ফ্রান্সে আসিয়া কয়েক দিন কার্য্যের বাহুল্যে বেশ কাটিয়া গেল। কিন্তু অবসর সময় ভাবীজীবনের কথা চিন্তা করিয়া কেমন একটা নিরাশার আবছায়া তাহার প্রাণের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইত; আর সে ভাবিত প্রভার ব্যবহারটা! প্রভার কি কোন কর্ত্তব্য ছিল না? শ্বশুর না হয় ধনের গর্ব্বেই এ ব্যবহার করিয়াছেন, সেও কি ধনের গর্ব্বে তাচ্ছিল্য করিল? এ সকল কথা যখন তাহার মনে হইত, যাতনায় তাহার বুক ফাটিয়া যাইত। তাহার জীবনের দাম্পত্য সুখের আশা—এই ব্যবহার ও চিন্তার অগ্নিতে পুড়িয়া ভস্ম হইতেছিল। ইন্দু যতই ধনীর ধন গর্ব্বের কথা ভাবিত, ততই যেন দারিদ্র্যের মাহাত্ম্যে তাহার শ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল। তাহার মনে সঙ্কল্প দৃঢ় হইতে লাগিল, একদিন আসিবে, যখন ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব সে পদাঘাতে চূর্ণ করিবে; তাহার সমগ্র শক্তি ধনার্জ্জনে নিয়োজিত করিয়া দেখাইবে—সে ধনকে ধুলির মত জ্ঞান করে। কিন্তু হায়, এরূপে যে তাহার জীবনের সুখ স্বপ্নের মত বিলীন হইয়া যাইবে।

ব্যর্থতার সোপানাবলি অতিক্রম করিয়াই যে সফলতার উচ্চ সৌধে উঠিতে হয়, একথা ভাবিয়া বুক বাঁধিবার প্রয়াস পাইলেও নিরাশার পীড়নে সময় সময় তাহার বুক ফাটিয়া যাইত, নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিত। ইন্দু সেই নিয়তির কোলে গা ঢালিয়া চলিতে লাগিল। প্রভা যখন দারিদ্র্যকে ঘৃণাই করিয়াছে, তখন সে তাহার ধনের গর্ব্ব লইয়া সুখে থাকুক; সে যদি আমার নিষ্ফল জীবনের বেদনা অনুভব না করিল, যদি সে আমার শোক দুঃখের ভাগীই না হইল, তবে আমিই বা তাহাকে গ্রহণ করিয়া কি করিব? এইরূপ চিন্তার চিন্তায় তাহার বহু অবসর সময় কাটিয়া যাইত।

ইন্দু যতই নিরাশায় ম্রিয়মান হইতেছিল, ততই ধন ও যশ যেন অতর্কিতভাবে ও অপ্রত্যাসিত ভাবে আসিয়া তাহার

ক্রমশ লুটাইয়া পড়িতে লাগিল। এইরূপে দুই বৎসর চলিয়া গেল।

* * *

পৃথিবীব্যাপী মহাসমর শেষ হইয়াছে। ভারতবাসী সম্মান অর্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিয়াছে। ইন্দুভূষণ ও রাজ সম্মানে সম্মানিত হইয়া বোম্বে উপকূলে নামিয়াছে। দুইদিন এখানে থাকিয়া সপ্তাহ মধ্যে কলিকাতায় পৌছিবে। সংবাদ পত্রে তাহার সচিত্র জীবনী বাহির হইয়াছে।

(৬)

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। সূর্য্য কিরণে চতুর্দ্দিকে ঝলসিয়া উঠিয়াছে। গাড়ী বারান্দায় একটা মোটর আসিয়া লাগিয়াছে। তাহা হইতে একজন বাঙ্গালী ও একজন সাহেব নামিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। তখন ইন্দু শয্যায় শায়িত। তাহার প্রবল জ্বর। ডাক্তার রোগীর শরীরে হাত দিয়া যেরূপ জ্বরের প্রাবল্য অনুভব করিলেন তাহাতে প্লেগের আশঙ্কা করিলেন। ক্রমে সন্দেহ সত্যে পরিণত হইল।

আগন্তুক বাঙ্গালী ডাক্তারটী ইন্দুর পূর্ব্ব পরিচিত,সহধ্যায়ী। সে ইন্দুর অবস্থা বুঝিতে পারিয়া আত্মীয় স্বজনকে সংবাদ দেওয়াই কর্ত্তব্য মনে করিল; এবং রোগীর অজ্ঞাতে রামনাথ বাবুকে টেলিগ্রাম করিল। তখন প্রবলজ্বরে ইন্দু অজ্ঞান প্রায়—জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে।

আশঙ্কার তাড়নায়, অনাহারে, অনিদ্রায়, দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া বিপন্ন পরিবার যখন শঙ্কা কম্পিতহৃদয়ে আসিয়া ইন্দুর গৃহদ্বারে উপনীত হইল, তখন ইন্দু অজ্ঞানবস্থায় জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে। গাড়ী বারান্দায় গাড়ীর শব্দ শুনিয়া ডাক্তার বাহির হইয়া আসিলেন,কেহ কোন শব্দ করিবার পূর্ব্বেই বলিলেন "অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন নাই।" কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। ডাক্তার সকলকে তাহার সঙ্গে যাইতে বারণ করিয়া রামনাথ বাবুকে সঙ্গে লইয়া রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

রামনাথ বাবু বাহিরে আসিয়া সকলকে গৃহের ভিতরে ডাকিলেন। ইন্দুকে দেখিয়া সকলেই একটু চঞ্চল হইল। ডাক্তার বলিলেন—এ সময় আপনারা কোন গণ্ডগোল করিবেন না; রোগীর সেবা করিতে আসিয়াছেন—সে কথা মনে করিয়া সময় স্নান আহার করুন; তারপর আমি সময় ভাগ করিয়া দিব—একজনের পর একজনকে রোগীর কাছে থাকিতে হইবে।

প্রভা কাতর দৃষ্টিতে মা'র দিকে চাহিল। তাহার বুকের মধ্যে প্রবল যাতনা তাহাকে স্থির থাকিতে দিতেছিল না। এমন তীব্র যাতনা সে আর কখনও অনুভব করে নাই। মানুষ যতই কেন হতাশ হউক না তাহার হৃদয়ে আশার শ্বাস লুপ্ত হয় না—যখন সেই আশার বিলোপ আশঙ্কায় মানুষ কাতর হয়, তখন তাহার যাতনা বুঝি মৃত্যু যাতনা অপেক্ষা প্রবল বলিয়া অনুভূত হয়। মা প্রভাকে হাত ধরিয়া স্নানে গেলেন। সে যন্ত্র চালিতবৎ মার সঙ্গে গেল—তাহার সমস্ত বৃত্তি যেন দিব্য দৃষ্টিতে পরিণত হইয়া রোগ শয্যায় শয়ান স্বামীকে দেখিতে লাগিল। সে কেবল দেখিতেছিল—তাহার জীবন মন্দিরের দেবমূর্ত্তি যেন দারুণ ভূমিকম্পে বেদী হইতে পতিত হইতেছে।

ডাক্তার সকলকে সময় ভাগ করিয়া দিলেন। রোগীর অবস্থা সমান—অজ্ঞানাবস্থারও তারতম্য নাই। কেবল—নাড়ীর গতি ও হৃদয়ের ক্রিয়া আশঙ্কার উপর আশার জয় ঘোষণা করিতেছিল।

ষষ্ঠদিন দ্বিপ্রহরে ইন্দুভূষণ চক্ষু মেলিল—মেঘাচ্ছন্ন প্রভাত-আকাশে বালার্ক কিরণ বিকাশের মত অচৈতন্যবস্থার পর তাহার জ্ঞান বিকাশ হইল। তখন তাহার পায়ের নীচে প্রভা—তাহার মুখেরদিকে চাহিয়া আছে। স্বপ্নের পর নিদ্রা ভঙ্গে মানুষ যেমন চাহিয়া দেখে—যাহা দেখিয়াছে, তাহা প্রকৃত কি না? ইন্দু তেমনি গাঢ় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অনেকক্ষণ চাহিয়া দেখিল। তারপর ভ্রূকুটি করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

ইন্দু বুঝিল, তাহার অজ্ঞান অবস্থায় ডাক্তার রামনাথ বাবুকে খবর দিয়াছে—কিন্তু সে কিছুতেই ডাক্তারের উপর রাগ করিতে পারিল না। তাহার বিরক্তিভাব বুঝিয়া ডাক্তার তাহাকে জানিতে দিয়াছিলেন ভাড়াটীয়া লোকদ্বারা এ সেবা শুশ্রূষা চলিতে পারে না।

(৭)

রোগের স্রোত ফিরিল—আরোগ্যের গতি দিন দিন দ্রুত হইতে লাগিল; স্বাস্থ্য, আপনার অধিকার ফিরিয়া পাইবার জন্য ব্যগ্র হইল। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দু এক নূতন চিন্তায় পড়িয়া গেল।

প্রভার অক্লান্ত ও আন্তরিক সেবা ইন্দু লক্ষ্য না করিয়া পারিল না। অন্য কোন কাজের অভাবেই ইন্দুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রভার ভাব বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিত। সে লক্ষ্য করিত—আর ভাবিত। ক্রমে তাহার মনে হইতে লাগিল—তাহার বেদনা তপ্ত হৃদয় যেন স্নিগ্ধ হইয়া আসিতেছে।

দশ দিনের মধ্যে ইন্দু অনেকটা সুস্থ হইল; তখন আর তেমন সেবার প্রয়োজন রহিল না।

ইন্দু সর্ব্বপ্রযত্নে প্রভার প্রতি তাহার প্রবল ভালবাসা অতিক্রম করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিল। কাজেই প্রভার সেবা সে তাহার প্রাপ্য বিবেচনা না করিয়া সেজন্য কৃতজ্ঞতার ভান করিতে লাগিল—আপনাকে আপনি বুঝাইয়া প্রতারিত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিল।

সে দিন হঠাৎ ইন্দু প্রভাকে বলিয়া ফেলিল—"প্রভা! তুমি আমার অসময়ে যে সেবা শুশ্রূষা করিয়াছ, সে জন্য আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ রহিব। আমার জন্য এত কষ্ট করিবার তোমার কোনও প্রয়োজন ছিল না।"

এতদিন ইন্দু যে তাহার সঙ্গে কোন কথা কহে নাই, তাহাতে প্রভার দুঃখ হয় নাই, বরং সে যে সেবা করিতে পাইয়াছে—তাহাতেই পরম তৃপ্তি অনুভব করিতেছিল। আজ ইন্দুর কথায় তাহার সকল বেদনা নূতন হইয়া উঠিল—তবে কি সে এতদিন স্বামীর কাছে যত দূরে ছিল—আজও তত দূরেই রহিয়াছে। তাহার আশার বালির ঘর কথার তরঙ্গাঘাতে অদৃশ্য হইয়া গেল। সে উত্তরে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। শেষে বহু চেষ্টায় বলিল "মা বলিতেছেন, আমি এখন এখানেই থাকিব।" তাহার কথা যেন দূরাগত গ্রামোফনের স্বর—অস্বাভাবিক ও ঈষৎ কম্পিত।

ইন্দুর মানসিক বৃত্তি স্থল ধরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ইন্দু বলিল—"যাহা ভাবিয়াছ তাহা কেমন করিয়া হইতে পারে। গত দুই বৎসরের স্মৃতি তুমি মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না; সুতরাং পূর্ব্ব ব্যবস্থার আর বদল নাই।"

কথা শুনিয়া প্রভার মনের মধ্যে যে কথা ফুটিয়া বাহির হইবার জন্য তাহাকে পীড়া দিতেছিল — ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া ঝড়ের মত প্রভার মুখে সে কথা বাহির হইয়া পড়িল। আজ প্রভা মুখর হইয়া বলিতে লাগিল—"তোমাকে আমি সেদিন বলিয়া বুঝাইব—অনুতাপে, আত্মগ্লানির অনলে আমার অতীত—আমার ভুল, পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে, আমার ভবিষ্যৎ তোমার,—তুমি তোমার প্রেমে তাহা সুখময় কর। তোমার ভালবাসা ছাড়া আমার কামনার ও সাধনার আর কিছু নাই। তুমি আমাকে অবসর দাও—আমি আমার ভালবাসা দিয়া তোমার স্মৃতির ঘা চিহ্ন মুছিয়া দিব।"

অনুতাপ ও অনুশোচনা কেবল কথায় প্রকাশ হয় না। সে যাতন—নয়নের কাতর দৃষ্টিতে, সেবার আন্তরিকতায় প্রকাশ হইয়া পড়ে। সুতরাং ইন্দু তাহার দর্প-হত পত্নীটার প্রতি অবাক হইয়া নতমুখে চাহিয়া রহিল, কোন উত্তর দিতে পারিল না।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

তত্ত্ব মীমাংসা দর্শনম্—শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বেদান্তরত্ন প্রণীত। মূল্য ॥০ দুর্গাবাড়ী। ময়মনসিংহ।

ময়মনসিংহ আর্য্যধর্ম্ম জ্ঞান প্রদায়িনী সভার আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বেদান্তরত্ন মহাশয় "তত্ত্ব মীমাংসা দর্শন" নামে একখানা অভিনব দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।

সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহে যদিও বহু দর্শন শাস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায় তথাপি আমাদের দেশে ষড় দর্শনেরই বেশী প্রচার এবং ষড় দর্শনই সর্ব্বজন সমাদৃত। এ অবস্থায় বেদান্তরত্ন মহাশয়ের "তত্ত্ব মীমাংসা দর্শন" সপ্তম স্থানীয় বলিয়া গণ্য হইলে গ্রন্থকারের শ্রম সফল হইবে। এই গ্রন্থের বিশেষত্বও আছে।

সাহিত্য-সংবাদ।

কবি হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত মহাশয়ের 'বেদানা' বাহির হইয়াছে। এ বেদানার দাম ॥০ আনা।

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নূতন কবিতা পুস্তক "হাসির হল্লা" যন্ত্রস্থ। তাহার নূতন গীতি কবিতাগুলিও পুস্তকাকারে সত্বরই বাহির হইবে।

সৌরভ সম্পাদক মহাশয়ের নূতন গ্রন্থ "মায়াবী সমাজ" মুদ্রিত হইতেছে।
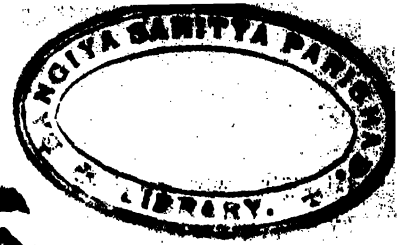
দশম বর্ষ। } ময়মনসিংহ, অগ্রহায়ণ, ১৩২৯। { একাদশ সংখ্যা।

প্রকৃতি-সুন্দরী।

মাধুরী ! মাধুরী ! মাধুরী ! দিকে দিকে মাধুরীর লীলা, আকাশে বাতাসে মাধুরীর খেলা ! যে দিকে নয়নের গতি সে দিকেই শুধু সুন্দরী প্রকৃতির শোভন হাস্য ও মধুর লাস্য, অসীম, অনন্ত। শুধু নয়নের গতি নহে, যে দিকে একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান সেই দিকেই অনন্ত প্রকৃতির অনন্ত রূপ লহরী দিগন্তে মিশিয়া অনন্তে বিলীন হইতেছে। রজনী প্রভাত হইল. উষার নির্ম্মলালোকে তরুলতা হাসিল, পাখা-কুলের মৃদু মধুর কলকল নাদে কলনাদিনী কুলঙ্কষার একূল ওকূল দুকূল উথলিয়া উঠিল। একদিকে পাখীর কলকল রব অপরদিকে তটিনির কুলু কুলু ধ্বনি। নিদ্রিতা পৃথিবী আর কি সুষুপ্তির কোমল শয্যাতল আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে ? ধীরে—অতিধীরে—ধরণীর ধীর নয়ন হইতে তন্দ্রাদেবী চুপে চুপে চলিয়া যাইতে লাগিল ; আনন্দে—মহানন্দে—জগতের জন-মানব জড়তা ছাড়িয়া সজীবতায় দাঁড়াইল। কুঞ্জে কুঞ্জে মধু পিপাসু মধুকরের অব্যক্ত মধুর গুঞ্জন ! গৃহে গৃহে কলকণ্ঠ বালক কুলের মধুর মধুর অতিমধুর কোলাহল ! চারিদিকে শুধু মাধুরীর ছটা, মাধুরীর ছড়াছড়ি। মাধুরী. মাধুরী !

প্রকৃতির প্রথমাবস্থা

তখনও আমার চক্ষু ফোটেনাই, ডানা (?) মেলেনাই, হাত পা নাড়িবার শক্তি হয় নাই। পাখীর ছানার মত অতি নিবিড়তম নীড়ে বসিয়া জননীর অঞ্চলতলে আত্মগোপন করিয়া আছি। সহসা একি এ! অলক্ষিতে কোথা হইতে ভীতির সঞ্চার হইল ? সংসারের রীতি নীতিতে প্রীতি জন্মে নাই যাহা জগতের গীতিরস কর্ণকুহরে সুধা বমন করেনা, শুধু অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে স্বর্গীয় এক অনন্ত স্মৃতি, অসীম ও অতি পুরাতন ! এই স্মৃতি ক্ষণে ক্ষণে জ্ঞানের ভাতিতে অতীতের বাতি জ্বালিয়া দিতেছে ও "আমি জগতে আছি" এই মহাসত্যকে ও মহতী সত্তাকে অনুভূতির সীমায় টানিয়া আনিতেছে। আমি আছি, অন্তর আছে. বিজ্ঞান আছে, থাকিবার বাসাটী আছে ; আর আছেন আমার মা ও মাতৃস্তন্য। আহা ! এক অদ্বিতীয়. অসীম ও অনন্তের মাঝে কত না পদার্থ বিদ্যমান !

মহত্তত্ত্ব

অহঙ্কার

বিজ্ঞান আছে বলিলাম কিন্তু তখনও বিজ্ঞানের শাখা প্রশাখা হয় নাই, প্রকার ভেদ ঘটেনাই। শুধুই একধারা, স্বচ্ছ পবিত্র বিজ্ঞান ধারা—"আমি ও আমার।" বিজ্ঞান পরে মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার সৃষ্টি করিল, হাসি কান্নার রোল তুলিল, গোল বাধাইয়া দিল ; আমি ও আমার ভিন্ন অপর কিছু আছে বুঝাইয়া দিতে লাগিল। জানি না কোন এক সোণার কাঠির মোহন স্পর্শে চক্ষু দুইটা ফুটিয়া উঠিল রে ! চাহিয়া দেখি দিব্য অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া শোভাদেবী মধুর—মধুর—অতিমধুর হাস্য করিতেছেন। চাহিয়া দেখি, রূপে ঝলমল, রসে টলমল বিমল পরিমল বসনাঞ্চলে সিঞ্চিত করিয়া ভগবতী বসুমতী বিবিধ বস্তুতে ভূষিত হইয়া উজ্জল স্বর্ণসিংহাসনে রাজরাণীর মত বসিয়াছেন। বিজ্ঞান বলিতেছে, এইখানেই আমার গবেষণার শেষ নহে ; এস শিশু, এস দেখাই, আমার সঙ্গে এস, তোমাকে আমার তেমন রাজ্যে পৌছাইয়া দিব—যেখানে আমার কার্য্য সমূহ পর্য্যবেক্ষণ

তন্মাত্রা ও ইন্দ্রিয়

চক্ষু, রূপ, ক্ষিতি

করিয়া তুমি আপনাকে ধন্য ধন্য মনে করিবে, জীবন সার্থক গণ্য করিবে।

আমি তখন ক্ষুৎ-পিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি। মাটীর গড়া ক্ষীণ অঙ্গযষ্টি আমার ক্ষুদ্র অস্তিত্ব টুকুর গুরুভার বহনে অসমর্থ—এই বার্ত্তা নিবেদন করিয়া আকাশের গায়ে এলাইয়া পড়িয়া

রসনা, রস, অপ, ভূমি — দেহ চুম্বন করিতে উদ্যত! মাটীতে ও ভূমিতে বুঝি এতই আন্তরিক আকর্ষণ! ক্ষিতি পদার্থ আজ স্বকায় উপাদান ক্ষিতিতেই মিশিতে চাহিতেছে! পরিদৃশ্যমান স্থূল একটী দেহপিণ্ড অদৃশ্য একটী সূক্ষ্মতম সত্তার গুরুভাব বহন করিতে পারিতেছেনা, ইহাতে বিস্ময়ের হেতু কিছুই নাই। অদৃশ্য পদার্থের এরূপই মহিমা, অদৃষ্ট পদার্থের এইরূপই মহনীয়তা!

সহসা অমৃতের ধারা নিষ্যন্দিত হইল, নন্দনের গন্ধ বহন করিয়া অমন্দ মন্দাকিনী রসনার আনন্দ উৎপাদন করিল। বৈদ্যরাজ ধন্বন্তরি কমণ্ডলু ভরিয়া

ঘ্রাণ গন্ধ তেজ — ক্ষীর সাগরের ক্ষীর প্রদান করিয়া বলিয়া গেলেন "এই নেও মহৌষধি।" সাগরকন্যা লক্ষ্মী আসিয়া বলিয়াগেলেন "এই ধর বাছা সোণার ঝাঁপি, আমার মায়ের বুকের এক বিন্দু সুধা!—ক্ষুৎ-পিপাসার শান্তি হইল, দেহের কান্তি বাড়িয়া চলিল, পুরাতন ভ্রান্তি দূরে পলাইল। আহার ও পানীয় ক্রমে ক্রমে আমার তন্দ্রা বিজড়িত অলস মনটাকে পুষ্ট করিয়া তুলিতেছে; অন্ন গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মনের রঙ্গ উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কল্পনার রাজ্যে আমি মানসী রাণীর অপরূপ রূপ নিরীক্ষণ করিতেছি। আহা কিবা তাহার ললিত লবঙ্গলতার ললামময়ী লাবণী! কিবা তাহার শারদীয় জ্যোৎস্না বিধৌত আবিলতালেশপরিশূন্য স্নিগ্ধ পেলব চাহনি! অহো কে এই রমণী রে! চঞ্চলা দামিনীর মত কে রে এই কামিনী, আমার নয়ন কোণে উঁকি ঝুকি দিয়া পরক্ষণেই পলায়মানা হইতেছে? এ কি নারী অথবা নর? এ কি প্রকৃতি অথবা পুরুষ? মনের শক্তি পরাভূত হইল, দর্শনের ক্ষীণ আলোক নিবিয়া গেল; বুঝিতে পারিলামনা আমার মনোরাজ্যে কাহার আসন শূন্য পড়িয়া আছে। ধরিতে পারিলামনা এই আসনের অধিকারী কি স্ত্রী, পুরুষ অথবা ক্লীব! শ্রীমান্ বিজ্ঞান চন্দ্র এইস্থানে আসিয়া থত মত খাইল। পদার্থ একটী আবিষ্কৃত হইয়া আছে—যাহা চিরনিত্য, চিরশুদ্ধ—অথচ তাহার নামকরণটী যথার্থ হইতেছে না, অন্বর্থের অভাবে বহু বহু কদর্থের মহানর্থ সংঘটিত হইতেছে, ব্যর্থকতার ব্যর্থতায় স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটিতেছে। রুচির সাগরে তুমুল তোলপাড়, মানসিক শক্তির প্রবল বিলোড়ন!

ত্বক্, স্পর্শ, মরুৎ — সামগ্রী এক, গুণাবলী এক, অথচ উহার সংজ্ঞানির্দ্ধারণে কত শত মত-বিভিন্নতা! বস্তুর যদি স্বরূপই নির্ণীত না হইল তবে ওহে ও বৈজ্ঞানিক, ওগো দার্শনিক! আমরা ওকে কি বলিয়া ডাকিব? কি বলিয়া ধরিতে যাইব? ঐ স্বরূপ শূন্য অপরূপ রূপটীর সঙ্গে কোন্ সম্পর্ক পাতাইব? বালকগণ "বাবা" বলিয়া আকুল, বালিকাগণ 'মা মা' রবে ব্যাকুল! ভ্রাতারা 'ভগিনী ভগিনী' ডাকিয়া স্নেহপ্রকাশ করিতেছে! ভগিনীগণ "ভাই ভাই" বলিয়া মমতার পরিচয় দিতেছে। পিতা 'পুত্র পুত্র' সম্বোধনে অন্তরের গভীর করুণা জানাইতেছেন। মাতা "কন্যা কন্যা' আহ্বানে দূরস্থাকে সমীপস্থা করিতেছেন। বন্ধুজন তাহাকে ডাকিতেছে সখা; ভৃত্যজন বিনয়নম্রবচনে আদেশ পালন করিতেছে 'যে আজ্ঞে হুজুর।" স্বামী তাহার প্রতি প্রেমময়ী প্রিয়তমা পত্নীর প্রীতি সম্ভাষণ বিজ্ঞাপিত করে, যেহেতু পতির নিকট পত্নী প্রিয়তম। পক্ষান্তরে পতিব্রতা পত্নী হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা নিংড়াইয়া আন্তরিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত করে।

আমার জন্য যে কিরূপ বিধান হইবে তাহা কে বলিয়া দিবে? আমি যে অদ্যাবধি উহার পুত্র নহি, পিতা নহি, কন্যা নহি, মাতা নহি, ভ্রাতা নহি, ভগিনী নহি, বন্ধু নহি, সখা নহি, প্রভু নহি, ভৃত্য নহি, স্বামী নহি, স্ত্রীও নহি। অথচ আমি জগৎছাড়া একটা অজাগতিক জানোয়ারও

কর্ণ, শব্দ, ব্যোম — নহি। আমি অবোধ, অদ্য পর্য্যন্তও কাহাকে চিনি নাই, বুঝি নাই; নিজের অস্তিত্বমাত্র অবগত আছি আপনি যে কি পদার্থ—স্বামী অথবা স্ত্রী, প্রকৃতি অথবা পুরুষ, মাটি অথবা জল, অণু অথবা মহান্, ভাব অথবা অভাব,—আছি কিংবা নাই—সেই বিজ্ঞান এখনও আমার মধ্যে স্বতঃস্ফুরিত হয় নাই। আমার মধ্যে ভৃত্যত্ব আছে অথবা

প্রভুত্ব আছে, পিতৃত্ব আছে অথবা পুত্রত্ব আছে—সেই তৎ-ত্বও গুহায় নিহিত! তবে আমার গতি কি?

যেই মুর্ত্তিখানি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে উদাবর্ত্তের অভ্যন্তরবর্ত্তী জল রেখার ন্যায় মহাস্ফূর্ত্তি সহকারে আমারই সমক্ষে রঙ্গে ভঙ্গে অঙ্গ সঞ্চালন করিতেছে, যে ছবিখানি সুনীল নভোমণ্ডলে উদ্ভাসিত হইয়া আপনার কান্তিচ্ছটায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া পরক্ষণেই মেঘমধ্যগতা দামিনীর ন্যায় লোকলোচনের অন্তরালে অন্তর্হিত হইতেছে, যাহার অঙ্গ সুবাসে আমার অঙ্গের প্রতি অবয়ব সৌগন্ধরসে অনুবাসিত, সেই ভ্রান্তিময়ী মূর্ত্তিকে আমি কি বলিয়া সম্বোধন করিব? তাহার সমক্ষে কোন্ ভাষায় আত্মবেদনা নিবেদন করিব?

অহো! গন্ধে যে আমায় আত্মহারা করিয়া তুলিল রে! বাতাস ভরা শুধুই যে গন্ধ! গন্ধ! গন্ধ! নাসিকারন্ধ্রে সুগন্ধ ব্যতীত এখন দুর্গন্ধ-বায়ুর সঞ্চার নাই। গন্ধের পূরকে আমার উদরকুম্ভ কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ, জানি না ইহা কোন নন্দনের চন্দনতরু নিষ্যন্দিত মহাগন্ধ। জানিনা ইহা কোন প্রসূনের বিমল পরিমল বাহিনী মৃত সঞ্জীবনী। গন্ধে আমার মৃতকল্প প্রাণে চৈতন্যের সঞ্চার করিয়া দিল, মনের অমোঘ-শক্তি-স্বরূপা মানসী প্রতিমাকে নাচাইয়া নাচাইয়া হাসাইয়া তুলিল। ষোল দিন ষোল রাত্রি ব্যাপিয়া সেই গন্ধ গ্রহণ করিলাম। চৌষট্টি দিবস চৌষট্টি রাত্রি যাবৎ সেই অনাঘ্রাতপূর্ব্ব অপূর্ব্ব সুবাসে আমার উদরকুম্ভ পূর্ণ করিয়া রাখিলাম। আজি বত্রিশ দিন ও বত্রিশ রাত্রি চলিয়া যাইতেছে, আমার সেই সঞ্চিতগন্ধ পর্য্যুষিত হইয়া গেল, পুরাতন গন্ধ সমস্তই পরিত্যাগ করিলাম। এখন আবার অভিনব গন্ধ গ্রহণে স্পৃহা হইতেছে। অদ্য আমার বয়স কাহারও অনুমানে এক শ্বাস ও এক প্রশ্বাস—দুই মুহূর্ত্ত; কাহারও অনুমানে এক পূরক, এক কুম্ভক ও এক রেচক—তিন মুহূর্ত্ত। আমার ন্যায় অপোগণ্ড শিশুর স্বয় হিসাবে অদ্য আমার বয়স ১৬+৬৪+৩২—১১২ মুহূর্ত্ত। এই মুহূর্ত্ত আবার কাহারও পক্ষে দিবস, কাহারও পক্ষে মাস কাহারও পক্ষে বা বৎসর, যুগ ও মন্বন্তর।

প্রাণায়াম
পূরক
কুম্ভক
রেচক

প্রাণায়ামের প্রক্রিয়া

বয়স আমার কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইল। ইন্দ্রিয় বৃত্তি একে একে সজাগ হইতেছে, কামনা বাসনা বৃদ্ধি পাইতেছে, রূপ-রসবতী গুণবতী প্রকৃতি সতীকে গাঢ় বাহু বন্ধনে আলিঙ্গনের আকাঙ্ক্ষা চিত্ত সমুদ্রকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিতেছে। তাহার সেই কোকিল কণ্ঠ বিনিন্দিত মধুর মধুর অতি মধুর মর্ম্মবাণী শ্রবণের নিমিত্ত নিতান্ত স্পৃহা জন্মিতেছে। তবে

জীবন ও বিষয়াশক্তি

এস, ওগো হৃদয়ে রাণী, ভুবনের রাণী আদরের ধনী এস!
এস প্রাণের আধার, স্নে পারাবার, সুধার আগার এস!
এস মানসী প্রতিমা, প্রীতি মধুরিমা, চকোর চন্দ্রমা এস!
এস চাতকের আশা, চিরভালবাসা অপরূপবেশে এস!
এস জীবের জীবন, জগৎমোহন, প্রিয় প্রাণধন এস!
এস নভোনীলিমায় লীলা ভঙ্গিমায় উজ্জ্বল ছটায় এস!

এস তুমি, মধুমাসের মলয়মারুতে মুখমণ্ডল মণ্ডিত করিয়া পূর্ণ আবেশে এস। আমার তৃষিত শীতল কাতর ওষ্ঠাধরে তোমার দিব্যগন্ধী রক্ত ওষ্ঠাধর নিপীড়িত কর, বদন সুবাসে মুখগহ্বর পূর্ণ কর। এই দীনভক্ত চির অনুরক্ত হউক, নাসিকারন্ধ্র পরিতৃপ্ত হউক। দেহে মনে প্রাণে তড়িৎ প্রবাহ ছুটিয়া চলুক, অঙ্গে অঙ্গে পুলকের বিলাসনৃত্য আরম্ভ হউক। বড় তৃষিত—বড় পীড়িত আমি; অমৃতস্রাবিনা সুধাবর্ষণে তৃষ্ণা বিদূরিত কর; প্রণয় মধুর সস্নেহ আলিঙ্গনে সকল পীড়ার অবসান কর, সর্ব্বেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হউক, চরিতার্থ হউক। উৎকর্ণ কর্ণকুহরে মন্দ মধুর বর্ণাবলীতে বলিয়া দাও, ওগো তোমার ও আমার এই পবিত্র বন্ধন যেন অনন্তকাল অক্ষয় অজর অমর ও অটুট হইয়া থাকে। যতদিন চন্দ্র সূর্য্যের অস্তিত্ব থাকিবে, যতদিন মহীতলে গঙ্গাদেবীর স্রোতোধারা প্রবাহিতা থাকিবে, যতদিন মেরুশেখরে দেবতাদের বাসস্থান নির্দ্ধারিত থাকিবে, যতদিন ঐ সমস্ত দৃশ্য পদার্থের কারণীভূত অদৃশ্য ও অব্যক্ত সূক্ষ্ম পদার্থের সত্তা স্মৃতির মাঝে জাগরূক থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত যেন তোমার ও আমার মাঝে বিচ্ছেদ না হয়—ছাড়া না হয়। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সম্মেলন ও অভেদজ্ঞাপী

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

স্নেহের দান।

(২৪)

কনকের সংস্রবটা মাখনের প্রাণে যেন তপ্ত হওয়ার মত বহিতে লাগিল ; সে যতই তাহাকে মন হইতে ছাড়াইতে চেষ্টা করিত, ততই মন নিবিষ্ট হইয়া তাহারই কথা ভাবিত।

সে দিন মাখন মাসীমার হাতের রাঁধা অন্ন-ব্যঞ্জন খাইয়া যেন মাতৃ গৃহের স্বর্গ-সুখ অনুভব করিল। তারপর হইতে সে মাসীমার পোষা পাখীটার মত হইয়া গেল। আহারান্তে মাসীমার অনুরোধে দ্বিপ্রহরে তাঁহাকে রামায়ণ শুনাইত; বিকালে পুকুর পাড়ে বসিয়া হরকুমারবাবুর সহিত মাছ মারিত ; প্রাতে ও রাত্রিতে মণিমোহনের সহিত বসিয়া পড়িত।

কনকের সহিত মাখন মাসীমার সম্মুখে প্রকাশ্যেই কথাবার্তা বলিতে ভালবাসিত এবং তাহাই সে নিরাপদ বলিয়া মনে করিত কিন্তু কনক তাহা পছন্দ করিত না। কনক মার সম্মুখে কেবল স্বল্প কথায় প্রশ্নের উত্তর দিত, অসাক্ষাতে বাজে কথাও পারিয়া বসিত। এরূপ বাজে আলাপ মাখন পছন্দ করিত না বটে কিন্তু কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর প্রত্যুত্তর না করিয়াও সে থাকিতে পারিত না। এইরূপ অবস্থায় তাহার মনের ভিতর যেন আতঙ্কের ঝড় বহিয়া যাইত। কিন্তু চেষ্টা করিয়াও সে তখন নিরুত্তর থাকিতে পারিত না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাখন মুগ্ধ হইয়া কনকের কথা শুনিত এবং প্রয়োজন মত তাহার মিষ্ট বা কড়া উত্তর দিত এবং সে উত্তরের পর পুনঃ প্রশ্নের যথেষ্ট অবকাশ রাখিয়া দিত।

কথা-বার্তা হইয়া গেলে পর সারা দিন মাখনের মনে সে সকল কথাবার্তার আলোচনা উঠিত। এরূপ আলাপ যে ন্যায় সঙ্গত নহে, তাহা সে খুব বুঝিত ; তাই তাহার প্রাণের পরদা সময় সময় আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিত।

চতুর্দশী দিন দ্বিপ্রহরে মাখন আসিয়া বিছানার উপর চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়াই কনককে বলিল—"দাও দেখি রামায়ণ খানা, আজ তোমাদিগকে শেষ পাঠ শুনাইয়া যাই"!

মাসীমা তখন তাঁহার হবিষ্যের ঘরে ছিলেন। কনক সুযোগ বুঝিয়া—"কেন, মহাশয় যাইবেন কোথায়?" বলিয়া নিজ কথার ভঙ্গির জন্য খুব একদম হাসিয়া ফেলিল।

মাখনও তেমনি ঠাট্টার স্বরে বলিল—"কেন, দাসখত দিয়াছি নাকি, যে রাজবাড়ীর সীমা রেখার ভিতরই নাকে-দড়ি ঘুরিতে হইবে?" মাখনও হাসিল

কনক রামায়ণ খানা মাখনের হাতে দিতে দিতে বলিল —"সে খবর জানি না, কিন্তু কলেজ খোলার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আর গেলেন কোথায়?"

মাখন রামায়ণের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিল —"আপনার আক্ষেপ বুঝি! না?"

কনক হাসিয়া বলিল "যা মনে করেন।"

মাখন বুঝিয়াছিল, এ অনাবশ্যক কথা ; না বলিলে কোন ক্ষতি নাই। তথাপি সে কিন্তু কথা বলিতে বিরত ছিল না। অথচ এদিকে যদি কেহ শুনে, তাহা হইলে যে কি মনে করিবে—সে ভয়ও তার মনে জাগিতেছিল।

এইবার সোজা কথায় মাখন বলিল "কাল বাড়ী চলিয়া যাইব।"

কনক ব্যঙ্গ ছাড়িল না, বলিল—"পদ্মার জলে ডুব দিয়া যাইবেন কি?"

মাখন বলিল "কেন?"

কনক "নন্দীগ্রাম তো পাতালে পদ্মার তলে, সে পথ পদ্মায় না ডুব দিলে পাওয়া যাইবে কি?

মাখন হাসিয়া বলিল—"ও, সেই কথা! আচ্ছা, তুমি এগুলি শুনিলে কোথায়?

কনক খুব বড় একটা কিস্তি দিয়াছে ভাবিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল—"আমি বুঝি শুনি নাই।"

এমন সময় মণিমোহন আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া বলিল—"হাসা হাসি কিসের হে?"

কনক হাসিয়া বলিল—"দাদা শুন! মাখন দা কাল বাড়ী যায় ... "

কনককে কথা বলিতে না দিয়া মণি মাখনকে বলিল তুমি বড়ই বদ রসিক ভাই ; তোমার যে এই এক জপ-মালা হইয়াছে—বাড়ী যাইব—বাড়ী যাইব—বলি আমাদের এই জলজিয়ন্তলালান কোঠা গুলি কি সব অরণ্য?'

মাখন বলি—"ভাই-ভগ্নীতে একত্র মিলিয়া হাসিয়া উড়ইয়া দিলেই কি হয় ভাই? যাইতে হইবে অনেক দিকে, অনেক কর্ত্তব্য আছে; আর কত দিন এখানে বসিয়া থাকিব, বল?'

কনক হাসিয়া বলিল—"দাদা যত দিন বাড়ীতে থাকিবে, তত দিন; ইহার পর আর এক মিনিট ও না।'

মণি হাততালি দিয়া বলিল—'বস,' আমি এই প্রস্তাব অনুমোদন এবং সমর্থন করিতেছি।"

মাখন—"ক্ষমা কর ভাই, আমাকে রায়পুর একবার না গেলেই হইবে না; কাল কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা—না গেলে কিশোরীবাবু দুঃখিত হইবেন। তরপর জেঠা মহাশয়ের খোজে......

মাখনকে কথা বলিতে না দিয়া মণি বলিল—"কিশোরী বাবুর দুঃখটাই বেশী. আমরা বুঝি কিছুই না?"

মাখন বলিল—"প্রতি কথায়ই রাগ করিলে চলিবে কেন?"

কনক—"আপনি চলিয়া গেলে দাদার বিবাহের পাত্রী দেখিতে যাইবে কে।'.

মণি বলিল—"সে জন্যই তোমাকে চাই; নতুবা তোমাকে বাঁধিয়া রাখিয়া আমাদের প্রয়োজন?"

মাখন—'তোমাদের জমিদারী চালে যে আমাদের কুলায় না, আমাদের গরীবের বহু দিকে মন রাখিতে হয়; বরং একটা দিন ঠিক করিয়া দাও. আমি ঘুরিয়া আসিয়া ঠিক সেই নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বে এখানে উপস্থিত হইব।

মণি বলিল—'তুমি বড় দাদাকে দিয়া বাবার মুখ হইতে কথাটা পরিষ্কার করিয়া লও, তারপর কর্ত্তব্য স্থির করা যাইবে; আজই বিকালে হউক না. কি বল তুমি?"

মাখন বলিল—"আচ্ছা, চেষ্টা করিব। কিন্তু জমিদার বাড়ীর কথা—হয়ত কথা বাহির করিতেও দুই চার দশ দিন হাঁটাহাঁটি করিতে হইবে—আমার কিন্তু সে অবসর নাই।"

মণি সে কথাটা স্বীকার করিয়া লইয়া বলিল—"তা মানি, কিন্তু তোমার চলিয়া যাইতে হইলেও তো বাবাকে বলিয়া যাইবে? তাই কর, তুমি বড় দাদাকে লইয়া বাবার নিকট যাও, তোমার যাইবার কথা বল, এই প্রসঙ্গে বড় দা সে কথাও তুলিবেন। বস্, তবেই সহজে সকল মীমাংসা হইবে।'

মাখন—"কলেন পরিচিয়তে—তা দেখিবেই খ'ন।"

মাসীমা আসিলে কতক্ষণ রামায়ণ পাঠ হইল, তারপর উভয়ে যাইয়া হরকুমার বাবুর উদ্দেশ্যে লোক পাঠাইল।

জমিদার বাড়ীর পোষ্যগুলিও অদ্ভুত জীব। পেটের ভাত হজম করিবার জন্য তাহাদের কতগুলি অবশ্য কর্ত্তব্য থাকে; সেগুলি নিদ্রা, তাস, দপা, পাসা ইত্যাদি খেলা; বর্শিতে মাছ ধরা; দালা পাড়ায় বসিয়া আড্ডা, বাজে বকা, আফিং খাইয়া ঝিমান, একের কথা অন্যের নিকট বলিয়া ঝগড়া বাঁধান; মিথ্যা, পরনিন্দা, কর্ত্তার মন রক্ষার্থ অযাচিত মিথ্যাবাদ ও তোষামোদ।

হরকুমার বাবুর সকল বিভাগে অধিকার না থাকিলেও ইহার কতকগুলিতে তাহার বেশ অধিকার ছিল। তাই মণি বাবু—তিনি কি অবস্থায়, কোথায় অবস্থান করিতেছেন—জানিবার জন্য দূত নিযুক্ত করিয়াছিল।

দূত আসিয়া যখন জানাইল, বড় দাদাবাবু জামাখির ঘরে বসিয়া ভাণ্ডারীদের সহিত তাস খেলিতেছেন—তখন মাখনের মুখ ঘৃণায় মলিন হইয়া গেল।"

মণি বলিল—"বড়দা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বর্শি লইয়া বাহির হইবেন, তখনই সুবিধা হইবে।"

মাখনের ঘৃণা বোধ হইতেছিল, সে আর তখন কোন কথা বলিল না।

অপরাহ্নে মণির অনুরোধে মাখন হরকুমারকে ধরিল এবং তাহার যাইবার কথা জমিদার বাবুর নিকট উত্থাপন করিতে অনুরোধ করিল। যদি মণির বিবাহের পাত্রী দেখিতে যাইতে হয় তাহাই বা কবে যাইতে হইবে, ইত্যাদিও জানিয়া দিতে বলিল।

হরকুমার হাসিয়া বলিল—"পিসা মহাশয়ের সহিত লক্ষ্মী পূর্ণিমার পূর্ব্বে আর সাক্ষাৎ হইতে পারিবে না। এখন পূরা মর্শুম চলিতেছে; পূজার জেরই এখনও মিটে নাই। যদি না বলিয়া যাইতে চাও, সচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পার; তোমার কার্য্য নষ্ট করিয়া তাঁহার খোস মেজাজের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। আর যদি তাঁহাকে জানাইয়াই যাইতে চাও,

রাসপূর্ণিমার তিন চার দিন পরে পূজার মর্শুম নিকাশ হইয়া গেলে সাক্ষাৎ হইবে। এখন দেখ চিন্তা করিয়া।

মাখন নিরাশ হইয়া আসিয়া মণিকে জানাইল। মণির নিকট এগুলি অবিদিত ছিল না; সে কিছুই বলিল না।

মাখন ঘৃণা মিশ্রিত হাসি হাসিয়া বলিল—"মর্শুম জিনিষটা কি ভাই?"

মণি অন্য কথা পাড়িল; মর্শুম সম্বন্ধে কোন উত্তরই করিল না।

মাখনের মন জমিদার পুরীতে কিছুতেই বসিতেছিল না। সন্ধ্যার পর সে মাসীমার নিকট আসিয়া চুপি চুপি সেসকল কথা বলিল এবং আগ্রহের সহিত মর্শুমের পরিচয়টা জানিতে চাহিল।

কনক তখন সেখানে ছিল না। মাসীমা মাখনকে চুপি চুপি বুঝাইয়া দিলেন—'পূজার সময় ঢাকা হইতে যে বাই-খেমটার দল আসিয়াছিল, তাহাদের থাকিবার ম্যাদ রাসপূর্ণিমা পর্য্যন্ত; পূর্ণিমার পরদিন তাহাদের বিদায়। এই পর্য্যন্ত তাহারা বাগান বাটীতে থাকে। বাগান বাটীতে তখন অতি জঘন্য কারবার চলিতে থাকে। সেই সংস্রবের লোক ছাড়া অন্য কেহ তথায় যাইতে পারেনা, ম্যানেজার ও না।"

মাখন জিজ্ঞাসা করিল—"মর্শুমটা কি?"

মাসীমা চুপি চুপি বলিলেন "মদ খাওয়া যত দিন শেষ না হয়, ততদিন কে মর্শুম। পূজায় আরম্ভ হইয়া শ্যামা পূজা দীপালী পর্যন্তও মর্শুম চলে।"

মাখন ঘৃণায় ও লজ্জায় মুখ বিকৃত করিয়া বলিল "মাসী মা, আপনারা এমন ভীষণ নরকে বাস করেন!"

মাসী মা বলিলেন—"ভগবান রক্ষা করেন বাবা! এই কয় দিন অপেক্ষা করিয়াই যাও—অনর্থক মণির মনে আঘাত দিয়া যাইওনা। আর কয় দিনইবা?

(২৫)

মণির মনে আঘাত লাগিবে আশঙ্কা করিয়া মাখন শ্যামাপূজার পর—মর্শুমের শেষ পর্য্যন্ত থাকিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল। ইতিমধ্যে গ্রামে ও চতুঃপার্শ্বে হঠাৎ কলেরা দেখা দেওয়ায় মাখনের মনোযোগ তাহাতে আকৃষ্ট হইল। যে দুই একটা রোগীর জন্য সে খাটিতে পারিয়াছিল, তাহাতে তাহার যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ জন্মিয়াছিল। কয়েকদিন বেশ কাটিয়া গেল। মণি আত্মসম্মানের ভয়ে মাখনের এই কার্য্যে প্রাণ খুলিয়া যোগদান করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু তাহাকে গোপনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল।

সামান্য লোকের ন্যায় পীড়িত ছোট লোকের সেবা করায় জমিদার বাড়ীর লোকের চক্ষে মাখনের পদ-মর্য্যাদা অনেকখানি খাটো হইয়া গেল। মাখন কিন্তু সে সম্বন্ধে একেবারেই ভ্রূক্ষেপ করিল না।

কলেরা থামিয়া গেল কিন্তু বাগান বাটীতে মর্শুম থামিল না। দীপালীর পর কলেজ খুলিবে। সুতরাং মর্শুমের অন্তিমকাল অপেক্ষা করিয়া এতদিন বসিয়া থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব। সে পুনরায় হরকুমার বাবুকে ধরিয়া বসিল। তিনি প্রথমে কিছু আপত্তি দেখাইলেন, তৎপর মণির মার সহিত পরামর্শ করিয়া আসিয়া জানাইলেন—"আজ সন্ধ্যার পর তোমার বিদায় মঞ্জুরীর পালা।"

মাখন বলিল "আমি কিন্তু কিছুই বলিতে পারিব না, আপনি সব বলিবেন। আমার নিজের বিদায় মঞ্জুরীর তেমন বিশেষ প্রয়োজন নাই; মণির সম্মতি লইয়া চলিয়া যাইব। আসল কথা, মণির বিবাহের মেয়ে দেখিতে যদি আমাকেও যাইতে হয়, তবে আমিতো আর অপেক্ষা করিতে পারিব না। তারিখ স্থির হইলে বরং সেই তারিখের পূর্ব্বে আসিতে পারিব; তাহাও কলেজ বন্ধের পূর্ব্বে হওয়া চাই।"

হরকুমার "দেখাযাবে 'খন" বলিয়া তাহার কর্ত্তব্য কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পর হরকুমার মাখনকে লইয়া জমিদার বাড়ীর প্রমোদ কাননে প্রবেশ করিলেন।

বাড়ীর সম্মুখে বৃহৎ দীর্ঘিকা দীর্ঘিকার পূর্ব্বতীরে, বাড়ীর ঠিক বিপরীত দিকে বৃহৎ বাগান বাটী। ইহারই নাম প্রমোদ কানন। বাগানের চতুর্দ্দিকে উন্নত প্রাচীর। প্রাচীর অভ্যন্তরে মনোরম উদ্যান। একধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যান গুল্মের বিচিত্র সমাবেশ, অপর ধারে আম্র, লেচু প্রভৃতি কলম জাত ফল বৃক্ষ সজ্জিত। উদ্যানের ঠিক মধ্যস্থলে বৃহৎ অট্টালিকা। অট্টালিকা গায়ে নানা জাতীয় লতা জড়ান, বারান্দায় ও সিড়ীতে নানা প্রকার গাছ ও আগাছা, মৃন্ময় ও চীন্ময় টবে সুরক্ষিত। উদ্যানের ফটক হইতে সর্পাকারে

কুণ্ডলী পাকাইয়া রক্ত ইষ্টক কঙ্কর বিন্যস্ত-সু-দৃশ্য "ফুটপাত" প্রমোদ কাননের নানা দিক ঘুরিয়া সেই প্রমোদ ভবনে গিয়াছে। পদ-পাদুকার পতনের সঙ্গে সঙ্গে সে কঙ্করের কঙ্কর ধ্বনি প্রমোদ ভবনের আমোদ প্রমোদ বাধা দেয়, তাই নিতান্ত অন্তরঙ্গ মোসাহেব ব্যতীত মর্শুম চলিত থাকা কালে অন্য কাহারও সে উদ্যানে প্রবেশ অধিকার নাই। জমিদার বাড়ীর লোকেরা উদ্যানে প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু 'এত্তেলা' ব্যতীত প্রমোদ ভবনে প্রবেশ করিবার অধিকার হরকুমার বাবুর ন্যায় আত্মীয় জনেরও নাই।

হরকুমারের আগমন সংবাদ মজলিসে পঁহুছিল; তাহারা দুইজন বারান্দার অসনে উপবেশন করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ভিতর মজলিস ভরপুর। চৌকির উপর বিস্তৃত ঢালা ফরাসে জমিদার বাবু পাত্র মিত্র গণের পরিবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট। নানা জনের মুখে নানা রকমওয়ারি কথা বাহির হইতেছিল। অধিকাংশই পরনিন্দা ও এইউপলক্ষে জমিদার মহাশয়ের স্তুতিবাদ।

একজন মোসাহেব বলিলেন—'পণ্ডিত হইয়াছে নীল কৃষ্ণের বড় ছেলে-যেন বিদ্যার জাহাজ।"

আর একজন—'আরে ছিঃ ছিঃ! ওটা বিদ্যার জাহাজ, হইলেও তলা ফুটা—কাকস্য পরিবেদনা। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার মুখ হইতে কথা বাহির হয় না, এমন বিদ্যার কোন কাজ?'

তৃতীয় ব্যক্তি "গর্জ্জন কারী বিড়াল কিন্তু অল্পই ইঁদুর ধরিতে পারে। ওর মুখে না আসিলেও পেটে আছে।

৪র্থ-"ছেলে আমাদের মণিবাবু—তবে কিনা আমোদ প্রমোদে মতিটা যেন হঠাৎ দমিয়াই গেল।"

১ম ব্যক্তি—"এর পর কি আর হরকদম আমোদ আহ্লাদ থাকিবে? মহারাজের আমলে যাহা হইল,তা ন ভূতনভবিষ্যতি।"

একজন এই কথায় সায়দিয়া বলিলেন—"ঠিক বলিয়াছ দাদা. পূর্ব্বে রাজা জরাসন্ধ এদানিং রাজবল্লভ—এটা আর হইবে না; মণি বাবুর সময় আমাদের পানটী পাইবার আশা থাকিবে না।"

মোসাহেব ডাক্তার বাবু বলিলেন—"রাজা জমিদারের ছেলে কি কোণের বউটা হইয়া থাকিলে জমিদারী রক্ষা করিতে পারে? জমিদারী শাসনে অনেক মালমসলার দরকার। ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া 'সদা প্রিয়ং ব্রুয়াৎ করিলে, নিত্যং প্রজা বিদ্রোহং ভবেৎ; আর সত্যং ব্রুয়াৎ করিলে. মামলা মোকদ্দমায় হারয়েৎ হইবে সুনিশ্চয়। জমিদারী বড় কঠিন পরীক্ষার স্থান। ওতে একদিকে চাই জাল, জুয়াচুরীতে অভিজ্ঞতা, পঞ্চ মকারে পূর্ণজ্ঞান ও তীক্ষবুদ্ধি; অপর দিকে চাই উচ্চজ্ঞান, প্রশস্ত অন্তঃকরণ এবং আত্মসম্মান বোধ।"

অন্নদা বাবু বলিল—"ঠিক বলিয়াছ ডাক্তার। যুধিষ্ঠির হইলে জমিদারী চলিবে না, দুর্য্যোধন হওয়া চাই। মণি বাবুকে কিন্তু যাই বলুন মহারাজ, কলিকাতায় রাখিয়া একেবারে মাটি করিয়াছেন। চতুর চালাক হইবার স্থান ঢাকা। ঢাকার লোকের সহিত মহারাজ, কলিকাতার লোক কোনদিনই সারিয়া উঠিতে পারে নাই।"

গগন খানসামা বলিল—"আরে ঢাকার মত অতবড় সহরইতো কলিকাতা না। যারে বলে ৫২ বাজার ৫৩ গলি। কথায় ও বলে দিল্লী লাহোর ঢাকার সহর; কলিকাতার তো নামই নাই।"

জমিদার বাবু এইবার জড়িত কণ্ঠে বলিলেন—"বড় ত্রুটীই হইয়াছে হে, ত্রুটীই হইয়াছে! কলিকাতার হোটেলে রাখিয়া এখন নিজের ঘরেই মুখ দেখাইতে পারি না। গিন্নী বলেন—একটী মাত্র ছেলে, তাহাও রাখিলে হোটেলে, যার জাতের সঙ্গে খায়; পান ছাড়িয়াছে, চা ছাড়িয়াছে চুরট ছাড়িয়াছে; ছেঁড়া কাপড় পরে, ছেঁড়া জুতা পায় দেয়, এ রাজার সংসার তবে কিসের জন্য? ছেলেটা যদি ইংরেজী পড়িয়া ব্রহ্মজ্ঞানী হয়, জমিদারী তোমার দেখিবে কে?' কি করা এখন তাই চিন্তা। মণি কিন্তু ছিল আমার খুব তোখার ছেলে! এণ্টেন্সটা পাস হইল কেমন আশ্চর্য্য! দেখ দেখি!"

জমিদার বাবুর মুখ হইতে পুত্রের প্রশংসা কীর্ত্তন হইতে ছিল সময়ই হরকুমার আসিয়া ফরাসের একদিকে বসিলেন। মাখন বারেন্দায় আসনে বসিয়াই মজলিসি গল্প শুনিতে লাগিল।

মোসাহেব বোকা বাবু হরকুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বাবাজি, কোন খবর আছে নাকি?"

হরকুমার জমিদার বাবুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মুখ-

বন্ধ করিল—"পিসিমা বলিয়াছিলেন মণির বিবাহের জন্য ইদিলপুরে মেয়ে দেখিবার জন্য যাইবার বাকি কথা ছিল—লক্ষ্মীপূর্ণিমার পরেই ; লোক পাঠাইতে হয় তো জল থাকিতেই পাঠানো উচিৎ। কার্ত্তিকের টানে জল শুখাইয়া গেলে..."

জমিদার বাবু মোসাহেব খোকা বাবুর দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন—"খোকা বাবু এ ভারতো তোমার উপরই ছিল, তুমি ভুলিয়া গিয়াছ! তোমার এই অগ্রপশ্চাৎ না জানামি ভাব মোটেই আমি পছন্দ করি না। আরে,মাসমাসে যে বিবাহ হওয়া চাইই। এখনি সেই বিষয়ের নিষ্পত্তি হউক। শুভস্য শীঘ্রং। কে কে যাইবে সেখানে? কম্মিকে ডাক, মুন্সী কোথায়? রায়জামান?"

খোকা বাবু গণ্য মানসমামাকে বলিলেন জলদি মুন্সিকে ও বাসীকে লইয়া আয়। কেল্‌ফোর!

মাখন তাড়া দেখিয়া অবাক হইয়া গেল।

হরকুমার জিজ্ঞাসা করিল—"মণিকেও যাইতে হইবে কি?"

জমিদার বাবু আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে বলিলেন—"সে যাইবে কেন?"

অমনি অন্নদা বলিলেন—'না, তিনি যাইবেন কেন?'

যদু লস্কর বলিলেন—'কুমার নিজে যাইবেন কেন? আমরা কিসের জন্য? আমরা ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান দেখিতাম, আর এখন চমসা দিয়াও চোখের সামনে জিনিষটা সুন্দর কি কুৎসিৎ বুঝিব না?"

হরকুমার বলিলেন—'পিসিমা মণিকেও যাইতে বলেন।'

জমিদারবাবু ধমক দিয়া বলিলেন—"মেয়েলোকের কথায় রাজত্ব চলেনা! মণি যাক, ও ছোকরাও তার সঙ্গে পিছু ধরুক! যতসব ছোটলোকের সঙ্গ। বল মণিকে কলিকাতায় রাহু হইয়াছে, তাহাতেই মুখে চূণ কালি পড়িয়াছে ; আর ঐ সঙ্গ না—ঐ সঙ্গে আর থাকিতে দেওয়া হইবে না। তাহাকে জমিদারী শাসন করিতে হইবে, মজুরের মত ছোট লোকের সেবা করিয়া দিন চালাইতে হইবে না। সেবা ধর্ম্ম রাখিয়া রাজধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হইবে।"

জমিদারবাবুর মেজাজ বুঝিয়া একজন মোসাহেব বলিলেন—"কি বলব মহারাজ যে বিড়াল পালে না, তাকে শেষটায় নেংটা ইঁদুরে দৌড়ায়"

কথা শেষ হইতে না হইতে আর একজন বলিলেন—"ঠিক মহারাজ নজর ছোট হইয়া গেলে শেষটায় পস্তাইতে হয় রাজ্য রক্ষা দায় হয়।'

গোপাকাণ্ডারি কলিকাতা হইতে আসিয়াই কর্ত্রী ঠাকুরাণীর নিকট তাহার সকল মনস্তাপের কারণ জানাইয়া বাগান বাটীর কার্য্যে মোতায়েন হইয়াছিল। সে সুযোগ বুঝিয়া বলিল—"আমাদের মহারাজের নজর বাদসাহি নজর, দে বলিতে হাত ভরা, আর কুমারবাবু কিনা—নাই বলিতে কিছুই নাই; লোকের চক্ষে অসম্ভ্রম..."

হরকুমার গোপীর প্রমুখাৎ কলিকাতার খবর শুনিয়াছিল। সেসকল কথার সূত্রপাতের নমুনা বুঝিয়া হরকুমার গোপীর দিকে চাইয়া চক্ষু ঘুরাইলেন। গোপী থামিয়া গল।

কথাবার্ত্তা গোপনে চুপি চুপি হইতেছিল না সুতরাং মাখন বারান্দায় বসিয়া বেশ স্পষ্ট ভাবেই সমস্ত কথা শুনিতেছিল। পারিষদ বর্গের ও জমিদারবাবুর এইপ্রকারের মন্তব্যের পর আর তাহার তিল মুহূর্ত্তও সেখানে অপেক্ষা করা প্রয়োজন দেখিল না। সে হরকুমারবাবুর প্রতীক্ষা না করিয়াই বাগান বাটী ত্যাগ করিল।

(ক্রমশঃ)

অসম্বৃতা।

বিদ্যার্থী অর্জ্জুন যবে বিশ্রামে মগন,
রূপের প্রভায় করি পূর্ণ সে ভবন
উর্ব্বশী আগতা তথা, মদনোন্মাদিনী ;
করেতে কঙ্কন বাজে কটিতে কিঙ্কিনী।
লালসাকুলিত চিত্ত কাঁপে থর থর,
তৃষ্ণায় নয়ন দুটী আরো স্ফুটতর।
গুরু নিতম্বের ভারে ক্লিষ্ট পদতল,
পয়োধর হতে ঝরে স্বেদ অবিরল।
সরম জড়িত কণ্ঠে, সঘন নিশ্বাসে
প্রকাশ করিলা যেই রুদ্ধ অভিলাষে ;
বঙ্কিম অধর পুটে, সহসা তখন
ফাল্গুনী করিলা তারে মাতৃ সম্বোধন!
অভিশাপে জ্বালাময়ী বাসনার চিতা,
অতঃপর নিবাইলা সেই অসম্বৃতা!

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাভূষণ।

ময়মনসিংহের প্রাচীন কথা।

ভূতের কথা।

৪৮ বৎসর পূর্ব্বে এই সহরে একটী মহিলা ভূতের সহিত আমার প্রথম দেখা-সাক্ষাৎ হয়। আজকাল অনেক কাগজ পত্রে আমরা অনেক বিলাতিভূতের অদ্ভুত গল্প শুনিতে পাই বটে কিন্তু সে সময় অনেকেই ভূতের কথায় বিশ্বাস করিতেন না; আমার কোনও দিন ভূতে বিশ্বাস ছিল না; ভগবান অবিশ্বাসীর মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিলেন, পরে আমারও ভূতে বিশ্বাস করিতে হইল। এখন যেখানে উকিল প্রসন্ন বাবুর বাসা, ঢাকা ময়মনসিংহ রেল হওয়ায় পূর্ব্বে ঐ স্থানে আমার বাসা ছিল। ঐ বাসার উত্তরাংশে আদালতের মোক্তার ভুবনচন্দ্র রায় বাস করিতেন, দক্ষিণাংশে আমি বাস করিতাম। তখন অখিল নামক আমার একটী প্রিয়ছাত্র আমার নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া এই জেলার বাট্টাগ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাড়ী থাকিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করিত। ছাত্রটীর বাড়ী আমার বাড়ীর নিকট, সে আমাকে ঠিক পিতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। এক দিন শেষ বেলায় একখানা পালকী আমার বাসায় উপস্থিত হইল। পালকীর দ্বার উদঘাটিত হইলে দেখিলাম, আমার সেই ছাত্র পালকীর মধ্যে রোগ যাতনায় ছটফট করিতেছে নিকটে গেলে "জ্বরে গেলাম, আমাকে রক্ষা করুন"—বলিয়া অখিল আমার পায় ধরিয়া কান্দিতে আরম্ভ করিল। আমি তাহাকে প্রবোধবাক্যে শান্ত করিয়া যথাশক্তি চিকিৎসা করিতে লাগিলাম। নানাবিধ চিকিৎসা হইল,অবশেষে গোপাল বাবুর নাশ টানা হইল. দুর্ভাগ্য বশতঃ কিছুতেই কিছু হইলনা। সে কখনও অজ্ঞান থাকিত, কখনও উন্মাদের ন্যায় মাতামাতী করিত,প্রলাপ বকিত. আবার কখনও অবসন্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। এই অবস্থায় দ্বাদশ দিন থাকিয়া ত্রয়োদশ দিনে মারা যায়।

মৃত্যুর পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার পরে আমি একামাত্র অখিলের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছি, হঠাৎ ঘরের বাতি নিবিয়া গেল। আমি বাতি আলাইয়া বাড়ীর মধ্য হইতে বাহির হইয়া দেখি রোগীর ঘরের দ্বারে একটী মহিলা ঘরের দিকে মুখদিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পরিধানে ধপ ধপে পরিষ্কার সাদা একখানা ধুতি, বর্ণ ফিট গৌর। পূর্ণিমার রাত্রি, সমস্তই স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। আমি দরজার নিকট হইতে ৭।৮ হাত ব্যবধান থাকিতেই মূর্ত্তি শূন্যে মিশাইয়া গেল, আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

এত বড় একটা অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়াও আমি সে দিকে তত লক্ষ্য করিলাম না কারণ তখন আমার মন ছাত্রের চিন্তায় ব্যাকুল, অন্য চিন্তা হৃদয়ে স্থান পাইতেছিলনা। আমি বাতি নিয়া ঘরে পঁহুছিতেই আবার তৎক্ষণাৎ বাতি নিবিয়া গেল. আমি আবার বাতি আলাইতে বাড়ীর ভিতর গেলাম। বলা বাহুল্য যে সে সময়ও মেচ বাতির ব্যবহার সর্ব্বত্র ছিল না। আমি আমার শয়ন গৃহ হইতে বাতি আলাইয়া বাহির হইতেই আমার সম্মুখে ঘরের দরজায় ঐ মূর্ত্তি পুনরায় স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। হঠাৎ গৃহ হইতে নামিতেই সেই মূর্ত্তি ঘরের এক পার্শ্বে সরিয়া গেল।

আমি তখন বিস্মিত হইয়া কম্পিত স্বরে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভৃত্যকে দুই তিন বার ডাকিলাম। তাহারা শীঘ্র শীঘ্র আমার নিকট আসিল। ভুবন রায় মহাশয়ও আসিয়া কি হইয়াছে, কি হইয়াছে, বলিয়া ডাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম একটা স্ত্রী লোক ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া ছিল, আমি নামিতেই ঘরের পাছে সরিয়া গেল। তাহারা তিনজনেই বাতি নিয়া গৃহেরচতুর্দ্দিক ঘুরিয়া আসিলেন, কিছুই দেখিলেন না; ঘরের পাছ দিয়া বাহির হইবারও পথ ছিল না। রায় মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"আপনার মন ভাল নহে, ভ্রম হইয়াছে, ঘরের পাছে কিছুই নাই।" আমার ছাত্র মারা যায়, সম্মুখে বিভীষিকা দেখিতেছি—এই অবস্থায় রায় মহাশয়ের মৃদু হাসি দেখিয়া মনে কষ্ট হইল, রাগও হইল, মনে করিলাম এই ঘটনা নিয়া নাড়াবাড়ী করিলে রাত্রে যাহারা শুশ্রূষা করিতে ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে আইসে হয়ত তাহারা ভয় পাইয়া আর আসিবে না।

পর দিন আমাকে শোক দগ্ধ করিয়া অখিল ইহ জগত হইতে চলিয়া গেল। তারপর হইতে রাত্রিতে বাহির হইলে আমি প্রায়ই এই মহিলাটীকে দেখিতে পাইতাম। আমার বাড়ীর মধ্যে শুক্লপক্ষের রাত্রেতো স্পষ্টই দেখিতে পাইতাম। বর্ণ পরিষ্কার চেহারা অতি সুন্দর; ঘোমটা অতি অল্প, সুতরাং মুখমণ্ডল প্রায় সমস্তই দেখা যাইত। এই মূর্ত্তি ছায়া মূর্ত্তির ন্যায় নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত না; সময় সময় তাহাকে

হাঁটিতে চলিতেও দেখিয়াছি। যখন পদ বিক্ষেপে একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইত, তখন মৃদু গতিতে একটা মেয়ে লোকই হাঁটিতেছে বলিয়া ধ্রুব বিশ্বাস হইত। হাত দোলাইত, মাথায় ঘোমটা টানিতেও মধ্যে মধ্যে দেখা যাইত।

একদিন আমার স্ত্রী বাহিরে যাইবার পথে ঘরের দরজা খুলিয়াই সম্মুখে ঐ মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই তিনি ত্রস্তভাবে আমাকে জাগাইয়া মূর্ত্তি দেখাইয়া দিলেন। আমি তাহাকে খুব সাহস দিয়া বলিলাম—"এইরূপ মূর্ত্তি অনেক দিন হইতে দেখিতেছি, ইহাতে ভয় করিও না; নিকটে গেলেই পলাইয়া যায়।" এই বলিয়া আমি মূর্ত্তির নিকট গিয়া তাহার অদর্শন পর্য্যন্ত দেখাইলাম। কিন্তু আমার স্ত্রী আর ঘরের বাহির হইলেন না, তাড়াতাড়ী দরজা বন্ধ করিয়া বিছানায় শয়ন করিলেন।

পর দিন রায় মহাশয়ের নিকট পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন—"ভয় করিবেন না, ঐ রূপ একটি স্ত্রী লোকের মূর্ত্তি আমরা অনেক দিন হইতেই দেখিয়া আসিতেছি। পাড়ার সকলেই জানে, কেহ ভয় করেনা; কাহারো কোন অনিষ্টও করেনা। বধুমাতা দেখিয়াছেন, আমি তাহাকে সাহস দিয়া বুঝাইয়া দিব যাহাতে তাহার ভয় দূর হইয়া যায়।"

যখন এই ঘটনা ঘটে তখন আমার পুত্র হয় নাই, তারপর আমার পুত্র শরতের জন্ম হয়।

সে ২১।২২ বৎসর বয়সে আদালতের কার্য্যে প্রবেশ করে; সেই সময় অন্নদা গাঙ্গুলী নামে আদালতের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি পুরোহিত পাড়ায় গোপাল ভট্টাচার্য্যের বাসা ভাড়া করিয়া থাকিতেন। তাঁহার সহিত ঐ মহিলা ভূতের কথাবর্ত্তা পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

উক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় একদিন আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, "কবিরাজ মহাশয়! শুনিয়াছি ঐ পাড়ায় থাকার সময় একটী বিধবা মহিলার সহিত মাঝে মাঝে আপনার দেখা সাক্ষাৎ হইত কিন্তু আমার সহিত কল্য রাত্রে তাহার কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত হইয়াছে। আমি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—কল্য রাত্রে বড় গরম পড়িয়াছিল। অধিক রাত্রে বাহির বাড়ীর ঘরে বসিয়া তামাক খাইতেছিলাম এমন সময় দেখি বাসার সম্মুখের ফটকের বাঁশের খিল খসাইয়া একটী স্ত্রীলোক বাসায় প্রবেশ করিতেছে। এ বাসাটি আবার কে করিল—এইরূপ বার বার বলিতেছে আর আমার সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে। আমি কে, কে? বলাতে বলিল—আমাকে চেন না, আমি আতরজান, আমাকে পাড়ার সকলেই জানে।" ইহার পর আর কিছু দেখিলাম না, সে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি ভূতের সঙ্গে কথা কহিতেছি—এ কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিলাম না, আমি মনে করিলাম; কোথাকার একটা খারাপ মেয়ে লোক বাসায় প্রবেশ করিয়াছে এখনই ইহাকে তাড়াইয়া দিতে হইবে। কিন্তু একা তাহাকে অন্বেষণ করিতে সাহস হইল না। প্রসন্ন বাবুর পুষ্করিণীর পারে একজন পশ্চিমা লোক ছিল, সে আমার বাসায় রোজ দুগ্ধ দিত। একটু অগ্রসর হইয়া তাহাকে ডাকিতে আরম্ভ করিলাম। উত্তর না পাইয়া আবার বলিলাম—শীঘ্র উঠ, বড় আশ্চর্য্য দেখিয়াছি! তখন সে বিছানায় থাকিয়াই বলিল—বাবু ঘরে যান, রাত্রি অনেক হইয়াছে, আর বাহিরে থাকিবেন না। আমি সাহস না পাইয়া অগত্যা গৃহে প্রবেশ করিলাম।

পর দিন ঐ দুগ্ধ ওয়ালা আমার মাতার নিকট আসিয়া জানাইল যে এ পাড়ায় অধিক রাত্রে একটা বিধবা স্ত্রীলোকের চেহারা অনেকেই দেখে, বাবুও বোধ হয় কল্য রাত্রে তাহাই দেখিয়া আমাকে ডাকিতে গিয়াছিলেন; আমি উঠিনাই। আপনি নিষেধ করিবেন, আর কোন দিন ঐরূপ দেখিলে বাবু যেন তাহাকে তাড়াইতে যান না, তাহাতে ভয় পাওয়াও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

অন্নদা বাবু এই আতরজানের কথা শেষ করিলেই আমার স্মরণ হইল বস্তুতঃই আতরজান নামে একটী মুশলমান মহিলা সেই পাড়ায় ছিলেন। এখন যেখানে নির্ম্মলাবাস তাহার একটু পূর্ব্ব দিকেই তাহার বাড়ী ছিল। আমি একবার তাহার বাত রোগের চিকিৎসাও করিয়াছি। তাহার জীবিত অবস্থার চেহারা হাঁটা চলা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নত', আর ভূতের চেহারা হাঁটা চলা ভাব ভঙ্গী ঠিক একরকম, ইহাও তখন স্মরণ করিয়া বুঝিতে পারিলাম। ১২৮১ সন হইতে ১৩০০ সন পর্য্যন্ত আতরজান ঐ পাড়ায় থাকিয়া অনেকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়াছে। শেষ বারে কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত বলিয়াছে। বর্ত্তমানে সেখানে সে আছে কিনা জানিনা, সে পাড়ায় অনুসন্ধান করিলে ঐ ভূতের অস্তিত্ব অনস্তিত্বের খবর পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ন।

বাংলার আম্‌লা।

নিত্য চৌ'পর দিনভর্ কলম
চলছে খস্ খস্ !
মাইনে দশ বিশ, সংসার অচল,
হোক্‌না চৌকস্ !
নাইরে নাই আর অন্তর্ মাঝার
ধর্ম্ম বিশ্বাস !
অন্নচিন্তায় সম্বল শুধুই
দীর্ঘ নিশ্বাস !
পেট্‌টা ভরলেই কিল চড় সকল
সহ্য হয় সব ;
খাটছে হরদম ফুর্‌সৎ কোথায় ?
শান্তি দুর্লভ !

মস্ত বৃক্ষের আওতায় যেমন
ক্ষুদ্র নিস্তেজ ;
তেম্‌নি নিস্তেজ আম্‌লার জীবন,
চিত্ত 'মর্‌গেজ' !
বাদ্‌শা বলছেন, "জল কাৎ গাঙের,
আচ্ছা কুদ্‌রৎ !"
বান্দা হাঁকছেন, "সুন্দর মেজাজ !
আজ্ঞে, আল্‌বৎ !"
চাক্‌রি বাদ্‌শার মর্জ্জির ওপর,
রাখলে থাকবেন !
"দূরহ উল্লুক বেওকুব শুয়ার !"
অম্‌নি ভাগবেন !
করলে দিনরাত কর্ত্তার তোয়াজ,
থাকলে হাত জোড় ;
মিলবে ফৌরন্ পাত্‌লুন পিরাণ্,
হোক্‌না জোচ্চোর।
গিন্নী পরবেন একলাখ টাকার
গওনা রাতদিন ;
ভাগ্যে ঘটবেই ঘরদোর প্রাসাদ,
কাটবে দুর্দ্দিন।

(দিচ্ছে রাইয়ত খোর্‌পোষ, মাথট,
খাজনা আক্‌সার ;
করছে সম্ভোগ দস্তর মাফিক্
ফূর্ত্তি এন্তার !)

থাকতে পায় কই নির্ম্মল মানুষ ?
ঈর্ষা হরদম !
(কুত্তা একমুট ভাত চায়, শুয়ার
বিষ্ঠা কর্দ্দম।)
থাকলে থাকবেন কুক্কুর শৃগাল,
মিলবে পয়জার !
সত্যি একবার হুঙ্কার দে ভাই,
কাঁপবে সংসার !

তুর্কী চীন জাপ আফগান মিশর
জাগলো সব দেশ ;
আফ্রিকার সব কাফ্রি বন্দর
বুঝছি আজ বেশ !
স্বর্গ আপনার দেশটাই তাদের,
চায় না মার্কিন ;
পাচ্ছে মুক্তির আস্বাদ সবাই,
জাগছে দীন হীন !
বলছে, আপ্‌নার দেশটার তারাই
করবে কল্যাণ ;
আত্মনির্ভর, দুর্জ্জয় সাহস,
জাগছে সম্মান।
বিশ্বে আজ সব দুর্ব্বল জাতির
শুনছি হুঙ্কার ;
মত্ত হস্তীর বল সব শিরায়
হচ্ছে সঞ্চার !
ধর্ম্ম ঘট আজ চণ্ডাল মেথর
করছে সব্বাই ;
দেখছি, আম্‌লার বিশ্বাস, গভীর
আত্মবোধ নাই !

গিয়েছে বাংলার সব্বাই খতম,
হায় কি আফ্‌শোষ !
পায়না নিশ্বাস ফেলবার সময়,
একটু সন্তোষ !
অয়ে'দিল্‌খোস সুত্‌রাং মরণ
মরছে তিল তিল ;
আত্ম সম্মান্ আম্‌লার কোথায় ?
হাসছে খিল্‌ খিল্‌ !
কাচ্চা বাচ্চার দুগ্ধের জোগাড়
করতে অস্থির ;
গিন্নী আধপেট খাচ্ছেন তোদের !
মর্দ্দ, খুব বীর !
হায় কি সুন্দর মুখখান প্রিয়ার
বিশ্রী আজকাল !
হাসলে টোল্‌ খায় কই গাল রঙীন !
নাইসে বোল্‌চাল্‌ !
স্বপ্ন সুন্দর উজ্জ্বল নয়ন,
আজকে নিঃসাড় !
কইসে চুম্বন, যৌবন, জীবন,
চিত্ত বিস্তার !
শুন সে দুধহীন, ভর্‌পেট আহার
পায় না হয় রোজ !
বঙ্গে বৌ-ঝির কয়জন পুরুষ
সত্যি নেয় খোঁজ !
আনছো দুইচার পয়সায় যা পাও,
খাচ্ছো একলাই !
বৌরা পায় কই ? ছাই খায় তারাই !
হায় কি খাই-খাই !
এইতো হিন্দুর সংসার মজার,
পাচ্ছে নির্ব্বাণ !
আনছো ফের্ ভাই দুর্ব্বল নারীর
গর্ভে সন্তান ?

অন্ন বস্ত্রের সঙ্কট সদাই,
একটু নাই জ্ঞান ?
করছো নির্ভর ভাগ্যের ওপর,
ভাগ্যে তাই ভয় !

* * * *

জাগ্‌রে দুর্ব্বল !
সত্ত্বশক্তির দুর্জ্জয় প্রতাপ
কর্‌না সম্বল !
দেখবি সব দুখ ফৌরন্ খতম্,
বাড়বে সম্মান ;
বাঁচবে আওলাদ গিন্নার জীবন,
রইবে খান্দান।
বিশ্বে আজ সব বাঁচবার আশায়
জাগলো সবাই !
দেখছি, বাংলার আম্‌লার কেবল
আত্মবোধ নাই !

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

নাসিকে নাসিকাচ্ছেদন।

কেহ যেন মনে না করেন, নাসিকে লেখকেরই নাসিকাচ্ছেদন হইয়াছিল। রামায়ণী যুগে লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন হইয়াছিল বলিয়াই দক্ষিণাপথের এই স্থানটীর এখনকার নাম হইয়াছে নাসিক। বোম্বাই প্রদেশের নাসিক একটী জিলা। গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলের নাসিক রোড্ নামক একটী ষ্টেশন আছে : ষ্টেশন হইতে সহর পর্য্যন্ত ট্রামগাড়ী আছে। এখান হইতে সহর ৩৪ মাইল। ট্রাম সাহায্যে সহরে যাওয়ার বিলক্ষণ সুযোগ আছে। কুলীর মজুরীও এখানে সস্তা। গো-গাড়ীও এখানে দুর্ম্মূল্য নহে।

শীতকাল, শীতে হি-হি করিতে করিতে সারাগায় অলষ্টার মোড়াইয়া ভোরের বেলা নাসিক রোড্ ষ্টেশনে নামিয়া পড়িলাম। প্রাতে নামিতেই চা ওয়ালা চায়ের বাটী সামনে ধরিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল। আমি হিন্দু-চা চাওয়াতে। একজন তিলককাটা, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ চা লইয়া হাজির হইল। গাড়ী আসিবার আগেই চাওয়ালা ব্রাহ্মণেরা তিলক কাটিয়া চা লইয়া বাহির হয়। আমাকে

আধা সাহেব আধা বাঙ্গালী দেখিয়া পঞ্চবটী তীর্থের পাণ্ডারা ফুটবলের মত লুফিয়া লইল। দেখিলাম, দুই একটী পাণ্ডা আমার সহিত বাঙ্গলা ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেও ইচ্ছা করিতেছেন। যিনি ভাল—বাংলা বলিতে পারেন আর একটু একটু ইংরেজী ও কহিতে শিখিয়াছেন আমি তাঁহাকেই পাণ্ডা করিয়া লইলাম। কোন কোন পাণ্ডা নিজেই ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন! কিন্তু অধিকাংশই পাণ্ডাদের ভৃত্য। আমরা ট্রাম না গিয়া একখানা গো গাড়ী ভাড়া করিলাম। গো গাড়ীতে গেলে একবারে পাণ্ডার বাড়ী বা তীর্থ স্থানে গিয়া পঁহুছান যায়।

গো-যান হটর হটর করিতে করিতে আমাদিগকে লইয়া চলিতে লাগিল। পথিমধ্যে পাণ্ডার সঙ্গে তাঁহাদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে গল্প চলিল। অল্পের মধ্যেই তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার সামাজিক বিষয়ই আমরা জানিয়া লইলাম।

পঞ্চবটী বন বেশ রমণীয় স্থান; এমন সুন্দর, সুরম্য স্থান বুঝি ভারতে আর নাই। তাইত শ্রীরামচন্দ্র বনবাস কালের অধিকতর সময় এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। এখান হইতেই লঙ্কাধিপতি দশানন সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এই হইতেই লঙ্কার অধঃপতন সুরু হয়।

গো রথ যখন তীর্থস্থানে আসিল তখন পাণ্ডাজীর ভৃত্য আসিয়া গাড়ী হইতে লট বহর নামাইয়া লইল। আমি গিয়া নদীতীরে একটী সুরম্য অট্টালিকায় আশ্রয় লইলাম। বাড়ীটী বেশ, আমার জন্য একটী খাটিয়া আর কিছু তৈজস পত্র আসিল। পণ্ডাজী আমাকে একাকী দেখিয়া তাদের বাড়ীতেই আমার আহারের বন্দোবস্ত করিলেন। আমিও স্বপাক হইতে রক্ষা পাইলাম। পাণ্ডারা সদ্ ব্রাহ্মণ। সকলেই তিলক কাটা সুতরাং পূজা আহ্নিকের কথা আর জিজ্ঞাসা করিলাম না। আমি চা পান করিয়াছিলাম, সেজন্য ঐদিন তীর্থ শ্রাদ্ধাদিতে আমার অধিকার আছে কিনা এবং দেবদর্শনাদি করিতে পারিব কিনা প্রশ্ন করিলে পাণ্ডাজী কহিলেন "তাতে দোষ, কি? চা তো একটা ঔষধ বিশেষ, "ঔষধার্থে সুরাং পিবেৎ" কহিয়া আজই তীর্থ শ্রাদ্ধ করিতে আয়োজন করিলেন। বুঝিলাম পাছে আমি হাতছাড়া হই, তাই পাণ্ডা প্রভুর এত গরজ!

সুন্দর স্থান, বৃক্ষগুলি সতেজ, যেন পরস্পর ভাই ভাই মিলিয়া আকাসের দিকে ধাবমান হইতেছে। এদিকে কোকিলের কুহু, ময়ূরের কেকা! আরো নানা জাতি পাখীর কত কিছু সুন্দর স্বর লহরি আমাদের শ্রবণ বিবর পরিতৃপ্ত করিতেছিল। সে যেন এক আনন্দ কানন! একটু দেহ মন খারাপ হইলে এখানে কয়টী দিন থাকিলেই বোধ হয় সব সারিয়া যায়। তবে কিনা বাঙ্গালা দেশ হইতে পঞ্চবটী বন অনেক দূরে, সহজে তাহা আমাদের পাইবার উপায় নাই। পঞ্চবটী হইতে একটু দূরে গেলেই হরিণ হরিণীর নৃত্য দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ স্বাধীন নৃত্য দর্শনের মত আনন্দ আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। এইখানেই সীতা মায়ামৃগ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিলেন।

মধ্যাহ্নে গোদাবরী নদীতে স্নানান্তে পিতৃ তর্পণ করিয়া—তীর্থ শ্রাদ্ধ করিলাম। পাণ্ডাদিগকে খরচের পরিমাণ বলিয়া দিয়া ভার দিলেই তাঁরা সব ঠিক ঠাক করিয়া দেন; নিজকে কিছুই করিতে হয় না। এখানকার পাণ্ডাদের কোন দৌরাত্ম্য নাই। সকলেই যেন ভাল লোক। সম্পদে, বিপদেও ইহারা যাত্রীদের সহায়তা করিয়া থাকেন। আহারান্তে পাণ্ডাজীর একজন লোক লইয়া ভ্রমণে বাহির হইলাম, পাণ্ডার লোক আমাকে কেবল দেব দেবীর মন্দিরগুলি দেখাইতে চায়; আমি কিন্তু কেবল তাহাই চাই না আমি চাই যা দেখিতে সুন্দর, যা আমাদের মত অযোগ্যদেরও চক্ষে মনোহর, আর যা যোগী মনলোভা তাই দেখিতে; প্রায় সবগুলি দেবালয়েরই বিচিত্রতা আছে—সেগুলি সবই স্রোতা, পুণ্যতোয়া গোদাবরী তীরে অবস্থিত। আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাত্যের মন্দির গুলির মধ্যে বিশেষত্ব আছে। যাহারা আর্য্যাবর্ত্তের মন্দির দেখিয়াছেন। তাহারা দক্ষিণাত্যের স্থাপত্যশিল্পের কোন কল্পনাই মনে অঙ্কিত করিতে পারিবেন না—এই রূপই এই দুই ভারতের স্থাপত্য নৈপুণ্যের প্রভেদ। পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাট গিরি নাসিকের সন্নিকটবর্ত্তী বিধায়—এখানে পাথরের কোন অভাব নাই, রক্তবর্ণ প্রস্তরদ্বারা মন্দির গুলির কলেবর গ্রথিত; সুতরাং তাহাতে সৌন্দর্য্যের অভাব নাই। এখানে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ প্রভৃতির মন্দিরই বেশী। যেখান হইতে রাবণ সীতাকে

হরণ করিয়া নিয়াছিলেন সেস্থানটাকে সুরক্ষিত করা হইয়াছে। এই তীর্থটার নামই নাসিকাচ্ছেদন। যেখানে বনবাস কালে রাম লক্ষণাদি অবস্থান করিতেন সে স্থান টাও প্রাচীর বেষ্টিত। যাত্রীদিগকে তাহা দেখাইয়া তৎতৎ স্থানের সেবাইতরা কিছু কিছু আদায় করিয়া থাকেন। এই রূপ নকল স্থান ও যে সেখানে অসংখ্য আছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

বাঙ্গালা দেশের মত সে দেশে স্ত্রীলোকদের কঠোর অবরোধ প্রথা নাই। তাই আমারা পথে ঘাটে অসংখ্য রমণীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি। মন্দিরে তাঁহারা আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। ইহাদের মনের বল আছে,স্ফূর্তি ও বিলক্ষণ! উন্নত মস্তকে অমোদের সামনে হাসিমুখে তাঁরা কথা কতই বলিয়াছেন; তাঁহাদের সরলতা দেখিয়া তাঁহাদিগকে দেববালা বলিয়া ভ্রম হওয়া বিচিত্র কি! যে দেশের বীর বালার বীরত্ব কাহিনী আজিও ইতিহাস সাহায্যে আমাদের সম্মুখে অভিনীত হইতেছে, আর যে দেশে শিবাজীর ন্যায় বীরাগ্রগণ্যের জন্ম হইয়াছিল এ হেন প্রদেশ যে আমাদের বঙ্গালা অপেক্ষা উন্নত সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

এখানে সংস্কৃত ভাষার চর্চা অধিক। শিক্ষিতা রমণী প্রায় সকলেই কিছু কিছু সংস্কৃত জানেন। তাঁহারা কেহ কেহ সংস্কৃত ভাষায় আলাপাদি করিতে পারেন। বাঙ্গালী অপেক্ষা এ দেশের হিন্দুরা হিন্দু ধর্ম্মে অধিকতর আস্থাবান। বিলাত বা বিদেশ অভ্যাগত এদেশবাসীরাও হিন্দু ধর্ম্মের আশ্রয়ে আছেন। বাঙ্গালা দেশে সেরূপ লোকদের লইয়া সমাজে দলাদলী হয় কিন্তু এদেশে তেমন হয় না, তাহাদিগকে লইয়া সকলে আহার করেন. সুতরাং তদ্রূপ লোকেরা কখনও ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন না।

যাহাদের স্বামী বর্ত্তমান তাঁহারা ঘোমটা বা মাথায় কাপড় দেননা কিন্তু বিধবা রমণীরা মাথায় সামান্য ঘোমটা বা কাপড় দিয়া থাকেন। এ দেশের লোকেরা দুবেলাই রুটি অথবা লুচি খায়; কেহ কেহ মধ্যাহ্নে অন্নাহারও করিয়া থাকে! ইহারা প্রচুর ঘৃত খাইয়া থাকে। এ প্রদেশে হিন্দুরা মৎস্য মাংস খায়না, আমিষাহারী বাঙ্গালী আমরা, তাই তাহারা যে আমাদিগকে একটু ঘৃণার চক্ষে দেখিবে আশ্চর্য্য কি? এখানে স্ত্রীপুরুষ একত্র মিলিয়া বসিয়া গল্প করে, পথে বাহির হইয়া থাকে— একজন ইহাদের মনে কাল্পনিক ভাবটা আসিতে পারেনা।

এপ্রদেশের রমণী ও পুরুষরা নিমন্ত্রণ ব্যাপারে একত্র বসিয়া আহার করেন। একদিকে রমণীদের পংক্তি, অপর দিকে পুরুষদের পংক্তি। তাহারা প্রায়ই আঙ্গনে বসিয়া আহার করেন।

বিবাহ ব্যাপার প্রায় সর্ব্ব ই একরূপ। বিবাহ ঠিক হইলে বর, কন্যার বাড়ীতে বীর বেশে বীর সাজে সাজিয়া গিয়া বিবাহ করিয়া আসে বরযাত্রী আত্মীয়রাও বরাণু গমন করিয়া থাকে। স্ত্রী-অবরোধ না থাকিলেও স্ত্রীলোকেরা বরাণুগমন করে না। এ প্রদেশে আসিয়া আমি দুই একটা বিবাহ দেখিয়াছি। বর ঘোড়ায় চড়িয়া গেলেও কনে কিন্তু ঘোড়ায় যায়না, আধুনিক কালে বর ও কনে প্রায়ই গাড়ীতে চড়িয়া ঘরে ফিরিয়া আসে। আমাদের দেশে যেমন বিবাহান্তে বউ ভাত, ফুল শয্যাদি প্রথা আছে। সেখানেও তেমন কতিপয় প্রথা আছে। মন্ত্রাদি উদ্বাহ তত্ত্ব হইতেই সংগৃহীত। কলাগাছ পুতিবার ব্যবস্থা কেবল বঙ্গদেশেই প্রচলিত. তাহা আর কুত্রাপি দেখাযায় না। এ জেলায় কয়েকটী পার্ব্বত্য দুর্গ আছে। মারহাট্টা সংগ্রামের সময় এ সকল দুর্গের সৃষ্টি হইয়াছিল। হিন্দু, মুসলমান খৃষ্টানাদি পার্ব্বত্য জাতির সংখ্যাও এখানে কম নহে। ইহারা অধিকাংশই ভীল জাতীয়। মুসলমান রাজত্ব কালেও নাসিক প্রাদেশিক রাজধানী ছিল।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ।

স্মৃতি-পূজা।

"যমুনা" লহরী ও "ভারত বিলাপের" কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ের নাম বাঙ্গালীর নিকট অপরিচিত নহে। কবির "কত-কাল পরে, বল ভারত রে" এবং "নির্ম্মল সলিলে বহিছে সদা তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও" এই প্রসিদ্ধ গান দুইটী তাঁহাকে চিরকাল অমর করিয়া রাখিবে। বাংলার এই নব জাতীয়তার উদ্বোধনের দিনে যে সকল মহাত্মা দেশবাসীর নিকট পূজারীরূপে শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করিয়াছেন, আমাদের এই কবি তাঁহাদের অন্যতম। আমাদের তরুণ সমাজের নিকট এই কবির নাম সমধিক প্রচারিত না থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহার এই অমর সঙ্গীতগুলি যে

অবগত নহেন, এমন বাঙ্গালী বড়ই বিরল। আমাদের মনে হয়, যতদিন দেশাত্মবোধের আদর থাকিবে, ততদিন এই সঙ্গীত গুলির রচয়িতা বলিয়া কবি আমাদের দেশবাসীর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য লাভ করিবেন।

কবির জীবন কাব্যে প্রতিফলিত হয়—ইহা অতি পরিচিত কথা। মানুষের স্বভাব এইযে, কবির কাব্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কবির ব্যবহারিক জীবনের সহিত পরিচয় লাভের ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে। ইহার কারন এই যে, যিনি প্রকৃত কবি তাঁহার ব্যবহারিক জীবনকেও কাব্যের সৌরভে উপভোগ্য ও স্বাতন্ত্র্যময় করিয়া তুলে। এই জন্য লোকে কবির অতি সামান্য কাজও আগ্রহের সহিত অবলোকন করিয়া থাকে এবং কবির বিশেষত্ব ফুটিয়া না উঠিলেও ইহাতে সে ক্ষুন্ন হয় না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমারা কবির কাব্য আলোচনা না করিয়া তাঁহার ব্যবহারিক জীবনের একটী ক্ষুদ্র বিষয়ের অবতারণা করিব। কবি একসময় তাঁহার জনৈক বন্ধুর নিকট চিঠি লিখিতে যাইয়া উহার সহিত একটী কবিতাও লিখিয়া দিয়াছিলেন। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমরা উহা পাঠকবর্গকে উপহার দিব। আশাকরি এই কবিতায় কবির কাব্যের বিশেষত্ব খুঁজিতে যাইয়া কেহ কবির প্রতি অবিচার করিবেন না। কবির এই সামান্য ঘরকন্নার কথাও যেন আমরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারি। এই প্রসঙ্গে কবির কাব্য জীনের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও দিব।

কবি বহুদিন হইতে বঙ্গের বাহিরে আগ্রা-প্রবাসী ছিলেন। "চিরবিশ্রুত ভারত কৌস্তভ তাজগৃহের নিকট "গৃহরূপ নীড়" বাঁধিয়া তিনি অবস্থান করিতেন। যেসময় সাহিত্যাচার্য্য কালীপ্রসন্ন "বান্ধব" সম্পাদন করিতেছিলেন তখন গোবিন্দ বাবু বান্ধবের একজন উৎসাহী লেখক ছিলেন। তিনি বান্ধবে যে লেখা পাঠাইতেন তাহার নীচে নিজের নাম দিতেন না। কেবল 'প্রবাসী' এই কথাটীমাত্র লিখিত থাকিত। বান্ধব সম্পাদকও "প্রবাসীবন্ধু" বলিয়াই সাহিত্য ক্ষেত্রে গোবিন্দ বাবুর পরিচয় দিতেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ "যমুনালহরী" ১২৮১ সনের শ্রাবণের বান্ধবে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইঁহার অন্যতম প্রসিদ্ধ "ভারত বিলাপ' সঙ্গীতটী ইহার পরে রচিত হয় অনন্যকর্ম্মা স্বর্গীয় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জাতীয় সংগীতের প্রথমভাগে বান্ধবের "প্রবাসীবন্ধু" কর্ত্তৃক লিখিত হৃদয় হারিণী "যমুনা লহরী" ও উদ্ধৃত হইয়াছিল। এই সংগ্রহ গীতি পুস্তকই সর্ব্বপ্রথম জাতীয় ভাব-উদ্দীপক সঙ্গীত গ্রন্থ। সমসাময়িক বান্ধব ও সাধারণী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে এই অপূর্ব্ব সংগ্রহের ভূয়সী প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। অতপর ১২৮৮ সনে কবি যমুনা লহরী, ভারতবিলাপ ও অন্যান্য গান এবং কবিতা সংগ্রহ করিয়া গীতি-কবিতা নামে একখণ্ড পুস্তক বাহির করেন। 'গোবিন্দ 'বাবু ঐতিহাসিক প্রবন্ধাদিও লিখিতেন। বান্ধব ও অবসর ইত্যাদি পত্রে, তাহার গদ্য প্রবন্ধও দেখা যায়।

আমরা যে চিঠি উদ্ধৃত করিতেছি উহা ১২৯৪ সনের ১৭ই জ্যৈষ্ঠ কবির নিজ প্রবাসগৃহ আগ্রা হইতে তাঁহার জনৈক বাল্য সখাকে লিখিত হইয়াছিল। ইহাতে কবির ব্যক্তিগত পরিচয়ের সহিত সংসারপথে ভগ্নমনোরথ বন্ধু ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা ,ও বন্ধুবৎসলতার ভাবও প্রকটিত হইয়াছে। পত্রখানা জীর্ণ ও স্থানে স্থানে কীটদষ্ট হওয়াতে অনেক স্থানের পাঠোদ্ধারের জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে। মাঝে মাঝে আমাদিগকে দুই একটা শব্দের যোজনাও করিতে হইয়াছে

চিঠি খানাতে কবি তাহার বাল্যবন্ধুকে লিখিয়াছেন—

"* * * কতকাল পরে যে তোমার পত্র পড়িয়া আজি কি পর্য্যন্ত সুখী হইলাম তাহা বলা যায় না। সংসার কাহাকেও কোথায় নিশ্চিন্ত অন্তঃকরণে এবং নির্ব্বিঘ্নে অন্ন খাইতে দেয় না এইটী জগতের সার্ব্বভৌমিক নিয়ম। তবে আপাততঃ যাহাকে সুখী এবং নির্ভাবনাযুক্ত বলিয়া মনে করা যায় তাহা কেবল অন্তর্গত বিষয়ে দৃষ্টি না থাকার দরুণ। যতক্ষণ পরের গৃহে প্রবেশ না করা যায় ততক্ষণ তাহার সুখ দুঃখ কিছুই জানা যায় না। এই পৃথিবীতে তুমি যে বড় অধিক কষ্টে আছ, এমন কখনও মনে করিও না"। অ'বোধঃ পশ্যতঃ কস্য মহিমানোপচিয়তে, উপর্য্যুপরি পশ্যন্তঃ সর্ব্বএব দরিদ্রতি " আমি এখানে সম্রাটদিগের শ্মশানে প্রায় দুই বেলা ঘুরি এবং দেখি যে সাম্রাজ্যেরই বা শেষ কি হইয়া থাকে। তুমি কেন আক্ষেপ কর?

সময় এক প্রকার উত্তীর্ণ হইয়া যাইবেই। আমি এতদিন নানা অবস্থাচক্রে নানা বেশে নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে আজ প্রায় ১৮ বৎসর যাবৎ এই মোগল সম্রাটের রাজধানীতে চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বনে এক প্রকার সুখে দুঃখে দিনপাত করিতেছি। বয়স প্রায় এখন ৫০ বৎসর আর হয়তো অতি উর্দ্ধে ১০ বৎসর কাল পৃথিবীতে বাসকরি; যেহেতু পিতামহ ৮৫ বৎসরে এবং পিতা ৭৪ বৎসরে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমিও যখন শারীরিক স্বাস্থ্যে তাঁহাদের অপেক্ষান্যূন তখন ৬০ বৎসরের অধিক আমি কখনও জীবিতাশা বাড়াইতে পারিনা। শরীরে রোগ প্রবেশ করিয়াছে এবং সময়ে সময়ে তদ্দ্বারা উৎপীড়িত হইতে হয়। ... ... আমার আয় এখন আগের মত নাই; ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে দিন দিনই কমিয়া আসিতেছে। ছেলেদের পড়ার ব্যয় ভিন্ন আর আর ব্যয়ে যাহা উপার্জ্জন হয় তাহা সমুদায়ই ব্যয় হইয়া যায়। কন্যাদের বিবাহেইত যাহা কিছু পুঁজি ছিল, প্রায় সমস্ত বহিয়া গিয়াছে। বয়স হইয়াছে বলিয়া এখন আর পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা হয় না এবং এ সকল বিষয়ে আর এখন রুচিও নাই। তবে যে পর্য্যন্ত একটী ছেলে না দাঁড়ায়, সেপর্য্যন্ত এ দুর্ভোগ ভোগিতে হইবেই। এই আমার সংক্ষেপ অবস্থা। ... ... চুলগুলি সব পাকিয়া গেছে নাকি? দিদি ঠাকুরাণী আর তুমি কবছর তফাত? আমার কোটি কোটি নমস্কার তাঁহাকে জানাইবে। বৃদ্ধস্য যুবতী ভার্য্যা প্রাণেভ্যোপি গরীয়সী—খুব যত্নের সহিত ব্যবহার করিও ... ... আমাদের এখানে বড় গরম। চিঠি লিখিতে হাতের ঘামে কাগজ ভিজিয়া উঠিতেছে, সুতরাং এখন বিদায় লই। ... ...

ইহার পর চিঠির বাকী অংশ পদ্যে লিখিত। তাহা এইরূপ—

এ শেষ বেলায় এ ঘোর সময়
সন্ধ্যার আকাশ তলে।
কে হে ডাকিতেছ প্রভাতের স্বরে
মধুর মধুর বলে।

প্রক্ষীণ প্রতাপ, প্রক্ষীণ কিরণে
বসি ভানু অস্তাচল,
উঠিল আঁধার, গ্রাসিতে ভারত
ধাঁদি আসে চক্ষুতল।
হয়েছে সকল সাদা হায়! গেছে
রঙ্গ সুরভির সাথে,
ঠক্ ঠক্ করি বাজিছে দশন
বার্দ্ধক্য বরফ পাতে॥
সারা এ দিনের, ঝড়ের ঝাকনে
হয়েছে সব অদৃঢ়,
বহিছে তুফান বিকালের দিন
ক্লান্ত তনু জড়সড়।
এ হেন সময়, এ সন্ধ্যা বেলায়
কে তুমি প্রভাতি তানে,
তুলিছ জাগায়ে, সে সুপ্ত স্মৃতিরে
কাতর কণ্ঠের গানে।
সে সুখ স্মৃতি! শুয়ে যাহা আজি
মনের সুদূর কোণে,
কেন বল তায়, উঠাইছ ডাকি
এ দুরদিন দারুণে।
আছে কিহে আর, এ হৃদি বাগানে
ভাবের সে পুষ্পচয়,
ভাবনা চিন্তার দাপট দলনে
হইয়াছে লয় ক্ষয়।
নাই যে আর সে, হাসির জোচ্ছোনা
খেলিত সদা যা মুখে
ঢেকেছে আঁধারি মেঘ প্রায় তায়
গৃহীর যত অসুখে।
নাহিক সরল ছবি সে, দেখে যা
ভুলিত বাল্যের সখা,
সংসারের পথে ঠোকরে ঠাকরে
হয়ে গেছে কুঁজো বাঁকা॥
নাহিক আর সে, পুলক পবন
বেড়াত নাচিয়া মনে,
সদা স্বগৃহের, আগা পাছা ভেবে
বয়ে গেছে মন সনে।

নাহি এ মধুপে, সে লালিত্য, * *
দিতো পাতি পুষ্পবুক—
মিলনে এবে সে, তলায় গলায়
মুদিয়া নয়ন মুখ।
নাহি এ শরীর, বাগানে * কিছু
হয়ে গেছে সব নাশ,
আছে মাত্র শুষ্ক স্মৃতি ও স্মরণে
তপ্ত সুদীর্ঘল শ্বাস।
আহা! এ সময় এ শেষ বেলায়
এ জীর্ণ উদ্যান ধারে,
হা! কে তুমি আজি; বিঁধিছ মরম
আর্ত্তনাদে হা হা করে।
দেখাইছে কি হে! এ দূর মরুতে
আজি ধন তৃষ্ণানল,
রাজপুতনার এ তপ্ত ধূলায়
মরীচিকা রূপী জল॥
কেনে বিসর্জ্জিছ অশ্রুর প্রবাহ
এ তপ্ত মরু কি ভিজে?
ফেলাইবে যত শোষি যাবে তত
পোড়া যে এ বালি নিজে।
সংসার কটাহ, লোকের প্রাণেরে
তাপিছে যম এ ভবে,
কি রাজা কি প্রজা, দুর্দ্দশা দুর্দ্দিন
পর্য্যায়ে ভেটিছে সবে।
কেন কর খেদ এসেছ যদ্যপি
কেটে এত কষ্ট পথে,
হয়োনা উতাল। যাবে কেটে এও
অল্প পথ কোন মতে॥
বেঁধেছ যদ্যপি গৃহরূপ নীড়
সংসার তরুর গায়
জানইতো বৃষ্টি বাত মাঝে মাঝে
আছাড়িবে আসি তায়।
বেঁধেছে এমন, চালা কে জগতে
লাগেনা তুফান যাতে,
মাথান জানিও ভাবনা ও ভয়
সম্রাটেরো দুধ ভাতে।
অতএব পুছে ফেলে চক্ষু জল,
সাহসে করহ ভর।
দেখ তোমা হতে দুর্ভাগা যে সেও
সাঁতারে ভব-সাগর।
বিহগ কুলায়ে, দোলিয়া দোলিয়া
ঝড়ের বাতাস তলে,
ঢাকিয়া শাবক, শাবকী পাখায়
বিহগীরে করি গলে।
কাঁপাবে যখন শীতে ও বাতাসে,
ডাকিবে করকা ব্যোমে,
রহিও গলায় গলায় সকলে
জড়িয়া প্রেমের ওমে।
ঢালে যে অশ্রুরে অন্য হৃদি স্রোতে
বাড়ায় অশ্রু কেবল।
কাঁদিলে কন্দরে কান্দে সে কন্দর
প্রতিশব্দে অবিকল।
বাওয়ায় যে সাধে আশার লতারে
সুজীর্ণ তরুর গায়,
বাতাসে তাহারে না দেয় বাইতে
ভাঙ্গিয়া ফেলে ধরায়।
সহেনা বোঝায় বোঝা, নাহি ধোয়,
কাদায় গায়ের মাটি,
বিড়ম্বনা সার আশ্রয়ে বুড়ার
দুর্গেতে জর্জ্জর লাঠি।"

কবি তাঁহার পিতা পিতামহের মতই দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন। অল্প কয়েক বৎসর হইল তিনি ৭৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন।

শ্রীঅমৃতলাল চক্রবর্ত্তী।

———::———

একদিনের কথা।

(১)

শাস্ত্রে আছে জীবন অমূল্য। সেই অমূল্য জীবনের অমূল্য সময়টার বিশ বৎসর যখন চলিয়া গেল তখনও বিশ্ব বিদ্যালয়ের অন্তঃসার শূণ্য ছাপের অন্বেষণে উহার পিছু পিছু মরীচিকা ভ্রমে ছুটিতে লাগিলাম। অবশেসে যখন ১৯১০ সনে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছাপের বোঝা মাথায় করিয়া বাহির হইলাম তখন হিসাব নিকাশ করিয়া দেখাগেল, লাভের দিকটা অপেক্ষা লোকসানের দিকটায়ই কাঁটা হেলিয়াছে বেশী। সেই শৈশবের পাঠশালা হইতে ল কলেজ পর্যন্ত প্রাইবেট মাষ্টারের দর্শনী, পরীক্ষার ফী, স্কুলের বেতন, উদরের খোরাক, শরীরের পোষাক, পুস্তকের দাম, খেলার চাঁদা প্রভৃতিতে প্রায় নয় হাজার টাকা খরচ করিয়া বসিয়াছি। এই নয় হাজার টাকার বিনিময়ে পাইয়াছি—ক্ষীণদৃষ্টি,ডিসপেপেসিয়া, রুগ্নশরীর, অকাল বার্দ্ধক্য আর বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাপযুক্ত সোয়াগণ্ডা ডিপ্লোমা পত্র। এই অপার্থিক দান সমষ্টি লইয়াই আমাকে জীবন সংগ্রামে এখন অগ্রসর হইতে হইবে। জীবনের অত্যুৎকৃষ্ট এই বাইশ বৎসর কাল প্রবাসের অন্নজলে শরীর খাটাইয়া সেই শরীরকে অবশেষ ব্যাধির আকর করিয়া লইয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ের যম তাড়না হইতে নিষ্কৃতি পাইতেই মা ধরিয়া বলিলেন—বিবাহ করিতে হইবে। ও সর্ব্বনাশ! এখনও যে ঘরের সেই জগদ্দল বোঝার চাপে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া দম ফেলিতে পারি নাই। আমি একদম নারাজ হইলাম। এত দিন বাড়ী হইতে নিয়া ব্যয় করিয়াছি, আবার তাহাই করিব কখনই হইবেনা। একটা আয়দানীর পথ না করিয়া আর সংসার বৃদ্ধি করা চলিবে না।

নব যৌবনের এই উদ্দীপ্ত প্রতিভার পসরা লইয়া যখন কার্য্য ক্ষেত্রে দাঁড়াইব তখন যে কি সম্মান, কি প্রতিষ্ঠা, কি আদর লাভ করিব তাহা ভাবিয়া একদিন হৃদয়ে কত বল, কত আশার সঞ্চার হইয়া ছিল কিন্তু আজ কার্য্য কালে সে আকাশ কুসুম কল্পনা কোথায়? ক্ষেত্রে আসিয়া চক্ষু মেলিয়া দেখি, সব অন্ধকার। এখানে যার মুরব্বী আছে, সে দাঁড়াইতে পারে। আর পারে; যার ঘরে টাকা আছে। আমার ইহার একটিও নাই। চতুর্দ্দিক চারিদিকেই অন্ধকার দেখিলাম। দুনিয়ার হাল চাল দেখিয়া অবাক হইলাম। বুঝিলাম এত কাল অনর্থকই কাটাইয়াছি। এই বাইশ বৎসর কুলি মজুরের কাজ করিলেও এতদিনে বহু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিতাম। অর্থ না হইলে সমাজে টীকা যায় না। যার অর্থ নাই, সে যত বড় বিদ্যার জাহাজই হউক না কেন, তার আদর নাই।

এম, এ, বি, এল পাশ করিয়া যেমন দশ জনে পুরুষকার দেখায়, আমিও তেমনি বহু সাহেব সুবার সঙ্গে যাতায়াত করিতে লাগিলাম; দেখিলাম একটা এক্‌জিকিউটিব সার্ব্বিস গ্রহণ করিতে পারি কি না? কত সাহেব বাড়ী ঘুরিলাম, কত মেম কে সুপারিশ ধরিলাম, কত চাপরাসিকে সেলাম করিলাম—সকলেই বলে তোমার বড় আত্মীয় কে আছে? কেহই বিশ্ববিদ্যালয় যে চাপরাশ দিয়াছেন সে চাপরাশের দৌড় কত, গতি কি, সে দিকে লক্ষ্য করিলেন না। সাহেব বাড়ীতে হাঁটীতে হাঁটিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। হৃদয়ে একটা নৈরাশ্যের বান ডাকিয়া আসিল।

আমি নিরাশ হৃদয়ে, অবসন্ন প্রাণে অবশেষে আখেরী বিদ্যার আশ্রয় স্থান বারলাইব্রেরীর সরণাপন্ন, হইলাম। সংসারে আপনার বলিতে কেহ ছিল না, একমাত্র সংসারের বাঁধন স্নেহময়ী মা, তিনিও আমার ইদৃশ অবস্থা দেখিয়া শস্তিময়ী মৃত্যুর কোলে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। এইবার ভব বন্ধনের সকল মায়া ডোর কাটাইয়া দিলাম।

আমি ফয়জাবাদেই আইনের পেশা খুলিয়া বসিলাম। পেশা খুলিয়া টাউটারের জাল বিস্তার করিলাম কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা—জালে মক্কেল ধরা পড়িল না। প্রতিদিন দুই প্রহরে শামলা মাথায় বার লাইব্রেরীর এক কোনে গিয়া চেয়ার টানিয়া বসিয়া টানা পাখার বাতাস খাইতাম এবং অগণিত হরকচ্ছম মক্কলের গতিবিধি লক্ষ্য করিতাম,আর গল্পগুজব করিয়া সময় কাটাইতাম। আমার কিশোর জনোচিত শ্মশ্রু বিহীন কোমল মুখের দিকে চাহিয়াই মক্কেল একদম তাহার আগ্রহ দৃষ্টি ফিরাইয়া নিত। তারপর ছায়া দেখিলে দশ হাত দূরে চলিয়া যাইত। আমি কাহা অপেক্ষা কম? যাহার মুখে দুকথা ইংরেজী শুনিলে লজ্জায় ও ঘৃণায় মুখ লুকাইতে ইচ্ছা হয়, তাহার বাড়ীতে মক্কেলের ভিড় দেখিয়া ঈর্ষায় প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আমি চেহারায় সুন্দর, বিদ্যা

বুদ্ধিতে যে কাহারও অপেক্ষা কম একথা হইতেই পারে না। লোকগুলা ঐরূপ পণ্ডিত উকীলগুলির কাছ হইতে একটা উত্তর পাইতে কত তপস্যা করে, তথাপি আমার কাছে ঘেসে না! মনে মনে ভারি রাগ হইত; কিন্তু রাগ করিব কাহার উপর?

(২)

আজ রবিবার। কাছারী যাইতে হইবে না। যাহার মাথা নাই, তাহার আবার মাথা ব্যথা কি? সুতরাং অন্যান্য দিনের মতই উদাস মনে বসিয়া হুকা টানিতে ছিলাম, আর মাঝে মাঝে "পতিত পতত্রে বিচলিত নেত্রে" লোক বিশেষের আগমন প্রত্যাশা করিতেছিলাম।

আমরা পিতামহের কাল হইতেই এই ফয়জাবাদ সহরের অধিবাসী। পিতামহ ঠাকুর এখানে কিছু জমি রাখিয়াছিলেন—পিতৃদেবের মুক্ত হস্তের কল্যাণে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পিতৃদেব ও বহু উপার্জ্জন করিতেন। তিনি আমাকে প্রচুর শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়াই আমার ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত মনে করেন নাই। যৎকিঞ্চিৎ যাহা সঞ্চয় ছিল, তাহা মাতৃশ্রাদ্ধে, পিতৃশ্রাদ্ধে, ভগিনীদের বিবাহে ব্যয় হইয়া কবে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। এখন পাওনা দারদের তাগাদার পালা। আত্মার কথা ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি বলিব! এমন করিয়া আর কতদিন চলিবে? সংসারের এক পেটও যদি এম, এ, বি এল, হইয়া না চালাইতে পারি, উপায় কি?

উপায় নাই—দেখিয়া সংবাদ পত্রের কর্ম্মখালির অনুসরণ করিলাম। এ ঝোঁকও কিছুদিন বাদে নিবিয়া গেল। ফলে খরচের খাতার খরচ খতিয়ান করিয়া পাওয়া গেল ডাক খরচ ১৻৮/৫।

তামাক টানিতে ছিলাম আর এইরূপ অদৃষ্ট নেমির অবস্থা ভাবিতেছিলাম। এমন সময় বাহিরের হাতায় পদশব্দ শুনিলাম।

কে আসে? মক্কেল ত নয়ই। এবিষয় নিশ্চিন্তই ছিলাম; বোধ হয় তাগিদদার—নিশ্চয় তাগাদার খাতা বগলে করিয়া আসিয়াছে।

পদশব্দ ক্রমে বারান্দায় উঠিল। পর মুহূর্ত্তেই একটী ভদ্রলোক গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে একতাড়া কাগজ। লোকটীকে দেখিয়া একটু ভীত হইলাম—"কি চান মহাশয়? ভদ্রলোকটী গৃহে প্রবেশ করিয়া আমার সম্মুখেই ফরাশের উপর বসিলেন। আমিও একটু আশ্বাস্তির শ্বাস ফেলিলাম। তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন

"আপনার নামই বাবু সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়"

"হাঁ আমিই সুশীলকুমার?"

"আপনি মফস্বলে যাইতে পারেন কি? আমি মৈণপুরী হইতে আসিয়াছি। ভিন্ন জেলায় যাইতে হইবে কিন্তু।"

আমি ভৃত্যকে আর একটা তামাকের ফরমাইস করিয়া আমার হাতের হুকাটী সেই ভদ্র লোকের দিকে হাত বাড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম—"মফস্বলে যাইতে পারিব না কেন? আমরা ব্যবসায়ী, মক্কলের চাকর, টাকা পাইলে…"

কথাবার্ত্তাগুলি মক্কেলের সহিত মানান সই গুরু গম্ভীর রকমের হইতেছে কিনা বুঝিয়া দেখিবার জন্য কথার অর্দ্ধ পথে আমি দাঁড়ি টানিয়া চুপ করিলাম।

ভদ্রলোকটি হুকাটা হাতে লইয়া তাহা বৈঠকে রাখিয়া বলিলেন—"আমি তামাক খাই না।"

আহা হা-তবে কেন, তবে কেন, দিন, আমার হাতে দিন।"

আমি ভদ্রতার ভান করিতে করিতে মক্কেল ভদ্রলোকটি তাঁর নিজ আক্কেলের তারিফ দেখাইলেন। তারপর আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"আপনি তবে যাইতে পারেন?"

আমি—"পারিব না কেন?"

তিনি—"কি ফিস হইলে যাইতে পারেন? আমাদের মোকদ্দমা গবর্ণমেণ্টের দাবীর বিরুদ্ধে—এখন নিম্ন আদালতে চলিতেছে—হয়তো বা প্রিভি কাউন্সিল পর্য্যন্ত আমাদের মুনিব জমিদার কে যাইতে হইবে। নিম্ন আদালতেও খুব শীঘ্র যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবে তেমন মনে হয় না—"

বুঝিলাম ভদ্রলোকটী নিজে মক্কেল নহেন। তিনি জমিদারের আমলা; মক্কেল তাঁহার জমিদার; আমি মোকদ্দমার মূল বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—গগড়া নদীর চরভূমি লইয়া গবর্ণমেণ্টের সহিত মোকদ্দমা। গবর্ণমেণ্ট দিয়াড়া বসাইয়া জমিদারের বহু বিস্তৃত এলাকা খাস মহালে পরিণত করিতে চাহিতেছেন—"

"তা বেশ, যাব আমি, আপনারা একটা দৈনিক ফিস ধরিয়া দিবেন। জমিদারের কাজ…

আমার মুখে স্পষ্ট কথা ফুটিতেছিল না। হর্ষে-ভয়ে, আশার আশঙ্কায় আমি যেন সময় সময় বিহ্বল হইয়া পড়িতেছিলাম। এরূপ মোক্কেল যদি ফিরিয়া যায় তবে হয়ত পাগল হইয়া যাইব?

মনে মনে ভগবানের নাম জপ করিতে লাগিলাম, আর টাকার হিসাব আওরাইতে লাগিলাম। ১০৲ টাকা করিয়া রোজ দিলেও মাসে ৩০০৲ তিন শত টাকা! ভগবান রক্ষা করুন! আমি আগ্রহের সহিত ভদ্রলোকর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

তিনি বলিলেন—"আপনাকে আমরা ত্রিশ টাকা করিয়া রোজ হিসাবে দিব। আর যতদিন মফস্বল থাকেন সরকারে খোরাকী, আসা যাওয়ার রেল ভাড়া ..'

আমি আর শুনিবার অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। বলিলাম—'কাগজ পত্র' রাখিয়া যান—টাকার জন্য কি? টাকাতো জীবনে কতই·· টাকাইতো সার সর্ব্বস্ব নহে। মোকদ্দমা প্রতুল করিতে পারিলে আমাদের future prospect কত!"

আমার সম্মতি বুঝিয়া ভদ্রলোকটী একটু কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে তাহার নিজ দস্তুরির অংশের কথা তুলিলেন।

ইঙ্গিত বুঝিয়া আমি তাহাতে সায় দিয়া বলিলাম "সেতো নিশ্চয় পাইবেন—আপনাদের চৌথাই ভাগ নিবেন।, তিনি যেন মন ভার করিয়া রহিলেন।

শেষে স্থির হইল; তাহারা কমিসন তিন ভাগের এক ভাগ দশ টাকা লইবেন, আমি কুড়ি টাকা পাইব। তথাস্তু!

আমার বুক আনন্দে কম্পিত হইতে ছিল বটে, কিন্তু আমার এই আকস্মিক সৌভাগ্য উদয়ের উৎসাহে তখনও গুরুতর আশঙ্কার কারণ ছিল, কেন না তখনও বায়না পাই নাই। দেশে উকীলের অভাব নাই। পাঁচ টাকা নিয়া পঁচিশ টাকা কমিশন দিতে পারে এমন উকীলও ঘাটে পথে রহিয়াছে; সে স্থলে আমার ন্যায় অর্ব্বাচীন উকীলকে কুড়ি টাকা কেন দেবে?

চক্ষু লজ্জা ভাঙ্গিয়া একটু মুলায়েম মুখবন্দের সহিত মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া ফেলিলাম—

"বেশতো আপনাদের প্রাপ্য আপনারা পাইবেন না কেন? এখন বায়না দিন, কাগজ পত্র রাখিয়া যান; আমি দেখিয়া প্রস্তুত হই। বিকালে আসিবেন, এখান হইতেই সন্ধ্যার গাড়ীতে উভয়ে যাত্রা করিব।'

ভদ্রলোকটী একশত টাকার একখানা নোট পকেট হইতে বাহির করিয়া আমার সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন "আপনাকে আপাততঃ এই এক শত টাকা দেওয়া গেল। জমিদারের সরকারে হিসাব দিতে হইবে একখানা রসিদ…

আমি দীর্ঘ নিশ্বাসে হৃদয়ের গুরুভার লঘু করিয়া দিয়া নোট খানা বাক্সে রাখিলাম ও একখানা রসিদ লিখিতে ব্যস্ত হইলাম।

ভদ্রলোকটী বলিলেন "কাগজ পত্র আপনাকে বেশী দেখিতে হইবে না—এই মোকদ্দমা চালাইতে এলাহাবাদ হইতে আমাদের পক্ষে পণ্ডিত কিষণ লাল আসিয়াছেন। আপনাকে জুনিয়ারের কাজ চালাইতে হইবে।"

"ও! পণ্ডিত কিষণ লাল আসিয়াছেন! তিনি যে আমার বাবার ছিলেন একজন বিশিষ্ট বন্ধু।"

কর্ম্মচারিটি বলিলেন—"তিনিই আপনাকে নিতে বলায় আপনাকে নিতে হইতেছে। টেলি করিয়াই আপনাকে নিতে পারিতাম। তবে না আসিলে আমাদের প্রাপ্যটা… আপনি কিন্তু ত্রিশটাকাই বলিবেন।"

আমি রসিদ খানা হাতে দিয়া বলিলাম—'নিশ্চয়।"

মোক্কেল বিদায় করিয়া মনে মনে বড় পস্তাইতে লাগিলাম। পণ্ডিত কিষণলাল আমার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন জানিলে কি দশটা টাকা এইরূপে অদানে অব্রাহ্মণে যায়! তখনই মনে হইল, ভগবান সকলেরই প্রাপ্য পাইবার ব্যবস্থা রাখিয়াছেন—আমি না দিবার কে? ইহাকেই বলে অতি লোভে তাতী নষ্ট।"

নোটখানা বাক্সে পুরিয়া, কিষণ লালের অনুগ্রহ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

এইবার চিন্তা হইল আমার অদৃষ্ট কি তবে ফিরিবার পথে? সরকারের বিরুদ্ধে যাইব তজ্জন্য ভাবনা কি? পুরুষকার দেখাইতে গিয়া আটখানা জুতা নষ্ট করিয়াছি,

কিন্তু লভ্যাতো হইলনা অষ্টরম্ভাও। এখন দেখি অদৃষ্ট কি করেন?

উকীল হইয়া বসিয়াই পিতৃবন্ধু পণ্ডিত কিষণলালের সহানুভূতি ভিক্ষা করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলাম; তিনি তখন উত্তর না দেওয়ায় তাঁহার প্রতি যে রাগও ঘৃণা হইয়াছিল, তাঁহার এই নীরব উপকারে সে রাগ ও ঘৃণা কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে ধুইয়া মুছিয়া গেল। তাইতো! না হইলে কি এই ফয়জাবাদের বার লাইব্রেরীতে আমার ন্যায় চৌকোষ উকীল নাই।

(৩)

দুইমাস কাল প্রায় ক্রমান্বয়ে শুনানী হইয়া মোকদ্দমার লম্বা তারিখ পড়িল। আমরা আপাততঃ মৌনপুরী হইতে বিদায় হইলাম। সেই ভদ্রলোক তাঁহার নিজ প্রাপ্য বুঝিয়া লইয়া আমার প্রাপ্য আমাকে বুঝাইয়া দিলেন এই সময় মধ্যেও আমি কিছু নিয়াছিলাম। সে সকল হিসাব পত্র করিয়া এবং মুক্তহস্তে কর্ম্মচারীদিগকে আরো কিছু বক্সিসদিয়া আমার সঙ্গের সাথী করিলাম—মক্কেলের সাড়ে সাত শত টাকা। তাহাতে নগদ এবং নোট উভয়ই ছিল।

জমিদারের সেই অমলাটী আমার সঙ্গে ষ্টেসনে আসিয়া আমার টিকেট করিয়া নিজেই আমাকে ১ম শ্রেণীর একখানা আরোহীহীন গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া বিদায় হইলেন। টাকার তোড়ার জন্য বারংবার তিনি আমাকে সাবধান করিয়া দিতে ভুলিলেন না। আমি সাবধানেই চারিটা ঘণ্টা একচাপে বসিয়া কোনমতে কাটাইয়া দিব স্থির করিয়া অটল হইয়া বসিলাম।

গাড়ি চলিল। সেই মুহূর্ত্তেই দেখি—দমকা বাতাসের হাওয়ায় যেমন গাড়ীর কপাট খুলিয়া যায় সেইরূপ কপাটটা মেলিয়া গেল এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই একটী ফুল্ল যৌবনা শ্বেতাঙ্গ মহিলা আমার সম্মুখের আসনে আসিয়া ভর্ত্তি হইলেন। আমি দ্বিতীয় সঙ্গী পাইয়া একটু নিশ্চিত হইলাম।

গাড়ী চলিতে লাগিল। আমি নীরবে বসিয়া সে দিনকার পাইওনিয়ার খানা পড়িতে লাগিলাম। হঠাৎ আমার দৃষ্টি শ্বেতাঙ্গ যুবতীর উপর আকৃষ্ট হইল। তিনি আমার তোড়াটীর উপর খুব খর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আছেন। আমি তাঁহার দিকে চাহিবামাত্র তিনি পরিষ্কার হিন্দি ভাষায় আমাকে পৌরুষ ভাবে বলিলেন "বাবু ভাল চাও তো টাকার তোড়া দাও আমায় এখনি দাও—নতুবা আমি শিকল টানিয়া তামাসা দেখাইব—তুমি আমার সম্ভ্রম নষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছ।"

এই কথা বলিয়াই যুবতী হঠাৎ চিং হইয়া গাড়ীর মেঝের উপর শুইয়া পড়িল এবং তাহার পরিস্কার কাল গাউনটাকে ধূলায় ধুসরিত করিয়া ফেলিল।

যুবতীর কথ শুনিয়া ও কার্য্য দেখিয়া আমি তো অবাক। আমার মাথা ঝিম্ ঝিম করিতে লাগিল; মুখে কোন কথাই সরিল না।

ভাবিতে ছিলাম, জীবনের প্রথম গৌরব জনক উপার্জ্জনটা এইরূপ একটা জঘন্য উপায়ে হস্তচ্যুত হইবে? কখনই নহে। কি করিব, নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলাম।

মেম সাহেব পুনরায় উঠিয়া শিকলের দিকে অগ্রসর হইয়া আমাকে ভয় দেখাইলেন এবং তাহার অভিযোগের সাক্ষ স্বরূপ নিজ গাউনটা আমার যেন চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া দিলেন।

যুবতী শিকলের দিকে যাইতেছেন দেখিয়া আমি উত্তির হইয়া পড়িলাম; তখন ধা করিয়া আমার একটা বিলাতি গল্পের কথা মনে পড়িল; আমি পকেট হইতে তাড়াতাড়ি ষ্টাইলোটা লইয়া এক টুকরা কাগজে লিখিলাম—

Deaf & Dumb

Please note here what you mear to say?

যুবতী ও তাড়াতাড়ি তাহার মনোভাব সেই টুকরা কলেজে লিখিয়া আমাকে দেখাইলেন।

আমি কলেজখানা তাহার হাত হইতে টানিয়া লইয়া ক্ষীণ দৃষ্টির ভান করিয়া বাহিরের আলোতে ধরিয়া পড়িলাম, তারপর দলিল পকেটস্থ করিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলাম।

সহজে এতগুলি টাকা যাইতে দিব। জীবন থাকিতে তো না।

যুবতীকে আমার পকেট চড়াও করিতে উদ্যত দেখিয়া আমি স্পষ্ট ভাষায় বলিলাম—

"আমি একজন আইন ব্যবসায়ী; সামলা আমার নিজের সঙ্গে আছে, দলিল ও পকেটে পুরিয়াছি সুতরাং মামলার

আমার এখন মোটেই ভয় নাই। বরং অধিক গোলমাল করিলে এই নিকটবর্ত্তী সম্মুখের ষ্টেসনেই দলিল সাহায্যে পুলিসের গ্রেফতারী বাহির করিব।"

আমার সাহস দেখিয়া ও বাকচাতুর্য শুনিয়া যুবতীর তপ্ত কাঞ্চনাভ মুখ মণ্ডল লাল হইয়া গেল! মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার অমিত পরাক্রম যেন কোথায় পালাইয়া লয় পাইয়া গেল।

যুবতী হিন্দু ঘরের বধুটীর মত আমার হাত ধরিয়া বসিয়া পড়িলেন। এবং আমার নিকট নিজ কার্য্যের জন্য বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

আমি যুবতীকে আসন পরিত্যাগ করিতে বলিয়া হস্ত টানিয়া লইলাম। ভয় তখনও আমার যায় নাই। বহু মেয়ে বোম্বেটের কথা গল্প পুস্তকে পড়িয়াছি। তাহাই আমার পুনঃ পুনঃ স্মরণ হইতে লাগিল।

আমি আত্মরক্ষার জন্য বলিলাম "তুমি এই ষ্টেসনে গাড়ী বদল কর, নতুবা আমি পুলিস ডাকিয়া তোমাকে ধরাইয়া দিব।"

মেয়েটা নামিতে স্বীকৃত হইয়া তাড়াতাড়ি ব্যাগ হইতে টাওয়েল' খুলিয়া লইয়া গাত্রবস্ত্র ও গাউনটা ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিল।

পরবর্ত্তী ষ্টেসনে গাড়ী থামিবামাত্র রমণী আমাকে বিনীত অভিবাদন জানাইয়া নামিয়া পড়িল।

যুবতী কোনদিকে গা ঢাকা দিল, লক্ষ্য করিতে পারিলাম না বটে কিন্তু একটা ভয়ানক বিপদ হইতে ত্রাণ পাইলাম।

ভগবান যে বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন এরূপ বিপদ মানুষের সহজে হয় না, হইলে তাহা সহজে যায় না। নিরাপদে বাড়ী ফিরিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম।

আজ একদিনের কথাই বলিলাম এই রমণীর হাতে আর একদিন পড়িয়া ছিলাম, সে গল্প আর একদিন বলিব। ভগবান রক্ষা কর্ত্তা।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

তর্পণ

অয়ি মাতঃ! অয়ি দেবি, অয়ি মোর চিরপূজনীয়া!
রাণী তুমি, রাজ গৃহ লক্ষ্মী রূপে ছিলে উজলিয়া!
ছিলে তুমি মন্দাকিনী পরিপূর্ণা স্নেহের সলিলে!
মমতার মধুচক্র, মূর্ত্তিমতী মায়া তুমি ছিলে!
দয়ার দক্ষিতে তব অযাচিত ছিল অন্নদান!
বাৎসল্যের উৎস ছিলে,—সন্তানের অনন্ত কল্যাণ!
সতীকুল শিরোমণি, সদা ছিলে পতিগতপ্রাণা;
কটাক্ষে করিলে ব্যর্থ বৈধব্যের বজ্রবহ্নি হানা!
কাঙ্গালের কল্পলতা আশ্রিতের প্রচ্ছদ পালিকা,
জ্ঞানে ছিলে গরিয়সী, সারল্যেতে সরলা বালিকা!
ভক্তিতে করিয়া সিক্ত দেব দ্বিজে সদা আরাধনা!
কামনা কখুতে অম্বু—ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গল কামনা;
আজি তুমি সুরপুরে বহুদূরে কর বিচরণ
তথা হ'তে লহ দেবী সেবকের শোকাশ্রু-তর্পণ।

রামগোপালপুর। শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

সংবাদ।

শোক সংবাদ।

'উদভ্রান্ত প্রেম' রচয়িতা প্রবীন সাহিত্যিক বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় আর ইহ জগতে নাই। তিনি বঙ্গদর্শন মণ্ডলীতে সম্মানিত আসন লাভ করিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর বাবুর প্রথম সাহিত্য জীবন ময়মনসিংহে আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি ময়মনসিংহের তৎকালীন সংবাদ পত্র ভারতমিহিরের প্রতিযোগী 'নবমিহির' পত্র সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়া এখানে আসিয়া ছিলেন। বঙ্গদর্শনের সম সাময়িক জ্ঞানাঙ্কুর পত্রেও তিনি প্রবন্ধ লিখিতেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা পরিমাণে কম হইলেইও মূল্যবান। এক "উদভ্রান্ত প্রেম"ই তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে।

সৌরভ

দশম বর্ষ। | ময়মনসিংহ, পৌষ, ১৩২৯ সন। | দ্বাদশ সংখ্যা।

স্নেহের দান।

(২৫)

পারিষদগণের বিচিত্র মন্তব্য শুনিয়া হরকুমারের লজ্জা বোধ হইতেছিল। তিনি বলিলেন—"তবে আমি যাইয়া পিসিমাকে জানাই—এই কথা।"

জমিদার বাবু বলিলেন—"একেবারে শেষ করিয়া যাও, এ বিষয়ে আর কাল ক্ষয় নিষ্প্রয়োজন।"

বৈদ্যনাথ কর বলিল—"বাইজীদিগকে একেবারে বায়না করিয়া দিলেই হইত; এ বাইজী ছিল বেশ..."

কথা শেষ হইতে না দিয়া কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—"এক দলই বারংবার থাকিবে কেন? হরেক রকম চাই।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"সে হবে'খন-রসভঙ্গ করিও না।"

মুন্সি ও বক্সী আসিলেন, স্ফটিক পাত্র সম্ভার মুহূর্ত্ত মধ্যে অপসারিত হইল। ফরাসের উপর সেরেস্তা বসিল।

বোকা বাবু বলিলেন—"ক খানা নৌকা চাই কিন্তু বক্সী মহাশয় কালই—কোষটা ম্যানেজারকে নিয়া মফস্বল চলিয়া গিয়াছে; পরশু শুভদিন, শুভস্য শীঘ্রং—হরিমোহন, জলদী পণ্ডিত মহাশয়কে লইয়া আইস—ধাই কিরি কিরি যাও।"

জমিদার বাবু আলবুলার নল টানিতে টানিতে বলিলেন—"কে কে যাইবে, ফর্দ্দকর—মুন্সী লিখ।"

জমিদার বাবু বলিতে লাগিলেন, মুন্সী লিখিলেন। "হরকুমার যাইবে, বৈদ্যনাথ মাষ্টার, অন্নদা সেন,—আর কে যাইবে হে?'

জমিদারের আহ্বানে বহু লস্কর বলিল—"মহারাজ যাহাকে আদেশ করেন, সেই যাইবে।"

জমিদার লস্করকে লক্ষ্য করিয়া—"তুমি যাইবে?"

লস্কর বলিলেন—"আপত্তি কি মহারাজ! মহারাজের দ্বিতীয় পক্ষের বেলায় কিন্তু আমিই গিয়াছিলাম।"

বোকা বাবু বলিলেন—"এক হরকুমার বাবাজীই এই দলে বয়সে যুবক—আর যে দেখিতেছি সকলেই বুড়ায় দলে, বুড়াদের পছন্দ নিয়া আবার পাছে মত ভেদ না হয় মহারাজ! আমি বলি কি, ওই মাখন ছোড়াটাও যাক্—নতুবা বাবুর মন উঠিবে না।"

বৈদ্যনাথ প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—"ছেলে ছোকড়ার সহিত কাজ ভাল হইবে না। কার্য্যের প্রোগ্রেম করিয়া দিবেন, "আইটেম বাই আইটেম." মিলাইয়া দেখিয়া আসিয়া কুমার বাহাদুরের নিকট তাহা পেস করিব; পছন্দ হইবে না কেন, আমরা কি চক্ষু লইয়া যাইব না? মেয়ের রূপ বর্ণনা পড়িয়া ও পড়াইয়া চার কালই প্রায় যাইতে বসিয়াছে—এখন সরকারী পেন্সন খাইতেছি—অভিজ্ঞতা কি আমাদের বেশী না তাদের বেশী?"

হরকুমার বলিল—"রাগ করিবেন না, মাষ্টার মহাশয়; আপনাদের সে কালের পছন্দ এখন আর নাই, আপনি সে কালের ভাবে যাহা সুন্দর মনে করিবেন, আমি একালের ভাবে তাহাকেই নিতান্ত কুৎসিৎ মনে করিব।"

বৈদ্যনাথ রাগ করিয়া বলিল—"সৌন্দর্য্য জ্ঞানের যে ইতর বিশেষ আছে, তাহা জানিনা। কালিদাস হইতে গোবিন্দ দাস পর্য্যন্ত সকলেরই কাব্য দেখিয়াছি..."

জমিদার বাধা দিয়া বলিলেন—"আচ্ছা মাষ্টার বল, কি কি দেখিবে? হরকুমারকে বুঝাইয়া বল।"

বৈদ্যনাথ—"বেশ, লেখ হে মুন্সি!"

মুন্সী কলম তুলিয়া বৈদ্যনাথের মুখের দিকে চাহিলেন; বৈদ্যনাথ বলিতে লাগিলেন—

"লেখ, দেহ—তন্বী অর্থাৎ নাতিস্থূল নাতিকৃশ
বর্ণ—শ্যামা
দন্ত—শিখর দশন
ওষ্ঠ ও অধর—পক্কবিম্ব প্রায়
কটি—ক্ষীণ অর্থাৎ সরু
দৃষ্টি—চকিত হরিণীর
নাভি—নিম্ন"

জমিদার বলিলেন—"আর নামিবার দরকার নাই। এই ফর্দ্দ হরকুমারকে দাও, সে তাহার পিসীমাকে দেখাইয়া তাঁহার মন্তব্য লিখিয়া আনিবে—বস্। কাল কিন্তু আর ওজর আপত্তি শোনা হইবে না। বক্সীকে বলিয়া দাও, সরকারী নৌকা ও বোট যেন কাল প্রস্তুত থাকে।

পণ্ডিত মহাশয় আসিয়াছিলেন, তিনি গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার বর্টন আওরাইলেন, তারপর কল্যই দিন স্থির করিতে হইবে শুনিয়া আদেশ মত কার্য্য করিলেন। বারবেলা ও কালবেলা ত্যাগ করিয়া সময় ধার্য্য করিয়া দিয়া বিদায় হইলেন।

বোকা বাবু বলিলেন—"শ্যাম বর্ণটা কি পছন্দ হইবে খোকার? গৌরাঙ্গিনী হওয়া চাই, কি বলেন সেন মহাশয়?"

মাষ্টারের স্ত্রীর শরীরের রং বেজায় কালো বলিয়া সকলেই জানিত। অন্নদা সুযোগ বুঝিয়া বলিলেন—"মহামূর্ত্তি কালীকা দেবী সন্নিভং শরীরশ্রী! তা—যার যেমন রুচি!"

বৈদ্যনাথ শ্লেষ উপেক্ষা করিয়া সংস্কৃত ঝাড়িল—"তপ্ত কাঞ্চন বর্ণাভা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা।"

তখন উভয় দলের মধ্যে মত ভেদ উপস্থিত হইল—শ্যামাঙ্গিনী সুন্দরী, না গৌরাঙ্গিনী সুন্দরী। উভয় পক্ষই সংস্কৃত ও বাঙ্গলা সাহিত্যের নজির উপস্থিত করিলেন। কাহার কথা কে শোনে? মতান্তর ক্রমে মনান্তরে পরিণত হইল। ভদ্র ভাষার পর ইতর ভাষা ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইল! হঠাৎ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া অন্নদা সেন বৈদ্যনাথের মাথায় এক চপেটা ঘাত বসাইলেন; বৈদ্যনাথ তাকিয়ার নীচে লুকাইত শূন্যগর্ভ মদের বোতল টানিয়া লইয়া অন্নদার মুখের উপর সজোড়ে আঘাত করিলেন। বোতল কপালে ও নাকে ঠেকিয়া সশব্দে ভাঙ্গিয়া খান খান হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে ফরাসের উপর রক্ত গঙ্গা প্রবাহিত হইল।

জমিদার বাবু কাণ্ড দেখিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন—"রামসিং! রামসিং!! জলদি নিকাল দাও, বেয়াদপ হারাম জাদা লোক কো! নিকাল দাও ফিলফোর!"

এই ভয়ানক আম হুকুম শুনিয়া অনেক পারিষদ জুতা চাদর ফেলিয়াই সম্মান রক্ষা করিলেন। কেহ কেহ অন্নদা সেনকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া বিদায় হইলেন।

অন্নদার মুখের, নাসিকার ও দন্তের শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করিয়া জমিদার ভয় পাইয়া গেলেন। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—"বোকা বাবু শীঘ্র আমার মাথায় জল দাও। হরকুমার, আমাকে বাড়ীতে লইয়া যাও; তারপর সব পরিষ্কার করিয়া ফেল; কাল পুলিস আসিয়া যেন রক্তের চিহ্নও দেখিতে না পায়। বড় অসম্মানের বিষয়। বলিও আমার……"

জমিদার কাঁপিতে ছিলেন। বোকা বাবু তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া বসিয়া অভয় দিতে লাগিলেন। হরকুমার ঝাড়ি দিয়া নালে মাথায় জল ঢালিতে লাগিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরে ইজি চেয়ারে বহন করিয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরে নেওয়া হইল।

(২৬)

মাখন এখন মণিমোহনের ভালবাসার দাবী ব্যতীত আর কোন দাবীই চিন্তার বিষয় বলিয়া গণ্য করিল না। শরীর খাটাইতে পারিলে ভাতের অভাব কি?

ভগবানের অনুগ্রহে মাখন এ পর্য্যন্ত দারিদ্র্যের তীব্র যন্ত্রণা উপলব্ধি করিতে পারে নাই; তাই জমিদার বাবুর মুখে তীব্র মন্তব্য শুনিয়া তাহার জমিদার নামক জীবের প্রতি যেমন বিতৃষ্ণা বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল, আত্ম জীবনের প্রতিও অনুরূপ ধিকার অনুভব করিতেছিল।

সে ক্ষুব্ধ হৃদয়ে মণিমোহনকে আসিয়া জানাইল—"তোমার পাত্রী দেখিবার ব্যাপারের ঢের বিলম্ব আছে। আমার কাল উষা যাত্রায় যাত্রাই ঠিক—তোমার কোন আপত্তি-বাধা আমি আর শুনিব না।"

মণিমোহন সবিস্তারে সকল আলোচনা মাখনের মুখে শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করিতেছিল। সে আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"কি কি কথা হইল?"

মাখন বিমর্ষ ভাবে বলিল—"আমি কথার ভাব বুঝিয়া চলিয়া আসিয়াছি—মীমাংসা হইতে রাত অনেক হইবে। কাল বড়দার মুখে তুমি সকল কথাই শুনিতে পাইবে। আমি বিদায় হইয়া আসিয়াছি।"

মণিমোহনের প্রাণে আঘাত দিয়া মাখন সুখ অনুভব করিতে পারিবে না, তাই এখানে মাখন প্রকৃত কথা গোপন করিল।

মাখনের মনের গুমট অবস্থা ও বিষণ্ণ ভাব দেখিয়া মণি বুঝিতে পারিল--জমিদারী কথার চালে মাখনের বাস্তবিক বিরক্তি জন্মিয়াছে। সে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—"কালই যাবে তবে?"

"হাঁ, কাল খুব ভোর রাত্রে—উষায়। আমি মাসীমাকে জানাইয়া আসি।" বলিয়া মাখন তাড়াতাড়ি ভিতর বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

মাখন মাসীমার নিকট আসিয়া আর হৃদয়ের বেদনার ভার ঢাকিয়া রাখিতে পারিল না। মাসীমাও তাহার পাংশু মুখের চাহনী দেখিয়াই বুঝিলেন, একটা কিছু ঘটিয়াছে। মাখনের প্রতি বড় হিস্যার সকলেরই যে একটা কঠোর বিতৃষ্ণা ভাব ক্রমে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা ভিতরের ও বাহিরের নানা কাজে ও কারণে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি মাখনের মুখের ও চক্ষের ভাব দেখিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা মাখন, এমন দেখিতেছি যে···"

শীতল বাতাসের পরশ লাগিয়া যেমন জমাট মেঘ জল হইয়া ধরণী প্লাবিত করে মাসীমার স্নেহের পরশে সেইরূপ মাখনের মর্ম্মান্তিক দুঃখ বেদনার রুদ্ধ আবেগ ভাঙ্গিয়া জল হইয়া গেল—তাহার চক্ষের জল বক্ষের ক্ষত বিচিত্র আকারে প্রকাশ করিয়া দিল।

মাসীমাও মাখনের হৃদয়ে একটা আগন্তুক বিপদ উপস্থিত বুঝিয়া দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ছেলে মায়ের নিকট এমন করিয়াই হৃদয়ের অপ্রকাশ্য ব্যথা প্রকাশ করিয়া থাকে।

মাসীমা, বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা মাখন, কি হইয়াছে···"

মাখন বিছানায় পড়িয়া বালিসের উপর মুখ লুকাইয়া কতক্ষণ ফুঁকাইয়া কাঁদিয়া মনের দুঃখ লাঘব করিল; তারপর উঠিয়া বসিয়া বলিল—মাসীমা, কাল ভোরে চলিয়া যাইব; আর আমাকে স্নেহের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবেন না দোহাই আপনার···"

মাখনের ক্রন্দনে মাসীমার ন্যায় কনকেরও চক্ষু হইতে দরদর ধারে জল পড়িতেছিল। সে পিছন ফিরিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল।

মাসীমা মাখনের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে অশ্রু ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলিলেন—"কি হইয়াছে বাবা, আমি কি শুনিতে পারি না?"

মাখন কণ্ঠ ঠিক করিয়া, স্থির হইয়া বলিল—"আপনি নিশ্চয় শুনিতে পাইবেন, কিন্তু মণি যেন না জানিতে পারে—শুনিলে সে মনে আঘাত পাইবে।"

মাখন মাসীমার নিকট অবস্থা বিবৃত করিয়া শেষ বলিল—"মাসীমা বড় লোকের প্রসাদও ভয়ঙ্কর রোষও ভয়ঙ্কর—সকলি ভয়ঙ্কর। আশীর্ব্বাদ করিবেন, আমার ক্ষুদ্রতাই যেন আমাকে রক্ষা করে। দুঃখ মাসীমা—আর কিছুরই জন্য নহে, শক্তি ও স্বাস্থ্য ভগবান যতদিন রাখিবেন, খাটিতে পারিলে অন্নের অভাব হইবে না। দুঃখ আমার জন্য নয়, দুঃখ মণির জন্য—ছেলেটার পরকাল নষ্ট হইবে।"

মাসীমা বলিলেন—"সকলি বাবা শুনিয়াছি। গোপী অনেক কথাই নাকি বলিয়াছে। দুঃখ কি বাবা, ভাতের অভাব কেন হইবে? ভগবান যখন জগতে পাঠাইয়াছেন তখন সে যোগাড় তিনি অবশ্যই করিয়া রাখিয়াছেন। তোমার সেজন্য কোন চিন্তা করিতে হইবে না।"

মাখন—"আর পর প্রত্যাশী হইব না মাসীমা, বাহিরের পর প্রত্যাশা ভিতরের আত্মমর্য্যাদাকে নাশ করিয়া দেয়। দুঃখী আমি, কিন্তু তোমাদের ধনীর সহিত তুলনায় দুঃখী নই; দুঃখীর সহিত তুলনায় দুঃখী। কিন্তু সে তুলনায়ও আমার চেয়ে ঢের দুঃখী রাতদিন শরীর খাটাইয়া মানুষ হইতেছে। আমার মা নাই, চাই শুধু মাতৃস্নেহ, আর অজস্র আশীর্ব্বাদ—যেন না খাইয়াও মানুষ হইতে পারি।"

এমন সময় মণি আসিয়া বাহির হইতে ডাকিল—"মাখন এখানে খুড়ী মা!"

কনক কপাট খুলিয়া দিল; মণি ঘরে আসিয়া বলিল—"তোমার যাওয়া কাল হয় কেমন করিয়া? হাতীতে মাটি খাইয়াছে, গাড়ীটাও সরকারী কাজে মহকুমায় গিয়াছে, ঘোড়ায় তো চড়িতেই জান না।"

মাখন হাসিয়া বলিল—"তোমাদের হাতীতে মাটি খাইয়াছে বলিয়া তো আর আমি মাটি খাই নাই। আর রাস্তা ঘাটের সকল মাটিই হাতীতে খায় নাই। রাস্তা আছে, আমার পা

আছে, রাস্তার উপর দিয়া অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারিব। ৭।৮ মাইল হাঁটিয়া রেল ধরিতে হাতী-ঘোড়া-গাড়ী-পাল্কী-লোক-লস্কর-পাইক-বরকন্দাজ—এ প্রয়োজন হয় তোমাদের।"

মণি বিস্ময়ের সহিত খুড়ীমার দিকে চাহিয়া বলিল—"পাগলের কথা শুনিলেন খুড়ী মা!"

খুড়ীমা হাসিয়া বলিলেন—"পায়ে হাঁটিয়া কেমন করিয়া যাইবে বাবা! এ বাড়ীর কোন আত্মীয় স্বজন হাঁটিয়া গেলে যে বাড়ীর বদনামের কথা—অসম্মানের কথা হয়।"

মাখন হাসিয়া বলিল—"গরীবের পক্ষে জমিদারের সহিত আত্মীয়তা করিতে নাই; নিতান্তই জমিদার যদি গরীবকে আত্মীয় ভাবেন, তাঁর তখন সে অপমান সহ্য করিতেই হইবে।"

মণি দুঃখিত হইয়া বলিল—"যা ইচ্ছা তাই কর।"

মাখন হাসিয়া বলিল—"এখন খাইতে দেন মাসীমা, তারপর ঘুমাই। ভোরে উঠিয়া আমার সহিত আর একটী প্রাণীরও সাক্ষাৎ হইবে না।"

মণি ঠাট্টা করিয়া বলিল—"একটা লোকও সঙ্গে লইবে না! না?"

মাখন—"নিশ্চয় না! একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া বতন—তারপর আর বলা অনাবশ্যক। পুস্তক ক খানা বাঁধিয়া হাতে লইয়া ধাঁ ধাঁ করিয়া চলিয়া যাইব। এই ৮ মাইল স্থান হাঁটিবার কষ্ট সহ্য না করিতে পারিলে জগতে টিকিব কিপ্রকারে হে? বাঁচিয়া, থাকিবার জন্য ঈশ্বর এখানে প্রেরণ করিয়াছেন,—কেবল বাঁচিতে নয়।"

শেষ রাত্রিতে মাখন আসিয়া মাসীমাকে নিদ্রা হইতে তুলিয়া বিদায় লইল। কনক চখের জল মুছিয়া মাখনকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"চিঠি লিখিবেন।"

মাসীমা দুইশত টাকার দুই খানা নোট মাখনের হাতে দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

মাখন নোট দুই খানা চৌকির উপর রাখিয়া বলিল—"মাসীমা কেবল মাতৃস্নেহের কাঙ্গাল আমি, আর কিছুরই নই। কপর্দ্দক হীন দরিদ্র ভিখারী আমি, দুইশত টাকা হাতে পড়িলে যে পাগল হইয়া যাইব। আপনার টাকা কিছুতেই লইব না।"

মাসীমা কাঁদিয়া ফেলিলেন—"বাবা তোর সম্পূর্ণ পড়ার খরচ আমি চালাইব—এই অধিকার মাসীমাকে দিতেই হইবে; বরং মানুষ হইয়া তুই আমার ধার শোধ করিস।"

মাখন বলিল—"মাসীমা আপনি কিছু মনে করিবেন না, আমাকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করুণ; টাকা পয়সার চিন্তা আমার ঈশ্বর ইচ্ছায় প্রকৃতই নাই। যে ঈশ্বর দুনিয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তিনি অবশ্য আমারও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, কেবল গুরুজনের আশীর্ব্বাদ এবং মাতৃস্নেহের আমি প্রার্থী। টাকার স্বচ্ছলতা মানুষকে অনেক সময় কুপথগামী করে।"

মাসীমা মাখনের হাত ধরিয়া তাহাতে নোটগুলি গুজিয়া দিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—"আমার স্নেহের দান, মাখন আমার স্নেহের দান—অগ্রাহ্য করিস না …"

মাখন সে আগ্রহের নিকট নতশির হইয়া বলিল—"তবে দাও মাসীমা, তোমার স্নেহের দান গ্রহণ করিলাম—আর টাকা পাঠাইলে কিন্তু বড় বিরক্ত হইব। আমি কেবল স্নেহের কাঙ্গালী।"

মাখন আর বলিতে পারিল না, তাহার চক্ষু হইতে দরদর ধারে অশ্রু ধারা ছুটিল।

মাসীমারও চক্ষে জল দেখা দিল। তিনি নিজ চক্ষের জল বস্ত্রাঞ্চলে মুছিয়া বলিলেন—"বাবা, স্নেহ ভালবাসা, আহ্লাদ আশীর্ব্বাদও খাওয়া দাওয়া, আসা যাওয়া, চাওয়া দেওয়ার অপেক্ষা রাখে।"

কনকের মুখের উপর প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, এবং মাসীমার চরণ ধুলা লইয়া মাখন ধীরে ধীরে যাত্রা করিল

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

প্রাচীন হিন্দুদিগের বিদেশ পর্য্যটন।

হিন্দুজাতিকে অধুনা অনেকে স্থিতিশীল জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের ধারণা হিন্দুজাতি কূপ মণ্ডুকের ন্যায় ভারতবর্ষেই অবস্থান করিতেন; কখনও ভারতবর্ষের বাহিরে অন্যত্র গমন করিতেন না। কিন্তু আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, মানব সভ্যতার সূতিকাগার—ভারতবর্ষ হইতেই ধর্ম্ম, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, শিল্পকলা প্রভৃতি বিবিধবিষয় শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত, হিন্দু প্রচারকগণ বিভিন্ন দেশে গমন করিয়া তত্ তৎ দেশ বাসীগণকে শিক্ষিত করিয়াছিলেন। কোনও অজ্ঞাত কারণে প্রাচীন হিন্দুগণ

তাঁহাদিগের ভ্রমণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। অথবা তাহা করিয়া গেলেও অতীত কোন রাষ্ট্র বিপ্লবের ফলে তাহা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে কি না, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। যাহা হউক প্রাচীন দেশ সমূহের বিবরণ হইতে আমরা এতৎ সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রাপ্ত হইতেছি, সংক্ষেপে এখানে তাহারই উল্লেখ করিলাম।

প্রাচীন হিন্দুগণ তীর্থ পর্য্যটন উদ্দেশ্যে উত্তর কুরু ও উপমেরু-প্রদেশের (বর্ত্তমান পামীর ও মার্ভের (Merv)এর) মালভূমিতে গমন করিতেন। Vans Kennedy বলেন মার্কণ্ড মুণির আশ্রম সমরকন্দ প্রদেশে ছিল। তদীয় নাম অনুসারে সেই স্থান সমরকন্দ নামে অভিহিত হইতেছে।

আলেকজাণ্ডারের সম-সাময়িক বেবিলনের বেলাস (Belus) গির্জ্জার পুরোহিত Berosus বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন যে, উক্ত গির্জ্জায় রক্ষিত দলিল সমূহ হইতে তিনি অবগত হইয়াছিলেন, বেবিলন দেশে কোনও বৈদেশিক জাতি সমুদ্র পথে আগমন করিয়া স্থানীয় অধিবাসী বৃন্দকে সভ্যতা ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। ঐ দেশে এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিতছিল যে, "পারস্য উপসাগর হইতে কোনও জন্তুর আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহার শরীর মৎস্যের ন্যায়, মস্তক মনুষ্যের ন্যায়, ইহার পুচ্ছ স্ত্রীলোকের পদদ্বয়ের ন্যায় ছিল। ইহার কণ্ঠস্বর মনুষ্যের ন্যায় এবং ইহা স্পষ্ট ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিত। দিবা ভাগে ইহা বেবিলন বাসীদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞান ও সাহিত্য শিক্ষা দিত এবং মন্দির নির্ম্মাণ করিতে শিক্ষা দিত। কিন্তু রাত্রিতে পুনরায় সমুদ্রে নিমজ্জিত হইত।" এই কিংবদন্তী হইতে বেবিলনের অতি প্রাচীন অবস্থাভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই অনুমান করেন যে অজ্ঞ বেবিলন বাসীরা ভারতীয় অর্ণববান কেই জলচর মৎস্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল। তাঁহারা বলেন হিন্দুরাই বেবিলন বাসীদিগকে প্রয়োজনীয় সভ্যতা শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিয়াছিলেন। বেবিলন বাসীরা বলিতেন—এ মৎস্য পারস্য উপসাগর হইতে বাহির হইয়া আসিত। বাস্তবিক এ অনুমান ভিত্তিহীন নহে! যেহেতু ঋগ্বেদে এবং মনু-সংহিতায় প্রাচীন হিন্দুগণের সমুদ্র পর্য্যটনের বিষয়, উল্লেখ* আছে। কিন্তু এখানে আর একটা কথা রহিয়াছে; বেবিলন বাসীরা বলিতেন—এই মৎস্যটী পারস্য উপসাগরের দিক হইতে আসিত। তবে কি বেবিলন বাসীর এই শিক্ষাদাতা আরব জাতি? বেবিলনের ইতিহাস বেত্তা বলেন—না; এই সমুদ্র পর্য্যটন কারী জাতি আরব দেশ বাসী নহে; যেহেতু মহাত্মা মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আরব দেশ বাসীরা ততদূর সভ্য ছিল না।

তাহা হইলে তাহারা পারস্য বাসী? পারস্য দেশবাসীগণ এবং ভারতীয় হিন্দুগণ একই আর্য্য বংশ সম্ভূত এবং উভয়েই আদিম বাসস্থান মধ্য এশিয়া হইতে আগমন করিয়া বিভিন্ন দিকে গমন করিয়াছিলেন। এখন এই দুই জাতির মধ্যে কোন্ জাতি বেবিলনে গমন করিয়া বেবিলনবাসীকে সভ্যতা শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাই বিচার্য্য।

Herodotus এবং Xenophon এই উভয়ের বর্ণনা হইতে আমরা অবগত হই যে "পারস্য বাসীরা পূর্ব্বে খুব উন্নত ছিল না; তাহাদের স্বকীয় কোনও সাহিত্য বা শিল্পও ছিল না। তাহারা তাহাদের প্রতিবেশী সভ্য জাতি হইতেই ইহা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সিন্ধু নদ ও গঙ্গানদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ যখন সভ্যতায়, শিল্পে ও জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নতির উচ্চশিখরে অধিরোহণ করিয়াছিল, তাহার বহু শতাব্দী পরে পারস্যে বর্ণমালা প্রকাশিত হইয়াছিল। এবং ইহার পূর্ব্বেই বেবিলন বাসীরা সুসভ্য জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

Layard বলেন মিসর দেশের প্রাচীন কীর্ত্তি সমূহই সপ্রমাণ করে যে একমাত্র মিসরই পৃথিবীতে সভ্য ও শক্তিশালী দেশ ছিল না। যখন ভারতবর্ষ অত্যন্ত সমৃদ্ধি শালিনী ছিল তখন Sesostris ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। মিসর দেশের ইতিহাসে কোনও সময়েই মিসর বাসীরা নাবিক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। বেবিলন বাসীদিগকে বর্ণমালা ও শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য যে বৈদেশিক জাতি আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারা মিসর বাসী ছিলেন না। তবেই প্রমাণিত হইতেছে যে আরব পারস্য অথবা মিসর বাসী ইহাদের কেহই বেবিলন বাসীদিগকে সভ্যতা শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করেন নাই। হিন্দুরাই তাঁহাদের সভ্যতা ও নাবিক বৃত্তি বশতঃ পারস্য উপসাগর দিয়া অর্ণব পোত আরোহণে বেবিলনে গমনা গমন করিতেন।

* Periplus এর অনুবাদক Dr. Vincent বলেন জরীর কার্য্য সমন্বিত বহুমূল্য বস্ত্রাদি ইউফ্রেটাস নদীর তীরে অবস্থিত হারণ, কান্না ও অন্যান্য নগর হইতে বেবিলনে আনীত হইত।

ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি কিন্তু ঐ নদীর তীরবর্ত্তী অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইত না। তাহা পূর্ব্ব এসিয়ার বহুদূরবর্ত্তী দেশ হইতে আসিত। আরব দেশ পার হইয়া আসিত সুতরাং তাহা ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য দেশ নহে। ইহা সত্য যে বেবিলন বাসীরা বিভিন্ন রংএর বস্ত্র বয়ন শিল্পে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং তাহাদের আরিচ (Arcch) নগরের তাঁত, মেঘনার? তীরে অবস্থিত ঢাকা নগরীর তাঁত অপেক্ষা কোন অংশে কম প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। বেবিলনে প্রস্তুত মশারীর বস্ত্র ও অন্যান্য বস্ত্র বহুমূল্যের বিনিময়ে প্রাচীন রোম দেশে বিক্রিত হইত। কিন্তু ইহা সকলেই অবগত আছেন টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটীস নদীদ্বয়ের তীরবর্ত্তী ভূমিতে তুলা জন্মে না।

Herodotus বলেন, তখন ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোন দেশই তুলার বিষয় অবগত ছিল না। ইহাতে কোনও সন্দেহই নাই যে, বেবিলন বাসীরা শিল্প ও বস্ত্র বয়ণ ও রঞ্জন বিদ্যা, তাহাদের বন্দরে বাণিজ্যার্থ আগত হিন্দুবণিক দিগের নিকট হইতে অথবা ঐ দেশে অবস্থিত ভারতবাসী কারিকর দিগের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছিল।

Colonel Wilford বলেন খৃষ্ট জন্মের ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনে প্রাচ্য দেশ অর্থাৎ পারস্য হইতে দূরে, অবশ্য ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম্ম প্রচারক ও জ্যোতির্ব্বিদগণ আসিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন।

গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ হিন্দুগণের জাতি বিভাগ প্রসঙ্গে নাবিক শ্রেণীকে অন্য এক জাতিতে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুগণের সৈন্য শ্রেণী চারি ভাগে বিভক্ত ছিল—অশ্বারোহী, পদাতিক, রথী ও গজারোহী। ইহা ব্যতীত Strabo রসদ বিভাগ ও নৌ-বিভাগের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

চন্দ্রগুপ্ত ও সেলুকসের মধ্যে যে সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছিল তাহাতে দৃষ্ট হয় যে, আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলুকস তদীয় প্রভুর রাজ্য বৃদ্ধির আশায় ভারতবর্ষে অভিযান করেন; কিন্তু তৎকালে ভারতের সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক তিনি বাধা প্রাপ্ত হ'ন। তৎপরে সিন্ধুনদের পূর্ব্বতীর হইতে সমগ্র ভূমি চন্দ্রগুপ্তকে দিয়া এবং তদীয় দুহিতাকে চন্দ্রগুপ্তের সহিত উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বহুমূল্য উপঢৌকন সমূহ উভয় পক্ষ হইতেই আদান প্রদান করা হইয়াছিল। তৎপর সেলুকস্ তদীয় জামাতা চন্দ্রগুপ্তের নিকট কতিপয় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন মেগাস্থিনিস্। তিনি দ্বি-সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বের তৎকালীন হিন্দু সমাজের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান ঐতিহাসিক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন।

চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোকের রাজত্বের বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে তিনি ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কাবুলের সীমান্ত হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খৃষ্ট পূর্ব্ব ২৬৩ অব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা হইবার কিছুকাল পরেই তিনি, মিসর, সিরিয়া এবং মেসিডনিয়ায়—তাঁহার সহযোগী রাজাগণের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। অশোক পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন, পরে বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার কল্পে Constantine যাহা করিয়াছিলেন, বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার কল্পে অশোকও তাহা করিয়াছিলেন। তিনি হিমালয় পর্ব্বতের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত দেশ সমূহে এবং ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। তদীয় পুত্র মহেন্দ্রকে তিনির সহিত বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারকগণসহ সিংহলেও প্রেরণ করিয়াছিলেন সপ্তদিনে অশোকের প্রেরিত প্রচারকগণ নৌ-যানে গঙ্গানদীর মোহনায় উপনীত হ'ন। এবং আর সপ্তদিনে তাঁহারা সিংহলে পঁহুছিয়া ছিলেন। ইহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে তৎকালে এত অল্প সময়ে বর্ত্তমান সময়ের ষ্টীমারের ন্যায় গমনাগমন করিতে পারিত।

প্রাচীন হিন্দুরা যে আরব দেশেও অবস্থান করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। Dr. Buchanan বলেন কতক জৈন সম্প্রদায় আরব দেশ হইতে আসিয়াছিল। Wilford লিখিয়া গিয়াছেন যে আরব দেশে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণের শিষ্যগণ ছিলেন, যেহেতু আরব দেশের বহুস্থানের প্রাচীন নাম সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষা মুলক। জ্যোতির্ব্বিদ্যা, চিকিৎসা ও অঙ্ক শাস্ত্র আরব বাসীরা হিন্দুদিগের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পরে পাশ্চাত্য দেশে উহার প্রচার হয়।

খৃষ্ট জন্মের ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে কলিঙ্গ দেশ হইতে বহু হিন্দু সমন্বিত একটী হিন্দু অভিযান ভারত মহাসাগরে প্রেরিত হইয়াছিল এবং যবদ্বীপে উপনীত হইয়াছিল। তথায় হিন্দুরা উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন; নগর

নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং তৎস্থানের অধিবাসীদিগকে সুসভ্য করিয়াছিলেন। কালে এই উপনিবেশ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল এবং বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সহিত তাহাদের নানাপ্রকার আদান প্রদান চলিয়াছিল। হিন্দুর ভাষা, হিন্দুর শাস্ত্র কথা, এমন কি হিন্দুর কুসংস্কার গুলিও আজ পর্য্যন্ত ঐ দ্বীপে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তথায় এমন বহু শিলা-লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যাহার ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত। ঐ ভাষায় ঐ দ্বীপের ইতিহাস কাব্য, এবং অন্যান্য বিষয় লিখিত হইয়াছে। এই দ্বীপের পূর্ব্বদিকে বালিদ্বীপ অবস্থিত। এখন পর্য্যন্তও ঐ দ্বীপের অধিবাসীগণ অনেকটা হিন্দুর মত আচার ব্যবহার রক্ষা করিতেছেন।

চৈনিক পরিব্রাজক Fa Hian খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ পরিদর্শন করেন। তিনি যবদ্বীপের সমস্ত অধিবাসীই হিন্দু ছিলেন বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্থলপথে কাবুল হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন কিন্তু দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় হিন্দুর অর্ণব যানে গঙ্গানদী দিয়া ভারতমহাসাগর অতিক্রম করিয়া সিংহলে উপনীত হইয়াছিলেন। সিংহল হইতে তিনি যাভা এবং তৎপরে চীনে গমন করেন। তিনি স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে তিনি হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী নাবিকগণ দ্বারা পরিচালিত অর্ণব পোতে আরোহণ করিয়া গিয়াছিলেন। যবদ্বীপ হইতে আনীত বহু শিব, মূর্ত্তি সূর্য্যমূর্ত্তি ও অন্যান্য দেবতাগণের মূর্ত্তি এখন কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত যবদ্বীপে হিন্দু গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত ছিল।

দক্ষিণ ভারতে প্রাপ্ত রোমান স্বুবর্ণ মুদ্রা হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে প্রাচীন হিন্দুগণের সহিত রোম দেশ বাসীগণের বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। কানানোরের নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামে এই সকল মুদ্রা মৃত্তিকায় প্রোথিত ছিল। প্রায় দুইহাজার বৎসর পরে (১৮৫১ খৃষ্টাব্দে) এই সকল মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার কতকগুলি মুদ্রা এরূপ অবস্থায় ছিল যেন সেগুলি রোমের টাঁকশাল হইতে সদ্য নির্ম্মিত হইয়া আসিয়াছে। সম্ভবতঃ ঐ সকল মুদ্রা হিন্দু বণিকগণের ছিল; তাঁহারা তৎকালীন দেশ-প্রথা অনুসারে মৃত্তিকা গর্ভে তাঁহাদের ধনরত্ন লুক্কায়িত রাখিত।

অত্যাচারী সম্রাট নিরোর রাজত্ব সময় (খ্রীষ্টীয় ৫০ অব্দে) বহু ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ রোম নগরে জ্যোতির্ব্বিদের ব্যবসায় করিতেন। রোমকে জ্যোতির্ব্বিদের কবলে পড়িয়া অদৃষ্টবাদের বিড়ম্বনা ভোগ করিতে দিবেন না বলিয়া সম্রাট নিরো ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদদিগকে রোম হইতে নির্ব্বাসিত করেন।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে বর্ণিত আছে ধনপতি সওদাগর ও তৎপুত্র শ্রীমন্ত সওদাগর বাণিজ্য ব্যপদেশে সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। ইহারা হিন্দুদেবীর (মঙ্গলচণ্ডী) উপাসক ছিলেন। সিংহলের তদানীন্তন রাজা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বিধায় সম্ভবতঃ পিতাপুত্র উভয়কেই কারাগারে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। এই উপাখ্যানে কল্পনার প্রভাব থাকিলেও ইহা হইতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে বাঙ্গালী হিন্দুরা তৎকালে নৌ-যানে আরোহণ করিয়া ভারতমহাসাগর দিয়া দেশ দেশান্তরে বানিজ্যার্থ যাতায়াত করিতেন।

জাহাজ-নির্ম্মাণ বিদ্যা এইক্ষণে হিন্দুদিগের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এ দেশীয় কোনও নৌকাই সাগর সঙ্গম অতিক্রম করিয়া অন্যত্র যাইতে সাহসী হয় না কিন্তু পনর শত বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালীর এ অবস্থা ছিল না।

বঙ্গদেশে পূর্ব্বে নারিকেল বৃক্ষ ছিল না। সিংহল হইতে ইহা আনীত হইয়াছিল। সে জন্যই বোধ হয় ইহা ব্রহ্মার সৃষ্ট ফল নয়, বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট ফল বলিয়া কথিত।

শ্রীহর্ষ প্রণীত চিত্তাকর্ষক নাটক "রত্নাবলীতেও" বর্ণিত আছে যে তৎকালে ভারতবাসীর সহিত সিংহলের বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। এবং সিংহলের রাজকুমারী সাগরিকার সহিত ভারতবর্ষীয় কোনও রাজপুত্রের বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহান্তে দম্পতি-যুগল যখন ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ছিলেন তখন তাঁহাদের জাহাজ জলমগ্ন হয়। রাজকুমারী কিন্তু নিরাপদে ভারতবর্ষের তীরে আনীত হন।

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর অন্তকালে চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান ভারতবর্ষ পরিদর্শন করিয়াছিলেন, একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তদীয় পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তদ্দেশ বাসী হিউ এন সাং দেড়শত বৎসর পরে তীর্থ পর্য্যটন, এবং বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শন শিক্ষাকল্পে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত "Si-in-ki" নামক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রথম ভাগের ভারতবর্ষের অবস্থার বহু বিবরণ অবগত হওয়া যায়।

খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে বহু হিন্দু চিকিৎসক বোগদাদে নীত হইয়াছিলেন এবং তথাকার ঐ প্রসিদ্ধ নগরের হাসপাতালে চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দুইজন হিন্দু চিকিৎসক বোগদাদের বিদ্যোৎসাহী নরপতি খলিফা হারুণ-অল্-রসিদ এর রাজদরবারের চিকিৎসক ছিলেন। ইহাদের সাহায্যে চরক ও সুশ্রুত গ্রন্থদ্বয় আরব্য ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। তিনি হিন্দুচিকিৎসকগণের সহিত কতিপয় হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদকেও তাঁহার রাজসভায় নেওয়াইয়াছিলেন। ঐ হিন্দু আচার্য্যেরা হিন্দুর জ্যোতিষগ্রন্থ "সূর্য্য সিদ্ধান্ত" বেগদাদে অধ্যাপনা করাইতেন। এই দুইটী অতি প্রয়োজনীয় বিস্তার জন্ম আরব্য লেখকেরা স্ব স্ব ইতিহাসে হিন্দুদিগের নিকট প্রচুর কৃতজ্ঞতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর নৌ-বিদ্যার অবস্থা দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে Drake মাত্র একহাজার টনজাহাজে আরোহণ করিয়া ভূ-প্রদক্ষিণ সম্পন্ন করিয়াছিলেন কিন্তু হিন্দুরা ইহার বহুপূর্ব্বেই সমুদ্র পথে নানাস্থানে গমন করিতেন ও বাণিজ্যার্থ বহু পণ্যদ্রব্য ঐ সকল নৌ-যানে পূর্ণ থাকিত। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দী হইতেই এ বিষয়ে হিন্দুদিগের পতনের কাল আরম্ভ হইয়াছে।

সুলতান মামুদের সৈন্য বাহিনী মধ্যে সেনাপতি শিবানন্দ রায় (Sewand Rai) এর অধীনে বহু সংখ্যক অশ্বারোহী হিন্দু সৈন্য ছিল। যে যুদ্ধে সুলতান মামুদের মৃত্যু হয়, সেই যুদ্ধে এই হিন্দুরা বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল।

হিন্দু স্থপতিদিগেরও সুনাম একদিন ভারতের বহির্ভাগে বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহারা সম্মানের সহিত বিদেশে নীত হইতেন। সুলতান মামুদ তাঁহার সুবিখ্যাত মসজিদ Celestal Bridge মথুরা ও কানোজ হইতে হিন্দু স্থপতিগণকে নিয়া নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

Vasco de Gama আফ্রিকার উপকূলে অবস্থিত Mozambique বন্দরে বহু গুজরাটী হিন্দু বণিকের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে একজন হিন্দু নাবিক তাঁহার পথ প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে আফ্রিকা হইতে ভারতমহাসাগরে আনয়ন করে।

সম্রাট আকবরের সময়ে রাজা মানসিংহের অধীনায়কত্বে কাবুল বিজয় সংসাধিত হইয়াছিল। এই রাজপুত বীর সিন্ধুনদ অতিক্রম করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

শ্রীরাজেন্দ্রকিশোর সেন।

সুধায় ক্ষুধায়।

(তোটক ছন্দে)

১

গৃহলক্ষ্মী এসো! কত সইবো জ্বালা!
সদা ঝুরছে আঁখি, সবি বুঝছো বালা।
আজি শূন্য ঘরে শুধু ভাবছি একা!
প্রিয়া, দাওগো দেখা, মোরে দাওগো দেখা!

২

ক্ষমা চাচ্ছি আজি, ক্ষমা কর্ব্বে না কি!
কত দুঃখ দাগা হেথা সইলে থাকি'!
সবি জাগছে মনে, দুখে চাচ্ছি ক্ষমা!
ক্ষমা কর্ব্বে না কি ওগো চিত্তরমা!

৩

পদ-চিহ্ন তব আজো দেখছি ঘরে!
দেহ-গন্ধ ভাসে সাদা শয্যা' পরে!
যবে সইতে নারি ধীরে আস্তে ডাকি!
গুঁজে মুখটা শিরো ধানে শুঁক্‌তে থাকি!

৪

মোরে ভুলতে পারো এটা সত্যি বটে!
তব মূর্ত্তি আঁকা মম চিত্তপটে!
তব মিল্‌টা খুঁজি সদা বিশ্ব জুড়ে!
কিছু মিললে গাহি খোলা স্বপ্ন-সুরে!

৫

কারো চাউনি টুকু বড় লাগছে খাসা!
কারো নাকটি যেন তব বংশী নাসা!
কারো ওষ্ঠে গালে যেন আল্‌তা মাখা!
কারো দেখলে গ্রীবা চুপি' যায় না থাকা!

৬

কেহ পরছে শাড়ী যেন ঠিক সে তুমি!
কত ইচ্ছা করে সেধে গালটি চুমি!
কারো হস্তি-মাথা সম সুশ্রী মাল্লা!
স্মর-অগ্নি জেলে করে জ্যান্ত ভাজা!

৭

কেহ আস্তে হাঁটে, বুকে কাঁপছে চূড়া !
কারে তুলতে কটি হৃদি হচ্ছে গুঁড়া !
তবু কেউ তো নাহি তব তুল্য কোথা !
আছে শান্তি-মধু বধু-চিত্তে হোথা !

৮

তব নগ্ন রূপে আছে অঙ্গ ব্যেপে !
আছে চুম্বনেতে, স্মরি' উঠছি কেঁপে !
প্রেমালিঙ্গনেতে আছে সঙ্গ সুখে !
আছে উচ্চ কুচোপরি কম্প্র বুকে !

৯

'সাধু' ব'লবে যা-তা, কিছু শুনছি নে কো !
মাতে গণ্ডগোলে যত ভণ্ড, দেখো !
ভোগে তৃষ্ণা মেটে, প্রীতি চক্ষে দেখে !—
এসো সম্রাজ্ঞী গো, শুধু মরছি ডেকে !

১০

র'বো যৌবনেরে সদা আঁকড়ে র'বো !
যত দুঃখ-দাগা যেচে এক্‌লা স'বো !
তুমি হাস্তে গীতে ব্যথা হাল্কা করি',
চলো তুল্‌কি তালে মম দুঃখ হেরি' !

১১

নারী, রইছো ভবে—সবি লাগছে ভালো !
সারা বিশ্ব মাঝে একি জ্বালালে আলো !
মনো কুঞ্জবনে মধু গুঞ্জরণে,
কত তন্ত্রী সদা মৃদু মঞ্জুরণে !

১২

ওগো সইতে নারি, দিবা যাচ্ছে ব'য়ে !
তুমি শীঘ্র এসো, কত রইবো স'য়ে !
কত যোদ্ধা কবি তব গর্ভকোষে !
তারা জাগবে কবে মহা রুদ্র রোষে !

১৩

তারা জাগতে নারে মম স্পর্শ ছাড়া !
তারা আনবে দেশে নব সৃষ্টি-ধারা !
তারা চলবে ছুটে মহা হুঙ্কারিয়া !
কত দুস্থ প্রাণে যাবে শক্তি দিয়া !

১৪

গেছো ফজ্‌লি আমের খাঁটি জন্মভূমে !
আছো নিত্য সুখে, তোফা তৃপ্ত ঘুমে !
আমি জাগছি সারা রাতি এম্‌নি করে' !
প্রেম-মুগ্ধা বধূ কেন রইলে সরে' !

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

মায়ের গান

আজ দেশের দশদিকে দশবাহু বিস্তার করিয়া "নাদাপূরিত দিঙ্মুখা, অতি বিস্তার বদনা, নরমালা বিভূষণা" অশান্তি বিরাজ করিতেছে। আজ যেন প্রকৃতি অতীতের ভীষণ প্রতিশোধ লইবার জন্য এই দেশের সুখ শান্তি স্বচ্ছন্দতা, আনন্দ উৎসব প্রভৃতি গুরু ও রুক্ষ শাসনে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। যদি কখনো কোনখানে একটুখানি সজীবতার লক্ষণ দেখা যায়;—ক্রুদ্ধ প্রকৃতি উষ্ণ নিশ্বাসে সেইখানের যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু আনন্দের চিহ্ন,—তাহা ভস্ম করিয়া দিয়া যান। দশদিক ব্যাপিয়া 'শ্মশানালয় বাসিনী' 'ঘোর রাবা মহারৌদ্রী' উগ্রচণ্ডা ধ্বংসকারিণীর তাণ্ডবলীলা ক্ষেত্র! আজিকার এই নিরানন্দময় বঙ্গদেশ ত চিরদিনই এমন ছিল না। যে আকাশ আজি বঙ্গনরনারীগণের ক্ষীণ আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ—অতীতের ইতিহাসে তাহা উৎসব কলরোল পরিপূর্ণ ছিল। বিধি-বিরচিত এই আনন্দ মঠে সেদিন চিরমঙ্গল (?) বিরাজিত থাকিত। দৈব দুর্ব্বিপাকে কোন রাহুর দৃষ্টিতে নিরানন্দ আসিয়া এ দেশে মৌরসী পাট্টা লইয়া বসিয়াছে। যে দেশে পালাক্রমে ছয়ঋতু আপনিই আসিয়া উপনীত হয়; বসন্তের সাড়া পাইলে তৃণশষ্প সহকারে অরণ্যানী ফুলে ফুলে বিভূষিত হইয়া উঠে; শাখায় শাখায় মধুকণ্ঠ বিহঙ্গমগণ কলকণ্ঠে আনন্দ সঙ্গীতে দিক্‌ মুখরিত করিয়া তোলে। আকাশে কুহেলী-মুক্ত নক্ষত্ররাজীর স্পন্দন স্পষ্টীকৃত হয়। যে দেশে উষায়, সন্ধ্যায়, দিনে রাত্রিতে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এক অশ্রান্ত সঙ্গীত মানবের হৃদয়ের তন্ত্রীতে ধ্বনিত হয়; যে দেশে জন্মে সঙ্গীত, মৃত্যুতে সঙ্গীত, সুখে সঙ্গীত, দুঃখে সঙ্গীত;—সে দেশে যে নিরানন্দের চিহ্নও ছিল

না—ইহা কল্পনার কথা নয়,—সত্য। যে দেশের মানুষ জ্ঞান, বিজ্ঞান ও যোগবলে যমালয়ের বিচার পণ্ড করিয়া দিতে পারিত, মৃত্যু ব্যর্থ করিত—অমরত্ব ব্রাহ্মণত্ব—জোর করিয়া আদায় করিয়া লইত; সে দেশে নিরানন্দ সূচ্যগ্র স্থানও পাইবার আশা করিতে পারে কি?—দেশের সে সামর্থ্য ধীরে ধীরে কর্পূরের মত উড়িয়া গিয়াছে;—অদৃষ্টের ফের—বিধাতার অভিসম্পাত! এত সুখ এদেশের সহিল না,—কারো সয় না! আমরা আজ ছাপার হরফে ব্রত পূজা পার্ব্বণের বিধি ব্যবস্থা পাঠ করি, 'ব্রত কথা' শিখি বা পড়ি, পুঁথির পাতায় অতীতের কীর্ত্তি কাহিনী পাঠ করিয়া বিস্মিত হই এবং নিজেদের বাপ দাদাদের নাম কেতাব খুলিয়া জানি। এখন আর ত্রিসন্ধ্যায় ভগবানের নাম স্মরণ করিনা,—মেকলের ইতিহাস পড়ি! এখন আর 'ধর্ম্ম কর্ম্ম' স্পর্শ করি না—প্রয়োজনও নাই, অবসরও নাই। অতীতের কার্য্যকলাপের মূর্খতা আমরা স্পষ্ট দেখি; বাপ দাদার 'আহাম্মুকীর' চিহ্নস্বরূপ 'দেবদ্বিজে' 'অচলা ভক্তির' কথা শুনিয়া সঘৃণ পরিহাস করি। বারমাসের তের পার্ব্বণে পুরোহিত কি লুণ্ঠনটাই যে করিয়াছে;—কি কতকগুলা অনুস্বর বিসর্গ উচ্চারণ করিয়া বামুন বেটারা কাপড়চোপড়, চাউল, পয়সা আদায় করিয়া নেয়,—ভাবিয়া বিস্মিত হই! হায় কি রাজার রাজ্যি, 'অয়রাণ' পড়িয়াছিল রে—আর বাপদাদারা কি 'সিধাবাদী' ছিলেন, যে এমনটাও তাঁহারা অনায়াসে সহ্য করিয়া গিয়াছেন! এমনই করিয়া আমরা দেশের অনেক ভাল ভাল কাজ উপেক্ষার দৃষ্টিতলে, আবর্জ্জনাস্তূপের সঙ্গে পচাইয়া ফেলিয়াছি। ব্যয় হ্রাস করিবার কল্পনায় নিত্য নৈমিত্তিক দেব-ব্রতগুলি, বার্ষিক ক্রিয়াকলাপ, বাপমায়ের শ্রাদ্ধ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন লোপ করিয়া দিয়াছি; আর ব্যয় বিধান শতগুণ বাড়িয়া চলিয়াছে। যে মহাপিপাসায় আমরা জর্জ্জর হইয়া পড়িতেছি, শিশির-বিন্দু তাহা নিবারণে কি সাহায্য করিবে? বাজে খরচ বোধে সেগুলি বন্ধ করিয়াছি; তাহার সঙ্গে আমাদের বৈশিষ্ট্য, আমাদের জাতীয়তা, আমাদের সাহিত্য, আমাদের কলালক্ষ্মী এবং অত্যুক্তি না হইলে বোধ হয় আমাদের মানবত্বও লুপ্ত হইতে চলিয়াছে! সেগুলির দিকে আজ যে কাহারো কাহারো নজর পড়ে নাই,—এমন কথা বলা চলে না। যাঁহারা ভাবুক, তাঁহারা সুদূর অতীতের কীর্ত্তি-সৌধগুলির ম্লান-স্মৃতি মনে করিয়া নয়নজলে সিক্ত হন এবং তাহার পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাণ পণে যত্ন করিয়া আসিতেছেন।

যে উল্লাস আনন্দের মধ্যে আমাদের জীবন গঠিত হইয়া উঠিতেছিল; যে ব্রত পূজা, দেবার্চ্চনা, অধ্যয়ন, অধ্যাপনের মধ্যে আমরা সমুন্নত হইতেছিলাম;, তাহারই একাংশে আমাদের দেশে অনাবিল হাস্য পরিহাস, আনন্দ-বিধায়ক ক্রীড়া কৌতুক, গোঠে মাঠে চাষীর সঙ্গীত-ধ্বনি, রাখাল বালকের বাঁশরী-বিনিন্দি মোহন সুরসুধা, তটিনী বক্ষে কর্ণধারের ভাটিয়াল রাগিণী আর আমাদের আঙ্গিনায় গৃহলক্ষ্মীগণের মঙ্গলকামী হুলুধ্বনির সঙ্গে মঙ্গল মাগিবার গীতি পুষ্পাঞ্জলি কত না সাহায্য করিয়া আসিতেছিল। কত পল্লী-কবির গীত-সাহিত্য, মঙ্গল-সাহিত্য, কত নিরক্ষর কবির সঙ্গীত, কত কুলবধূর করুণ কবিতা লহরী দেশের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিত আর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দরসে জাতীয়তার মূল সিঞ্চন করিয়া—জাতিকে শক্তি-শালী ও সরস করিয়া তুলিতেছিল। আজ আর দেশের সে শুভ দিন নাই, আজ আর দেশের সেই স্বচ্ছল ঐশ্বর্য্য নাই। দেশের রাজা জমিদারগণ যেমন এখন আর টাকা লইয়া, ধনসম্পদ লইয়া 'ছিনি মিনি" খেলিতে পারেন না, আমরাও আর এখন আনন্দ সুখ, শান্তি, স্বস্তি লইয়া গৌরব করিবার অধিকারী নহি। এদিকে ও গেছে—সেদিকে ও গেছে। ইহ পর উভয় কালই একই সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে।

এই উপলক্ষে আজ আমরা "মায়ের গান" শীর্ষক প্রবন্ধে চিরকল্যাণময়ী বঙ্গজননীগণের গীত গান গুলির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। "মায়ের গানেরও" কিছু মূল্য আছে, মাতৃগণের মঙ্গল কীর্ত্তনে যে আমাদের গৃহ প্রাঙ্গন—তথা সমগ্র দেশ পবিত্রিত হয়, এ বিশ্বাস আমার আছে। এই সঙ্গীত সুধার মধ্যে যে আমাদের মঙ্গল-বীজ উপ্ত আছে, এ ধারণা আমার রহিয়াছে। পাল পার্ব্বনে, পূজায়, উৎসবে, সন্তান মঙ্গলে—সুধু মঙ্গলে যে জোকার ও মেয়েলী সঙ্গীতের ব্যবহার আছে তাহা

যে কত মধুর, আমি বর্ণনায় অক্ষম। এ সকল কার্য্য আমাদের জীবনব্যাপী সকলকার্য্যের একটা অত্যাবশ্যক অঙ্গ। সন্তান জন্মের ষষ্ঠী দিনে যখন কোথাও

"ললাটে লিখিতং যত্র ষষ্ঠী জাগর বাসরে
ন হরি শঙ্করোব্রহ্মা নান্যথাপিঃ কদাচন।"

লিখিয়া সূতিকা গৃহের দুয়ারে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয় আর গৃহিণীরা হুলুধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে—

১। শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম হইল অযোধ্যা নগরে
স্বর্গে থাকি দেবগণ গো আনন্দ অন্তরে
নাচে গায় সকলে মিলিয়া।
ষষ্ঠী দিনে বিধি লিখিলেন গো রাবণ বধের আজ্ঞা
সূতিকার ঘরে গিয়া
(আমার) রামের কপালে॥ ইত্যাদি।

কোথাও বা—

২। যখন কৃষ্ণ জন্ম লইলেন দেবকীর উদরে
মথুরাতে দেবগণে পুষ্পবৃষ্টি করে—　　ইত্যাদি।

কোথাও বা কন্যা জন্মে—

৩। ওগো, গিরিরাজ, দেখ গো আসিয়া
তোমার ঘরে আজি কোটী চাঁদ মিলিয়া
এক চান্দ হইয়াছে উদয়।
আইস গিরিরাজ, আর কৈর না ব্যাজ
এমন ভাগ্য না কি আর কারো হয়।

ইত্যাদি। সঙ্গীতে মঙ্গল বরণ করিয়া লন।

তারপর কিছু দিন সব নীরব। সূতিকাগৃহ ছাড়িয়া শিশু তাহার অভিযান বাস্তু গৃহে পরিবর্ত্তন করিল। পূর্ণ কয়েক মাস গৃহখানিকে গীত-জ্যোৎস্না-পুলকিত করিয়া শিশু অন্ন ভোজনের উপযুক্ত হইয়া উঠিল। এবং এক উৎসব! এ উৎসবে গৃহে আনন্দের উৎস উথলিয়া উঠে। আত্মীয় বন্ধুগণ ঢুলী, মালী, নাপিত, ধোপা— সকলেই সেই উৎসবে আহূত হয়। ঢাকে ঢোলে, জোকার জয়ধ্বনিতে দিগন্তে উৎসব বার্ত্তা প্রচারিত হয়। হিন্দুরা এই শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষে জগজ্জননী আদ্যাশক্তির অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ৺ কালীপূজার রাত্রিতে মেয়েরা গান ধরিলেন—,

"নমস্তে শর্ব্বাণী　ঈশানী রুদ্রাণী
ঈশ্বরী ঈশ্বর জায়া"　　ইত্যাদি

কিন্তু ইদানীং বঙ্গের গৃহে কালী বিষয়ক সঙ্গীতে যুগল রামপ্রসাদের এক চেটিয়া আসন *। তবে পূর্ব্ববঙ্গে ভুবন রায়, কুমার, দেওয়ান রঘুনাথ, গোবিন্দ চৌধুরী, কমলাকান্ত প্রভৃতির ও আধিপত্য না আছে একথা বলা যায় না। সে সকল সঙ্গীতে আমাদের মাতৃমন্দির যখন মুখরিত হইয়া উঠে, তখন হৃদয়ে অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকি।

নামকরণ, অন্নাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ, গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন প্রভৃতি প্রত্যেক মঙ্গল উৎসবের জন্যই বিভিন্ন সঙ্গীত আছে। সেই সকল সঙ্গীতই যে পুরুষ বা পণ্ডিতের রচনা, তাহা নহে।

উহারমধ্যে কত যে কুলমহিলার রচনা স্থান পাইয়াছে কে তাহা নির্ণয় করিবে? কত নিরক্ষর ভাষাভূষা ছোটলোকের হাতে যে সেই সকল সঙ্গীত-কুসুম-মালা গ্রথিত হইয়াছে, তাহাও স্থির করিবার উপায় নাই। বিষ্ণুপূজা, বনদুর্গা পূজা, গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকার পূজা, শুক্‌মাই পূজা প্রভৃতি মঙ্গলোৎসবের অঙ্গীয় ব্রতাদিতে বিভিন্ন গীত গীত হয়। এ সকল গীতে 'কানুছাড়া কীর্ত্তন।' এ সকল ক্ষেত্রে শ্রীরামচন্দ্রেরই প্রাধান্য। রামচন্দ্র ও সীতার বিবাহ, উমার পরিণয় প্রভৃতি গীতেই আমাদের জননীগণ বিবাহাদি শুভ কার্য্য আনন্দ রসসিক্ত ও দেব আশীর্ব্বাদ পূত করিয়া তোলেন। বনদুর্গা পূজায় যখন ব্রতিনীগণ শেওড়া বা বটগাছের তলায় কলার "আগপাতে" খৈ, চিড়া, কলা, গুড় দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি উপকরণ দিয়া গান ধরেন—

"ভক্তিভাবে পূজিবাম তোমারে, গো বনদুর্গা,
ভক্তিভাবে গো—চিত্তভাবে।
হংস কৈতর আনছৈ গো জুলুঙ্গায় ভরিয়া (১) গো
বন দুর্গা ভক্তিভাবে।
খৈ চিড়া যে আনছ সৈ গো, ডালাতে ভরিয়া গো,
বনদুর্গা... ....

* রামপ্রসাদ সম্বন্ধে ১৩১৮ সনের চৈত্র "আত্মশক্তি" ও পরবর্ত্তী "সৌরভে" আলোচিত হইয়াছে।　— লেখক

পুষ্প দূর্ব্বা আনছ সৈ গো সাজিতে ভরিয়া গো
বনদুর্গা... ... ...
ইত্যাদি

এই সকল গীতের মধ্যে অবসর মতে রামের জন্ম, জাতকর্ম্ম, বিবাহ, গায়ে হলুদ, রামের স্নান, সীতার স্নান, ক্ষৌরকার্য্য ইত্যাদি বিষয়ক বহুগীতি আছে। এই সকল গীতের মধ্যে রাজা দশরথের আনন্দ উল্লাস ও আছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, চন্দ্রাবতীর রামায়ণ গাতি, করুণাময়ীর রামকথা প্রভৃতি প্রচলিত। আমরা সময়ান্তরে "মায়ের গান" সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

গৌর আনা গোসাই

তোমার গুণ না বল্‌লে সারে
তুমি করলে জগৎ ধন্য,
তোমার জন্য কেঁদে মরে
আজো কিন্তু লোক অগণ্য।
ধর্ম্ম কর্ম্ম যে'তে বসলো
সোঽহং বাদের ঘোর প্রাবল্যে,
তুমি এসে সেই তুফানে
হালটারে খুব চে'পে ধরলে।
তানা হ'লে হতো কি যে
প্রকাশ ক'রে বলা শক্ত,
চন্দ্র সূর্য্য ডুবে যে'ত
মান্‌ষে খেতো মান্‌ষের রক্ত।
সার্থক তোমার ভাগবত সভা
সার্থক তোমার যোগ তপস্যা,
তোমার পুণ্য জ্যোতিতেই
ঘুচে গেল অমাবস্যা।
শচী মায়ের রত্ন গর্ভে
পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হ'ল,
আচণ্ডালে যে'চে যে'চে
প্রেম শক্তি বিলাইল!
আজ যে এত দিকে দিকে,
হরিনামের এই তরঙ্গ
আজ যে এত ধিন্‌ ধিনি যে
বাজছে মধুর মৃদঙ্গ।
আজ যে এত লোক উন্মত্ত
তুলসী তলার মাটি চুমি,
কেনা জানে গোসই ঠাকুর
এ সকলের মূল যে তুমি?
অহো, জীবের কি সৌভাগ্য
যারে পায় না কঠোর তপে,
তিনি এসে দিলেন ধরা
কৃপা করে মানব রূপে!
সোঽহং সোঽহং করতো লোকে
ব্রহ্মানন্দ পাবার তরে,
প্রেমানন্দ বহাইলেন
তিনি কেবল নামের জোরে!
তাই বলি হে মুনি ঠাকুর,
তুমি ছিলে জীবের আপ্ত,
তোমার গুণ দিন যতই যাবে
ততই হবে ভুবন ব্যাপ্ত!
তোমার ঋণ আর শোধিতে কেহ
পারবে না এ ভূমণ্ডলে
সবার আগে প্রণাম দিয়ে
তাই গৌর আনা গোসাই বলে।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কবিভূষণ।

একটী সত্য ঘটনা

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি কর্ম্মোপলক্ষে গয়া ধামে অবস্থান করিয়াছিলাম। সেই সময় একবার শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজার পূর্ব্বে শ্রীকাশীধামে শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর ও শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দেবীর দর্শন বাসনায় সস্ত্রীক হিন্দুর পবিত্র তীর্থস্থান ও মোক্ষধাম বারাণসী ক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলাম। পথিমধ্যে মোগলসরাইএ গাড়ী পরিবর্ত্তনের সময় নদীয়া জেলা নিবাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্তকালীরতন বাগ্‌চির ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। কালীরতন বাবু আমার

শ্বশুর মহাশয়ের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে বন্ধুত্বভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী বিধবা, সঙ্গে তাহার ভগিনী পুত্র মাত্র ছিল। এই দুইজনকে সঙ্গী পাইয়া আমার স্ত্রী অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। আমরা চারিজনে যথা সময়ে কাশীধামে পৌছিয়া প্রথমতঃ ভাটপাড়ার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ তত্ত্বরত্ন মহাশয়ের আবাসস্থানে উপস্থিত হই। তত্ত্বরত্ন মহাশয় কাশীরাজের সভা পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার বাটীতে স্নানাহার সমাপন করিয়া বৈকালে আমরা পূজনীয় স্বর্গীয় অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। অঘোর বাবু সে কালের নাম জাদা হেডমাষ্টার ছিলেন। ছাপ্‌রা জেলাস্কুল তাঁহার শেষ কর্ম্মস্থল। ছাপরা হইতে পেন্সন লইয়া তিনি কাশীবাস করিতেছিলেন। অঘোর বাবুর পুত্র শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় তেজচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার সবিশেষ আলাপ পরিচয় ছিল। তেজ বাবু যে সময়ে ময়মনসিংহ সদরে সব্‌জজ ছিলেন, আমি সেই সময় তথাকার জেলা স্কুলে শিক্ষকতা করিতাম। ময়মনসিংহ নগরে অবস্থান সময়ে প্রতি রবিবার তথাকার দুর্গা বাড়ীতে হিন্দুগণের বিশেষতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম সভার অধিবেশন হইত। সেই সভায় উকীল, মোক্তার, মুন্সেফ, সব্‌জজ, শিক্ষক ও জমীদারগণ প্রায় অনেকেই যোগ দান করিতেন। আমি ঐ সভায় শ্রীমদ্ভাগবদগীতা অথবা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতাম। তেজ বাবু সেই সভায় আসিতেন এবং কোন কোন দিন তাঁহার বাসাতেও সান্ধ্য-সম্মিলন হইত এবং ধর্ম্ম বিষয়ে নানারূপ বার্ত্তালাপ চলিত। তেজ বাবুর শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার ও অমায়িকভাব আমার হৃদয়ে সবিশেষ অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। অঘোর বাবুও যেরূপ শ্রদ্ধা স্নেহ সমাদরে আমাকে গ্রহণ করিয়া সুমধুর বাক্যে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, তাহাতেই বুঝিয়াছিলাম, তেজ বাবু উপযুক্ত পিতার যোগ্য পুত্র ছিলেন। অঘোর বাবু আমার পরিচয় পাইয়াই কাশী ধামে আমাদিগের সাময়িক বাসস্থানের সুব্যবস্থা করিবার জন্য মনোযোগী হইলেন, কিন্তু তাহার বাসা বাটীতে আমাদের চারিজনের যোগ্য স্থান না থাকায় তাহার বাসার অনতিদূরবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে ডাকাইয়া তাহার বাটীতে আমাদিগের বাসা স্থির করিয়া দিলেন। অঘোর বাবু ও পণ্ডিত মহাশয় উভয়েই বাঙ্গালী—টোলায় বাস করিতেন। স্মৃতি রতন মহাশয় ও তাহার সহধর্ম্মিণী উভয়েরই বেশ সরল প্রকৃতি ও উদার হৃদয়। স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের স্ত্রী আমার পত্নীকে "দিদি" বলিয়া সম্বোধন করিল এবং নিজ অগ্রজার মত তাহাকে জানিয়া ও মানিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। সুতরাং বাসা সম্বন্ধে আমাদের কোনরূপ সঙ্কোচ বা উৎকণ্ঠার কারণ কিছু মাত্র রহিল না। বলিতে কি যে কয়দিন কাশীতে ছিলাম, আমরা বাসায় কোনরূপ অসুবিধা বা ক্লেশ অনুভব করি নাই। প্রতিদিন প্রাতঃকালে দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গা স্নান করিয়া বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণাদেবীর সন্দর্শন, অর্চ্চনা ও বন্দনা করিয়া অন্যান্য দেবদেবী দর্শন করিতে যাইতাম। তারপর বাসায় আসিয়া পাকের পর আহারাদি করিয়া বৈকালে প্রায় ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতাম অথবা দূরবর্ত্তী কোন দেব দেবীর মূর্ত্তি দর্শনার্থ যাইতাম। একদিন বৈকালে দুর্গাবাড়ীতে যাইয়া বানরগণের অত্যাচারে ও উৎপাতে সাতিশয় বিরক্ত ও ব্যস্ত হইয়াছিলাম, পরে পাণ্ডাগণের পরামর্শ মত চারি পয়সার ভাজা চাল তাহাদিগকে প্রদান করিলে তবে নিস্কৃতি পাইয়াছিলাম।

প্রাতিদিনই সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাসায় প্রত্যাগত হইয়া সায়ং সন্ধ্যা সমাপন করিয়া শ্রীশ্রী৺বিশ্বেশ্বর দেবের আরতি দর্শনে যাইতাম। এই আরতির ব্যাপার কি সুন্দর, কি শ্রবণ মনোহর, কি ভক্তি ভাবোদ্দীপক ও কি নয়ন সুখকর তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কাশীবাসী নরনারীগণ ও ভক্তি ভাবুক যাত্রীগণ এই দর্শনীয় ও রমণীয় আরতি সন্দর্শন করিয়া কৃতার্থ ও পুলকিত হইয়া থাকেন। বাস্তবিক যাহারা এই আরতি দর্শন করে নাই, তাহাদের নিকট—ইহার অপূর্ব্বভাব, চমৎকারিত্ব ও মনোহারিত্ব সম্যক্ প্রকারে বুঝান সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইহা আরাধনা ও উপভোগের সামগ্রী। সুকৃতিফলে এই আরতি দর্শন ঘটিলে, সেই সময় যে অদ্ভুতভাব ও অপূর্ব্ব অবস্থা উপস্থিত হয় তাহাও অবর্ণনীয় সুতরাং আমার লেখনী নিজ অক্ষমতা উপলব্ধি করিয়া সে বর্ণনা হইতে বিরত হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই আরতি দর্শনার্থ আমরা প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় যাইতাম, একদিন একটু সকাল সকাল যাইয়া দেখিলাম তখনও আরতি আরম্ভ হইতে প্রায় আধঘণ্টা বিলম্ব আছে। আরতির পূর্ব্বে যে ডমরু বাদ্য দ্বারা তাহার পূর্ব্ব সূচনা ও ঘোষণা হইয়া থাকে এবং যে বাদ্য শ্রবণে দর্শনার্থী ভাবুক ভক্তগণের আগ্রহ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সেই সুমধুর বাদ্য তখন বাজিতেছিল। আমরা বিশ্বেশ্বর দেবকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া, আরতির বিলম্ব আছে জানিয়া অন্নপূর্ণা দেবীর সন্দর্শনার্থ তাঁহারই মন্দিরাভিমুখে গমন করিলাম। সেখানে যাইয়া আমরা দেবীকে দর্শন ও প্রণাম বন্দনাদি করিবার পর মন্দিরের পূর্ব্বপ্রান্তে বসিয়া নানা বিষয়িনী কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত ও অবহিত হইলাম। প্রসঙ্গক্রমে ব্যাসকাশীর কথা উঠিল। এই প্রসঙ্গে, ব্যাসকে, তিনি কি জন্য কাশী হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, ও নিজ তপস্যার প্রভাবে স্বতন্ত্র কাশী নির্ম্মাণ করিবার অভিপ্রায়ে অন্নপূর্ণার আরাধনায় ও তপোযোগে তাঁহার সন্তোষ বিধানে যত্নশীল হইয়া কিরূপে মহামায়ার মায়ায় মোহিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার যত্ন চেষ্টা, উদ্যম ও অধ্যবসায় সকলই কিরূপে ব্যর্থ হইয়াছিল, আমরা সেই সকল বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলাম। এই সকল কথা বলিবার পর অন্নদা জরতীবেশে যেরূপে ব্যাসের নিকট যাইয়া তাঁহাকে প্রবঞ্চিত করেন, সেই কথা বলিয়া অন্নদার জরতীর বেশের যে বর্ণনা ভারত কবি ভারতচন্দ্রের অমৃতময়ী লেখনী হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল, সেই বর্ণনাটী নিম্নলিখিত প্রকারে আমি আবৃত্তি করিয়া সকলকে শুনাইতেছিলাম :—

"মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী।
ডানকরে ভাঙ্গা নড়ী বাম কক্ষে ঝুড়ী॥
ঝাকড় মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি।
হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়াকাঁদি॥
ডেঙ্গুর উকুন নীকি করে ইলি বিলি।
কোটি কোটি কাণ কোটারির কিলি কিলি॥
কোটরে নয়ন দুটি মিটি মিটি করে।
চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে॥
ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে।
শুনিতে না পান কাণে শত শত ডাকে॥
বাতে বাঁকা সর্ব্ব অঙ্গ, পিঠে কুঁজ ভার।
অন্ন বিনা অন্নদার অস্থি চর্ম্ম সার॥
শত গাঁটি ছেঁড়া টেনা করি পরিধান।
ব্যাসের নিকটে আসি হৈলা অধিষ্ঠান॥"

অন্নপূর্ণার এই জরতী মূর্ত্তির বর্ণনা যখন আবৃত্তি করিতেছিলাম এবং ১৫।১৬ জন স্ত্রীলোক পুরুষ তদ্গত চিত্তে আমার কথাগুলি আগ্রহের সহিত শুনিতেছিলেন, সেই সময় হঠাৎ একটী প্রাচীনা স্ত্রীমূর্ত্তি যষ্টিধারণ পূর্ব্বক অতিমৃদুভাবে ধীরে ধীরে আমাদিগের দিকে অগ্রসর হইয়া ক্ষাণ ও কম্পিতকণ্ঠে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "হাঁগা তোমরা কি বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখ্‌তে যাবে না?" আরতি ত আরম্ভ হয়েছে, তবে এখানে ব'সে আছ কেন?" বৃদ্ধার মুখে এই কথা কয়টী শুনিবামাত্র আমাদের শরীর মধ্যে যেন তাড়িত সঞ্চার হইল। (সেই সাময়িক ভাব, সেই অপূর্ব্ব জরতী মূর্ত্তির দর্শন তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত সেই মধুময়ী কথাগুলির স্মরণ-মননে এখনও আমার দেহে পুলকের আবির্ভাব হইতেছে!!) আমরা কোনরূপ বাক্য ব্যয় বা বৃদ্ধার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়াই সকলে অতি দ্রুতবেগে আরতি দর্শনার্থ বিশ্বেশ্বরের মন্দিরাভিমুখে প্রধাবিত হইলাম। বুড়ীকে? এবং সে কিপ্রকারে আমাদের মনোভাব অর্থাৎ আরতি দর্শনের জন্য ঔৎসুক্য বা আকাঙ্ক্ষার বিষয় জানিল, এসকল বিষয়ে কিছুমাত্র লক্ষ্য আমরা কেহই করিলাম না। ভাগবতে বর্ণিত আছে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বংশী গান শ্রবণে ব্যাকুল ও ব্যগ্র হইয়া ছুটিয়া গিয়াছিলেন, কেহ কাহার প্রতি লক্ষ্য করেন নাই :—

"নিশম্য গীতং তদনঙ্গ বর্দ্ধনং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীত মানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ
স যত্র কান্তো যবলোল কুণ্ডলাঃ॥"

অর্থাৎ সেই অনঙ্গবর্দ্ধন গীত শ্রবণে কৃষ্ণ গৃহীতমানসা ব্রজসুন্দরীগণ অলক্ষিত উদ্যমে অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের

প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, দ্রুতগমনবেগে চঞ্চল কুণ্ডলা হইয়া ভবৎ সন্নিধানে আগমন করিলেন।

রাস লীলায় গমন সময়ে গোপীদিগের যে দশা হইয়াছিল, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরাভিমুখে গমন কালে আমাদের ও সেই অবস্থা, স্বতরাং কোন কিছুর প্রতিই লক্ষ্য ছিল না মন্দিরে সমুপস্থিত হইয়া সানুরাগে ও ভক্তিভাবে প্রণত হওয়ার পরে আমরা অনন্যমনা ও অনন্য কর্ম্মা হইয়া স্থির ধীর ও গম্ভীরভাবে আরতি দর্শন ও তৎকালিক বন্দনাগীতি শ্রবণ করিতে লাগিলাম।

শুক্ল ও শুভ্র চন্দন, কুসুম, বিল্বদল, বিল্বমালা, ও পুষ্পমালা দ্বারা বিশ্বেশ্বরকে অতি অপূর্ব্বভাবে সাজান হইয়াছিল। সে সময়ের সুসজ্জিত দর্শনীয় মূর্ত্তিও না দেখিলে কাহাকেও বুঝান যায় না। নয় জন ব্রাহ্মণ সমকালে সমস্বরে সুললিত ও সুমধুর রাগে আরতির মন্ত্র গুলি আবৃত্তি পূর্ব্বক দীপ দান, কর্পূর দান ও ধূপ দান লইয়া আরতি আরম্ভ করিয়া দিলেন। মন্ত্রের কথাগুলি সমস্ত মনে নাই; কিন্তু আরতিকারী ব্রাহ্মণগণের উচ্চারিত স্বর ও সুর যেন এখনও কাণে বাজিতেছে। এখনও যেন মনে হইতেছে, সেই কথার আভাষ মাত্র শুনিয়াও মনে মনে বলিতে ইচ্ছা হইতেছে :—

জয় দেব জয় দেব, জয় গিরিজাপতে,
শিব, গিরিজাপতি দাসে পালহ নিত্য,
শিব দাসে পালহ নিত্য।
জগদীশ কৃপা করহে।

আরতির সময় মনে হয় কাশীনাথের কি বিস্ময়কর প্রভাব। অধম পাতকীর অন্তঃকরণেও স্বতঃই তাঁহার অপূর্ব্ব মহিমা ও অদ্ভুত গরিমা বিষয়ে নানাবিধ ভাবতরঙ্গ অদ্ভুত হইতে থাকে। আমরাও সেই ভাবে বিভোর হইয়া ও বাহ্যজ্ঞান বিরোহিত হইয়া কেবল দর্শনশ্রবণে পুলকিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। যথাসময়ে ও যথা নিয়মে আরতির ব্যাপার সমাপ্ত হইল। সমুপস্থিত দর্শকগণের সহিত আমরাও সমস্বরে ও উচ্চৈঃস্বরে "জয় বিশ্বেশ্বর কি জয়, হর হর হর, শিব শিব শিব, ব্যোম মহাদেব" এবং বম্ বম্ শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে বাবা বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করিয়া মন্দির প্রাঙ্গণ হইতে বহির্গত হইয়া ক্রমে ক্রমে সদর রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই সময় আমাদের মনে হইল হটাৎ যে বুড়ী আসিয়া না ভাবিয়া না শুনিয়া আমাদিগকে আরতি দর্শনার্থ যাইবার কথা বলিয়া চলিয়া গেল, সেই বুড়ী কে? এবং কি প্রকারেই বা আমাদের মনোভাব জানিতে পারিয়া আমাদিগকে হঠাৎ আরতি দর্শনের জন্য যাইতে বলিল। এই সকল আলোচনা করিতে করিতে আমি ও আমার স্ত্রী একাগ্রচিত্তে বুড়ীর কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার অনুসন্ধান জন্য পুনরায় অন্নপূর্ণার মন্দিরের দিকে ফিরিয়া গেলাম। এবং মন্দিরের চতুর্দ্দিকে যে সকল লোককে দেখিতে পাইলাম, তাহাদের প্রত্যেককে অতি ব্যস্ততার সহিত ব্যগ্রভাবে সেই বৃদ্ধার খবর জিজ্ঞাসা করিলাম। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই যথাযথ ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া সন্ধান লইলাম ও আমরাও যথাসাধ্য সবিশেষ যত্ন চেষ্টা করিয়া অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু বিস্ময় ও বিষাদের বিষয় এই যে কেহই বুড়ীর সম্বন্ধে কোন খবরই দিতে পারিল না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমাদের প্রতি দয়া করিয়া যে বৃদ্ধামূর্ত্তিতে মহামায়া দর্শন দিয়াছিলেন, সেইরূপ বৃদ্ধা যে মন্দিরের কোন স্থানে বাস করেন অথবা সময় সময় মন্দিরে বা মন্দির প্রাঙ্গণে দেখা দেন, একথাও কেহ কিছু বলিতে পারিল না। অনেকক্ষণ অনেক রকম অনুসন্ধান করিয়াও যখন কোন খবর পাইবার সম্ভাবনা নাই দেখিলাম, তখন নিতান্ত বিষন্ন মনে অগত্যা হতাশ হইয়া আমরা ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। যথা সময়ে আহারাদি সমাপন করিয়া শয়নের পূর্ব্বে অনেকক্ষণ ধরিয়া বৃদ্ধার সম্বন্ধে নানাভাবে নানা কথায় আলোচনা করিলাম। প্রাতঃকালে তারপর দিন নিত্যকৃত্য সম্পাদন পূর্ব্বক দশাশ্বমেধ ঘাটে যথা রীতি স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার দর্শন, অর্চ্চনা ও প্রণাম বন্দনা করিয়া পুনরায় বুড়ীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। দুঃখের বিষয় আমাদের অনুসন্ধানের কোনই ফল হইল না। বিফল মনোরথ হইয়া আবার বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। তার পর যে কয়দিন কাশীধামে ছিলাম পূজার সময় ও আরতির সময় সকাল সন্ধ্যায় যখন অন্নপূর্ণারমন্দিরে যাইতাম তখনই রীতিমত শ্রমস্বীকার ও যত্ন চেষ্টায় বুড়ীকে খুঁজিতাম ও যাহাকে মন্দির সমীপে পাইতাম

যা দেখিতাম, তাহাকেই আগ্রহ সহকারে ও ব্যাগ্রভাবে বুড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিতাম, কিন্তু কোন দিনই কোন খবর কেহ দিতে পারে নাই। সুতরাং একরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইল, বুড়ী কেবল আমাদিগকেই দর্শন দিয়াছিলেন। ব্যাসদেবকে যেমন জরতীবেশে বিমোহিত করিয়াছিলেন, মহামায়া সেইরূপ আমাদের সম্মুখেও বৃদ্ধারূপে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা॥
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥"

এই শাস্ত্রবচন অতিসত্য বলিয়া আমরা বুঝিয়াছি। বৈষ্ণবেরা বলেন—

'অদ্যাপি ও সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥'

আমরাও বলি—

মায়ের অপূর্ব্বমায়া কে বুঝিতে পারে?
সেই জানে মহামায়া দেখা দেন যারে॥

কাশী বাসের পর আমরা বিশ্বেশ্বরও অন্নপূর্ণার নিকট বিদায় লইয়া কর্ম্মস্থান গয়াধামে আসিয়াছিলাম। তারপর আরও ২।৩ বার কাশীদর্শন হইয়াছে। কিন্তু আর সেই "বুড়ী দর্শন" সৌভাগ্য ঘটে নাই। আজি সৌরভের পাঠকপাঠিকাগণকে এই পূর্ব্বকথার আলোচনায় একটী সত্য ঘটনার বিষয় জানাইলাম। ইতি—

শ্রীদুর্গানাথ রায়।

বাপ-দুলালী

(১)

ওলো আমার পাগ্‌লী মেয়ে,
ওলো আমার পাগ্‌লী,
ভোর না হ'তে সবার আগে
কেমন করে জাগ্‌লী?
ঊষার আলোর আমেজ পেয়ে,
দোয়েল ডাকে মিষ্টি;
তোর গলাতে মিশিয়ে, নব
বৈতালিকের সৃষ্টি!
তুইত করিস্ অলস জনে
জাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা;
সবাই বলে—পাগ্‌লা মেয়ে,
চেঁচিয়ে মারে দেশটা।

(২)

কাদামাখা মেখে কাপড় জামা,
ঘর নিকানো নিত্য!
আঙ্গুল কেটে কোটনা কোটায়
সদাই খুসী চিত্ত!
বাসন-কোসন মাজ্‌তে গিয়ে,
দুচার খানা ভাঙ্গা!
বাট্‌না বেটে আঙ্গুল থেঁতো,
কাপড় শোণিত রাঙ্গা!
এম্নি ক'রে করিস্ সদা
মায়ের সাহচর্য্য;
তবু সে তোর মা জননী
হারিয়ে ফেলেন ধৈর্য্য!
বলেন সদা—"পোড়ার মুখী,
হতচ্ছাড়ি পাগ্‌লী!
ঠেঙ্গিয়ে দেবো আচ্ছে করে—
বল্‌ছি আমি, ভাগ্‌লি!"

(৩)

লেখা পড়ায় সদাই মত্ত—
পুঁথীর পাতা ছিন্ন!
কারুর কাছে পড়িস্‌নে তুই,
বাবার কাছে ভিন্ন
দাদার খাতার সাদা পাতায়
পাখী লেখার ছন্দে—
লিখিস্ যে তুই—দাদার যাহা
লিখ্‌তে হ'ত বন্ধে!
দাদা আমার এম্নি গাধা,
বুঝেই না যে মাত্র;
চড় চাপড়ে অষ্ট পহর
যখম করে গাত্র!

(৪)

সবাই তোরে দিচ্ছে সাজা,
যাহার যত সাধ্য;
পৃষ্ঠে যেন সৃষ্টিরে তোর
নূতন ধারা বাদ্য!
তবুরে তুই সকল ব্যথা,
করে তুলিস্ ধন্যা;
সবাই যখন বলে তোরে—
বাপ-দুলালী কন্যা!

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

আলোচনা।

ময়মনসিংহের প্রাচীন কথা।

ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের "সৌরভ" পত্রিকায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ন মহাশয় "ময়মনসিংহের প্রাচীন কথা" নাম দিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। যে সকল বিবরণ গিরিশ বাবু লিখিয়াছেন, তাহা অতি উপাদেয় হইয়াছে; আশা করি, আগামী আরও অনেক মাসের সৌরভে কবিরত্ন মহাশয় অনেক উপভোগ্য বিষয় প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত করিবেন। আমরা উভয়ে সমসাময়িক এবং দেখা যাইতেছে, প্রায় সমবয়স্ক। তিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার বর্ত্তমানে বয়স ৭৭ বৎসর; আমার যাইতেছে ৭৩ তেহাত্তর; সুতরাং বড় অধিক তাফাতে নয়। তিনি যে সময়ে ময়মনসিংহ সহরে গিয়াছিলেন, আমি গিয়াছিলাম তাহার দুই বৎসর পূর্ব্বে কিন্তু আমার তখন ছাত্র জীবন ও পাঠ্যাবস্থা, তিনি সংসার প্রবিষ্ট বিষয় ব্যবসায়ী। যাহা হউক, আমাদের এই দীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ কাল আমরা এই ময়মনসিংহ নগরে ও মফঃস্বলে অতিবাহিত করিয়াছি। সুতরাং প্রাচীন কালের অনেক বিবরণ আমরা অবগত আছি। ঐ সকল বিবরণ একালের তরুণ বয়স্ক লোকদিগের নিকট মনোহর গল্প বা উপন্যাসের ন্যায় বোধ হয় এবং আমাদের মত প্রাচীন লোকদের কাছে বোধ হয় যেন আমাদের নিজের সংসার ও পরিবারের ঘটনা। এরূপ অবস্থায় যাহা কিছু লিপি বদ্ধ করা যায়, তাহা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে করাই কর্ত্তব্য এবং তাহাতে কুত্রাপি সত্যের অপলাপ না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা সমুচিত। কবিরত্ন মহাশয় হিন্দু সমাজের পৌত্তলিক সম্প্রদায় ভুক্ত লোক বলিয়া পরিচয় দিতে যাইয়া ব্রাহ্ম সমাজের লোকদের প্রতি যে অবজ্ঞা সূচক কটাক্ষ পাত করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম।

"কেশব বাবুর আগমন হইতে এখানে অনেকেরই কিছু কিছু চক্ষু বোজার অভ্যাস হইয়াছিল, তারপর গোস্বামী মহাশয়ের বক্তৃতার তেজে অনেকেই ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিলেন"

উদ্ধৃত অংশ সুরুচির পরিচায়ক নহে। হইতে অবজ্ঞার কটাক্ষ যথেষ্টই রহিয়াছে।

খনার বচন—"ইহ বাধা বুকে ঠেলি যদি সম্মুখে না দেখি মাকুন্দা তেলী"

কবিরত্ন মহাশয়ের এই সামান্ত শ্লেষ দেখিয়া কখনই লেখনী ধারণ করিতামনা কিন্তু তাহার পর সারস্বত উৎসব সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছি, কারণ তাহাতে সত্যের অপলাপ হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

"একবার সারস্বত উৎসবে রাত্রে একটী অভিনয় দেখান হয়, একখানি মৃণ্ময়ী সরস্বতী মূর্ত্তি স্থাপিত, তাহার সমীপে দুইজন ভক্ত সরস্বতীর স্তুতি করিতেছেন; এমন সময় একব্যক্তি আসিয়া একটী পদ্য পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই পদ্য হিন্দুর দেবতার ও হিন্দু সমাজের কুৎসা কীর্ত্তনে পরিপূর্ণ। অর্থাৎ মুনি ঋষিরা মাটির সরস্বতী পূজা করিতেন না, অশিক্ষিত হিন্দুরা মাটির পুতুল পূজা করে, সুতরাং এই মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি পদাঘাতে চূর্ণ চূর্ণ করিয়া ফেল।

"দখহ চিড়িয়া বুক, নাহি রক্ত একটুক,
পদাঘাতে চূর্ণ চূর্ণ কর এই মাটী" ইত্যাদি ইত্যাদি।"

ইহার পরেই গিরিশ বাবু যদি লিখিতেন যে "তখনই বুট পরিহিত দুইটী যুবক সেই সরস্বতী মূর্ত্তির দুই পার্শ্ব হইতে দণ্ডায়মান হইয়া সজোরে পদাঘাত করিতে করিতে সেই মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল।" তাহা হইলে গল্পটী খুব জমাট বর্দ্ধিত এবং অনেকের নিকট আমোদ জনক বোধ হইত।

সারস্বত সমিতি ও সারস্বত উৎসবের জন্মদাতা ও পরিচর্য্যাকারীদিগের মধ্যে আমি একজন অগ্রণী ছিলাম, সুতরাং আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, কবিরত্ন মহাশয় এই সারস্বত সম্বন্ধে প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ করিতেপারেন নাই। সরস্বতীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি গঠন করিয়া কখনও উৎসব ক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয় নাই, অথবা যেরূপ অভিনয়ের কথা লিখা হইয়াছে, তাহাও হয় নাই। এই সমিতি ও উৎসব নেহাৎ ছেলে খেলার ব্যাপার ছিলনা। দেশের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বহু লোক ইহাতে লিপ্ত ছিলেন। তদ্রূপ সমাজের উপভোগ্য বিশুদ্ধ আমোদের অনুষ্ঠান করিতে যাইয়া এরূপ অসভ্য রুচির পরিচয়

দেওয়া হইবে এটা বিশ্বাস করিতে কেমন করিয়া প্রবৃত্তি হয়, তাহাই বুঝিতে পারিনা।

মৃণ্ময় কোন মূর্ত্তিগঠন না করিয়া একবার এক জন জীবিত মনুষ্যকে বীণাপাণি সাজান হইয়াছিল। নীলকান্ত ভট্টাচার্য্য নামক একটী সুশ্রী যুবক ফৌজদারী কোর্টে এপ্রেণ্টিস ছিল, আমরা তাহাকে বীণাপাণি সাজাইয়া বসাইয়াছিলাম। আমার অন্যতম বন্ধু স্বনামখ্যাত কবি আনন্দচন্দ্র মিত্র বাণী স্তোত্র নামে এক কবিতা লিখিয়াছিলেন সে কবিতা বান্ধবে, প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা সেই মনোহর সঙ্গীত সমস্বরে গান করিয়াছিলাম। তাহার কিয়দংশ এখানে লিখিয়া দিতেছি।

জয় বিশ্বে জগত জননী
জীবন মুক্তি প্রদায়িনী,
কলুষ নাশিনী ভবে
জয়দে বরদে বাণীও।
বাল্মীকি, গৌতম, ব্যাস,
মৃত্যুঞ্জয় কালিদাস,
শঙ্কর, ভারত সুপ্ত ভারত শ্মশানে।
অযোধ্যা অবন্তি পুরী,
মথুরায় সে মাধুরী,
হায়রে কপাল দোষে ভারত দুখিনীও।
জয় বিশ্বে ইত্যাদি
মধুর মলয়ানলে, গায় ভ্রমরে কোকিলে,
বসন্তে তোমার গুণ বসন্ত বাসিনী।
আহা কিবা সুখ সঙ্গ, নাহি স্বর তাল ভঙ্গ,
হাসিছে কুসুম, নাচিছে তারা,
খেলিছে তরঙ্গিনীও।
অপরূপ দেখরে চাহিয়ে,
বসেছেন আনন্দে মায়েরে লইয়ে—
সারস্বত সুত যত মধ্যে বীণাপাণিও।
জয় বিশ্বে ইত্যাদি।

সুমধুর কবিতা যখন আমরা সমস্বরে গাহিয়াছিলাম, তখন শ্রোতৃবর্গ আনন্দে বিভোর হইয়াছিলেন, আমাদের প্রাণে যে কত আহ্লাদ, কত উৎসাহ, উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এখন আর কি বলিব?

এই অভিনয়কে কি কদাকার দিয়া কবিরত্ন মহাশয় পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা সুধিগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

উল্লিখিত ঘটনার কয়েক বৎসর পর, আর এক বৎসরের উৎসবে আমাদের অন্যতর বন্ধু স্বভাব কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস এক কবিতা লিখিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। তাহাতে ছিল—

"ভাই! কেন এ মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি মিছে পূজ আর?
তিলে তিলে অবিরত, গেল বর্ষ কত শত
তবু এ পূজার আশা মিটেনা তোমার?
কেন এ মাটির দেহে, এত ভক্তি এত স্নেহে,
প্রীতির সুবর্ণপুষ্প দেও উপহার?
কি দেখে নিরখিয়া, বলহে ভুলিল হিয়া,
এই পরিণাম তব উন্নত আত্মার?
কেন ওই মৃত মূর্ত্তি পূজ মৃত্তিকার?
কেন ওই মৃত মূর্ত্তি পূজ মৃত্তিকার?
শুনেছ কাহার কাছে, মাটিতে মমতা আছে,
বোঝে কি মাটির মন যাতনা কাহার?
চিরিয়া দেখ ও বুক, নাহি রক্ত এক টুক,
নাহিক ধমনী শিরা নাহি রক্ত ধার,
যেখানে পরাণ থাকে, লুকাইয়া আপনাকে
কেবলি মাটিতে ভরা মাটি তথাকার।
নাহিক চৈতন্য বোধ, সুখ দুঃখ হর্ষ ক্রোধ,
আছে ও নির্দ্দয় চক্ষু, নাহি অশ্রু ধার,
আছে অকর্ম্মণ্য হস্ত, নিত্য পক্ষাঘাত গ্রস্ত,
বিপদে বিপন্নে নাহি দয়ার প্রসার।
কেন ওই মৃতমূর্ত্তি পূজ মৃত্তিকার?
ভাই! কেন এ মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি মিছে পূজ আর?
কি আকাঙ্ক্ষা কি বাসনা, কি প্রার্থনা কি কামনা,
কি যে সে গভীর গুপ্ত উদ্দেশ্য তোমার?
মৃত মৃত্তিকার কাছে, কি তোমার আশা আছে?
হায় মূর্খ! এ যে দুঃখ নহে বলিবার—
কার কর উপাসনা, কি লাঞ্ছনা বিড়ম্বনা,
ভারতী জননী কিরে মৃণ্ময়ী তোমার?

যেই সর্ব্ব শক্তিময়ী, তারি কি প্রতিমা অই
অচেতন জড় পিণ্ড মৃত মৃত্তিকার?
যে বীণার বীরগাণ, জাগাইত মৃত প্রাণ
অই কি সে সঞ্জীবনী বীণা সারদার
হা মূর্খ! কেমনে হয় বিশ্বাস তোমার?"

এই কবিতা পাঠের পর দুর্গাবাড়ীর হিন্দু সভার কোন কোন সভ্য প্রাচীন হিন্দু সম্প্রদায়ের কাহারো কাহারো কাছে এই বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত করেন যে, উহা দ্বারা হিন্দু ধর্ম্মকে ও হিন্দু সমাজকে আক্রমণ করা হইয়াছে ও সে সম্প্রদায়ের নিন্দাবাদ করা হইয়াছে। তাহাতে এই বিষয়ের বিচারার্থ এক কমিশন বসিয়াছিল এবং বাবু ব্রজনাথ বিশ্বাস, বাবু অনাথবন্ধু গুহ ও বাবু রেবতীমোহন গুহ প্রভৃতি দুর্গাবাড়ীতে যাইয়া সভা করিয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা ও বিচার করিয়াছিলেন। তাহাতে এই মীমাংসা হইয়াছিল যে যদিও মৃণ্ময় মূর্ত্তির অসারতা প্রতিপাদন করিয়া কতিপয় কবিতা লিখা হইয়াছিল তথাপি তদ্দারা কোন সম্প্রদায় বিশেষকে আক্রমণ করা কি কোন ধর্ম্মের নিন্দা করা করিব উদ্দেশ্য ছিলনা; সুতরাং সে জন্য কাহারো কোনরূপ ক্ষোভের কারণ নাই। এই ভাবেই এই ব্যাপার শেষ হইয়া যায়। "আর সারস্বত উৎসবে যোগ দেওয়া হইবেনা" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করার কারণ দুর্গাবাড়ীতে কোন সভা হওয়ার কথা আর কখনও শুনি নাই, সারস্বত উৎসবে যোগদান করিতে কেহকে বিরত থাকিতেও দেখি নাই।

দুর্গাবাড়ীতে যেমন বাসন্তী পূজা, দীপান্বিতা-কালীপূজা ও দোলযাত্রা ইত্যাদি হইয়া থাকে সেইরূপ সরস্বতী পূজাও হইতেছে; তবে দুর্গাবাড়ীর এই উৎসব সারস্বত উৎসবের কয়েক বৎসর পর হইতে আরম্ভ করাতে কতকটা প্রতিযোগীতার ভাব দেখা দিয়াছিল? কিন্তু তাহাতে ঈর্ষা বিদ্বেষ কিছু ছিল না। উভয় পক্ষ হইতেই ব্যাপারের বিশুদ্ধিতা রক্ষা করিতে চেষ্টা হইত। জমিদার, তালুকদার ও ব্যবসাদার সকলেই সচ্ছন্দ চিত্তে উভয় স্থানেই চাঁদা দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তবে সকল শ্রেণীরই শিক্ষিত সম্প্রদায় হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সারস্বত সমিতির উৎসবেই অধিক যোগ দিয়াছেন।

উল্লিখিত "কবিতা পাঠের কিছু দিন পরে পাঠক সেজন্য অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, কোনও ঘটনায় তাহা পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি" বলিয়া যে কবিরত্ন মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন ইহাও সম্পূর্ণ নূতন কথা। কোন্ ঘটনা উপলক্ষ্যে লিখক ঐরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা সমুচিত; নচেৎ এ সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। যিনি কবিতা লিখিয়াছিলেন এবং যিনি তাহা পাঠ করিয়াছিলেন, সে দুজনেই এখন পর লোকে; তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিতে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াই বলা কর্ত্তব্য। সেই কবিতার রচয়িতা ও তাহার পাঠকের সমসাময়িক বন্ধু অনেকেই বিদ্যমান আছেন। ঘটনার বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিলেই আমরা বুঝিতে পারিব, কথিত অনুতাপের মূলে কতটা সত্য অথবা কল্পনা নিহিত রহিয়াছে।

ময়মনসিংহের দুর্গাবাড়ীতে হিন্দুসভা এবং সারস্বত উৎসব সম্বন্ধে অনেক কৌতুক পূর্ণ ও আমোদ জনক বিষয় আছে; গিরিশবাবু সেই সমুদয় তাঁহার প্রাচীন কথার মধ্যে প্রকাশ করিলে একালের অনেকেই তাহা উপভোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন।

আমরা সহরে যাইয়া শুনিলাম যে হিন্দু সভার ব্যাকরণকেশরী মহাশয় ব্যাখ্যা করেন যে "ঈশ্বর যদি সাকার বি না হইল, নিরাকার বি না হইল, তবে কি ঘণ্টা হইল?" শ্রদ্ধেয় ঈশানচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পূর্ব্বে পার্ব্বতী পণ্ডিত জেলা স্কুলের হেড পণ্ডিত এবং ধর্ম্মসভারও পণ্ডিত ছিলেন; তিনি সকল ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করিতেন। তখন ব্রাহ্ম সমাজের কোন লোককে সেখানে দণ্ডায়মান দেখিলে বলিতেন "বিপক্ষের চর, তুমি কিজন্য আসিয়াছ। আমি তোমাদের মস্তকে পদাঘাত করি।" কালের পরিবর্ত্তনে সুশিক্ষার সম্প্রসারণে কি না হয়? আমরা ঐ সকল পণ্ডিতের স্থলে দেখিলাম ঈশানচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শশধর তর্কচূড়ামণি, কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ ও শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম প্রভৃতি; এবং তাঁহাদের কাছে শুনিলাম ধর্ম্মের উদার ব্যাখ্যা, হৃদয় গ্রাহী উপদেশ ও প্রাণ পার্শী বক্তৃতা।

সারস্বত উৎসবের কার্য্যে ডিষ্ট্রিক্টজজ ও মাজিষ্ট্রেটদিগের মধ্যে কেহ কেহ আগ্রহের সহিত যোগদান করিতেন এবং সর্ব্ব-সাধারণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। মিঃ গ্রেজিয়ার যখন ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন তাঁহাকেও ইহাতে যোগ

দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। তিনি বলিয়া বসিলেন. কি? ইহাতে idolatry—পৌত্তলিকতা আছে সুতরাং তিনি আসিবেন না। আমরা শুনিয়া অবাক এবং ভাবিয়া ব্যাকুল হইলাম। আমরা বসন্ত পঞ্চমীর উৎসব এক নূতনতর প্রণালীতে সম্ভোগ করিবার জন্য হিন্দু-মুসলমান-ব্রাহ্ম-খৃষ্টান জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে একত্রে মিলিয়াছি—সরস্বতীর মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করা তো ছাড়িয়াই দিয়াছি, একটা পুষ্পাঞ্জলী দেওয়ার ভার যে বালক বৃন্দের উপর পড়িয়াছে তাহাও উহারা কোন প্রকারে তাড়াতাড়ি সারিয়া উৎসবক্ষেত্রে ছুটিয়া আসিতেছে—এই তো অবস্থা! তাহাতে সাহেব বাহাদুর বলিয়া বসিলেন—ইহাতে পৌত্তলিকতা আছে সুতরাং তিনি যোগ দিতে পারেন না। শুধু তাহাই নহে; তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে স্কুলের মাঠে যে সারস্বত উৎসবের প্যাণ্ডেল করা হইয়াছে সেখানে রবিবার দিবস কোন গান বাদ্য বা আমোদের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারিবে না; কারণ সেটা Sabbath day.

জামালপুর মেলার মাঠে কালীপূজা করিয়া যে মূর্ত্তি রাখা হইয়াছিল, তাহা এই সাহেব হুকুম দিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন এবং পরে যখন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর কৈফিয়ত তলব করেন, তখন বলিয়াছিলেন যে খৃষ্টান লেণ্ডে ঐরূপ মূর্ত্তি রাখিতে দিতে তিনি পারেন না। জামালপুরের মাঠটা গবর্ণমেণ্টের খাসমহাল কিনা, তাই খৃষ্টানলেণ্ড! জেলা স্কুলের কম্পাউণ্ডটাও সেই ভাবে খৃষ্টানলেণ্ড। গ্রেজিয়ার সাহেবের এই কৈফিয়ত সন্তোষজনক বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল না। তাঁহাকে গালাগালি দিয়া এজেলা হইতে বদলী করিয়া নেওয়া হয় এবং কিছুকাল পরেই সিভিলসার্ভিস ইস্তাফা দিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য করা হয়।

শ্রীকালীকৃষ্ণ ঘোষ।

প্রতিবাদের উত্তর।

ময়মনসিংহের প্রাচীন কথা গত ভাদ্র মাস হইতে সৌরভে ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছি। কোন সম্প্রদায় বিশেষ বা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি কটাক্ষ করা কি কুৎসা কীর্ত্তন করা, আমার অভিপ্রেত নহে। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই আমি ব্যক্তি বিশেষকে ভক্তিশ্রদ্ধার চক্ষুতে দেখি, বিশেষতঃ ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের অনেকের সহিতই আমার আত্মীয়তা বান্ধবতা আছে। আমি অনেক কথা চাপা দিয়া সরলভাবে সত্যকথা প্রকাশ করিয়াছি, তথাপি ভূত-পূর্ব্ব পুলিশ ইনস্পেকটার শ্রদ্ধেয় বাবু কালীকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় আমার প্রবন্ধের বিস্তৃত প্রতিবাদ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

তিনি প্রথমেই লিখিয়াছেন, "কবিরত্ন মহাশয় হিন্দু সমাজের পৌত্তলিক সম্প্রদায়ভুক্ত লোক বলিয়া পরিচয় দিতে যাইয়া ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি অবজ্ঞা সূচক কটাক্ষপাত করিয়াছেন।"

আমি পৌত্তলিক হিন্দু বলিয়া প্রবন্ধের কোনখানেই পরিচয় দিতে যাই নাই, তিনিই আমাকে পৌত্তলিক হিন্দুরূপে পরিচয় দিয়া বিদ্রুপাত্মক কটাক্ষপাত করিয়াছেন। হিন্দুরা মূর্ত্তিপূজা করে, তাই পৌত্তলিক, অর্থাৎ কুসংস্কারী।

কেশববাবুর আগমন হইতে এখানে অনেকেরই কিছু কিছু চক্ষুঃ বোজার অভ্যাস ছিল, তারপর গোস্বামী মহাশয়ের বক্তৃতার তেজে অনেকেই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিলেন।

আমার এই লেখাই ঘোষ মহাশয়ের প্রথম আপত্যজনক হইয়াছে। তাঁহার মতে চক্ষুবোজার কথাটা বড়ই খারাপ, ইহাতে নাকি ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞার কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। আমরা কিন্তু চক্ষুবোজার কথায় কিছুই দোষ দেখিতে পাই না। আমাদের মুনি ঋষিরা চক্ষু বুজিয়া ধ্যান ধারণা করিতেন। আজও হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকে চক্ষু বুজিয়া ইষ্টদেবতার ধ্যান-পূজাদি করিয়া থাকেন। আমার নিজের রচিত একটী গানেও লেখা আছে—

বসাইয়ে তারে, হৃদয় সরোজে,
বুজিয়ে যুগল আঁখি।
পূজরে সকলে প্রেমময় ফুলে,
ভকতি চন্দনে মাখি॥

এই গানে চক্ষুবোজার কথা শুনিয়া ত কুরুচি কিংবা কোন সম্প্রদায়কে কটাক্ষপাত করার কথা কেহ বলে না, অথচ বহু সহস্র লোকে আমার এই গান শুনিয়াছে। ঘোষ মহাশয়ের ইহাতে অন্তভাব আসে কেন, জানিনা। যাহা হউক, চক্ষুবোজার কথায় যদি ব্রাহ্ম সম্প্রদায়কে কটাক্ষ করা

হইয়া থাকে, তবে তিনি যে আমাকে প্রথমেই পৌত্তলিক হিন্দু বলিয়াছেন, ইহাতে কি আমাকে কটাক্ষ করা হয় নাই।

দ্বিতীয় কথা ঘোষ মহাশয় বলেন—সারস্বত উৎসবে মৃন্ময়ী মূর্ত্তি ছিল না, একটা মানুষকে স্ত্রীবেশে সাজাইয়া বীণা হাতে দিয়া রাখা হইয়াছিল, এবং "পদাঘাতে চূর্ণ চূর্ণ কর এই মাটি" এ কথাও কবিতাটিতে ছিল না; এই দুই কথা লেখাতে সত্যের অপলাপ করা হইয়াছে।

একটা মানুষের হাতে মুখে শ্বেত রঙ্‌ মাখিয়া নিশ্চলভাবে সাজাইয়া রাখিলে রাত্রিতে দূর হইতে দর্শকের মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বিশেষতঃ কবিতায় যে সকল কথা ছিল, তাহা মাটির মূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছিল। এই অবস্থায় ঐ মূর্ত্তি যে মাটীর নয়, মানুষের ভেলকি, দর্শকের মধ্যে কেহরই এরূপ উপলব্ধি হইতে পারে না। ইহাতে সত্যের অপলাপ হইল কিরূপে?

মানুষের মূর্ত্তিই হউক আর মাটির মূর্ত্তিই হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না, কথা হইতেছে কবিতাটা নিয়া, কবিতাটাতেই হিন্দুর কুৎসা কীর্ত্তন ও হিন্দুকে ঘৃণা করা হইয়াছিল। ঘোষ মহাশয় বলেন কবিতায় পদাঘাতের কথা ছিল না। এই বলিয়া তিনি কবিতাটার অনেক কথা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। আমরা তাহা হইতে ২।৪ পঙক্তি পাঠকগণের নেত্রগোচর করিতেছি। যথা—

"কেন এ মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি মিছে পুজ আর।
তিলে তিলে অবিরত,　　গেলবর্ষ শত শত,
তবু এ পূজার আশা মেটেনা তোমার॥
কেন এ মাটির দেহে　　এত ভক্তি এতস্নেহে
প্রীতির সুবর্ণ পুষ্প দেও উপহার।
ছিড়িয়া দেখহ বুক,　　নাহি রক্ত একটুক্‌
নাহিক ধমনী শিরা নাহি রক্তাধার॥
মৃত মৃত্তিকার কাছে,　　কি তোমার আশা আছে,
হায় মূর্খ! এযে দুঃখ নাহি বলিবার।
কার কর উপাসনা,　　কি লাঞ্ছনা কি যাতনা,
এই কি সে সঞ্জীবনী বীণা সারদার?
হা মূর্খ! কেমনে হয় বিশ্বাস তোমার?"

ঘোষ মহাশয় বলেন গোবিন্দচন্দ্র দাস একবার সারস্বত উৎসবে এই কবিতা লিখিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র দাস এই কবিতা কখনও পাঠ করেন নাই, তিনি কবিতা লিখিয়া ছিলেন বটে, পাঠ করিয়াছিলেন অন্য এক জন।

আমি লেখক পাঠক কেহরই নাম প্রকাশ করি নাই, ঘোষ মহাশয় লেখকের নাম অম্লানচিত্তে প্রকাশ করিয়া পাঠকের নাম গোপন রাখিয়াছিলেন। ইহার উদ্দেশ্য এই যে কবিতার লেখক হিন্দু, পাঠক ব্রাহ্ম। কবিতায় কোন দোষ থাকিলে হিন্দুর মাথায় পরুক, এ জন্য পাঠকের নাম গোপন রাখিয়া গোবিন্দ বাবুকেই পাঠকরূপেও উপস্থিত করিয়াছেন। ইহাতে কি সত্যের অপলাপ করা হয় নাই?

এই কবিতা সারস্বত উৎসবে পঠিত হওয়ার পরে ইহা নিয়া সহরময় একটা ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়, অন্য পক্ষ হইতে তুমুল প্রতিবাদ হওয়ায় লেখক গোবিন্দদাস মহাশয় কবিতার কোন কোন স্থানের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস ঘোষ মহাশয় সেই পরিবর্ত্তিত কবিতা তাহার প্রতিবাদে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। আমি যাহা লিখিয়াছি তাহা সে সময় অনেকে স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন, যাঁহারা শুনিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই লোকান্তরে ও স্থানান্তরে আছেন। সুতরাং এবিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগ উপস্থিত করা কেহরই সাধ্যায়ত্ত নহে।

তর্কের অনুরোধে পদাঘাতের কথা ছাড়িয়া দিলেও কবিতাটা অমার্জ্জিত ভাষায়ও ধর্ম্মবিদ্বেষে পরিপূর্ণ। সারস্বত উৎসব হিন্দু মুসলমানাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের আদরের বস্তু এবং সকল সম্প্রদায়ের সাহায্যে সম্পাদিত। এহেন উৎসবে ভরপুর সভার মধ্যে একটা অভিনয়েরচ্ছলে বারবার মূর্খ মূর্খ বলিয়া হিন্দুর পিতা পিতামহ প্রভৃতিকে অর্থাৎ মূর্ত্তি পূজককে গালা গালি করা ভাল কাজ করা হইয়াছিল, কি সুরুচির পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল, চিন্তাশীল পাঠক অনায়াসেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

মাটির মূর্ত্তিতে যে রক্ত নাই, শক্তি নাই, তাহা বালকেও জানে। তথাপি হিন্দুরা কেন মূর্ত্তি পূজা করে, তাহার কারণ ও শাস্ত্র কয়জনে বুঝিবার চেষ্টা করেন, কয়জনেরইবা তাহা বুঝিবার শক্তি আছে?

সাহেবেরা আমাদের শাস্ত্রের ও ধর্ম্মের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে অক্ষম, তাই তাহারা মূর্ত্তিপূজাকে পুতুল পূজা মনে

করে ও হিন্দুকে পৌত্তলিক বলে। সাহেবদের অনুকরণে নিজের পূর্ব্ব পুরুষকে যাহারা মূর্খ পৌত্তলিক প্রভৃতি সুললিত ভাষায় বিদ্রূপ করিয়া থাকেন, তাঁহারা কিরূপ লোক, পাঠক তাহা সহজে অনুমান করিতে পারিবেন।

ঘোষ মহাশয় বলেন যে এই কবিতার বিচারের জন্য দুর্গাবাড়ীতে এক কমিশন বসে, তাহাতে বিচারে ঠিক হয় যে এই কবিতায় কোনও সম্প্রদায় বিশেষের নিন্দা কি আক্রমণ করা উদ্দেশ্য ছিল না। একথা মন্দ নয়, মূর্খ মূর্খ বলিয়া মূর্ত্তি পূজক হিন্দুগণকে প্রকাশ্যে বহুবার তীব্র আক্রমণ করা হইল, তথাপি কোন ধর্ম্মকে নিন্দা কি আক্রমণ করা হইল না!

কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং।

ঘোষ মহাশয় কমিশনরদের মধ্যে উকিল ব্রজনাথ বাবুরও নাম করিতেছেন কিন্তু ব্রজনাথ বাবুই আমি এবং আরও অনেক ভদ্রলোকের মোকাবেলা বলিয়াছিলেন যে ঐ কবিতা পূর্ব্বেই তাঁহাকে দেখান হইয়াছিল তিনি তখনই বলিয়াছিলেন যে এরূপ কবিতা পাঠ করা অন্যায়। তার পর কোন্ দিনের বিচারে কবিতায় নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হইল তাহার বিন্দুবিসর্গও তিনি জানেন না।

আমি লিখিয়াছিলাম কবিতা পাঠের কিছুদিন পরে পাঠক অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন কোথায় অনুতপ্ত হইয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করিয়া বলা উচিত ছিল। আমি বলি—সকল কথা প্রকাশ করা যায় না, প্রকাশ করিতে গেলে কেঁচো তুলিতে সাপ বাহির হইয়া পড়ে—অনেক গুপ্ত রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই জন্যই আমি অনেক স্থলে নাম ধাম চাপা দিয়া গিয়াছি। বিশেষতঃ সে সময় ঘটনা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই মৃত। এজন্য এই অনুতাপ রহস্য আমি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। ঘোষ মহাশয় যদি ইচ্ছা করেন, তবে সাক্ষাতে স্মরণ করাইয়া দিতে পারি। ইতি।

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ন।
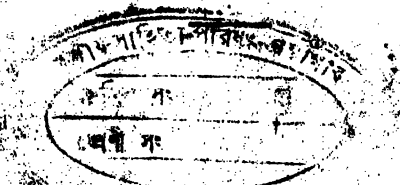
সংবাদ।

সাহিত্যিকের শেষ অবস্থা।

বহরমপুরের "প্রতিকার" পত্রের সম্পাদক, স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়কে মৃত্যুশয্যায় দেখিতে গিয়া লিখিয়াছেন,—

বিগত বিজয়ার পর ত্রয়োদশীর দিন প্রাতে আমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। তিনি তখন চৌকিতে একটী লেপ গায়ে দিয়া বসিয়াছিলেন। আমাদের দেখিবা মাত্র বাম হস্ত প্রসারণ করিয়া এস ভাই বলিয়া আহ্বান করিলেন। চন্দ্রশেখর অনবরত ধূম পান করিতেন। তাঁহার সম্মুখে গড়গড়া না দেখিয়া আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "তাম্রকূট সেবন কি তুমি পরিত্যাগ করিয়াছ?" তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—চাকরাণী নিজ-গৃহে বিবাদ করিয়া কাজ করিতে আইসে নাই। যে ব্যক্তি দুগ্ধ দিত গত পরশ্ব তারিখের দুগ্ধ নষ্ট হইয়া গিয়াছে—তাহার দাম পাইবে না বলায়—সে ট্যাকখোর লোক আর দুগ্ধ দেয় নাই। সুতরাং এ পর্য্যন্ত আমার "চা" পান হয় নাই। আমার দুরবস্থার সীমা পরিসীমা নাই। মাসাবধি আমার মস্তকে তৈল জল পড়ে নাই। একখণ্ড অপরিষ্কার "ন্যাকড়ায়" দক্ষিণ চক্ষু মুছিতে মুছিতে কহিয়া ছিলেন যে, এই দেখ ভাই চক্ষু দিয়া অনবরত-জল পড়িতেছে। চক্ষু কর্ণ উভয়ই বা জবাব দিল।"

দক্ষিণ-আমেরিকার চিলি রাজ্যের ভীষণ ভূমিকম্পের ফলে প্রশান্ত-মহাসাগরের একটি দ্বীপের একেবারে অস্তিত্ব লোপ ঘটিয়াছে। দ্বীপটির নাম ছিল ইষ্টার দ্বীপ। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ১৭২২ সালের খৃষ্টানদের ইষ্টার পর্ব্বের দিন রগেভিন ইহার আবিষ্কার করেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্তেন কুক নামক ইতিহাস-বিখ্যাত নাবিক এই দ্বীপ দেখিতে গিয়াছিলেন। দ্বীপটির আয়তন ছিল ৪৭৪৭ বর্গমাইল। এই দ্বীপে অনেকগুলি আগ্নেয় পর্ব্বত ছিল। এখানে ৫৫০ প্রস্তর মূর্ত্তি ছিল, এই সব প্রস্তর মূর্ত্তির জন্য দ্বীপটি বিখ্যাত। পাঁচফুট চওড়া দেওয়ালযুক্ত কতকগুলি পাথরের বাড়ীও ইহার আর এক বিশেষত্ব। ১৮৮৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চিলি এই দ্বীপটী তাহার এলেকাভুক্ত করিয়া লয়। চিলির নির্ব্বাসিত কয়েদীদিগকে এইখানে কয়েদ করিয়া রাখা হইত।